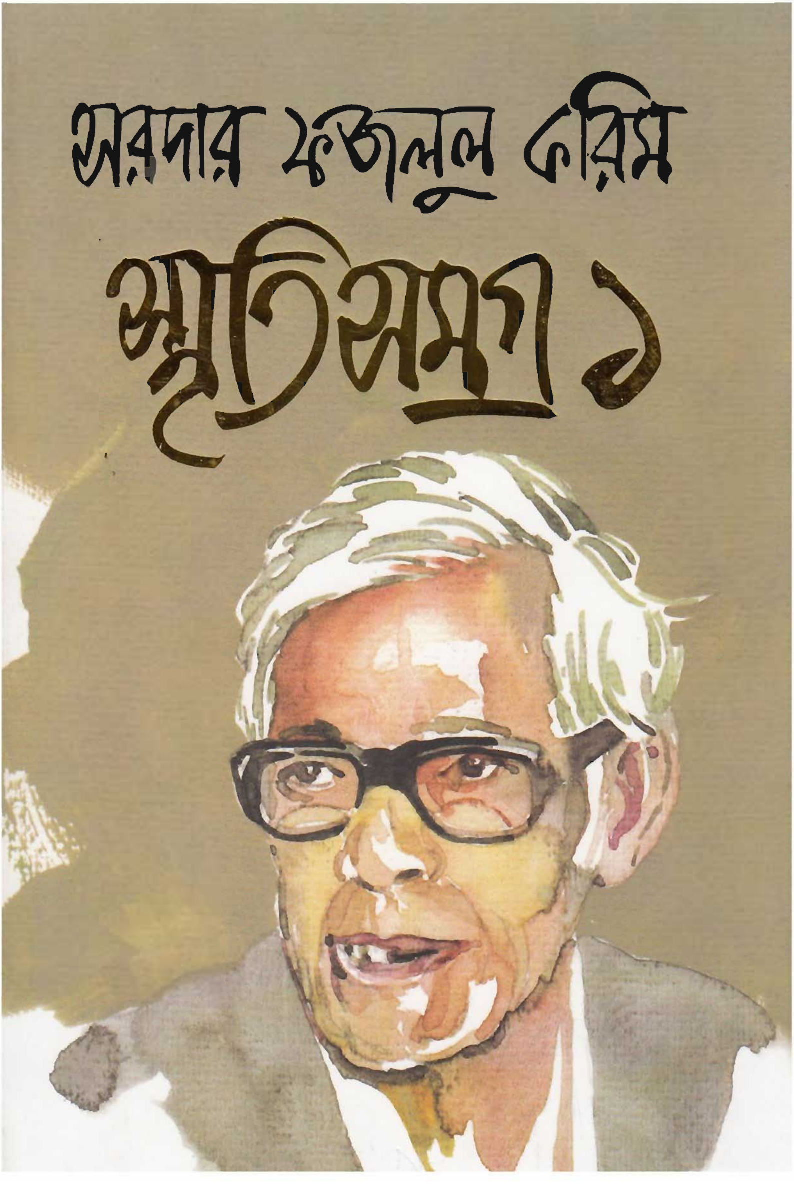

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"...সরদার ফজলুল করিম বলেন, তাঁর পুরো জীবনেই নাকি লাভ, লোকসান বলে কিছু নেই। চার বারে মোট ১১ বছর জেলখাটা নাকি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ। কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের সামনে বিলেতে বৃত্তির আমন্ত্রণপত্র ছিঁড়ে ফেলা, দলের হুকুমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়া–এসব কিছুকেই তিনি মনে করেন জীবনের পরম পাওয়া। এখন ৮৭ বছরে পা দিয়েও জীবিকার জন্য যত ছোটাছুটি, এও নাকি লাভ, আনন্দ, বেঁচে থাকার, জীবনযাপনের।..."

ISBN 984 70156 0291 8

9 847015 602918

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতিকথা ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ হতে পারে। আরও বিশেষ করে তা যদি বেরিয়ে আসে সরদার ফজলুল করিমের মতো একজনের কলম থেকে, যিনি আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শীই শুধু নন, ইতিহাস নির্মাণের শরিকও। আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত ভূখণ্ডটির বিগত প্রায় সাত দশকের ঘটনাপ্রবাহ, তার চড়াই-উতরাই, নানা বাঁককে অন্তরঙ্গ আলোয় চেনা ও বোঝার পক্ষে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠকের জন্য সরদার ফজলুল করিমের স্মৃতিচারণধর্মী রচনাগুলোর বিকল্প কমই আছে, একথা একরকম জোর দিয়েই বলা যায়। সরদার ফজলুল করিমের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পাণ্ডিত্য তাঁকে কখনো ভারাক্রান্ত করে না। দর্শনের মতো জটিল-কঠিন বিষয়কেও তিনি খুব সহজ-সরল ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে পারেন, তাঁর স্মৃতিকথা-জাতীয় রচনাগুলোতে যে গুণটি আরও সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা এবং শ্রদ্ধানিবেদন বা স্মৃতিচারণার সূত্রে কিংবা গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে অন্য বিশিষ্টজনদের অভিজ্ঞতার যে-বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন, ভাষার সারল্যে ও বর্ণনার চমৎকারিত্বে তা কেবল পাঠককে মুগ্ধই করবে না, অনেক অজানা তথ্যের মুখোমুখিও দাঁড় করাবে। লেখকের সমুদয় স্মৃতিকথাজাতীয় রচনার সংগ্রহ দুই খণ্ডে বিন্যস্ত *সরদার ফজলুল করিম : স্মৃতিসমগ্র* পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত বোধ করছি।

ISBN : 984 70156 0291 8

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

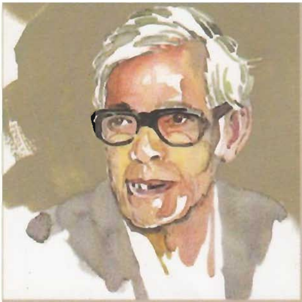

সরদার ফজলুল করিম জন্মেছিলেন ১৯২৫ সালের পহেলা মে বরিশালের আটিপাড়া গ্রামের এক কৃষক পরিবারে। বাবা খবিরউদ্দিন সরদার। মা সফুরা বেগম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৪৫ সনে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স ও ১৯৪৬ সনে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সরদার ফজলুল করিম ছাত্রজীবন থেকেই শোষণমুক্ত মানবতাবাদী একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন জীবনের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে একের পর এক লড়াই করেছেন। রাজবন্দি হিসেবে দীর্ঘ ১১ বছর তিনি কারাভোগ করেন। ১৯৫৪ সালে জেলে থাকাকালে সরদার সাহেব পাকিস্তান সংবিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৩-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষের পদে কাজ করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সরদার ফজলুল করিম ১৯৭২ থেকে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সরদার ফজলুল করিম অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে শিক্ষাক্ষেত্রে দীপ্যমান অবদান রেখেছেন। তাঁর উলেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *প্লেটোর সংলাপ*, *প্লেটোর রিপাবলিক*, *অ্যারিস্টটলের পলিটিক্স*, *এঙ্গেলসের অ্যান্টি ডুরিং*, *রুশোর সোস্যাল কন্ট্রাক্ট*, *নানা কথার পরের কথা*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক*, *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, *নূহের কিশতি*, *রুমীর আম্মা*, *দর্শনকোষ*, *শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্মারকগ্রন্থ* ও *সেই সে কাল*।

সৃজনশীল লেখক হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পদকে ও জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে ভূষিত হন।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরদার ফজলুল করিমকে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ২০০০' প্রদান করা হয়।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬০ দশকে সরদার ফজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরদার ফজলুল করিম

স্মৃতিসমগ্র ১

সম্পাদনা
মোরশেদ শফিউল হাসান

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৯
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৬৮৭৭৩ ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
পাঁচশত বিশ টাকা মাত্র

ISBN 984 70156 0291 8

SARDAR FAZLUL KARIM : SMRITI SOMOGRO, VOL : 1 (a collection of memoirs by Sardar Fazlul Karim) Edited by Dr. Morshed S Hasan. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka Five Hundred and Twenty only. US $ 18.95

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটবড় অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে গড়িয়ে এসেছে জীবন। চলার পথে কৃতী ও মহৎ অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। এসব অভিজ্ঞতা আমার চেতনায় কমবেশি ছাপ ফেলেছে। যখনই সুযোগ পেয়েছি চেষ্টা করেছি আমার এই স্মৃতির সঞ্চয়কে কলমের আঁচড়ে ধরে রাখতে। এখন দেখছি তার পরিমাণ একবারে কম নয়। আমার এই স্মৃতিলিপিগুলোর অন্য কারো কাছে কোনো মূল্য বা গুরুত্ব আছে কি না জানি না। তবে স্নেহভাজন আহমেদ মাহমুদুল হকের আবদার ফেলতে পারলাম না। রচনাগুলো একত্র করে প্রকাশ করতে চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমাকে রাজি হতেই হল। মাহমুদ আমার আরও একাধিক বইয়ের প্রকাশক। অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান এই বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। তাঁদের উভয়কে ধন্যবাদ।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

সরদার ফজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

স্মৃতিকথা ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ হতে পারে। বিশেষ করে তা যদি বেরিয়ে আসে সরদার ফজলুল করিমের মতো একজনের কলম থেকে, যিনি আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শীই শুধু নন, কতক পরিমাণে সে-ইতিহাস নির্মাণের শরিকও। আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত ভূখণ্ডটির প্রায় অর্ধশতাব্দীর ঘটনাপ্রবাহ, তার চড়াই-উতরাই, নানা বাঁককে অন্তরঙ্গ আলোয় চিনতে-বুঝতে হলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠককে তাঁর স্মৃতিচারণধর্মী রচনাগুলোর শরণাপন্ন হতে হবে, একথাটা একরকম জোর দিয়েই বলা যায়।

বহুধাবিস্তৃত তাঁর কর্মক্ষেত্র, বিচিত্র এমনকি অনেকাংশে রোমাঞ্চকর তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা। উনিশ শো চল্লিশের দশকে পূর্ব বাঙলার গ্রামীণ কৃষিজীবী মুসলমান পরিবারের একটি তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ও কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল নিয়েও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিংবা চাকুরির মোহ ত্যাগ করে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামকেই তাঁর জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকের চাকুরি-ছেড়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন বিপ্লবসাধনায়। দেশভাগের পরপর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে মুষ্টিমেয়সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান তরুণ গোপন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সরদার ফজলুল করিম ছিলেন তাঁদের নেতৃস্থানীয়দের একজন। তবে অন্য অনেকের ক্ষেত্রে যা ছিল প্রায় স্বল্পস্থায়ী সংযোগ, সরদার ফজলুল করিমের বেলায় তা-ই হয়ে দাঁড়ায় এক দীর্ঘ ঝুঁকিপূর্ণ পথচলা। জীবনের এক দশকেরও বেশি সময় তাঁর কেটেছে জেলে। জেল থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরিষদের এক অধিবেশনে যোগ দিয়ে পরবর্তী অধিবেশনে যোগ দিতে যাবার পথে বিমানেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের জন্য কাজ করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় তাঁকে আত্মগোপন অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। কাজ করেছেন গ্রামের কৃষকদের মধ্যে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার পর সারস্বতসাধনাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর মূল কর্ম। এককালের লড়াকু বিপ্লবীর পরবর্তী জীবন উৎসর্গিত হয়েছে একাগ্র জ্ঞানসাধনায় ও বিদ্যার্থীদের নিবিড় পাঠদানে। তরুণমনে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলার নিরলস প্রচেষ্টায়। আর সেখানেও তিনি একটি জীবন্ত কিংবদন্তি।

আজকের দিনে বিশেষ করে আমাদের সমাজে সততা, সারল্য, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি গুণগুলোর সঙ্গে বুদ্ধিজীবিতার দূরত্ব যখন ক্রমবর্ধমান, তখন সরদার ফজলুল করিমের ব্যক্তিত্ব আমাদের সামনে শুধু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তই নয়, অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবেও গণ্য হবার দাবি রাখে। বিদ্যার সঙ্গে ঔদ্ধত্যের কিংবা পাণ্ডিত্যের সঙ্গে উন্নাসিকতার সম্পর্ক যে আবশ্যিক নয়, বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না, আমাদের কালে ও সমাজে তিনি তার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পাদপ্রদীপের আলোয় বারবার উদ্ভাসিত হয়েও তিনি যাকে বলে মঞ্চের মানুষ তা কখনো হননি, বরং সব সময়ই থেকেছেন প্রায় নিভৃতচারীর মতো। কোনো ব্যাপারেই যাকে বলে উচ্চকণ্ঠ তা তিনি নন, বরং অনেকটাই যেন মৃদুভাষী। আপন বিশ্বাসে দৃঢ় ও একনিষ্ঠ থেকেও ভিন্নমতের প্রতি সহনশীল। দীর্ঘ স্বৈরতান্ত্রিক আবহাওয়ায় সমাজে যখন স্বাধীন চিন্তাচর্চার পরিবেশ নানাভাবে ব্যাহত হয়, ভীতি ও প্রলোভন যখন তার হিংস্র ও মধুর চেহারা নিয়ে প্রতিভাবান ও করিৎকর্মাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন আত্মরক্ষার সংগ্রামই বোধকরি একজন বুদ্ধিজীবীর মহত্তম কর্তব্য হয়ে ওঠে। সরদার ফজলুল করিম সম্পর্কে বলা যায় তিনি সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

তাঁর ব্যক্তিত্বের মতোই তাঁর রচনাও একইরকম সরল, আটপৌরে, ভানহীন। সাধারণ মানুষের প্রতি যে-দায়বদ্ধতা একদা তাঁকে বিপ্লবসাধনায় নিরত করেছিল, মনে হয় লেখক হিসেবেও তেমন কোনো বোধই তাঁকে পরিচালিত করেছে। ফলে যখন তিনি দর্শনের মতো আপাত-জটিল-কঠিন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তখন তাও লিখেছেন খুব সহজ-সরল ভঙ্গিতে। অন্তত অকারণ পাণ্ডিত্য কখনোই তাঁর রচনাকে ভারাক্রান্ত করেনি। তাঁর স্মৃতিকথা জাতীয় রচনাগুলোতে যে-গুণটি আরও সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা এবং শ্রদ্ধানিবেদন বা স্মৃতিচারণার সূত্রে কিংবা আলাপচারিতার ভিত্তিতে অন্য বিশিষ্টজনদের অভিজ্ঞতার যে-বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন, ভাষার সরলতায় ও বর্ণনার সততায় তা কেবল পাঠককে মুগ্ধই করবে না, ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্যের মুখোমুখিও দাঁড় করাবে।

মাওলা ব্রাদার্স দুই খণ্ডে সরদার ফজলুল করিমের সমুদয় স্মৃতিকথা জাতীয় রচনা সংকলন করে প্রকাশের মাধ্যমে একটি জরুরি কর্তব্য পালন করছে বলে মনে করি। 'সরদার ফজলুল করিম : স্মৃতিসমগ্র' নামে সংকলিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রধানত লেখকের আত্মস্মৃতি ও দ্বিতীয় খণ্ডে সমসাময়িক বিশিষ্টজনদের সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণ সংকলিত হয়েছে। এই বিশিষ্টজনদের মধ্যে রয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শেখ মুজিবুর রহমান, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মণি সিংহ, কাজী মোতাহার হোসেন, রমেশ শীল, অজিত গুহ, এ কে নাজমুল করিম, মুনীর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, সৈয়দ নুরুদ্দিন, জহুর হোসেন চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, অনিল মুখার্জি, জাহানারা ইমাম প্রমুখ, বিংশ শতাব্দীতে আমাদের সমাজ-রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্র যাঁদের বিশাল-বিপুল অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। চল্লিশের দশকের ঢাকা নিয়ে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা গ্রন্থের সরদার ফজলুল করিম লিখিত অংশটি এই রচনাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতাভিত্তিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ এ-বইয়ের একটি মূল্যবান সংযোজন, যা দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

লঘু-গুরু নানা বিষয়ে লেখা সরদার ফজলুল করিমের অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ, *প্লেটোর রিপাবলিক*সহ বিভিন্ন অনুবাদকর্ম কিংবা তাঁর বিখ্যাত *দর্শনকোষ* এ সবই তাঁর অমূল্য কীর্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও ভবিষ্যতে যা তাঁকে আমাদের জন্য অপরিহার্য করে তুলবে তা হল তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা ও স্মৃতিকথাসমূহ, ইতিহাসের অনেক গূঢ় সত্যকে যা আমাদের চোখের সামনে উন্মোচন করে দেয়।

ঢাকা
জানুয়ারি ২০১৩

মোরশেদ শফিউল হাসান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

বান্ধব পাঠচক্র ১১
বই পড়ার স্মৃতি ১৫
গল্প নয় ২০
আমরা আত্মাকে ডাকলাম ২৫
বঙ্গবন্ধু ৩০
২৫ বছর আগের কথা ৩৫
গুজবে কান দেবেন না ৪০
'মধ্যরাতের অশ্বারোহী'র সঙ্গে আলাপ ৪৬
একুশ থেকে একুশ ৫৮
নূহের কিশতি ৬৭
'৮৫-র 'রক্ত খরচ' ৭২
'সোভিয়েট সাম্যবাদ : এক নতুন সভ্যতা' ৭৬
'নির্বাসিতের আত্মকথা' ৮২
'বিষাদ-সিন্ধু' এবং একটি কিশোর ৮৮
'আপনারাই আমাদের ডুবাবেন।' ৯৩
চার ঘণ্টার প্যারোলে ১০১
পূর্ববঙ্গ : বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের বামপন্থী সমাজতন্ত্রী চিন্তার উদ্ভব এবং বিকাশের প্রসঙ্গ ১০৭
অনশনে আত্মদান ১২৭
একজন প্রাক্তন রাজবন্দীর ডায়রী ১৩৯
তখন আমার চারপাশে সবাই কমিউনিস্ট ১৫৬
প্রথম জেল জীবন ১৬৭
দ্বিতীয় জেল জীবন এবং বন্ডদানে মুক্তি ১৭৬
১৯৭১ : দস্তখত দিলাম তবু গ্রেফতার হলাম ১৮৫
একুশের সংকলন '৮০ : স্মৃতিচারণ ১৯১
সেই সে কাল : কিছুস্মৃতি কিছুকথা ১৯৯
সোমেন চন্দের হত্যা ২৮০
হাটুরের জীবনদর্শন ২৯১
ভিন্নধর্মী একটি স্মারক বক্তৃতা সমাজ ও রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট একটি উদ্যোগ ২৯৯
বরিশালের 'পোলা'র ঢাকা আগমন ৩০২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বান্ধব পাঠচক্র

নারায়ণগঞ্জের তরুণদের প্রতিষ্ঠিত সুধীজন পাঠাগার নামটি সুন্দর। আমারও একটি পাঠাগার ছিল। নাম 'বান্ধব পাঠচক্র'। সে অনেককাল আগের কথা। ১৯৪৪-৪৫ তো বটেই। শুনলেই বুঝা যায় 'সুধীজন' আধুনিক আর 'বান্ধব পাঠচক্র' সেকেলে। তবু এ কালের যে-তরুণরা সেকালকে কিছুটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন তাঁদের কাছে সেকালের এই 'বান্ধব পাঠচক্রের' কাহিনীটিও তত খারাপ না লাগতে পারে মনে করেই এ কথার অবতারণা।

আসলে আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারটিকে কোনো কাহিনীর নায়ক করে আমি সেদিন তৈরি করি নি। তার কোন ঘর ছিল না, কোনো দোরও ছিল না। তার কোনো মুখপাত্র ছিল না, মুখপত্রও নয়। তার বার্ষিক রিপোর্টেরও কোনো ব্যাপার ছিল না। তবু আজ স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে ব্যাপারটিকে একটা কাহিনীই বলতে হচ্ছে। আস্তে আস্তে সে দস্তুরমতো কাহিনীরই রূপ পেয়েছিল।

আদপে মহৎ কি অমহৎ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই আমি 'বান্ধব পাঠচক্র'কে তৈরি করি নি। স্কুলে থাকতেই বই পড়ার ও কেনার কিছুটা বাতিক ছিল। তার কারণ, বই পড়ার মতো সংসারের আর কোনো কাজই যে সহজ নয় তা বেশ অল্প বয়স থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বাড়িতে অতিথি মেহমান এলে হুঁকায় তামাক সেজে আগুনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিয়ে আসার ঝকমারির চেয়ে একখানা বই পড়া যে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার তা বুঝার পর থেকেই বই-এর মধ্যে ডুবে থাকার দুষ্টবুদ্ধি আমি আয়ত্ত করেছিলাম। কিন্তু সে তো অনেক ছোটকালের কথা। পরবর্তীকালে এই নিরাপদ কাজের মধ্য থেকে আর একটা মনোভাব এই গড়ে উঠল যে, কোনো একখানা বইকে ভালো লাগলে অপর বন্ধুকে তা না বলে, এমন কি না শুনিয়ে স্থির থাকতে পারতাম না।

বই পড়ুয়াদের সাধারণত ভালো ছেলে বলা হয়। আসলে আমি মোটেই ভালো ছেলে ছিলাম না। তাই স্কুলে এমন কি কলেজ জীবনেও পেছনের বেঞ্চে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসা আমি উত্তম মনে করতাম। এই সূত্রে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল পেছনের বেঞ্চেরই ছাত্রদের সঙ্গে। পেছনের বেঞ্চের বন্ধুদের একটা গুণ ছিল যে, ওদের লেখাপড়ার ব্যাপারে কোন অহঙ্কার ছিল না। আর বই পড়াটা যে আদৌ কোনো ক্রেডিট বা অহঙ্কারের ব্যাপার নয় এটা বুঝতে পেরে লেখাপড়া সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কোনো বন্ধুকে আমি সাহায্য করতে পারলে নিজেকেই ধন্য মনে করতাম। ভাবতাম তবু যা হোক, ওকে তো একটু সাহায্য করতে পারলাম।

তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বি. এ-তে ভর্তি হয়েছি। কার্জন হলের পেছনের বাড়িটা ফজলুল হক হল। আমি ফজলুল হক হলের ছাত্র। এখানে এসে বন্ধুর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেল। এখন দেখলাম আমার একটা দায়িত্বও বেড়েছে। কোনো বন্ধুর সময় কাটছে না, তাকে একটা পড়ার বই দিতে হবে। কারুর রাতে ঘুম হচ্ছে না, তাকে একটা গল্পের বই দিতে হবে। হলের লাইব্রেরি যে না আছে তা নয়। কিন্তু তার দ্বার কি সরদারের ঘরের মতো অবারিত? এ দায়িত্ব থেকেই এবার বই কেনার প্রয়োজনও বেড়ে গেল। আমার সিটের পাশের দেয়াল-শেলফগুলো বইতে ভরে গেল। এতদিন এর কোন নাম ছিল না। এবার স্বাভাবিকভাবে এর নাম হয়ে গেল 'বান্ধব পাঠচক্র'। আমি একটা ইস্যু রেজিস্টারও করলাম। হলের যে কোনো বন্ধু যখন ইচ্ছা শেলফ থেকে বই নিয়ে ইস্যু রেজিস্টারে বইয়ের নামটি লিখে রেখে যেতেন। ঘর বন্ধ থাকলেও খুলতে পারতেন। কেননা তালার চাবিটা তাঁদের জানা মতেই দরজার এক পাশে ঝুলিয়ে রাখা হত। বই কেনার জন্য কোনো চাঁদা চাই নি। কিন্তু কিছুদিন পরে বন্ধুদের অনেকেই আগ্রহভরে যে যা পারতেন বই কেনার জন্য দিয়ে দিতেন। বিষয়টা শুনে খুব বড় মনে হচ্ছে। আসলে তা নয়। বই এর সংখ্যা হয়ত পাঁচশতও ছিল না।

তবে ব্যাপারটা যে একেবার ছোট নয়—তা টের পেলাম কিছুদিন পরে। আমার সঙ্গে লাইব্রেরি গড়ার কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেল। ছাত্রদের মধ্যে কোনো কোনো মহল শঙ্কিত হয়ে বলল, বান্ধব পাঠচক্র সমস্ত ছাত্রদের বিপ্লবী করে দিচ্ছে। এসো আমরা পাল্টা লাইব্রেরি করি আর তার নাম দেই ইসলামি পাঠচক্র। আমার আনন্দ হলো এই ভেবে, এমন মহৎ প্রতিযোগিতা তো আর কিছু হতে পারে না। এরূপ লাইব্রেরি হলে আমি নিজেই তার পৃষ্ঠপোষক হব।

এরও কিছুদিন পরে বুঝলাম যে, কম্পিটিশনটা মহত্ত্বের নয়—কম্পিটিশনটার সূত্রপাত ভয়ে ও আশঙ্কায়। জ্ঞানের আশঙ্কায় হলে এবার আমার বিরোধিতাটা বেশ সংঘবদ্ধ রূপ নিতে লাগল।

আমার সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারিত হতে লাগলো : খবরদার, কেউ যেন আমার কাছ থেকে কোনো বই না পড়ে, আমার সঙ্গে কোনো আলাপে রত না হয়। তাহলে নির্ঘাত তারা সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

আসলে আক্রমণটা ব্যক্তিগতভাবে কেবল আমার ওপর ছিল না। আক্রমণটা এল এ যাবত হলে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আলাপ আলোচনায় যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত আবহাওয়া ছিল তার উপর। এই উপলক্ষে কত সুন্দর রাত্রির কথা মনে পড়ে। হলের প্রত্যেকটি ঘরে হয়ত আলো নিভে গেছে। জ্বলছে তিন সিঁড়ি ঘরে তিন আলো। তারই কোনো একটায় পূর্ব কিংবা পশ্চিম ব্যারাকের সিঁড়িতে আলোর নিচে জড়ো হচ্ছে একটি দুটি করে বন্ধু। আলোচনা হচ্ছে হিটলার মুসোলিনি স্টালিন থেকে শুরু করে দেশের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সব ধারা উপধারা নিয়ে। আলাপে মতের ঐক্যের উপর জোর নয়, জোর হচ্ছে যেমন ইচ্ছা তেমন করে নিঃশঙ্ক প্রকাশের।

কিন্তু এ আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেল। অবাধ আলোচনার জায়গায় সন্দেহ ও আক্রমণের পরিবেশ তৈরি হতে লাগল। প্রগতিমূলক পুস্তক রাখা হত বলে শহরের একটি বিশিষ্ট বই-এর দোকানে হিংসাত্মক হামলা হলো। দোকানের বই পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল একদল লোক। তারপর তার উপর দিয়ে ডলে মলে চলে গেল। হামলা শুরু হলো হলে হলে। আমি বোকার মতো হাসতাম আর নির্বোধের মতো সত্য কথা বলতাম বলে আমাকে দৈহিক পীড়নের যুৎসই লক্ষ্য না পেয়ে আক্রমণ হলো সলিমুল্লাহ হলের একটি অংশের ছাত্রদের উপর। তাদের বইখাতা জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। তবুও সেদিন ভেবেছিলাম এটা ব্যতিক্রম। (আজকালকার ঘটনায় বুঝতে পারছি ব্যতিক্রম নিয়মের পর্যায়েই এসে গেছে)।

এম. এ. পরীক্ষা হয়ে গেছে। কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করলাম। বছর খানেক কাটতে না কাটতে শুনতে পেলাম আমি নাকি বহু অন্বেষিত ব্যক্তি। কিন্তু আমার চিন্তা সেজন্য নয়। চিন্তা হলো বাক্সভর্তি বইগুলো নিয়ে আমি কী করি। এক বছর দু বছর নয়—বহু বছর ধরে বৃত্তির টাকায় কিংবা নাস্তার পয়সা বাঁচিয়ে তৈরি করেছি আমার এ লাইব্রেরি। একদিন এ ছিল কতো তরুণ মনের প্রিয়পাত্র। কিন্তু আবহাওয়াটাই এমন হয়ে উঠল যে, মনে হলো, বইমাত্রই যেন নিষিদ্ধ বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরাট একটা বাক্স ভর্তি করে রাতের অন্ধকারে জোসুয়া কুনিজের 'ডন ওভার সমরখন্দ', গোপাল হালদারের 'একদা', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', অনিল মুখার্জীর 'সাম্যবাদের ভূমিকা', হাবিবুল্লাহ বাহারের 'ছোটদের পাকিস্তান', সোমেন ঠাকুরের 'লক্ষ্মীর স্বর্গলাভ', প্যাট স্লোয়ানের 'রাশিয়া উইদআউট ইলিউশন' কিংবা নেহেরুর 'গ্লিম্পসেস অব দি ওয়ার্লড হিস্টরি' নিয়ে এ বন্ধুর বাড়ি থেকে ও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠি,—অনুরোধ করি, আমাকে রাখার দরকার নাই, আমার এ বইগুলোকে রাখো। আমার প্রস্তাবে ওঁরা আঁৎকে ওঠে, বলে—তোমার চেয়েও ওরা বিপজ্জনক।

অবশেষে এক বন্ধুর বাড়িতে গছিয়ে দিয়ে এলাম আমার বইভর্তি ট্রাঙ্কটাকে—সেই 'বান্ধব পাঠচক্রে'র মূল পুঁজিকে। মনে আশা ছিল আবহাওয়ার পরিবর্তন একদিন নিশ্চয়ই হবে। সেদিন আমি না থাকি কিংবা এ বইগুলো আমি না পড়ি, আর পাঁচজন তরুণ তো পড়তে পারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরে প্রথম কিস্তিতে এক দুই তিন করে প্রায় ছবছর পরে কারাগার থেকে একদিন মুক্তি পেয়ে প্রথমেই খোঁজ করতে লাগলাম সেই বন্ধুর, যাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম আমার বইগুলি। অনেক চেষ্টার পরে তার সাক্ষাৎ না পেলেও আমার ট্রাঙ্কটার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। বন্ধুর বাড়ি থেকে আমার সেই সুবৃহৎ ট্রাঙ্ক আমাকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে বই ছিল না একখানাও। তাতেও আমার আফসোস ছিল না। ভাবছিলাম—বইগুলো হয়ত বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব পড়তে নিয়েছে। তারই হদিস করতে জিজ্ঞেস করায় জানলাম—না, কেউ পড়তে নেয় নি, পাছে কেউ পড়ে সে আতঙ্কে বইগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মানুষ পোড়ানোর চেয়ে বই পোড়ানো সহজ। বই একটুও বাধা দেয় না। হাত পা ছুঁড়ে না।

সে যা হোক। সব চেয়ে বড় কথা হলো, বন্ধু আমার বৃহৎ ট্রাঙ্কটি ফেরত দিয়েছে; সে ট্রাঙ্কটি আমার বেশ উপকার দিয়েছে; তাতে সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র আমি রাখতে পারি। আর তার চেয়েও বড় কথা, আমার সে বন্ধু একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েছেন।

কথাটা এ পর্যন্ত টানলাম আমার ব্যক্তিগত 'বান্ধব পাঠচক্রে'র পরিণামের কাহিনীটা বলার জন্যই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই পড়ার স্মৃতি

আগে পারা যেত; কিন্তু ঢাকার রাস্তায় আজ আর নিরুদ্বেগে হাঁটা এবং নিজের মনে চিন্তা করা সম্ভব নয়। তবু যদি কখনো একটু খোলা যায়গার সাক্ষাৎ পাই, একটু নিরুদ্বেগে হাঁটার কিংবা নির্ঝঞ্ঝাটে বসার অবকাশ পাই তাহলে নিজের মনে স্মৃতিচারণ করতে আমার বেশ ভালো লাগে। সেই শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের পর্যায়গুলির কথা ভাবতে ভালো লাগে। আবার সেই স্মৃতিচারণকে যখন একটু আত্মবীক্ষণের দৃষ্টিতে দেখতে চাই তখন নিজেই অবাক হয়ে যাই। অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, বছরের হিসাবে বয়সের পরিমাণ কম না হলেও কত সামান্য সংখ্যক ঘটনার কথাই না এই স্মৃতিপটে ভেসে উঠে। খুবই সামান্য। সেই ছোটকালে স্কুলে যাওয়ার দুএকটি দিনের কথা। মা বাবার মুখ। কিশোর বয়সের প্রিয় সাথীদের কারুর নাম, বিস্মৃত নামের কোনো মুখ, অপর কারুর কণ্ঠের শব্দ। কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময় জাগে যখন দেখি এই প্রিয়জনদের মুখের সঙ্গে, তাদের কোন ব্যবহার বা ঘটনার সঙ্গে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ভেসে ওঠে কয়েকখানি বই-এরও স্মৃতি।

আর এই বই-এর স্মৃতি প্রসঙ্গেই আমার মনে প্রশ্ন এসেছে : আমরা যত বই পড়ি তার কখানাকে আমরা স্মরণ করতে পারি। স্কুল কলেজের পাঠ থেকে পরবর্তী জীবনে জীবিকার ক্ষেত্রেও যারা বই পুস্তকের সঙ্গে কম-বেশি জড়িত থাকি তারা হয়ত নিত্য নতুন বই-এর নৈকট্যে আসি। পরিচয়ের সংখ্যা কারুর কম, কারুর বেশি হতে পারে। কিন্তু সঙ্গীহীন একাকীত্বে যখন আমরা নিজেরা নিজেদের মুখোমুখি হই তখন কখানা বই আমাদের স্মৃতির পটে ভাস্বর হয়ে ওঠে? আর যারা ওঠে তারাই বা কী কারণে ওঠে? এ দুটিই আমার কাছে নিরতিশয় কৌতুকজনক প্রশ্ন বলে মনে হয়েছে।

এ প্রশ্নের কোনো নিয়ম বা জবাব আমি নিজের স্মৃতি থেকেও পাই নি। আমি ঠিক জানি নে কেন শরৎবাবুর 'পথের দাবি' আমার মনে একটি প্রিয় সাথীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবয়ব নিয়ে ভেসে ওঠে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য বই-এর নাম যে আমি জানি নে তা নয়। নাম হয়ত আমি অন্যান্য বড় সাহিত্যিকদের আরো কিছু বই-এর জানি। তাঁদের সে সমস্ত বই-এর কিছু আমি পড়েছিও। কিন্তু সে জানা জ্ঞানের কথা। আবেগের কথা নয়। তার কোনো বই পড়া ঘটনা হয়ে মনের পটে দাগ কেটে বসে নেই, যেমন রয়েছে 'পথের দাবি' পড়ার ঘটনা।

সে একটি রাতের কাহিনী। আমার কিশোর কালের কথা। কিন্তু কিশোর কালে আমি নিশ্চয়ই এই একখানি মাত্র বই-ই পড়ি নি। সন তারিখের কথা মনে নেই। হতে পারে ৩৯ কিংবা ৪০। রাতটির কথা মনে আছে। আর মনে আছে কিশোর বন্ধু মোজাম্মেলের কথা। ও-ই আমাকে বইখানা দিয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে। কিন্তু বইখানার কোনো নাম ছিল না। তার লেখকের কোন হদিস ছিল না। নাম-পৃষ্ঠাটি যত্ন করে কাটা ছিল। কেবল নাম-পৃষ্ঠা নয়। প্রতি পৃষ্ঠার মাথায় ডানে কিংবা বামে বই-এর নামের যে পুনর্মুদ্রণ থাকে সযত্নে তিনশ সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার বই-এর প্রতি পৃষ্ঠার সেই জায়গাটুকুও কাটা ছিল। বন্ধুর বলে দেওয়ার আবশ্যক করে নি যে, এ অতি নিষিদ্ধ দ্রব্য। বমাল ধরা পড়লে সেদিনই কয়েক বছর হয়ে যেত। কিন্তু সে ধমকানিও নিশ্চয়ই সেদিনের কিশোর আমিকে নিরস্ত করতে পারতো না।

সন্ধ্যার অন্ধকার না হতে পড়তে শুরু করেছি। ভারতী সব্যসাচী আর ভারতীর সেই ভালো মানুষটির কথা যার নাম এই মুহূর্তে আর মনে পড়ছে না। হাঁ, এবার মনে পড়েছে, অপূর্ব। রঙ্গমঞ্চ ব্রহ্মদেশ। রেঙ্গুনের শহরতলীতে সব্যসাচী। তার আস্তানার সামনে 'পথের দাবি' বলে দুটি কথা লেখা আছে। দেশের স্বাধীনতার সে অগ্নিপুরুষ। ডান বাম দুহাতে তার সমান চলে রিভলবার। স্বাধীনতার সংগ্রামে বিন্দুমাত্রও দুর্বলতার ক্ষমা নেই। কিন্তু স্নেহাস্পদ কোমল ভারতী আর তার প্রেমাস্পদকে তিনি স্নেহ না করে পারেন না। সব্যসাচী আজ রেঙ্গুনে, তো কাল পেনাং-এ, তার পরে সিঙ্গাপুর বা জাকার্তায়। জাহাজ এসেছে কোত্থেকে। পুলিশের লোক অবতরণের সময়ে প্রতিটি যাত্রীকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালাচ্ছে। সব্যসাচী এসেছে এই জাহাজে। তারা খবর পেয়েছে। কত লোককে তারা আটকাল। কিন্তু সব্যসাচীর সন্ধান পেল না।

যাদের আটকাল তাদের মধ্যে হ্যাংলাপনা ময়লা কাপড় পরা এক গাঁজাখোর-ও ছিল। তার ট্যাঁকে পাওয়া গেল গাঁজার কলকে। পুলিশ বলল : 'তুমি গাঁজা খাও।' সে অম্লানে বলে দিল : 'না হুজুর'। 'তবে এ কল্কি কেন?' লোকটি নিঃসঙ্কোচে বলে : 'যারা খায় তাদের জন্য আমি কল্কি বহন করি।' এই বলে সব্যসাচী বেরিয়ে এল পুলিশের জাল ভেদ করে। গা শির-শির করা এক রোমাঞ্চকর পরিবেশের কাহিনী। পরাধীন দেশের তরুণের মনকে উদ্বেল করে তোলে এমন সংলাপ ভরা কাহিনী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পথের দাবি'কে শরৎ সমালোচকগণ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করেন না। লেখক নিজেও করতেন না। কিন্তু এ রচনার জন্য লেখকের একটি সস্নেহ আবেগের কথাও সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত। বয়সকালে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনা পড়েছি, হয়ত একাধিকবার পড়েছি। কিন্তু তাঁর অন্য কোনো বই পড়া ঘটনা হিসাবে এমন আবেগের সঙ্গে আমার মনের স্মৃতিতে বিজড়িত হয়ে নেই, যেমন বিজড়িত হয়ে আছে 'পথের দাবি'। সেই যে সন্ধ্যায় পড়তে বসেছিলাম তারপর কখন যে ঘন্টা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার হাল্কা হয়ে সকালের সূর্য আবার উঁকি দিয়েছিল তা টের পাই নি। কিন্তু সেই রাতেই 'পথের দাবি' পড়া শেষ করেছিলাম। এমন একাগ্রতায় সে বয়স পর্যন্ত আর কোনো বই পড়িনি বলেই হয়ত 'পথের দাবি' পড়ার ঘটনা এমনিভাবে বিস্মরণের অতীত হয়ে আঁকা রয়েছে। স্মৃতির পাতায়।

পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' পড়ার ঘটনাটিও মনের পাতায় চোখ দিলেই আমি দেখতে পাই। হয়ত তখন আই. এ. পড়ি। এখন যে দালানে ফজলুল হক হল, তখন সেটাই ছিল ঢাকা কলেজের হোস্টেল। আমি ঢাকা কলেজে পড়তাম। কলেজের হোস্টেলে থাকতাম। হিন্দু মুসলমান ছাত্র একই হোস্টেলে থাকত। একদিকে হিন্দু ছাত্র। আর একদিকে মুসলমান ছাত্র। আমাদের হোস্টেলের সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ সাহেব। আজ আর তিনি নেই। শুনেছি মারা গেছেন। তিনি বড় কড়া লোক ছিলেন। রাত দশটার ঘণ্টা পড়লেই দারোয়ান তাঁর হুকুম মতো মেইন সুইচ নিভিয়ে দিত। দশটা বাজতেই হোস্টেলের তিন দিকের তিনটা দালানই অন্ধকারে ডুবে যেত। কেবল বাতি জ্বলত সিঁড়ির উপর। তিনটা দালানের তিনটা সিঁড়িতে তিনটা বাতি। কেমন করে জানিনে, 'গুড আর্থ' খানা আমার হাতে এসেছিল। সন্ধ্যার সময়ে হয়ত পড়তে বসেছিলাম। দশটার সময়ে ঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তখন চীনের কৃষক পরিবারে। বাবা কৃষক। ক্ষেতে গরু নিয়ে হাল দিতে গেছে। ছেলেরা বাবাকে সাহায্য করছে। কিংবা হয়ত দেখছি সমস্ত চীন জুড়ে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমেছে। খরার তাপে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। চারদিকে 'এক মুঠো ভাত দাও' কান্না ছড়িয়ে পড়ছে। হাজার হাজার মানুষ মরছে। তখনো বাংলা দেশে ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষ আসে নি। কিন্তু তবু পার্ল বাকের আঁকা এ ছবি একটি বাঙালি কিশোরের কাছে আদৌ অপরিচিত নয়। কোনো চিত্রের আকর্ষণ নয়। নিরাভরণ ভাষার কী অদ্ভুত আকর্ষণ। ইংরেজি বাইবেলের রীতিতে লেখা। তেমনি প্রাচীন ধরনের। সহজ শব্দের গাঁথুনি। সেই শব্দের তরীতে পাল তুলে আমি যেন আমারই অতি পরিচিত নদীর বুকে তর তর করে এগিয়ে চলেছি। কখনো দেখছি বাঁশের ভারে দুখানা বোঝা ঝুলিয়ে কৃষক চলছে বাজারের পথে। কখনো বাঁক নিয়ে যাচ্ছে আবার জমিদার-বাড়ির উপপত্নীদের অন্দরমহলে। ঘরের আলো নিভে যেতে সিঁড়ির গোড়ায় যেয়ে একখানি চেয়ার পেতে বসলাম। যখন বইয়ের পাতা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ তুললাম তখন হোস্টেলের পূর্ব দালানটার ওপাশে রেল ইঞ্জিনের শেডের মাথায় সকাল বেলাকার সূর্যের লাল রঙ ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে। রাত্রি জাগরণের কোন ক্লান্তি বোধ নেই। সকাল বেলাকার নির্মল হাওয়া আমার মনের আনন্দের সঙ্গে মিশে আমাকে যেন একটা নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে তুলল।

এমন স্মৃতি খুব বেশি নেই। যদি আরো থাকত, আরো হতো তাহলে তার সম্পদে নিজেকে আজ ধন্য মনে করতে পারতাম।

কেবল আর একখানি বই পড়ার কথা মনে হয়। কিন্তু সে কেবল নিজে পড়া নয়—পাঁচজনকে নিয়ে পড়ার ঘটনা। সে এক কথকতার কাহিনী।

আমি তখন রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ। যে ওয়ার্ডে থাকি সেটার নম্বর হয়ত পাঁচ। এখন ভুলে গেছি। একটা লম্বা হলঘর। পাশে কম। দুটো লোহার চৌকি পাতলে মাঝখান দিয়ে এক ফালি হাঁটার পথ। রাতে এক ঘরের মধ্যে তালাবদ্ধ থাকতাম। ওয়ার্ডের মধ্যে পঞ্চাশ কি ষাটজন রাজবন্দীর বাস। মোটামুটি এই সংখ্যা। এর মধ্যে জেলের শাসন কখনো একে চালান করে দিচ্ছে রাজশাহী থেকে রংপুর, কখনও পাবনা থেকে আমদানি করে পুরে দিচ্ছে আর এক রাজবন্দীকে এই ওয়ার্ডে। কখনো বা বাছাই করে কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ডিগ্রিবন্ধ করে ফেলেছে। তবু এর মধ্যে বন্দীরা একটা শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গড়ে তুলেছে। নিজেরা কিচেন কমিটি বানিয়েছে। তাদের কাজ রান্না-বান্না করা। চাল ডালের হিসাব রাখা। টিনের থাল পিটিয়ে গোসল আর খাওয়ার সময় ঘোষণা করা। পেপার কমিটি বানিয়েছে। এর কাজ হচ্ছে জেলের অফিস থেকে দেওয়া কয়েকখানি দৈনিক খবরের কাগজ এলে যারা ইংরেজি কিংবা বাংলা জানে না তাদের পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দেওয়া। সব কিছুরই লক্ষ্য হচ্ছে, কর্মহীন একঘেয়েমীর শ্বাসরুদ্ধকর বোঝা যেন কোনো বন্দীর বুক ভারি করে তুলে তার মনকে ভেঙে দিতে না পারে।

বন্দীদের মধ্যে বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত কর্মী। কম-বেশি বাংলা-ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। এঁরা বই পত্রিকা পড়ে নিজেদের জীবনের শূন্যতা ভরিয়ে রাখেন। কিন্তু বন্দীদের মধ্যে রয়েছে দিনাজপুর-রংপুরের কৃষক আন্দোলনের বেশ কিছু সংখ্যক কৃষক কর্মী ও নেতা। এঁদের মধ্যে যারা বয়স্ক তাদের কারোর বয়স পঞ্চাশ। কারোর পঞ্চান্ন। এরা লেখাপড়া তেমন জানেন না, কিন্তু চারদিকের পাঠের আবহাওয়ায় তাঁদের বৃদ্ধ বয়সেও শেখার ও পড়ার আগ্রহ শিশুর চেয়েও অদম্য। এই সময়ে আমার হাতে এল একখানা রাজনৈতিক ইংরেজি উপন্যাস। যুদ্ধের সময়কার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইংরেজ সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্কের পটভূমিকায় একজন অস্ট্রেলিয় সাংবাদিকের লেখা প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বই 'ডিপ্লোম্যাট'। স্ট্যালিন তখন সোভিয়েত রাশিয়ায় রহস্যময় পুরুষ। তাঁর সঙ্গে সে দেশের কিংবা বিদেশের কোনো নেতা বা সাংবাদিকের সাক্ষাতের ঘটনা এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। সেই রহস্য পুরুষকে ঘিরে এ উপন্যাসের কাহিনী। আমি ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলাম এ উপন্যাস আমি কৃষক কর্মীদের নিয়ে যৌথভাবে পড়ব। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রোজ দুপুরে খাওয়ার পরে আমরা গোল হয়ে এই বই পড়তে বসতাম। আমি কয়েক লাইন ইংরেজি পড়তাম। তারপর সেই কয়েক লাইনের বাংলা অনুবাদ করতাম। আবার কিছু দূর ইংরেজি পড়তাম। আবার সেটুকুর বাংলা করতাম। আমার শ্রোতা কজন ছিল আজ ঠিক মনে নেই। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে দুজনের মুখ এখনো আমি ভুলতে পারছিনে। একজন আভারাম সিং, আর একজন ডোমারাম সিং। দিনাজপুরের আদিবাসী কৃষক। দুজনার বয়সই ছিল পঞ্চাশের অধিক। নিজেদের বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন রয়েছে। কিন্তু কখনো এঁদের মুখ ভার করতে দেখিনি। আমারই কখনো মন ভার হলে এঁরা এসে এঁদের গাঁয়ের ভাষায় বলতেন, 'কী ভাবছেন কমরেড? মন খারাপ কেনে করছেন?' দুপুরে খাওয়ার পরে আমি একটু বিশ্রাম করতে চাইতাম। কিন্তু সেই ডিপ্লোম্যাট শোনার তাদের আগ্রহ আমার নিজের সব পরিশ্রমের কথা ভুলিয়ে দিত। খাওয়ার পরে মিনিট পনের বিশ্রামের পরেই তাঁরা আমায় ডেকে তুলতেন, 'কেনে আসেন না বাহে? আইসেন। শুরু করেন।' এমনি করে রোজ চলত 'ডিপ্লোম্যাটে'র কথকতা। হাজার পৃষ্ঠার বই হাজার দিন না লাগলেও পাঁচশ' দিনের কাছাকাছি নিশ্চয়ই লেগেছিল। এত দীর্ঘ দিন ধরে কোনো বই আমি জীবনে পড়িনি। কিন্তু এই বৃদ্ধ সাথীদের আগ্রহের উষ্ণতায় কোন বই পাঠে এত আনন্দও কোনো দিন লাভ করিনি। কী করে যে পার হয়ে গেল বন্দীত্বের এই পাঁচশ' দিন—তা টের পাই নি। কেবল যে আমার শ্রোতারাই রোজ পাঠ শেষে আগ্রহ করে থাকতেন পরের দিনটির পাঠ শুরু হবার—তাই নয়; আমিও আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করে থাকতাম এই মজলিসটির।

এখন আমরা বই পড়ি একা একা। কেউ কারুর মনের আনন্দের খোরাক অন্যকে দেইনে। আমরা বলিনে কাউকে ডেকে : এই বইখানা পড়েছেন? এই দেখুন না এই জায়গাটাতে কেমন লিখেছে! কিন্তু একদিন ছিল যখন আমরা এমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন এক একটি আত্ম-দ্বীপে বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত হয়ে যাই নি। একের মনের জ্ঞানের আনন্দ অপরকে না দিতে পারলে নিজেকে অতৃপ্ত মনে হত আভারাম সিং ও ডোমারাম সিং-এর সঙ্গে ডিপ্লোম্যাট বই পড়ে যে তৃপ্তি পেয়েছলাম বন্দীখানাতে তার স্মৃতি তাই এক অমৃতের ভাণ্ডার হয়ে আজো আমার মনে ভেসে উঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প নয়

কিশোর কয়েকটি মুখ আমার সামনে। আসরটি বসেছিল একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণে। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমি জেলে ছিলাম।

আসরের ছেলে-মেয়েরা বলল, আপনি কিছু বলুন। আমি বললাম, আমি কী বলব? তোমাদের মধ্যে আজ যারা বড় হয়েছ তারা একুশে ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের রাস্তায় ছিলে। সেক্রেটারিয়েটের সামনে মিছিল করেছ। গুলি ও গ্যাস খেয়েছ। তোমাদের জীবন রোমাঞ্চকর। কিন্তু আমি তো বন্দী ছিলাম। আমি কিছু জানিনে।

ওরা বলল : তবু আপনি বলুন।

আমি বললাম : হাঁ, তবু আমার বলার কথা যে নাই, তা নয়। আমার বলার আছে একুশের কাছে আমার দেনার কথা। ঋণের কথা। কেউ যদি তোমাদের কাউকে কিছু দেয়, দেয় এমন কিছু বিরাট ও মহৎ যা তুমি কল্পনা করতেও পার না, তাহলে সে ঋণের কথা কি তোমরা ভুলতে পার?

কেউ পয়সা ধার দিলে সে ধার ফেরত দেওয়া যায়। কেউ বই ধার দিলে তাও ফেরত দেওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি আমাকে তার জীবন ধার দেয় তাহলে কি আমি ফেরত দিতে পারি? জীবনের ঋণ কেবল জীবন দিয়েই শোধ করা যায়। কিন্তু তেমন করে শোধ করতে আমরা কজনে পারি। কিন্তু জীবনের ঋণ শোধ করতে না পারলেও তাকে ভুলে যেতেও পারিনে। কেননা জীবনদাতার ঋণ ভুলে গেলে জীবনটাই মিথ্যা হয়ে যায়।

এ জন্যই একুশে-কে আমি স্মরণ না করে পারিনে।

আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে, তাঁতিবাজারের একটা গলিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তার আগে অধ্যাপক ছিলাম। আমার কাছে ঘটনাটা এই সেদিনের বলে মনে হলেও হিসাব করে দেখলে সে আজ থেকে প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। উনসত্তরে যে কিশোররা ঢাকার বুকে রক্ত ঢেলেছিল তাদের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মের আগে। সেদিনও প্রশ্ন এসেছিল আমাদের সামনে : স্বাধীনতা। কিন্তু কার স্বাধীনতা? আজাদী। কিন্তু কার আজাদী?

প্রশ্নের জবাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ঘরে দেওয়া কিংবা পাওয়া সম্ভব নয় জেনে আমি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলাম সেদিন। আর সেই অপরাধের জন্যই পুলিশ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

গ্রেপ্তার হওয়ার পরে পুলিশ চৌকিতে প্রহার, ডিসেম্বরের কনকনে শীতে প্রায় বস্ত্রহীন থাকা—এসব কথা থাক। আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পরের দিন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে রাজবন্দীদের দীর্ঘতম অনশন ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে। আমরা যখন গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলে যাই তখন বোধ হয় অনশন ধর্মঘটের আঠারো কিংবা উনিশ দিন চলছে।

জেল গেট থেকে নাজির জমাদার আমাদের ঠেলে নিয়ে ঢুকিয়ে দির ফাঁসির সেল '৮' ডিগ্রিতে। ওরে বাপ! নাজির জমাদারের সেদিন কী আওয়াজ! কী রোষ চক্ষু। মেষ শাবকের মতো নিরীহ আমাদের চার হাত পাশে আর দশ হাত লম্বা লোহার শিক দেওয়া এক একটা কুঠুরীতে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিয়ে সে বলল : এই সেল থেকে আর বেরুতে হবে না।

আমরাও জেলে ঢুকে অনশন শুরু করে দিলাম। আমাদেরও দাবি : রাজবন্দীকে সম্মানের সঙ্গে দেখতে হবে। তার সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তখন সে অসহায়ের দাবি। জেলখানায় বন্দীর কী শক্তি। একজন রাজবন্দী অপর রাজবন্দী থেকে বিচ্ছিন্ন। সারা বাংলার কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহকুমার জেলখানাগুলোতে তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে বন্দী। জেলের উঁচু দেয়াল পেরিয়ে কাকেরও সাধ্য নেই, বন্দীদের দুর্দশার খবর বাইরে এনে ছড়িয়ে দেয়।

আমার গ্রেপ্তারের আগেই, বোধ হয় ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা জেলে অনশনরত রাজবন্দী শিবেন রায়কে ওরা মেরে ফেলেছে। অনশন করছে এই অপরাধে জোর করে খাওয়াবার নামে একদিন ষণ্ডা-মার্কা কয়েদী ও জেল কর্মচারী শিবেনের বুকে চেপে একটা রবারের নল নাক দিয়ে ফুসফুসের মধ্যে ঢুকিয়ে দম আটকিয়ে মেরে ফেলেছিল শিবেনকে।

এই অনশন শেষ হয়েছিল আটান্ন দিন পরে। এই অনশনের পরেই ঢাকার প্রখ্যাত রাজনীতিক নেতা ফণি গুহ মারা যান ময়মনসিংহ জেলে। অনশনের মধ্যে চট্টগ্রামের অমর সেন পাগল হয়ে যান।

ঢাকার অনশন শেষ হলে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে বদলি করে পাঠায় সিলেট জেলে। ১৯৫০-এর মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে।

সিলেট জেলে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার কিশোর বন্দী কাজল, গোপেশ ও বিজনের সাথে। গোপেশ আজ মালাকার। আমাদের তরুণ শিল্পীদের অন্যতম। সিলেট জেলের ডিগ্রির কুঠুরীর দেয়ালে সেদিনও দেখেছি অঙ্গারে আঁকা গোপেশের ছবি। বদ্ধ কুঠুরীতে দিন কাটাবার এবং বেঁচে থাকবার স্বাক্ষর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিলেট জেলের বন্দীরাও ঢাকার অনশনের কথা কোনো প্রকারে শুনতে পেয়ে অনশন করেছিল। কিন্তু সেখানে বন্দীদের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল তার নির্মমতার কথা বাইরে কেউ জানতে পারে নি।

অনশন করেছে, এই অপরাধে কাজল, বিজন ও গোপেশকে ভিন্ন ভিন্ন কুঠুরীতে তালাবদ্ধ করে জেলের কর্মচারী, তার সিপাহী, জমাদার ও ষণ্ডা কয়েদীরা একদিকে কিশোর বন্দীদের সামনে ভাতের থালা রেখেছে আর বিরামহীনভাবে প্রহার করে বলেছে : খা, ভাত খা।

ওরা যতই বলেছে, আমরা রাজবন্দী। তোমরা বিনা দোষে, বিনা বিচারে আমাদের আটকে রেখেছ, আমাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে হবে, ততই ওদের প্রহার বেড়ে গেছে। এত নির্যাতনেও যখন কিশোর বন্দীরা অনশন ভাঙে নি তখন ওদের কুঠুরী থেকে পানির ভাণ্ডটুকুও জেল কর্তৃপক্ষ সরিয়ে নিয়েছে।

কাজলের কথা যেন আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি : "এখন আর ওরা পানিটুকুও খেতে দিচ্ছে না। কিনতু পানির পিপাসা যে বেড়ে যাচ্ছে। ভাত না খেয়ে থাকতে পারি। কিন্তু পানির পিপাসায় শরীর যে জ্বলতে শুরু করেছে। তাই বলে বন্দীশালার সিপাহী শান্ত্রীর কাছে মাথা নোয়াতে আমরা চাই নি। এক দিন যায়। দুদিন যায়। তবু ওরা একটু পানি দিল না। মুখের ভিতরে যে লালা ছিল তাও শুকিয়ে গেছে। এখন জিভ ঘষলে রক্ত বেরোয়। ডিসেম্বরের কনকনে শীত। ঠাণ্ডা মেঝে। একটু বিছানা নাই সাথে। তবু পিপাসায় শরীর গরম হয়ে উঠেছে। একটু যদি ঠাণ্ডা করতে পারি এই চেষ্টায় গায়ের কাপড় ছেড়ে ফেলে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম ... ।"

তোমরা 'বিষাদ-সিন্ধু' পড়েছ, কারবালার কথা শুনেছ। কিন্তু এই বাংলাদেশে একদিন দেশপ্রেমিক রাজবন্দীরা যে এমনি কারবালার প্রান্তরে একটু পানির জন্য আকুল হয়ে কাতরেছে, সে কাহিনী কি তোমরা শুনেছ?

ঢাকার অনশনে কিছু সুযোগ বন্দীরা যে না পেয়েছিল তা নয়। কিন্তু তাতে কি? চারদিকে যে ঘোর অন্ধকার। দেশময় তখন স্বৈরতন্ত্রের দাপট। সিলেটের সানেশ্বর আর রাজশাহীর নাচোলের কৃষক আন্দোলনকে ওরা নির্যাতন চালিয়ে দমন করে দিতে চেয়েছে। শত শত কৃষক ও কৃষক কর্মীকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে। কত যে গুলিবর্ষণ হয়েছে, তার হিসাব আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। ইলা মিত্রের উপর অত্যাচারের কোন তুলনা নেই।

এমনি সময়ে ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল ঘটল রাজশাহী জেলের রাজবন্দীদের ঘর খাপড়ায় গুলিবর্ষণ। ঘরের মধ্যে বন্দীদের আটকে জানালার শিকে বন্দুকের নল রেখে ওরা গুলি করেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল পাঁচ জন বন্দী : দেলওয়ার, হানিফ, আনোয়ার, সুখেন ভট্টাচার্য আর সুধীন ধর। আহত হলো আরো অনেকে। আহতদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনা চিকিৎসায় সন্ধ্যা না হতে মৃত্যু হলো আরো দুজনের : কম্পরাম সিং আর বিজন সেনের।

সিলেট জেল থেকে আমাকে আবার বদলি করে নিয়ে আসা হলো রাজশাহী জেলে। এমনি করে এক জেল থেকে আর এক জেলে যাই। হাতে থাকে হাতকড়া। পাশে থাকে বন্দুক হাতে সিপাহী শান্ত্রী। রেলের স্টেশনে কিংবা গাড়িতে অথবা জাহাজের ডেকে যাত্রীরা বোবা চোখে চেয়ে থাকে কৃশদেহ লোহার বদ্ধ বন্দীর দিকে। তাদের দৃষ্টির অর্থ পড়তে পারিনে। কী আছে সে দৃষ্টিতে? অভয়, না অভিশাপ? হতাশায় মন ভরে উঠে। তবে কি নাজির জমাদারের কথাই ঠিক? আমরা কি কেউ বেরুতে পারব না এই বন্দীশালা হতে? আমাদের দেশ কি এমনি বোবা হয়ে থাকবে যুগের পর যুগ? আমাদের কি কোনো ভবিষ্যৎ নেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ? এ অবস্থা দুঃসহ। এমন জীবন তোমরা কল্পনা করতে পার? এ যে মৃত্যুর চেয়ে অধিক।

এমনি হতাশায় কাটে ৫১ সালও।

তারপর হঠাৎ এলো একুশে ফেব্রুয়ারি। এলো ৫২ সালে। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের বন্দীদের জীবনদাতা। একটি কিশোর রক্তে রাঙা।

ওর আসার দিন এখনো আমার চোখের উপর জ্বলজ্বল করে ভাসছে। ও এলো জেলের সুপার, জেলার, হেড জমাদার, সিপাহী, মেট, পাহারা সবাইকে ফাঁকি দিয়ে খবরের কাগজের একটা বিরাট ফাঁকের মধ্য দিয়ে। সে ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়ের, তেমনি আনন্দের আর কৌতুকের।

সরকার ও জেলের কর্তারা আমাদের খবরের কাগজ পড়তে দিলেও বাইরের আন্দোলনের কোন খবর আমাদের জানতে দিতে চায় না। তাই আজাদ, মর্নিং নিউজ বা পাকিস্তান অবজারভার যে পত্রিকাই জেলের ভেতরে পেতাম সবগুলোই জেলার ও পলিশের কর্তারা তন্নতন্ন করে পড়ে তা সেন্সর করে দিত। তাদের সতর্ক দৃষ্টি, বাইরের কোনো আন্দোলনের খবর যেন জেলে রাজবন্দীর কাছে পৌঁছতে না পারে। এজন্য ওরা অনেক সময়ে খবরের কাগজে কোনো আন্দোলনের খবর থাকলে তার গায়ে কালি লেপে বা কাঁচি দিয়ে কেটে খবরের কাগজে জানালা করে দিত।

তাতে আমাদের তেমন কোনো ক্ষতি হত না! আমরা কাগজের গায়ে ফুটো দেখে আন্দাজ করতাম, ওখানে নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষের কোনো খবর ছিল। নিশ্চয়ই বাইরে জনতা অত্যাচারের শেকল ভাঙার চেষ্টা করছে। এই কথা মনে করে আমরা উৎসাহ পেতাম। ৫২ সালের প্রথম দিকেই আমরা দেখছিলাম যে, আমাদের জেলের ভেতরে খবরের কাগজে জানালার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কাগজের এখানে ফুটো। ওখানে ফুটো। এখানে কালি লেপা। ওখানে কালি লেপা। এ দেখে আমরা ক্রমেই বেশি খুশি হয়ে উঠছিলাম। আমরা কেউ ছিলাম ডিগ্রিবন্ধ। আবার কেউ ছিলাম অপর বন্দীদের সঙ্গে একটা বড় ঘরে। একসাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা থাকতাম তারা খবরের কাগজের এই জানালা আঙ্গুল দিয়ে মেপে দেখতাম। কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়। খবরের কাগজের জানালা যত বড় হত আমাদের মনের আনন্দ তত বেড়ে যেত। আমরা ভাবতাম, এই যে এত বড় করে ওরা কাগজ কেটেছে, নিশ্চয়ই এখানে জনসাধারণের কিংবা ছাত্র আন্দোলনের কোনো বড় খবর ছিল।

এইভাবে খবরের কাগজের জানালা বড় হতে লাগল। সেই জানালার ফাঁক দিয়ে বন্দীশালার বাইরের জগতের মুক্ত বাতাসের আমরা কল্পনা করতাম।

একুশে ফেব্রুয়ারি নয়। বাইশে ফেব্রুয়ারির কথা বলছি। কারণ রাজশাহী জেলে ঢাকার কাগজ আমরা এক দিন পরে পেতাম। বাইশে ফেব্রুয়ারি দুপুরে কিংবা বিকেলে সিকিউরিটি জমাদার, মানে রাজবন্দীদের তদারকি জমাদার আমাদের একুশ তারিখের খবরের কাগজ দিয়ে গেল। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, নতুন কী খবর এসেছে দেখবার জন্য। কিন্তু খবর কই? কাগজই বা কই? অবাক চোখে দেখলাম, কাগজের মাথায় কাগজ কেটে ওরা বিরাট এক দরজা বানিয়ে দিয়েছে। সে দরজা দিয়ে ইচ্ছে করলে আমরা পুরো মানুষ মাথা গলিয়ে এপার-ওপার যাওয়া-আসা করতে পারি।

আমরা করলামও তাই। খবরের কাগজের অত বড় জানালা দেখে আমাদের মনে ফূর্তি আর ধরে না। চোখ থেকে আনন্দের পানি ঝরতে আরম্ভ করেছে। আমরা ছেলে বুড়ো, কিশোর অ-কিশোর, কৃষক, শ্রমিক যত রাজবন্দী একসাথে ছিলাম তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে লাগলাম। আমরা চিৎকার করে বলতে লাগলাম : আমরা জীবন পেয়েছি। আর আমাদের মারে কে? দেখ, দেখ, কত বড় জানালা। জানালা নয়ত দরজা। শেকল ভাঙার দরজা। মুক্তির দরজা। আর সেদিনকার সন্ধ্যা না ঘনাতে সত্যি সেই খবরের কাগজের দরজা দিয়েই শুনতে পেলাম ছাত্র-জনতার মিছিলের আওয়াজ : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। ছাত্র হত্যার বিচার চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আত্মাকে ডাকলাম

পাকি দখলদার বাহিনীর হাতে বন্দী ঢাকার অসহায় মানুষ আমরা। ওরা ২৫শে মার্চ রাতে অতর্কিত আক্রমণে আমাদের ঘেরাও করে ফেলল। ট্যাংক, কামান, রকেট ও মেশিনগানে ওরা ঢাকার বুকে সে রাতে রাজারবাগ পুলিশ ঘাঁটিতে, পিলখানায়, ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল।

পুরো ২৬ তারিখ ওরা সান্ধ্য আইন জারি রেখে চালাল হত্যালীলা। ২৭শে মার্চ কয়েক ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন তুলে নিতেই হাজার নয়, প্রায় লক্ষ অসহায় মানুষ কাপড়-চোপড়ের একটি করে পুঁটুলি নিয়ে অবোধ শিশুদের কোলে কাঁখে মাথায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ঢাকা শহর ছাড়ার জন্য। সন্ধ্যা হয়, তবু অসহায় ভয়ার্ত মানুষের বিরাম নেই। বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে পেলাম না কোথায় যাবে ওরা? কেমন করেই বা যাবে? হানাদার বাহিনী বিনা অজুহাতে গুলি করছে, আগুন দিচ্ছে। ২৬ তারিখ বিকেলে মতিঝিল কলোনীর বাসা থেকে দেখলাম দক্ষিণ দিকে উর্দ্ধগতি কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। সেদিন বুঝি নি। পরে শুনেছি, সেদিন ওরা ইত্তেফাককে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে। কিন্তু এতো মানুষ কেমন করে বেরিয়ে যাবে এই অবরুদ্ধ ঢাকা শহর থেকে? খবর পেলাম শহর ছাড়ার সময়েও বহু মানুষকে পাকি বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে। জিঞ্জিরা বাজারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড তো কয়েক দিন পরের ঘটনা। ২রা কিংবা ৩রা এপ্রিল ওরা চারিদিক ঘেরাও করে সকাল থেকে গুলি করতে আরম্ভ করেছে জিঞ্জিরায় আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার মানুষের উপর। জাহাজের ওপর কামান বসিয়ে জিঞ্জিরা বাজার তাক করে ওরা গোলাবর্ষণ করেছে। চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ভয়ার্ত মানুষ কোরান খুলে বসেছে, কলেমা পড়েছে আর পাকি বাহিনী হাসতে হাসতে মেশিনগানের ঝড় তুলে ভয়ার্ত মানুষকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে আর ব্যঙ্গ করে বলেছে : কলেমা পড় লিয়া তো আব শহীদ হো যাও!

AMARBOI.COM

এই ভয়ংকর অবস্থায় ছোট্ট তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি আর আমার স্ত্রী কোথায় যাব, কোথায় পাড়ি জমাব? তাই আমরা প্রায় মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। বন্দী ঢাকাতেই রয়ে গেলাম।

তার পরের জীবন? সে তো মৃত্যুর পরে মৃতের জীবন। তার আকুতি ও অসহায়তার কথা কোনদিন সাথী কাউকে শোনাতে পারব, এমন কথা সাহস করে ভাবতে পারি নি। যে অযুত প্রাণের সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে আমাদের মতো হতভাগ্য মানুষ বেঁচে থাকতে পেরেছে এবং সেই ভয়ংকর দিনগুলির স্মৃতিচারণ করতে পারছে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সে ঋণের কোন প্রতিদান নেই। আজ মনের চোখে যখন এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরের মাসগুলোর প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তের পাতা উল্টেপাল্টে দেখি তখন সে জীবনকে কী করুণ ও অসহায় বোধ হয়!

বন্দী ঢাকার রাস্তায় লোকজন নেই। বিকেল না হতে খা খা করে। সামরিক বাহিনী টহল দেয়। গাড়ির মাথায় মেশিনগান বসানো। একাডেমি শুধু আমাদের অফিস নয়। একাডেমি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এ জন্যই ২৬শে মার্চ সকালে ওরা একাডেমি লক্ষ করে কামান দেগে একাডেমিকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। গণজাগরণের দিনগুলোতে একাডেমি ছিল সহস্র জনতার পায়ের ধ্বনিতে মুখরিত। এপ্রিল, মে মাসেও একাডেমিতে সকালে গিয়েছি আর দুপুরে ঘরে ফিরেছি, অফিস করতে নয়, উদ্বেগাকুল আর বিপন্ন সহকর্মীদের খবর দিতে, খবর নিতে। কেমন আছেন? কেমন আছ? বিপদ হয় নি তো কোনো? জড়ো হই মনের সাথে যার মনের বন্ধন আছে তার সাথে দুটো কথা বলতে : জয়বাংলা বেতার তরঙ্গটা কাল যে শুনতে পেলাম না। বলতে পার কোন পয়েন্টে ওকে ধরা যায়? কানের কাছে মুখ নিয়ে বলার মতো বন্ধু জবাব দেয় : সেটের একেবারে ডান দিকে, বিবিসির কাছেই। ওরা এখন শর্টওয়েভে ছাড়ছে।

আলাপ করি : কালকের সংবাদ পরিক্রমা আর সংবাদ বিচিত্রা শুনেছেন? 'এক মুজিবের কণ্ঠ হতে লক্ষ মুজিবের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি' গানটি খুব ভালো লেগেছে। বিবিসি খবর দিয়েছে, ঢাকায় মুক্তিবাহিনী অ্যাকশন শুরু করেছে।

: টিক্কা খান কি সত্যি আছে? অনেকে তো বলে এ টিক্কা সে টিক্কা নয়। অন্য কাউকে টিক্কা বলে চালিয়েছে। আসল টিক্কা খতম হয়েছে।

: পাকি ফৌজ খতম হচ্ছে কম নয়। ওরা তিন দিনে খতম করতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে। আজ তিন দিন থেকে তিন মাস গড়িয়ে চলেছে। ভাইজানরা বুঝতে শুরু করেছে, বাংলাদেশ বড় কঠিন জায়গা।

: কিন্তু আর কতোকাল?

: অস্থির হয়ো না। দেখো না ভিয়েতনামের যুদ্ধ। বাংলাদেশে নতুন ভিয়েতনামের স্বাধীনতার মরণপণ লড়াই শুরু হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: ভবিষ্যদ্বক্তা জিন ডিকসনের বাণী, দেখো, ঠিক ফলে যাবে। আগেও তো এর বাণী ফলেছে বলে শুনা গেছে।

: কী বলেছে জিন ডিকসন?

: কেন শোনো নি, জিন ডিকসন বলেছে, ১৯৭১ সালে এশিয়া ভূখণ্ডে জন্মলাভ করবে নতুন এক স্বাধীন রাষ্ট্র। আর কোনো এক রাষ্ট্রনেতা হয় পাগল হয়ে যাবে, আত্মহত্যা করবে, নয়ত নিহত হবে।

: খেয়াল রেখো, আলোচনার সময় সন্দেহজনক কোনো লোক যেন না আসে।

: প্লানচেটে বিশ্বাস করো, তুমি?

: আজ সবকিছুতে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি তাকেই যে আমাকে আশ্বাস দেয় এই নরপিশাচদের মৃত্যুর।

: তোমরা তো প্লানচেটে বিদেহী আত্মা ডাকতে পার। বসো না প্লানচেটে অফিসেই একবার। কী করব আমরা, অসহায় বন্দী মানুষেরা? আমরা তাই করলাম। দুই বন্ধু বসলেন টেবিলে। আঙ্গুলে আঙ্গুল ঠেকিয়ে। চক্ষু বন্ধ। অক্ষরে অক্ষরে আত্মারা প্রশ্নোত্তরের সংকেতভূমি রচনা করা হলো। উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

: কই এলো কেউ?

চোখ বন্ধ করা প্লানচেটের আসনের বন্ধু প্রশ্ন করলেন আত্মাকে : আপনি যদি এসে থাকেন, আপনার নাম বলুন।

আঙ্গুল কেঁপে কেঁপে চলতে থাকে। অক্ষর থেকে অক্ষরে চলতে চলতে আঙ্গুল নাম বলে : হক সাহেব। হক সাহেবের আত্মা এসেছে। আবার প্রশ্ন হয়।

: বাংলাদেশ স্বাধীন হবে? স্বাধীন হলে বলুন : হাঁ।

আঙ্গুল নড়ে উঠল। ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে অক্ষর থেকে অক্ষর ঘুরে আত্মা জবাব দিল : হাঁ।

আবার প্রশ্ন হলো : আপনি বলুন আমাদের এ মুক্তি সংগ্রাম জয়লাভ করবে কোন ফ্রন্টে—অর্থনীতির ক্ষেত্রে—না যুদ্ধের ফ্রন্টে?

আঙ্গুল আবার নড়ে। আবার জবাব তৈরি হয় : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

: আপনি বলুন, কত দিনে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে?

আঙ্গুল আবার নড়ে। জবাব বেরোয় : সময় লাগবে।

: আপনি যদি জানেন তা হলে বলুন, কোন বছর এ যুদ্ধের শেষ হবে?

জবাব এলো : '৭২ সালে।

: বলুন, কোন মাসে?

আঙ্গুল নড়ে, জবাব তৈরি হয় : এপ্রিল মাসে।

জবাব শুনে মনটা যেন একটু দমে যায়। কেননা এর আগে কোনো কোনো আত্মা আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে, ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই পাকিস্তানের চরম পরাজয় ঘটবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী বলব এই প্লানচেট করাকে? কোনোদিন এমনভাবে বিদেহী আত্মার আগমনকে বিশ্বাস করি নি বা গুরুত্ব দেই নি। ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষার সময়ে ছাত্রছাত্রী নাকি এরূপ প্লানচেট করে থাকেন। পরীক্ষায় তাঁরা কৃতকার্য হবেন কিনা, তা আগাম জানার জন্য। এ কথা শুনে হেসেছি। কিন্তু নিজেদের ভাগ্যের চরম পরীক্ষার ভবিষ্যৎ জানতে আজ আর আত্মাকে ডাকার ব্যাপারটি নিয়ে পরিহাস করতে পারছি নে। বুদ্ধি দিয়ে বুঝি যে, প্লানচেটে আসনগ্রহণকারীর জবাবের আঙ্গুল যেন আমাদের বন্দী মনের স্বপ্নের ইঙ্গিতে অক্ষর গুণে গুণে চলে। তবু, তবু তো তাকে অবিশ্বাস করতে মন চায় না।

কিন্তু প্লানচেটে মজার কাহিনীও ঘটে। বন্ধু বলে : জিন্নাহ সাহেবের আত্মাকে কাল রাতে ডেকেছিলাম।

: ভারী মজার তো। তারপর? তারপর?

: মেজাজটা বড় কড়া। কথা বলতে চায় না। নাম বলতে চায় না।

: কী জিজ্ঞেস করেছিলে?

: জিজ্ঞেস করেছিলাম, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কী?

: কী বলল?

: কথা বলতে চায় না।

: তারপর?

: আবার জিজ্ঞেস করলাম, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে?

: জবাব দিল, হবে।

: আচ্ছা, বড় মজার জবাব তো। ভূতের মুখে রাম নাম!

: তখন চেপে ধরলাম, বলুন, কবে হবে?

: কী বলল?

: এর আর জবাব দিতে চায় না। বারবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু জবাবও দেয় না, আবার আমাদের আঙ্গুল থেকে ভরও সরায় না। অনেক কষ্টে শেষে তাকে তাড়াতে হয়েছে।

প্লানচেটের আত্মা আমাদের ব্যক্তিগত ভাগ্যের হদিস দিতেও কসুর করত না।

জিজ্ঞেস করেছি, বারট্রান্ড রাসেল কিংবা আব্রাহাম লিংকনকে : বলুন, অধ্যাপক ... কোথায় আছেন?

জবাব এসেছে : আগরতলায়।

আমি করুণভাবে বললাম : তোমাকে না বলেছিলাম, আমার ভবিষ্যৎটা একটু জিজ্ঞেস করবে।

বন্ধুবর মুখখানা ম্লান করে বলল, করেছিলাম, কাল রাতে।

: কী জবাব দিল আত্মা?

AMARBOI.COM

: বলল, ভবিষ্যৎ ভালো নয়। তোমার পক্ষে ইন্ডিয়া চলে যাওয়াই ভালো। আমি জানি, তাতে আমার নিজের জীবনের নিরাপত্তা আসবে। তখন আর দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টার প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেন্ড মৃত্যুর আতঙ্ক থাকবে না। কিন্তু অবোধ শিশু আর স্ত্রী নিয়ে আমার সংসার। সংসার নয়, ছোট্ট পাখির বাসা। আমার মতোই হাজার হাজার পরিবার অসহায়। আমি কোথায় যাব আমার পাখির বাসাকে বর্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে। না, আমি তা পারবো না। প্রতি রাতে বাসার দুয়ারে জীপের শব্দে শিশুপুত্র আতঙ্কে আমাকে জড়িয়ে ধরে : 'আব্বা, এই জীপ এসে থেমেছে।' আমি জানি, ঐ জীপ একদিন আমার জন্যই আসবে। আসুক। এসে আমাকে টেনে নিক। গুলি করে মেরে ফেলুক। তবু যেন না পাখির ছানার মতো আমার নিরীহ সন্তানদের উপর অত্যাচার করে। শুধু আজ নয়, করুণ হাসি ফুটেছে নিজেরই মুখে সেদিনও, এই নির্বোধ কামনায়। কত শিশুকে ওরা খুন করেছে মা-বাবার সামনে, সে কাহিনী কি কান থেকে কানে ছুটতে ছুটতে সেদিন আমার কানেও পৌঁছে নি? তবু আমি ছেড়ে যেতে পারি নি। আমার অসহায় স্ত্রী আর সন্তানদের আরো অসহায় করে। আমাকে পেলে হয়ত পশুগুলো ওদেরকে হত্যা করবে না, হয়ত শুধু আমাকেই নিয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে না পেলে যে ওদের উপর মুহূর্তের বিলম্ব না করে পশুর দল ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তাই প্রতি রাতে জীপের শব্দ পেলেই বুকের স্পন্দন বেড়ে গেলেও তৈরি হই দরজার উপর সবুট লাথির জন্য : খোল দো, দরওয়াজা খোল দো।...

বিদেহী আত্মার কথা বিফল হলো না। ভবিষ্যৎ আমার ভালো নয়। ৭ই সেপ্টেম্বর একাডেমিতে যেয়ে বসতেই শাদা পোশাক পরা দুটো পাঞ্জাবী পাষণ্ড এসে ঘরে ঢুকে আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে বলল : আর ইউ সরদার ফজলুল করিম। আমি বললাম : হ্যাঁ। ওরা বলল, 'ইউ আর টেকন ইনটু কাস্টডি', 'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো।' বলেই প্রায় জোর করে অপেক্ষমাণ জীপে আমাকে তুলে নিয়ে বেদনাহত বন্ধুদের চোখের সুমুখ দিয়ে মুহূর্তে জীপটা বেরিয়ে এল বহু বছরের স্মৃতি বিজড়িত বাংলা একাডেমির অফিস থেকে।

জীপের মধ্যে শূন্য চোখে বসে বসে নিজের মনের দিকে তাকাই। দেখি মন বলছ : বিদেহী আত্মার কথা তো মিথ্যা হলো না। ভূত-ভবিষ্যতের কথা হয়ত জানে এই বিদেহী আত্মারা। তাহলে মিথ্যা হবে না সেই বাণীও : স্বাধীন হবে বাংলাদেশ। আমরার মৃত্যুর আশঙ্কা, কিংবা মৃত্যু—সে তো আজ লক্ষ ঘটনার একটি মাত্র ঘটনা। কিন্তু ইতিহাসের চাকা কি বর্বর দস্যুর দল আমাদের হত্যা করে স্তব্ধ করতে পারবে? কোন দস্যুর দলই কি পেরেছে কোনোদিন? ...

জীপটা এতক্ষণে শহরের রাস্তা ঘুরে ক্যান্টনমেন্টের পথ ধরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু

'তোমার নেতা, আমার নেতা—শেখ মুজিব, শেখ মুজিব'—কোনো একদিন এ আওয়াজ যদি কয়েকটি যুবকের বা একটি মাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের থেকে থাকে, তবে আর একদিন এ আওয়াজই ফ্যাসিস্ট বর্বর পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে সংগ্রামী বাংলাদেশের একমাত্র সার্বজনীন আওয়াজে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসে মহান নায়কদের নাম আছে। সানইয়াত সেন, লেনিন, স্টালিন, গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ নেতার কথা আমরা পড়েছি। কিন্তু ইতিহাস মানেই অতীত। তা আমার কাছে দূর আর অপ্রত্যক্ষ। আর তাই ইতিহাসের এক কালের মহান নায়কদের জীবনের সঙ্গে অন্য কালের পাঠক আবেগময় যোগ উপলব্ধি করতে পারে না। বুদ্ধি দিয়েই ইতিহাসের মহান নেতাদের জীবনের তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সঙ্গে ১৯৭১ সালের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনের যে আবেগময় সম্পর্ক রয়েছে একদিন হয়ত তার ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য ইতিহাসের গবেষণার বিষয় হবে, কিন্তু আজ তা আমাদের প্রতিটি জীবনের গর্বের, গৌরবের আর আনন্দের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। আর ইতিহাসেরও এ এক অপার বিস্ময়।

গল্প শুনেছি, শেখ সাহেব গেছেন অপর এক সহকর্মীর বাড়িতে বেড়াতে কিংবা কাজের কথা বলতে। বাড়ির উঠানে পা দিতে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর পাঁচ থেকে দশ বছরের শিশু মোর্চার সঙ্গে। তারা কাঠির মাথায় কাগজ বেঁধেছে, নিশান লাগিয়েছে। সারিবদ্ধ হয়েছে আর ছোট্ট উঠানে চক্রাকারে ঘুরছে আর বলছে : 'তোমার নেতা, আমার নেতা—শেখ মুজিব, শেখ মুজিব'; 'ভুট্টোর মুখে লাথি মার—বাংলাদেশ স্বাধীন কর; ইয়াহিয়া খানের মুসলমানি—এক পোয়া দুধে তিন পোয়া পানি।' ঘুরে ফিরে আবার : 'তোমার নেতা, আমার নেতা—শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।' স্বাধীন বাংলার মুক্ত আকাশের নিচে নিঃশঙ্কচিত্তের ধ্বনি নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশাল ঝড়ের পূর্বক্ষণে আকাশে ধূসর কালো মেঘগুলো যখন ঈশান কোণে কেবল পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে, সেই মহালগ্নের আওয়াজ কচি কচি কণ্ঠে। জানিনে কর্মব্যস্ত উদ্বেগভরা প্রতিদিনের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে শিশুদের এই মোর্চার সামনে পড়ে তাঁর মনে কী আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে মানুষ দোজখের আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েও জীবনের হাসি হাসতে পারেন, তিনি শিশু মোর্চার সামনে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম আতঙ্কে বলে উঠেছিলেন : 'আরে বাবা, তোদের নেতা শেখ মুজিব!! এমন বিচ্ছুদের নেতা হওয়ার আমার সাহস নাই।'

কিন্তু বাংলাদেশ জানে, শেখ মুজিব এই বিচ্ছুদেরই নেতা হয়েছিলেন, যে কিশোর তরুণ বিচ্ছুরা জল্লাদ বাহিনীর হাতের রাইফেল কেড়ে নিয়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য হাজারে হাজারে সংগ্রামের ক্ষেত্রে রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। ওদের সেই সংগ্রামী চোখের সামনে আশা ও সাহসের দেদীপ্য শিখা হয়ে জ্বলছিল যুদ্ধক্ষেত্রের বাঙ্কারে, অন্ধকার গোপন আড্ডায়, বন্দীর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে, জ্বলছিল একটি নাম, একটি প্রতীক : শেখ মুজিব।

শেখ মুজিব একজন মানুষ। তা আমরা জানি। তাঁর দেহ আছে। তাঁর সুস্থতা-অসুস্থতা আছে। আমাদের মতো তাঁরও আত্মজন আছে। বৃদ্ধ পিতা আছেন। মা আছেন। তাঁর অবোধ সন্তান আছে। তবু বাংলাদেশের দুর্জয় সংগ্রাম আর সাহসের প্রতীক শেখ মুজিব যেন ব্যক্তি শেখ মুজিবকে অতিক্রম করে গেছে। এ প্রতীক শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা বন্দী, মুক্ত সব মানুষের কাছে ৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রি থেকে একটি পবিত্র আশা ও স্বপ্নের রূপ ধরে ভাসছিল।

২৭শে মার্চ। পাকি জল্লাদ সামরিক বাহিনী কারফ্যু কয়েক ঘণ্টার জন্য হ্রাস করেছে। বাসা থেকে দুরুদুরু বুকে রাস্তায় বেরিয়েছি। মেশিনগান রেডি পজিশনে সৈন্যবাহিনীর গাড়িগুলো টহল দিচ্ছে। দেখতেই বুক কেঁপে উঠছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ফকিরাপুল বাজারের দিকে এগুচ্ছি। বাজারের মুখ ইটের বেরিকেডে তখনো বন্ধ। ভয়ার্ত মানুষ কিছু জড়ো হয়েছে। একটা মিলিটারি ট্রাক দেখে ভয়ে আবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ছে। আমিও ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়েছি টি অ্যান্ড টি কলোনীর দেয়ালের মধ্যে। মনে হলো, একজন বাঙালি পুলিশকে ঘিরে বেশ কিছু লোক কী যেন বলছে। কাছে গেলাম। শত মুখে কোটি কোটি প্রাণের একমাত্র প্রশ্ন সেই বাঙালি পুলিশটির উপর বর্ষিত হচ্ছে : আপনি ছিলেন শেখ সাহেবের বাসায় ২৫ তারিখ রাতে? আপনি গার্ড ছিলেন? বলুন শেখ সাহেব কেমন আছেন? কোথায় আছেন? কী বললেন? ওরা গ্রেফতার করেছে? হায় আল্লাহ! বেঁচে আছেন তো? বেঁচে আছেন তো শেখ সাহেব? বেঁচে আছেন তো? এই এক প্রশ্ন। এই প্রশ্ন শুধু সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মনেরই দিনরাত্রির প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন ছিল বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে সহানুভূতিশীল বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের।

দখলদার বাহিনীর হাতে বন্দী ঢাকার মানুষ আমি। পাখির মতো ছোট্ট বাসাটির চারপাশে কেবল ঘুরি। ডানে বায়ে সশংকিত চোখে পথ চলি। ফ্যাসিস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায়েনার সাথে দেশি কুকুরও নাকি পথে নেমেছে। যখন-তখন ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পথ থেকে, হাট থেকে, বাসা থেকে। রাত-দুপুরে, ভরসন্ধ্যায়। শেষরাতের নিস্তব্ধতায়। তবু এর মধ্যে মানুষ ফিসফিস করে কথা বলে। কানের কাছে নিয়ে ট্রানজিস্টার সেটে স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ আর চরমপত্র শুনতে চায়। একদিন যদি সে আওয়াজ খুঁজে না পায় তো হতাশায় মনটা ভরে উঠে। 'শুনেছ, যাত্রাবাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে আকাশবাণী শোনার অজুহাতে। শুনেছ, পুরান শহরে আওয়াজ দিয়েছে জল্লাদের দল, আকাশবাণী আর স্বাধীন বাংলা শুনলে গুলি করা হবে।' তবু কানের কাছে মানুষ তুলে নেয় দেবদুলাল বাবুর দরদভরা সহানুভূতির আওয়াজকে : "ভয় নেই বন্ধু। এ মৃত্যুর শেষে জীবনের সূর্য উঠবেই। ঐ শোন মুক্তিবাহিনীর বিষাণ বাজছে।"

হাঁটছিলাম পথ দিয়ে। পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটি বৃদ্ধা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। জীবনের আর ভয় কী! এই মৃত্যুর মাঝে। তাই যেন অসম সাহসে কথা বলে চলেছে সঙ্গের মানুষটিকে ডেকে ডেকে : "হুনছো! ফাঁসি দিবে বোলে হারামজাদারা শেখ মুজিবকে। দেশময় ঘরবাড়ি জ্বালাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ মারছে। আবার ফাঁসি দিবে শেখ মুজিবকে। আল্লাহ কি নাই? সইবে না এ পাপ। ওরা মরবে। এই হারামজাদারা মরবে।" বৃদ্ধা বলেই চলেছে সেদিনের নিষিদ্ধপুরীতে সবচেয়ে নিষিদ্ধ কথা।

বর্বরের হাস্যকর সাহস দেখাতে কোনো চিন্তা হয় না। তাই সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করেছিল : শেখ সাহেব কি জীবিত আছেন, তখন জল্লাদ ইয়াহিয়া জবাব দিয়েছিল : হাঁ, আজ জীবিত আছে, কিন্তু কাল থাকবে এমন কথা কে বলতে পারে? সেদিন সেই পাপিষ্ঠের এই ব্যঙ্গোক্তিতেও আমরা শিউরে উঠেছিলাম। ঘরে ঘরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে একে অন্যকে প্রশ্ন করেছিলাম, শয়তানদের এ কথার অর্থ কী? তবে কি ওরা শেখ সাহেবকে মেরে ফেলেছে?

কিন্তু আশার পতাকাকে কি কেউ শেষ করতে পারে? তুমি তাকে যতই ছিন্ন করতে চাও সে ছিন্ন হতে হতে শত থেকে সহস্রে, সহস্র থেকে অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটিতে পরিণত হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর জল্লাদের অনুচররা এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। জীবননাশের আতঙ্কে কে-না আতঙ্কিত হয়। প্রিয়জনের বিচ্ছেদের ব্যথা কার না লাগে! সেই আতঙ্কিত বিমর্ষ অবস্থায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢুকতে প্রথম রাতেই প্রহরারত বাঙালি সিপাহীর মুখে শুনলাম শেখ সাহেবের কথা।

: আপনি তো পুরোনো মানুষ। আপনি এই যে বিশ ডিগ্রিতে আছেন, এর পাশেই দেওয়ানি। সেই দেওয়ানি ফাটকে ছিলেন শেখ সাহেব। সেই যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ওঁকে জড়িয়ে দিল তখন এখান থেকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এসে রাতের অন্ধকারে জেলের সব বন্দী যখন তালাবন্ধ, তখন তাঁকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে, সেই ৬৮ সালে। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিপাহীদের পাহারায় রেখেছিল জেল কর্তৃপক্ষ আমিও ছিলাম তার মধ্যে। ক্যান্টনমেন্ট যেতেই যখন হবে, তখন আর বাধা না দিয়ে শেখ সাহেব বেরিয়ে এলেন দেওয়ানি ফাটকের বারান্দা থেকে। সামনের মাটি থেকে এক মুঠো মাটি তিনি হাতে তুলে নিলেন। মনে হচ্ছিল যেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে বাংলার ক্ষুদিরাম আবার হাসতে হাসতে অগ্রসর হচ্ছে। এক মুঠো মাটি তুলে কপালের কাছে নিয়ে যেন বললেন : 'বাংলা মা আমার, আমি তোমায় ভালোবাসি।' তারপর আমাদের জড়িয়ে ধরে বললেন : 'যাই ভাই। তোমরা আমায় দোয়া করো।'

এ কাহিনী শুনতে শুনতে নিজের মনের বিষাদ যে কখন কেটে গেল তা জানতেও পেলাম না। শেখ সাহেব নিজে যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছেন পরবর্তী কালের ভয়ার্ত বন্দী মানুষের জন্য আশার টুকরা, সাহসের মণি, আর দেশকে ভালোবাসার মন্ত্র।

আশার পতাকাকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। তাই অযুত জনতা '৬৯-এর গণ-আন্দোলনে ফাঁসির সজ্জিত মঞ্চ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল তাদের জীবন আর সংগ্রামের প্রতীক শেখ মুজিবকে।

সেই '৬৯ সালের কথা। যখন শুনেছিলাম শেখ মুজিব ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হয়েছেন, তখন বুদ্ধি আর বয়সের সব বাধা অতিক্রম করে চোখে আবেগের অশ্রু নেমেছিল। জানি, লক্ষ মানুষের বাধা অতিক্রম করে তাঁকে দেখতে পাবো না। তবু যেন কিসের আকর্ষণে সেদিনও ছুটে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়ির দিকে। নিজের মনকে বলেছিলাম : না দেখলাম শেখ সাহেবকে। জনতাকে দেখাই তো শেখ সাহেবকে দেখা। জন দিয়েই জনতা। আমি সেই জনতারই একজন হব, আর সেই জনতাকে দেখেই নিজেকে গর্বিত মনে করব।

AMARBOI.COM

আমেরিকার সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকা পাকিস্তানে কোনোদিন নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে, কল্পনায় আর যা কিছুই চিন্তা করে থাকি না কেন এমন কথা কল্পনা করি নি। দখলদার পাকি বাহিনীর হাতে বন্দী বাংলাদেশ আর ঢাকায় সেই 'টাইম' পত্রিকাও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে। তাদের সাধারণ সংখ্যায় বাংলাদেশের একটি কথাও থাকতো না। কিন্তু গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যায় নাকি বাংলাদেশের সংগ্রামের কথা কিছু থাকছে। গোপনে গোপনে সেইসব সংখ্যা সংগৃহীত হচ্ছে। হাতে কপি করে তা কেউ কেউ বিলি করেছে। দুরু দুরু বক্ষে 'টাইম' পত্রিকার সেই কপি আমরা পড়েছি। এরই এক সংখ্যায় দেখলাম, রমনা ময়দানের ৭ই মার্চের লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েতের একটি ছবি তুলে পাশে শেখ সাহেবের একটি জীবনালেখ্য দিয়েছে। শেখ সাহেবের একখানি ছবি দিয়েছে। আর তার নিচে লিখে দিয়েছে : 'ফ্রম হিরো টু মারটায়ার, বীর থেকে শহীদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ঠিকই চেয়েছিল আমাদের আশার এই প্রতীককে নিশ্চিহ্ন করতে। আমেরিকার বিবেকবান মানুষ তাদের সরকারের সেই ষড়যন্ত্রে শামিল হন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অকুণ্ঠ সমর্থন আর সাহায্যের সঙ্গে পৃথিবীময় বিবেকবান মানুষ সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছে বন্দী সংগ্রামী বাংলার দিকে।

সহস্র আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আশার মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিব ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আবার এসে দাঁড়ালেন সেই রমনা ময়দানে, যেখানে তিনি শেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

দূর মধ্যপ্রাচ্যের ইয়াহিয়ার বন্দীশালার দুর্বিসহ নিঃসঙ্গতা আর চিন্তায় শুকিয়ে যাওয়া দীর্ঘদেহ মানুষটি লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে যখন বললেন : 'আমি আবার আপনাদের কাছে এসেছি। লক্ষ লক্ষ ভাই, মা আর বোন নিজেদের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন, আমাকে মুক্ত করেছেন। আমার প্রতি ভালোবাসার কোন পরিমাপ নেই। এর কোনো প্রতিদান আমি দিতে পারিনে—', তখন এমন কোনো বাঙালি ছিল না, যার নিজের চোখেও পানি জমে নি এবং আবেগে গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে নি।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫ বছর আগের কথা

সাতচল্লিশ সালের শেষ কিংবা আটচল্লিশ সালের গোড়ার কথা। দিন-তারিখ মনে নেই। দিন-তারিখের কথা মনে করিয়ে দিতে পারত মুনীর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত নাম, মুনীর চৌধুরী।

সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী অধ্যাপকের অন্যতম কেন্দ্র বলেই যে সারা ভারতে সেদিন আবাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল, তাই নয়। ১৯৪০-৪২ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল উদার জীবনময় একদল মুসলিম তরুণেরও বিকাশ ঘটেছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে পরীক্ষার প্রতিযোগিতায়, বিতর্কের সভায়, সাহিত্যের আসরে, জ্ঞানের ব্যাপকতায় এই প্রগতিশীল মুসলিম তরুণরাই সেদিন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ঢাকা শহর এবং বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন গোঁড়া ধর্মান্ধ রাজনীতিরও ঘাঁটি ছিল। সেই প্রতিক্রিয়ার সামনে প্রগতিশীল মুসলিম তরুণদের মধ্যে যাদের কথা মনে পড়ে তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর, সানাউল, সৈয়দ নূরুদ্দীন, এ. কে. এম. আহসান, হেসামুদ্দীন (বাহাদুর) এবং আরো অনেকে।

মুনীরকে বলতাম আমরা 'কথার রাজা'। ওর মতো সরস কথা বলতে খুব কম লোকই পারত। ওর কথার মধ্যে যেমন থাকতো বুদ্ধির দীপ্তি, পরিহাসের আমেজ, তেমনি পরিবেশনের নাটকীয়তা। মুনীর তখন ছাত্র : ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত হলের বাৎসরিক বিতর্ক কিংবা উপস্থিত বক্তৃতায় মুনীরের প্রথম হওয়াটা ছিল বেশ কয়েক বছর ধরে একবারেই পূর্ব নির্ধারিত।

আমার এখনও মনে আছে, মুনীর সলিমুল্লাহ বিতর্কের যোগদান শেষ করে সাইকেল চেপে দৌড়ে এসেছে একই সন্ধ্যায় ফজলুল হক হলের বিতর্কেও অংশ নিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের এই দলের কোনো নাম ছিল না। গোঁড়া সম্প্রদায় ঢালাওভাবে আমাদের কমিউনিস্ট বলে আখ্যায়িত করত। আমাদের অপরাধ ছিল, আমরা সে যুগের জনপ্রিয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'পিপলস ওয়ার' পড়তাম, ছাত্রদের মধ্যে বিক্রি করতাম। ঢাকা ছিল তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে আন্তর্জাতিক শহর। ইংল্যান্ড আমেরিকার জ্ঞানী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী—যাঁরা সেদিন ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ইতালি ও জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে দূরপ্রাচ্যের ফ্রন্টে এসেছিলেন তাঁরা ঢাকায় এসে এই প্রগতিশীল তরুণদের সঙ্গে তাঁদের মনের সম্পর্ক স্থাপন করতেন। ফজলুল হক হল আর ঢাকা হলের মধ্যখানের পুকুরের পাড়ে আমাদের কত আলোচনায় বিকেল সন্ধ্যার অন্ধকারে যে পৌঁছে গেছে আশরাফের রেস্তোরাঁর চায়ের কাপে, তার ইয়ত্তা ছিল না।

প্রগতিশীল এই মুসলিম তরুণদের বিরুদ্ধে সেদিনকার জঙ্গীবাদী মুসলিম লীগের গোঁড়া ছাত্র সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে একটা গোপন কাউন্সিল তৈরি করেছিল। তাকে তারা নিজেরাই ফ্যাসিস্ট কাউন্সিল বলে আখ্যায়িত করত। সমাজের বিকাশ, ধর্মের উৎপত্তি ও ভূমিকা, সাম্যবাদের জন্ম, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমস্যা, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে তার সমাধানের সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে যারা কোনো আলোচনা করত তাদেরকে এই ফ্যাসিস্ট কাউন্সিল কওমের শত্রু বলে ঘোষণা করে তাদের বেকায়দায় ফেলে তাদের উপর নানা রকম অত্যাচার ও জুলুম চালাত।

হয়ত '৪৮ সালের গোড়ার দিকেই হবে। সলিমুল্লাহ হল ছিল মুসলিম ফ্যাসিস্ট কাউন্সিলের কেন্দ্র। মুনীর থাকত সলিমুল্লাহ হলে। এক রাতে অতর্কিতে এই ফ্যাসিস্টরা আক্রমণ করল মুনীর এবং হলের প্রগতিশীল অপর ছাত্রদের উপর। মুনীরের বিছানাপত্র ঘর থেকে বার করে ফেলে দিল। বইগুলো তছনছ করে মুনীরকে হল থেকে বার করে দিল। মুনীর এবং অপর কয়েকজন ছাত্রকে এমনি করে বার করে দিয়ে জয়ের উল্লাসে ফ্যাসিস্ট অধিনায়কদের একজন আবার মুনীরের ঘরে এল। মুনীরের ঘরে সে রাতে তার খালাত ভাই রফিক ছিল। রফিক তখন কলেজে পড়ত। রফিক এখন কোথায় আমি জানিনে। কিন্তু রফিকের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আজো আমার মনে পড়ে। রফিকের ঠোঁটে সব সময়ে একটি সহজ পরিহাসময় হাসি ভেসে থাকত মনে হত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সব কিছুকে ও যেন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। রফিকও তখন তার কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র কর্মী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়র হলের ছাত্রদের কাছে তত পরিচিত নয়। ফ্যাসিস্টপন্থী ছাত্রদের একজন যখন মুনীরের সেই ছত্রছন্ন ঘরে এসে ঢুকলো। তখন দেখলো সেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলা বই-এর রাশি থেকে একখানা বই নিয়ে রফিক নিবিষ্ট মনে পড়ছে। বিজয়ীর ব্যঙ্গ নিয়ে আগত ছাত্রটি রফিককে জিজ্ঞেস করল : কি সাব, কী করছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিক বলল : বই পড়ছি।

: কী বই পড়ছেন?

: রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'মানব সমাজ।'

: কেন, আগে আর পড়েন নি এ বই?

: হ্যাঁ পড়েছি।

: তবে আজ আবার কী পড়ছেন?

রফিক এক মিনিট প্রশ্নকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠোঁটের পরিহাসময় হাসিটি যেন আর একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই ফ্যাসিস্ট কীটের দিকে চেয়ে বলল : বর্বরতার যুগটাকে আজ আবার পড়ে দেখছিলাম!

ফ্যাসিস্ট ছাত্রদের আক্রমণ আমাদের ফজলুল হক হলেও হয়েছিল। সলিমুল্লাহ হলের এই ঘটনার পরেই বোধ হয়। আমি তখন এম. এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা করি। ফজলুল হক হল তখন দ্বিতল দালান। কয়েকজন শিক্ষকও তখন হলে থাকতেন। হলের পূর্ব দালানের দক্ষিণের মাথায় দোতলায় থাকতাম আমি। অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী (বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর) এবং নুরুল ইসলাম চৌধুরী। তিনিও হয়ত তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেছেন।

একদিন হঠাৎ শুনলাম হলের মাঠে হাতবোমা ফাটার শব্দ আর 'নারায়ে তকবীর—আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। হলের পশ্চিম দালান থেকে অভিযান শুরু হলো। কয়েকজন ছাত্রের অভিযান। হাতবোমা ফাটাতে আর নারায়ে-তকবীর ধ্বনি দিতে দিতে তারা হলের পূর্ব-দালানের দোতলায় উঠে এল। আমার বুঝতে বাকি রইল না, এ অভিযানের লক্ষ্য আমি নিজে। বোমা ফাটাতে ফাটাতে এসে ওরা হাজির হলো আমার ঘরের দরজায়। সবাই যেন এগুলো না। আমার মতো নিরীহ লোকের উপর অভিযানের অনুসারীদের হয়ত কিছুটা সঙ্কোচ এসেছিল। দলের নেতা কে ছিল, আজ তার নাম ভুলে গেছি। সে সামনে এসে বলল : আপনি হলে থাকতে পারবেন না।

আমি বললাম : কেন, আমার কী অপরাধ?

দলনেতার জবাব : আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। আপনি হলে থাকতে পারবেন না।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম : আপনারা হলের ছাত্র, আমি শিক্ষক। মতামত যাই হোক, একজন ছাত্রও যদি আমার হলে থাকায় আপত্তি জানায় আমি নিশ্চয়ই থাকবো না।

নিরীহ মানুষের কাছ থেকে নিরীহ জবাব পেয়ে আক্রমণকারীর দল বিজয়ীর মনোভাব নিয়ে আবার বোমা ফাটাতে ফাটাতে চলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনা বাড়ছিল। একদিন 'পাকিস্তান' মুসলিম জনতার সার্বজনীন দাবি বলে সমর্থন করেছিলাম। ধর্মের ভিত্তিতে জাতি হয়। একটি ধর্মাবলম্বী জনতার বিপুল অংশ যখন সেই ধর্মের নাম নিয়ে কোনো দাবি তোলে তখন সে দাবি যথাসম্ভব স্বীকার না করে তার আবেগকে প্রশমিত করা যায় কেমন করে? কিন্তু মুসলিম জনতার দাবির স্বীকৃতিতে সেদিন পাকিস্তানের শাসনাধিকার তো মুসলিম জনতা পায় নি। পায় নি তো কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতা কিংবা তার সন্তানেরা। শাসনের এবং শোষণের একচ্ছত্র অধিকার পেল সামন্ততান্ত্রিক নবাব-নাইট জমিদার আর বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের অনুচরগণ। এরা এদের স্বার্থ চিরস্থায়ী করার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞান উদারতা মানবতা—মানুষের সব মহৎ প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে ধর্মান্ধতার ধারায় সমগ্র দেশ ও তার যুব সমাজকে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইল। এ জন্য তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত শক্তিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন, জীবিকা—সর্বক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যবহার করতে শুরু করল। এরই পরিণামে নওয়াবপুরের রথখোলার ন্যাশনাল বুক এজেন্সির প্রগতিশীল বই-এর দোকান একদিন শহরের মুসলিম লীগ গুণ্ডারা ভেঙেচুরে লুট করল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অধিনায়ক কমরেড মুজাফফর আহমদ ন্যাশনাল বুক এজেন্সির রথখোলার শাখাটি স্থাপন করেছিলেন। বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য ও আন্তর্জাতিক জ্ঞানের সেদিনকার একমাত্র প্রগতিশীল পুস্তকাগার ছিল ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। ফ্যাসিস্ট গুণ্ডারা দোকানের দরজা ভেঙে বইগুলো রাস্তায় ফেলে পুড়িয়ে মাড়িয়ে দুমড়ে মুচড়ে চলে গেল।

AMARBOI.COM

সদরঘাটের লেডিস পার্কের পাশে ছিল করোনেশন পার্ক। সেকালে সেই ছোট্ট মাঠেই সব রাজনৈতিক সভা হতো। সেই পার্কে ৪৮ সালেই আমরা একটা জনসভা ডেকেছিলাম। আমার আর মুনীরের বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। দেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে শাসকদের কাছে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা দাবি করার সভা। কিন্তু মুসলিম লীগের গুণ্ডারা সেদিন সে সভাও হতে দেয়নি। আমাদের কোন বাহিনী ছিল না। মানুষের মঙ্গলকর কথা বলার আন্তরিক আগ্রহই ছিল আমাদের একমাত্র শক্তি। কিন্তু সে দিন সে সভায় কথা বলা আমাদের সম্ভব হলো না। গুণ্ডাদের অতর্কিত আক্রমণে সভা ভেঙে গেল।

তারপর দিনের পর দিন গেছে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। জীবনের আকাশ মেঘে ভরেছে। দিগন্তে কালো মেঘ স্তূপীকৃত হয়ে দুর্মর ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করেছে। গ্রেফ্তার হয়েছি। বছরের পর বছর নিচ্ছিদ্র কারাগারে প্রহর গুণেছি। মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুতের চমক খেলেছে। যে তরুণরা '৪৭ সালে জন্ম নেয় নি তারা জন্ম নিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, জীবনের জয়ধ্বনি তুলেছে। সাহস করে ভাবতে পারি নি ৪৭ সালের ঘটনার কথা কোনো দিন প্রকাশ্যে বলতে পারব। মুনীরও হয়ত এমনি করে ভাবত। ভাবত—উত্থানময় যুগান্তরের সেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন স্মৃতিকথা লিখবে। যে কথা কোনো দিন লিখতে পারে নি সে কথা একদিন লিখবে।

যে বর্বরতা শুরু হয়েছিল ৪৭ সালে তারই চরম রূপ দেখেছি আমরা ১৯৭১ সালে। '৪৭ সালের বর্বর পশুরাই '৭১ সালে মুনীরসহ সহস্র বুদ্ধিজীবীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের বুকে সমাজবিজ্ঞানের একটি সাধারণ মৌল সত্য : জীবন আর মৃত্যু, প্রগতি আর প্রতিক্রিয়া, দ্বন্দ্বমান দুই শক্তির পরিবর্তনে ভারসাম্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। সংগ্রামের ক্ষেত্রে জীবন মৃত্যুর উপর জয়লাভ করবেই—হোক না সে মৃত্যু যতই ভয়াল, যতই ভয়ঙ্কর।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুজবে কান দেবেন না

এপ্রিল শেষ হয়ে মে মাস আসতে না আসতেই বর্বর পাকিবাহিনী ঢাকায় পোস্টার আর মাইক দিতে বাধ্য হলো। 'গুজবে কান দিবেন না'। ওদের আওয়াজেই ঢাকার বন্দী মানুষ আমরা টের পেলাম খানসেনাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

সময় মনের উপর কেমন ভারী বোঝা হয়ে উঠতে পারে এ অভিজ্ঞতা আমার একদিন হয়েছিল জেলখানার মধ্যে। সেই ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫, আর '৫৮ সাল থেকে '৬২ সাল পর্যন্ত। জেলের মধ্যে বসে গুণেছি এক দিনে কত ঘণ্টা, এক ঘণ্টায় কত মিনিট, এক মিনিটে কত সেকেন্ড, এক সেকেন্ড কত পল আর এক পলে কত অণুপল। কিন্তু জেলের বাইরে সমস্ত ঢাকা শহর, সমস্ত দেশটাই যে সেই জেলের চেয়েও দুঃসহ আর একটা জেলে পরিণত হতে পারে, এ অভিজ্ঞতা হলো বন্দী ঢাকাবাসীর ২৫শে মার্চের সেই কালরাত্রি থেকে। সন্ধ্যা না হতেই গা ছমছম করে। নির্জন রাস্তায় বর্বর বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি ছুটে বেড়ায়। দরজায় দরজায় যেয়ে হানা দেয়। কারুর টু শব্দটি করার সাহস নেই। নিঃশব্দে গাড়িতে তুলে মুহূর্তে উধাও হয় কিংবা ঘরের দুয়ারেই গুলি করে শেষ করে দিয়ে যায়—বাবাকে মাকে মেয়েকে ...। অন্ধকার রাত্রি যদি বা ভোর হয়, ঢাকার মানুষের মনের ভার কমে না। মিনিট কাটে না, ঘণ্টা কাটে না, দিন কাটে না। কী করে সময় কাটবে? কী করবে সে? মৃত্যু বাদে কী ঘটনা আছে আমাদের জীবনে?

তবু সেই মৃত্যুর মধ্যেও আমরা বাঁচতে চেয়েছি। দুরুদুরু বুকে স্বাধীন বাংলা বেতারের তরঙ্গে কান পেতেছি। আকাশবাণীর সহানুভূতিভরা সংবাদ আর পর্যালোচনা শুনে চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। ভেবেছি, আহা। তবু তো দুনিয়া জানছে কী মহামৃত্যুর মধ্যে আমরা রয়েছি।

কিন্তু কেবল অসহায় আর্তনাদ নয়। মে মাস আসতেই কান থেকে কানে খবর এল : যাত্রাবাড়িতে অ্যাকশন হয়েছে। দুঘণ্টা লড়াই হয়েছে। গ্রীন রোডে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটা খানসেনা খতম হয়েছে। ওরা পাগলা কুকুরের মতো পাড়াকে পাড়া ঘেরাও করে মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে গেছে। দখলদার জল্লাদের দল জোর করে খবরের কাগজ বের করেছে। কিন্তু সে কাগজ রাখে খুব কম লোকেই। পড়ে আরো কম লোকে। খবরের কাগজ রাখা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। সেই অভ্যাসেই সেদিন পত্রিকা রাখতাম। হকার নিজের জীবিকার জন্যই হয়ত জোর করে দরজার ফাঁকে দিয়ে যেত একটা কাগজ। কিন্তু কী পড়ব সেই কাগজে? শহর স্বাভাবিক হওয়ার বিবরণ? সে বিবরণের কালি শুকোতে না শুকোতে মতিঝিলে রাত্রির বুক কেঁপে উঠে গ্রেনেডের শব্দে। আনন্দ-আশঙ্কায় মন ফুলে ওঠে। সকালে ফকিরাপুল বাজারের দিকে যেতে দেখি টি অ্যান্ড টি স্কুলের দালানটা শূন্যগর্ভ হয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে আছে। সাধ্য নেই কেউ তাকে পাশ কাটিয়ে যায়, না দেখে। পীর জঙ্গী মাজারের বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনেও একদিন গ্রেনেড ছুঁড়লো দামাল ছেলের দল। আমরা জানি একটা গ্রেনেডেই খানসেনার দল খতম হয়ে যাবে না। এ যেন দামাল ছেলের দল ওদের অসহায় বন্দী বাবা মা ভাই বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে : "তোমরা হতাশ হয়ো না। এই দেখ আমরা আছি। তোমাদের পাশেই আছি। তোমাদের জন্যই মরছি। শুধু মরছি নয়, ওদের মারছিও। আমরা রক্তবীজের ঝাড়। ওরা আমাদের কত মারবে?"

এবার আমাদের মনের হতাশা কাটতে লাগল। সময়ের পালে যেন হাওয়া ভরে ওঠে। আমাদের খবরের কাগজ তৈরি হয়। বর্বর খানসেনাদের ভাষায় 'গুজব'। এ কাগজকে ওরা বেআইনি করার চেষ্টা করে। হুকুম জারি করে। দেয়ালে দেয়ালে নিষেধনামা টাঙিয়ে দেয়। সে কাগজ হাওয়ায় ভর দিয়ে উড়ে চলে, বেড়ে চলে। আর তার মধ্যে কত খবর, কত কাহিনী, কত ব্যঙ্গ, পরিহাস আর টিপ্পনী।

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে আড়ালে ডেকে চোখ টিপে জিজ্ঞেস করি, খবর কী? খবর?

খবর হচ্ছে : ওদের শান্তি কমিটি প্রস্তাব নিয়েছে, 'দুষ্কৃতিকারীরা' শহর ঘেরাও করে ফেলতে পারে। তাই তাদের শহরে ঢোকার আওয়াজ পেলেই সাইরেন বাজিয়ে দেওয়া হবে।

খবর হচ্ছে : সদরঘাটে ওরা কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। ওদের ধারণা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে মুক্তিবাহিনীর শহরে অনুপ্রবেশ আটকে দিবে। চালুনি দিয়ে পানি ছাঁকবে। দেয়াল তুলে হাওয়া আটকাবে।

খবর হচ্ছে : খানসেনারা কচুরীপানা মাথায় দিয়ে সদরঘাটে রবার বোটে চড়ে বর্ষাকালে মুক্তি ফৌজের মোকাবেলার কসরত আঁটছে বর্বরের দল এমন মজার দৃশ্যটা টেলিভিশনের পর্দায় দেখাতেও সঙ্কোচ বোধ করেনি।

চরমপত্রের গল্প বানানো নয়। মৃত্যুপণ সংগ্রামী বাংলার জীবনের কাহিনী। তার টুকরো টুকরো ঢাকার বন্দী মানুষ আমরাও পেয়েছি। আমরা দেখেছি রাস্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকস্মিকভাবে জল্লাদের দল বাস থামিয়েছে। যাত্রীদের চেক করেছে আর জোয়ান জোয়ান যাত্রীদের বাছাই করে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেছে ক্যান্টনমেন্টে, ওদের শরীর থেকে রক্ত নিংড়ে নিয়ে মেরে ফেলতে।

এরূপ অসংখ্য ঘটনা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে মা বাবার বুকে। নিজেদের কিশোর আর যুবক সন্তানকে কোথায় লুকোবে তার পথ পায় নি। মা তার ছেলেকে মুহূর্তের জন্য রাস্তায় যেতে দিতে শঙ্কা বোধ করেছে।

: ওরে আজাদ, তুই বাইরে যাসনে। ওরা তোদের মতো ছেলেদের রক্ত নিংড়ে নেয়।

মাকে ফাঁকি দিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে আজাদ। মুখে দুষ্টুমির হাসি ছড়িয়ে বলে : মা, সে ভয় আর নেই।

: কেন রে?

: আরে জানো না? বাঙালির রক্তে খানসেনারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। ওরা যেই না বাঙালিদের রক্ত ওদের মর মর জখমি সেনাদের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে অমনি ওরা বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে কেবল লাফাচ্ছে আর বলছে : জয় বাংলা! জয় বাংলা!

মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দুষ্টু ছেলের বুদ্ধি দেখে।

গ্রামের রাস্তায় খানসেনাদের ট্রাক গর্তে পড়েছে। টেনে তুলতে পারছে না কিছুতেই। গ্রামের মানুষকে ডেকে আনা হয়েছে। তুলে দাও গাড়ি। মানুষ বাধ্য হয়ে হাত লাগিয়ে ঠেলছে, তবু গাড়ি ওঠে না। খানসেনারা অফিসার হাঁকছে : কিউ নেহি উঠতা?

গ্রামবাসীদের মধ্য হতে সমস্বরে জবাব আসে : একসাথে আওয়াজ না দিলে উঠবে না।

: আওয়াজ? কেয়া আওয়াজ?

: জয় বাংলা আওয়াজ?

: জয় বাংলাকা আওয়াজ! খানসেনাদের মুখ কুঞ্চিত হয়। মেশিনগান কি টিপে দেবে? না, কুকুর যে গর্তে পড়েছে। তাই বলে : জয় বাংলাকা আওয়াজ? ঠিক হ্যায়। লেকিন জেয়াদা নেহি। শ্রেফ এক মোর্ত্তবা বোলো : জয় বাংলা।

এই নিয়ে আমরা বাঁচি। গল্প নিয়ে। কাহিনী নিয়ে। গুজব নিয়ে। বন্ধু এসে বলে, খানসেনাদের সাহসের কথা শুনেছেন!

: কী।

: কাল রাতে সিদ্ধেশ্বরীতে আমাদের বাসায় এসে পাহারা দিচ্ছে। স্কুলে পরীক্ষা নিবে। তাই পাহারা বসিয়েছে। সন্ধ্যা না হতেই ঘাবড়ে যেয়ে বলছে, দরোয়াজা বন্ধ করো। দরোয়াজা বন্ধ করো। গুলি শুরু হো যায়গা। বলেই ভয়ের চোটে ছুটে একেবারে তেতলার ছাদে। তা ছাদে যাবি তো যা। আমাদের নিয়েও টানাটানি : তোম লোগভি আযাও। হামারা সাথ গার্ড দেনে হোগা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার খবর দিচ্ছ : গত তিন মাসে অন্তত পঁচিশ হাজার খানসেনা নিহত হয়েছে। কী করে মিলাই এ খবর?

সাথী বলেন এক কাহিনী। মিলিটারী জিপ যাচ্ছে। খানসেনা ঠাসা। তার মধ্যের একজন কায়দা করে ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখিয়ে সামনের সিটে বাইরে পা ঝুলিয়ে বসেছে। ড্রাইভার হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছে : পা আন্দার লাইয়ে। অ্যাকসিডেন্ট হো যায়গা। খানসেনা জবাব দিচ্ছে হতাশ ভঙ্গীতে : আরে আরে ইয়ার ছোড়্দো। মরণ তো হোগা। হিঁয়া নেহি তো উহা ফ্রন্টমে। তিন ভাই এসেছিলাম। তার দুজন তো এরই মধ্যে খতম হয়ে গেছে।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আর মুক্তিবাহিনীকে রোখা যাচ্ছে না। সব জায়গায় মুক্তিবাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। খানসেনারা উদ্‌ভ্রান্ত। যাকে পাচ্ছে তাঁকেই ধরছে 'মুক্তি' বলে। অফিসের কেরানি কর্মচারীর আইডেনটিটি কার্ড রাগে ছিড়ে ফেলে বলছে : ইয়ে সব লাক 'গাদ্দার' হ্যাঁয়। ও দিনকো অফিস করতা আওর উসকা বাদ রাত মে মুক্তি হোতা।

খুবই সত্য কথা। কিন্তু বেধড়ক মানুষ মারলেই তো মুক্তি মরে না। তাই যত মারে তত মুক্তির আঘাত আসে। গাছপালা ঘেরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে খানসেনাদের গাড়ি। শুধু গ্রেনেড নয়। গ্রেনেডসহ একটি যুবক নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাছের মাথা থেকে ট্রাকের উপর। নিজেকে সুদ্ধ উড়িয়ে দিয়েছে খানসেনাদের গোটা ট্রাকটাকে।

খানসেনারা ঘাবড়ে যাচ্ছে : ইয়ে তো বড়া আজব চীজ। ইযে কাঁহাসে আতা, কাঁহা যাতা, কুই পাত্তা নেহি, মালুম নেহি।

টাঙ্গাইলের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এর কাহিনী খানসেনাদের বিরুদ্ধে পরিহাসের গল্প হয়ে ঢাকায় এসেছে। আমরা শুনেছি, পাকসেনারা বহুদিন পরে যেদিন টাঙ্গাইল ঢুকলো সেদিন টাঙ্গাইলে মুক্তিবাহিনীর জারি করা কারফ্যু চলছে।

খানসেনারা টাঙ্গাইলে ঢুকে দেখে, কোনো লোক রাস্তায় বেরোয় না। তারা জিজ্ঞেস করে : কিঁউ।

টাঙ্গাইলবাসীরা জবাব দেয় : বেরুব কেমন করে, মুক্তিবাহিনী কারফ্যু দিয়ে রেখেছে।

কারফ্যুর একচ্ছত্র মালিক খানসেনারা ক্ষেপে যায় : ইয়ে কারফ্যু নেহি চলেগা। ইয়ে কারফ্যু তোড় দো!

বিশ্বব্যাঙ্কের কারগিল মিশনের কাছে বন্দী ঢাকার মানুষ সেদিনও মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। কারগিল মিশন এসেছে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা সরেজমিনে দেখতে। মনে সন্দেহ যতোই থাকুক, ইয়াহিয়া-টিক্কার উপায় থাকে নি মিশনকে বাংলাদেশে আসতে না দিয়ে। মিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাঙ্ক মিটিং করে ঠিক করবে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া যাবে কিনা। বিশ্বব্যাঙ্ক পাকিস্তানকে অর্থনীতিক সাহায্য মঞ্জুর করলে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো দীর্ঘকালীন এবং আরো কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু নিহত বাঙালির জন্য কারগিল মিশনের সহানুভূতির কথা আমাদের অগোচর রইল না। ইয়াহিয়া-টিক্কার কাগজে কিছু না লিখুক, বন্দী মানুষের কান থেকে কানে, চোখ থেকে চোখে ছড়িয়ে পড়ল সেই কাহিনী।

কারগিল মিশন সামরিক জান্তার অফিসারদের জিজ্ঞেস করল : তোমাদের কারখানা কেমন চলছে?

জবাব এল চটপট : বিলকুল নরম্যাল।

আচ্ছা আমরা নারায়ণগঞ্জের শিল্পাঞ্চল দেখতে যাব। রাজি হতে হলো টিক্কার সাগরেদদের। কন্ট্রোল রুম থেকে হুকুম গেল গোপনে : কাল দুপুরে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা যাবে মিল দেখতে। গ্রাম থেকে লোক ধরে মিলের নরম্যালসি দেখাও।

পরদিন দুপুরে কারগিল মিশনকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা কাপড়ের কলের মধ্যে। মেশিন চালু করেছে খানসেনারা। মিশনের প্রতিনিধিরা আস্তে আস্তে হাঁটছেন কারখানার মধ্য দিয়ে। মেশিনের শব্দের মধ্যেও কান খাড়া আছে। হাতের কাজ করতে করতে একজন বাঙালি সুযোগ পেয়ে বলে দিল : কাম আফটার টু আওয়ার্স : দু ঘণ্টা পরে আবার আসুন।

মিশনের নেতা যেন শুনতেই পান নি। এক মিল থেকে আর এক মিলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দুঘন্টা পরে বায়না ধরলেন : ঐ আগের মিলটাকে আবার একবার দেখতে চাই। সে মিলে ফিরে এসে দেখেন : মিলের গেট পর্যন্ত বন্ধ। মিশনের নেতা টিক্কা খানকে জিজ্ঞেস করেন : এ কী রকম নরম্যালসি? টিক্কা জিজ্ঞেস করে তস্য টিক্কাকে। তস্য তার তস্যকে। শেষকালে স্বীকার করে। থোরাকুছ গলতি হুয়া।

প্রায় মন্দিরই ওরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। রমনার ময়দানের মন্দিরের চূড়ায় ন্যায় উঁচু চূড়া ঢাকার অপর কোনো মন্দিরের ছিল না। দেশি বিদেশি কোন মানুষ না জানত যে, এখানে বিরাট এক মন্দির ছিল।

মিশন প্রধান জিজ্ঞেস করলেন খান বাহিনীর অফিসারকে : এ মন্দিরটা তোমাদের কী ক্ষতি করেছিল?

বর্বরের জবাব তৈর ছিল : হিঁয়াছে গুলি আয়া। এখান থেকে গুলি এসেছিল, মর্টার মেরেছিল।

মিশন প্রধান অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন : ইভেন গডেস কালী ওয়েন্ট অ্যাগনেট ইউ! কী তাজ্জব ব্যাপার। দেবী কালীও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে!

মিশন প্রধান জিজ্ঞেস করছেন : ঢাকায় আরো অনেক মন্দির ছিল। সবই তোমরা ধ্বংস করেছো?

ইয়াহিয়ার অনুচররা বলে : নেহি নেহি। অনেক মন্দির আছে।

মিশন প্রধান প্রশ্ন করেন : সব পুরোহিতকে তোমরা মেরে ফেলেছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানসেনারা অফিসার জবাব দেয় : কভি নেহি। প্রিস্টভি হায়।

: ঠিক আছে আমরা পুরোহিত দেখতে চাই আর দেখতে চাই মন্দিরে পূজো হচ্ছে। প্রমাদ গুণে দখলদার সরকার তবু মুখরক্ষার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, সন্ধ্যায় তোমরা মন্দিরে পূজো দেখবে।

সন্ধ্যায় এক মন্দিরে নিয়ে যায় খানসেনা আর দখলদার সরকারের পুলিশ বাহিনীর অফিসার। পুরোহিত মন্ত্র আওড়াচ্ছিল জোরে জোরে। মিশন প্রধান এগিয়ে এলেন মন্দিরের কাছে।

পুরোহিত চোখ তুলে চেয়ে দেখল, পুলিশ অফিসার। অমনি ঘট করে উঠে খট করে সেলাম ঠুকলো পুরোহিতবেশী আই বি ওয়য়াচার তার পুলিশ অফিসারকে।

মিশনের প্রতিনিধিদের চোখে মুখে হাসি। হেসে বলেন : ওহ! হাউ স্মার্ট এ প্রিস্ট উই সি। বাহবা! কী চতুর পুরোহিত, বলে বেরিয়ে আসেন মিশন প্রধান মন্দির থেকে।

ঢাকার শাঁখার কথা কোন রসিক বিদেশি না শুনেছে? সেই শাঁখার শিল্পকেন্দ্র শাঁখারী বাজার। তাকে জনশূন্য করে দিয়েছে খানসেনারা মেশিনগান আর মর্টারের গোলাবর্ষণে। সে কথা মিশনের কানে পৌঁছেছে। সেই সত্য যাচাই করার চেষ্টা করছেন মিশন প্রধান।

নিউমার্কেটে ইংরেজি জানে বলে মনে হয় এরূপ বাঙালি যুবক একজনকে ধরে অনুরোধ করেন মিশন প্রধান : আমাদের একটু শাঁখারী বাজারে নিয়ে চলোনা? অনুরোধ শুনে আতঙ্কিত বাঙালি যুবক শিউরে ওঠে। বলে, এক্সকিউট মি প্লিজ। আমাকে মাফ করুন।

মিশন প্রধান বলে উঠেন। আমরা যা জানতে চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেছি। ধন্যবাদ। আপনার যাবার প্রয়োজন নেই।

আমি কি বন্দী ঢাকার সব কাহিনী জানি? তবু বন্দী ঢাকার মানুষ আমরা কেমন করে বেঁচেছি, কী ছিল আমাদের মনের খোরাক তারই আভাস দিতে চেষ্টা করলাম এই কাহিনী কটিতে।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘মধ্যরাতের অশ্বারোহী’র সঙ্গে আলাপ

আমাদের কবি ফয়েজ আহমদ এখন একজন প্রবীণ সাংবাদিক। এখনো কুমার। (বয়স আমার চেয়ে খুব বেশি কি কম?) খুব সামাজিক, আমুদে, হাস্যরসিক এবং গাল্পিক। শিশুদের জন্য ছড়াকার এবং কবি। গল্প বলার শুধু নয়, গল্প লেখার রীতিটিও ঝরঝরে, মনোমুগ্ধকর। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংবাদপত্র জগতে চমৎকার ঘটনা ও সমস্যার হেডলাইন সৃষ্টিকারী রিপোর্ট তৈরি করে এসেছেন। আজ সাক্ষাৎ রিপোরটিংয়ে জড়িত না থাকলেও বিগত দিনের সেই সব রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ঘটনাবহুল জীবনের স্মৃতিচারণে আনন্দ পান এবং তাঁর সে স্মৃতিচারণে যে এই সকল ঘটনার সমসাময়িক বা এদের সঙ্গে কমবেশি জড়িত আমার মতো পাঠককে আনন্দিত করেও, তার পরিচয় রয়েছে সম্প্রতি ‘বিচিত্রা’য় প্রকাশিত ‘মধ্যরাতের অশ্বারোহী’ নামের স্মৃতিচারণমূলক তাঁর লেখা কয়টিতে। এর মধ্যে সেই ’৫৪ সালের বন্যার সময়ে ঢাকা শহরের যে ডুবন্ত গলিতে ফয়েজ থাকতেন সে গলিতে রাত দুটো কি তিনটের সময়ে সংবাদপত্রের কাজ সেরে কেমন করে তিনি একেবারে শুকনো ধোপদুরস্ত প্যান্ট-শার্টে গলির খাল পেরিয়ে বাসায় যেতেন সাহেবেদের গোরস্তানে বিচরণরত অশ্বকুলের কাউকে বশ করে তার উপরে আরোহণ করে, সে কাহিনী একেবারে অনবদ্য।

ফয়েজের এখন ঝোঁক সেই পুরনো দিনের ঘটনার টুকিটাকি স্মৃতি আলাপ-আলোচনায়, রচনায় মজবুত করে তোলার দিকে। আর সে প্রয়োজনেই আমাকে তিনি ধরলেন দিন দুই আগে : ‘সরদার ভাই, আপনার সেই বিমানে গ্রেফতার হওয়ার কাহিনীটি বলুন, আর সেই জেলের কাহিনী যেখানে আপনি নাকি জেল থেকে ‘পালিয়েছিলেন’। সে বড় মজার কাহিনী।

ফয়েজের আগ্রহ এবং জবরদস্তিতে তাঁর বাসায় গিয়ে সে কাহিনী আমাকে বলতে হলো। এ বলার একটা আনন্দ এই যে, বন্ধুজনের সঙ্গে এমন আলাপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই অতীতে আবার একেবারে সাক্ষাতভাবে ফিরে যাওয়া যায় এবং ফিরে গিয়ে সেই সময়ে আবার বাস করার একটা অনুভূতি পাওয়া যায়। আর তার মাধ্যমে দুর্বল স্মৃতির ভাণ্ডারে বিলুপ্তপ্রায় ঘটনা আর অভিজ্ঞতার মরচে পড়া টুকরোগুলো ক্ষণিক আলোর দ্যুতিতে আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে। ফয়েজের আগ্রহ বেশ সিরিয়াস। ফয়েজ নিজের মিনি রেকর্ডারটি বার করে কাহিনীটির বেশ কিছু অংশ রেকর্ড করে রাখলেন।

অথচ আমার নিজের কোনো খাতায় বা লেখাতেও এ কাহিনী এখনো তুলে রাখা হয়নি। কিন্তু এসব কাহিনী লিখে রাখার কিছুটা বাধ্যবাধকতা এবং যুক্তি আছে। যে কোনো ব্যক্তির স্মৃতিচারণের ঐতিহাসিক একটা মূল্য আছে। ব্যক্তি, সে যত ছোটই হোক না কেন, তার জীবনকালের নানা ঘটনার সঙ্গে সে যুক্ত। কোনো ঘটনার সে কারণ, কোনো ঘটনার সে কার্য বা ফল। সেই ঘটনার সঙ্গে সে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সূত্রে জড়িত। আর তার এবং এমনি অপরাপর ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের ছোট-বড় সব ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জীবন, কাল, সমাজ, রাষ্ট্র তথা ইতিহাস বিবর্তিত হয়।

এদিক থেকে দেখলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত নিজের অতীতকে ব্যক্তিগত বিষয় বিবেচনা না করে ইতিহাসের অনস্বীকার্য উপাদান বলে বিবেচনা করা এবং তাকে ইতিহাসের অপরের গ্রাহ্য, পাঠ্য, বিবেচ্য হিসাবে ধরে রাখার চেষ্টা করা। এর একটা উপায় অবশ্যই আত্মকথা, আত্মকাহিনী বিবৃত করা বা স্মৃতিচারণ। তাই ফয়েজের লেখাগুলির এ মূল্যও আমাকে বেশ আনন্দ দেয়।

আমার নিজের স্মৃতির টুকিটাকি দুএকটি ব্যক্তিগত রচনার মধ্যে এলেও আমাদের দেশের একটি মধ্যবিত্ত, কিশোর-তরুণ যুবক এবং প্রৌঢ় ব্যক্তির জীবনযাপন, তার শিক্ষা লাভ, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা ঘটনার সাক্ষাতে আসা, তার দীর্ঘ কারাবাস এ কাহিনী ধারাবাহিকভাবে কোথাও আমি লিপিবদ্ধ করিনি। নৈতিকভাবে এর প্রয়োজনবোধ করলেও একে তুলে ধরার কষ্টকর পরিশ্রমের কারণে কাজটি করা হয়নি। এবং এখন গোড়া থেকে আর করা যাবেও না। কারণ দুর্বল স্মৃতির মানুষ আমি। আমার অনেক ঘটনার স্মৃতিই আজ তার সন তারিখ আর ব্যক্তিবর্গের নাম-ধামের ক্ষেত্রে প্রায় ধোঁয়াটে।

কিন্তু কবি ফয়েজকে যে কাহিনী বলেছি সেটি বেশ কৌতুকজনক। তাই বিস্তারিতভাবে সব মনে না থাকলেও মোটা ঘটনাগুলি আজো আমার স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

সে সেই '৫৪-'৫৫ সালের কথা। '৪৯ সালের ডিসেম্বরে সেই যে আমি ঢাকা শহরে তাঁতীবাজারে আজকের সাংবাদিক সাহিত্যিক সন্তোষ গুপ্তের বাসায় সন্তোষ এবং আরো কয়েকজন সাথীসহ গ্রেফতার হলাম তারপর থেকে বন্দী দশা আমার পাঁচ বছর অতিক্রম করে গেছে। আজকে যখন লিখছি, এই একাশি সালের মার্চ থেকে সময়ের হিসাবে প্রায় সাতাশ বছর আগের কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৫৪ সালে নির্বাচন হলো। যুক্তফ্রন্ট জয়ী হলো। অনেক রাজবন্দী মুক্তি পেলেন। কিন্তু আরো অনেকের সঙ্গে আমিও তখনো বন্দী।

কিন্তু '৫৪ সালের পর '৫৫ সালের মধ্যভাগে হয়ত জুন-জুলাই মাসে আমারও একদিন জেলের ভেতর জেল, 'সেল' থেকে জেলের গেটে ডাক পড়ল।

নাজির জমাদার। আমরা বলতাম, 'সিকিউরিটি জমাদার'। জাঁদরেল জমাদার, মানে জেলের সিপাহীদের উপরওয়ালা। 'সিকিউরিটি প্রিজনার' মানে রাজবন্দীদের তদারকি করে। তাদের মন মেজাজ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করে। কাউকে কখনো ১০ ডিগ্রি থেকে ৬ ডিগ্রিতে (ডিগ্রি মানে ছোট ছোট খুপরী) কাউকে বা ২ নম্বর খাতা (খাতা মানে হলো জাতীয় বন্দী বাস) থেকে পুরোন বিশে, এমন কি জেল থেকে জেলান্তর চালান দেয়। বস্তুত তার রিপোর্টে সব কিছু হয়। এমন জাদরেল ছিল সে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সেই নাজির জমাদার এসে হাঁক দিল : 'কাহা সরদার জফলুল করিম, চলিয়ে জি!' এরকম ডাক অতীতেও সে বহুবার দিয়েছে। কখনো অমনি রহস্যময় আওয়াজে আতঙ্ক সৃষ্টি করে অসহায় বন্দী আমাকে কিংবা অপর কোনো সাথীকে নাজির জমাদার তার বন্ধুদের কাছ থেকে ছিন্ন করে নিয়ে গিয়ে আর তার বন্ধুদের কাছে ফিরতে দেয়নি। দিয়েছে অপর কোথাও সরিয়ে। একই জেলের অপর কোনো স্থানে কিংবা অপর কোনো সেলে। কাজেই নাজির জমাদারের এমন ডাকে ভয় ছাড়া ভরসার কিছু ছিল না। তবে দিনকাল বদলেছে। আজকাল কোনো কোনো রাজবন্দী বা কয়েকজন করে রাজবন্দী প্রায় প্রত্যেক রোজ মুক্তি পাচ্ছেন।

AMARBOI.COM

আমাকেও জেল গেটের অফিসে নিয়ে এসে জেলের অভিসাররা সুখবর দিলেন যে আমার রিলিজ অরডার এসে গেছে।

আমার নামের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই নাম বহনকারী আমার অবয়বটি যতো ক্ষুদ্র তার তুলনাতে নামটি বেশ ভারী। কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর একটি ব্যাপার সম্প্রতি যেমন আমাকে তেমনি জেল কর্তৃপক্ষকেও কিছুটা চমকিত করেছিল।

সে ব্যাপারটি একটু খুলে বলতে হয়। '৫৪ সালের শেষের দিকে বোধহয় (অক্টোবর, ১৯৫৪) পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সেই '৪৭ সাল থেকে বহালকৃত গণপরিষদ তথা কেন্দ্রীয় পাকিস্তান আইন পরিষদকে ভেঙে দিয়েছিলেন। কারণ ছিল, মন্ত্রীরা নাকি তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর অজ্ঞাতে পেছন দরজা দিয়ে। সেই রাগে তিনি গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতাবলে গণপরিষদ ভেঙে দিয়েছিলেন। সেই গণপরিষদের স্পিকার ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা তমিজ উদ্দীন খান। তাঁর মারফতে মুসলিম লীগ গভর্নর জেনারেলের এই কাজের বৈধতার প্রশ্ন তুলে কোর্টে মামলা করেছিল। তখনো পাকিস্তানে আইন আদালত এবং তাদের বিচারকদের কিছুটা ব্যক্তিত্ব ছিল। তমিজ উদ্দীন সাহেবের সেই মামলা পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিবর্তনে বেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোড়াতে সিন্ধু চিফ কোর্টে বোধহয় তমিজ উদ্দীন সাহেবের আপত্তির পুরো পক্ষে রায় চলে যায়। গভর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে সুপ্রীমকোর্টে তার বিরুদ্ধে আপিল করা হয়। সে আপিলের রায়ে বিচারপতি মুনীর 'সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে'র খেলা দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি রায় দিয়েছিলেন : গণপরিষদ চিরস্থায়ী। তাকে ভাঙার ক্ষমতা কারুর নাই। তবে গভর্নর জেনারেল যখন রাষ্ট্রের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তিনি যখন তাকে ভেঙে ফেলেছেনই তখন সেটা স্বীকার্য ঘটনা ঘটে। তবে গভর্নর জেনারেলকে অচিরে আর একটি গণপরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

আর এই নির্দেশের ভিত্তিতে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রত্যেক প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ভোটে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যকে গণপরিষদে প্রেরণের বিধি।

পূর্ব পাকিস্তানে তথা রাজনৈতিক শক্তির পালা বদল ঘটে গেছে। এখন এখানে প্রধান শক্তি যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট আবার তত যুক্ত নয়। তার মধ্যে রয়েছে আওয়ামী লীগ, এ, কে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতান্ত্রিক দল, এমনকি নিজামে ইসলাম। তবে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন প্রগতিশীল দলের মধ্যে সমাজতন্ত্রী বামপন্থী বলে তরুণ সদস্যদের একটি গ্রুপও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। গণপরিষদের তখনকার নির্বাচনের পদ্ধতিটিকে রাজনৈতিক পরিভাষায় বলা হয়, 'প্রত্যেক নির্বাচকের হস্তান্তরযোগ্য একক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন বা 'সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল' ভোটের পদ্ধতি। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল এই যে, কোনো একক দলই কেবলমাত্র সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে পরিষদের সমগ্র সদস্যপদকে করায়ত্ত করতে পারত না। গণপরিষদের একজন সদস্যের নির্বাচনে, পদের সংখ্যা দ্বারা নির্বাচক বা ভোটারদের সংখ্যাকে ভাগ করার ভিত্তিতে, যে কয়টি ন্যূনতম ভোটের আবশ্যক সে কয়টি ভোট যে দল বা গ্রুপের হাতে আছে সে অবশ্যই একটি সদস্যপদ দখল করতে পারতো।

যে কারণে 'সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট' এর এই পদ্ধতির উল্লেখ সেটি বলছি। যুক্তফ্রন্টের বামপন্থী সদস্যগণ একদিকে যেমন তাঁদের সমর্থন প্রধানত আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের দিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তেমনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই তালিকার বাইরে তাঁদের নিজস্ব কোনো মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে গণপরিষদে প্রেরণের। আর এমন ব্যক্তির অন্বেষণে তাঁরা শেষপর্যন্ত আমাকে মনোনীত করেছিলেন গণপরিষদে যাওয়ার জন্য। তাঁদের শক্তি এবং এরূপ সিদ্ধান্তের কথা আমি বন্দী অবস্থাতে কিছুই জানতাম না। কেবল এর আভাস পেলাম সেদিন যেদিন মনোনীত ব্যক্তির সম্মতি হিসাবে আমার দস্তখত তাঁরা সংগ্রহ করলেন ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে। এ সমস্ত ঘটনার কারণে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা জেলের কর্তৃপক্ষের নিকট নিশ্চয়ই কিছুটা পরিচিত এবং বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলাম।

সে যা হোক, বোধহয় ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে আমি সেই '৪৯ সালের পর থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর বন্দি জীবনের পরে মুক্তি পেলাম। মুক্তি পাওয়ার পরের দিনই সম্ভবত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ভোটে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবং পূর্ববঙ্গ থেকে অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে আমিও গণপরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত হই। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই জনাব সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, মাহমুদ আলী এঁরা সবাই গণপরিষদে নির্বাচিত হন। এঁদের বেশরিভাগ পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদের বাইরে থেকে মনোনীতদের মধ্যে যেমন জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন, তেমনি আমি ছিলাম।

পাকিস্তানের গণপরিষদে আমার নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারটা আমার নিজের নিকট যতোটা অপরিচিত এবং তাৎপর্যহীন বলে বোধ হোক না কেন, বাইরের জগতে বিভিন্ন মহলে এটি বেশ তাৎপর্যময় বলে চিহ্নিত হতে লাগল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন-বিজয়টাকেই সেদিন মার্কিন মহল আতঙ্কের চোখে দেখেছিল। পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সমগ্র পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট কবলিত বলে শোরগোল তুলেছিল এবং এ কে ফজলুল হক সাহেবকে তাঁর কলকাতায় প্রদত্ত কিছু আবেগমিশ্রিত উক্তির ভিত্তিতে 'রাষ্ট্রবিরোধী' বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছিল এবং সে অজুহাতেই ইসকান্দার মির্জা হক সাহেবকে গৃহবন্দী পর্যন্ত করেছিল। এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই জেল থেকে একজন বামপন্থী প্রার্থীর গণপরিষদে নির্বাচনে জয়লাভ এই মহলের মনের আতঙ্ককে বৃদ্ধি করেছিল। তারা একে কমিউনিস্ট বিজয় বলে চিহ্নিত করে পাকিস্তান সরকারকে জবাবদিহি করেছিল। কিন্তু উচ্চতর রাজনীতির এসব কথা আমার মতো গোবেচারীর পক্ষে অনুধাবন করা সহজ ছিল না। আমার সঙ্গে এসব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যোগাযোগটি পরবর্তীকালে বোঝা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় গণপরিষদ নির্বাচিত হওয়ার পরে তার প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয় করাচীতে নয়—আহ্বান করা হয় পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডি ছাড়িয়ে মারী পাহাড়ের চূড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা ছাউনীতে। গণপরিষদের এমন স্থানে অধিবেশন, অবশ্যই অস্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সেই সময়কার রাজনীতি, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের এ অধিবেশন অর্থবহ ছিল। পাকিস্তান সরকারের মূল নায়ক তখন গোলাম মোহাম্মদ আইয়ুব খান, ইসকান্দার মির্জা, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, মোশতাক আদম গুলমানী—এঁরা। তাঁদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটেছে। পূর্ববঙ্গের এসেছে নতুন শক্তির প্রতিনিধি শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান এবং তাঁদের অপর সঙ্গীরা। রাজনীতিক আবহাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষাটা ছিল এরূপ : পূর্ববঙ্গ যদি পশ্চিম পাকিস্তানের হুকুম না মানে, পাকিস্তানের নেতাদের কথামত 'এক ইউনিট' আর 'প্যারিটি'কে যদি স্বীকার না করে তাহলে পূর্ববঙ্গের উপর সামরিক আইন জারি করা হবে। এই সামরিক আইনের হুমকিকে বাস্তবে প্রকাশের উপায় হিসাবে পাকিস্তান সরকার গণপরিষদকে আহ্বান করেছিল করাচী কিংবা লাহোরে নয়। আহ্বান করেছিল মোগল আমলে রাজবন্দীদের নির্বাসনস্থল অগম্য মারী পাহাড়ের চূড়ায়।

কিন্তু মারী পাহাড়ের গণপরিষদের অধিবেশনের কাহিনী বলার জন্য এ কথার অবতারণা নয়। আমি গণপরিষদের নির্বাচিত একজন সদস্য হিসাবে মারী পাহাড়ের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলাম। কয়েকদিন অধিবেশন চলার পরে অধিবেশন মূলতবী করা হয় এবং পরবর্তী অধিবেশন করাচীতে আহ্বান করা হয়।

আমি মারী অধিবেশন শেষ করে ঢাকাতে ফিরে আসি এবং কিছুদিন পরে করাচী অধিবেশনে যোগদানের জন্য তৈরি হতে থাকি। পূর্ব পাকিস্তান মানে পূর্ববঙ্গে তখন আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী। তখনি ঢাকাতে সংঘটিত হয়েছিল পুলিশ ধর্মঘট, পুলিশ বাহিনীর দাবি-দাওয়ার কারণে। আর এই ধর্মঘটের অজুহাতে প্রথম চোটেই আবু হোসেন সরকার আবার গ্রেফতার করতে আরম্ভ করলেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থী সেই সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের যারা দীর্ঘদিন কারাবাসের পরে কিছুকাল পূর্বে মাত্র মুক্তি পেয়েছিলেন। আবু হোসেন সরকারের এমন পদক্ষেপ ছিল যেমন অগণতান্ত্রিক তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুম-বরদারী। আমাদের নিজেরও এমন অবস্থাতে আশংকা হচ্ছিল যে, সরকার আমাকে বোধহয় গণপরিষদের করাচী অধিবেশনে আদৌ যোগদান করতে দিবে না এবং গ্রেফতার করবে।

ব্যাপারটা ঘটলও তাই। এই আশঙ্কার মধ্যেই আমি করাচী অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বিমান আরোহণের জন্য তেজগাঁ বিমানবন্দরে হাজির হলাম। হয়ত সেটা আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাস, '৫৫ সালের। বিমানে চলেছেন, পূর্ববঙ্গের সকল প্রখ্যাত নেতা যারা গণপরিষদের সদস্য। শেখ মুজিবর রহমান, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ—এঁরাও সেদিন যাত্রা করেছেন করাচীর জন্য। আমি বিমানে যথারীতি আরোহণ করেছি। বিমান ছাড়ার সময়ও হয়ে গেছে। পি. আই.এ সুপার কনসটেলেশন। পথে কোথাও বিরাম না নিয়ে একদমকে প্রায় পাঁচ ছ ঘণ্টা আকাশ যাত্রার পরে পৌঁছে যায় করাচী। বিমান ছাড়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তবু যেন কেন বিমান ছাড়ছে না।

তখন দেখা গেল, একজন পুলিশ কর্মচারী বিমানের সারিবদ্ধ সিটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিচ্ছেন : 'হু ইজ সরদার ফজলুল করিম?' আমি বুঝলাম, আমার আশঙ্কা সত্য হতে চলেছে। আমি দঁাড়িয়ে বললাম : 'আই এ্যাম সরদার ফজলুল করিম।' পুলিশ অফিসার ভদ্রতার সঙ্গে বললেন : 'ইউ উইল প্লিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাম ডাউন। ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট। আপনি নেমে আসুন। আপনাকে গ্রফতার করা হয়েছে।'

সেদিনও ভেবেছি, এখনো ভাবছি, এসব ঘটনা আমার মতো সরল, ক্ষুদ্র আর গোবেচারী মানুষের জীবনে দুর্লভ অভিজ্ঞতাই বটে। একে নির্বিকারভাবে উপভোগ করা ছাড়া এ নিয়ে বিব্রতবোধ করে কোনো লাভ নেই। আমি নেমে আসতে আসতে শেখ মুজিব এবং আতাউর রহমান সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম এই বলে : 'আপনারা দেখুন, আমি গণপরিষদের সদস্য। আমাকে এরা তার অধিবেশনে যোগ দিতে দিচ্ছে না।'

নিচে নামিয়ে এনে তেজগাঁও বিমানবন্দরের থানা অফিসার ভদ্রতা সহকারে বসিয়ে মাফ চাইলেন। বললেন : 'আমাদের কিছু করার নাই। আমাদের মাফ করবেন। উপর থেকে নির্দেশ এসেছে, এই দেখুন।' সেই নির্দেশে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে : 'সরদার ফজলুল করিম গণপরিষদের সদস্য। তিনি যে কোনো সময়ে করাচী যেতে পারেন। তিনি এ জন্য তেজগাঁও বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেই তুমি তাঁকে নিজে গ্রেফতার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিবে।' না, আমার মনে করার কিছু নেই। আমি থানা অফিসারকে তার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ জানালাম। থানা অফিসার একটি জীপে করে আমাকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দিলেন। কয়েকমাস ব্যবধানের পরে আবার আমি ফিরে এলাম সেই পুরোন বন্দী আবাসেই। তখন সেখানে নতুন গ্রেফতারকৃত এবং পুরোন বন্দীরা অনেকে রয়েছেন। পুনরায় মিলিত হলাম তাঁদের সঙ্গে।

কিন্তু এ কাহিনীর চমৎকারিত্ব এখানেই শেষ নয়। করাচীতে যখন অধিবেশন বসল গণপরিষদের, তখন পূর্ববাংলার সবচেয়ে জোরাল আর তেজী যুবনেতা শেখ মুজিব প্রশ্ন করেছিলেন : 'আমরা জবাব চাই, সরদার ফজলুল করিমকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে?'

হ্যাঁ, এ প্রশ্নের জবাব যে একটা দিতে হবে তা কেন্দ্রীয় সরকার জানতেন এবং আবু হোসেন সরকারও জানতেন। কারণ, বুর্জোয়া আইন পরিষদের ইংরেজি ঐতিহ্য যা একটু তখনো বহাল ছিল তাতে গণপরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্যকে সুনির্দিষ্ট কোনো ফৌজদারী অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ বাদে গ্রেফতার করা চলে না। আর সে কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে জরুরী তারে জানিয়েছিল, 'একটা কিছু কারণ বল, সরদার ফজলুল করিমকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে। গণপরিষদে এর জবাব দিতে হবে।' এমন জরুরী তারের উৎস অবশ্য আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তারা জবাব চেয়েছিল ওয়াশিংটনের পাকস্তান দূতাবাসে : 'কেমন করে একজন বামপন্থী রাজবন্দী কারাগার থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত হতে পারেন তা ব্যাখ্যা কর।' ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাস জবাব চেয়েছিল পাকিস্তানের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে। আর বৈদেশিক মন্ত্রণালয় চেয়েছিল প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকারের কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু হোসেন সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট জবাব চেয়েছিল ঢাকা জেলের কর্তৃপক্ষের কাছে আর সে জবাব চাওয়ার সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছিল, সরদার ফজলুল করিমের বিরুদ্ধে যা হোক একটা অভিযোগ নিয়ে আস।

আর সেই অভিযোগের তল্লাশিতে তারা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করল এবং বলল : সরদার ফজলুল করিমকে আমরা মুক্তি দিইনি, তিনি জেল থেকে পালিয়ে গেছেন। সুতরাং তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির অমুক ধারামতে নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এ ছাড়াও জেল থেকে সরকার-সকল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হলো যে সরদার ফজলুল করিমকে এবার আর ভুলক্রমেও ছাড়া হবে না। কারণ তিনি এই নির্দিষ্ট অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেও আমাদের বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল আটকের বিধান রয়েছে। তা থেকে তিনি মুক্তি পাবেন না।

বাইরের দুনিয়ার মানুষ বিশেষ করে দূরকালের আজকের পাঠকবর্গ এমন জটিল কাহিনীর রস কতখানি উপভোগ করতে পারবেন, তা জানিনে। তবে অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতাতে আমি যে সমৃদ্ধ হচ্ছিলাম, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং আমার আর দ্বিতীয়বার গণপরিষদে যাওয়া হলো না। বিমান আরোহণ করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে আমাকে অবতরণ করতে হলো।

এবং এবার একটি নতুন অভিজ্ঞতা হতে শুরু করল। কয়েকদিন বিরতিতে ঢাকা কোর্টে জেল থেকে গমনাগমন একজন রাজবন্দীর পক্ষে একেবারে অবাঞ্ছিত নয়। এরই মাধ্যমে সে রাজবন্দী অন্তত কিছুক্ষণের জন্য বাইরে জগতের আলো-হাওয়ার, তার চলমান জীবনের, রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার, জন-যাতায়াতের কিছুটা সাক্ষাৎ, কিছুটা আভাস পায়। আর এমন আলো হাওয়া টেনেই তাকে বন্দীনিবাসের অন্ধকারে মানসিকভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হয়।

প্রবীণ আইনজ্ঞ আতাউর রহমান খানের একটা গুণ এই যে, তিনি যেমন সুরসিক তার আলাপ আলোচনাতে, তেমনি তিনি গণতন্ত্রীমনা। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি স্বদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। যখনকার কথা বলছি সেই '৫৪-'৫৫ সালে তিনি আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা। প্রাদেশিক পরিষদ এবং গণপরিষদ—উভয়েরই প্রথম সারির তিনি সদস্য। আমাকে তিনি প্রথম পরিচয় থেকেই বয়োকনিষ্ঠ স্নেহভাজন হিসাবে দেখে এসেছেন। আমাদের বিমানে গ্রেফতার তার চোখের সামনেই ঘটেছে। তিনি কৌতুক বোধ করছেন সমগ্র ব্যাপারটাতে। তাই যখন আমার বিরুদ্ধে জনাব আবু হোসেন সরকারের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে 'জেল-পলায়নের কেস হাজির করা হলো তখন তিনি নিজের আগ্রহেই কেসটির আইনবিদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ব্যাপারটা কোর্ট পর্যন্ত গড়ালে সরকারই নাজেহাল হবে ভেবে আতাউর রহমান সাহেব নিজে আবু হোসেন সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন এ মামলা তুলে নিতে। তখনো জনাব আবু হোসেন সরকার তার স্বভাবসুলভ সিদ্ধান্তহীন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহায় ভাব দেখিয়ে বলেছিলেন : 'এ কেসে তো কিছু হবে না। কিন্তু কী করি? করাচীর হুকুম।'

কাজে কাজেই আমার বিরুদ্ধে মামলা কোর্টেই ফয়সালা করতে হলো। খুব যে বেশীদিন গাড়িয়েছিল, তা নয়। বার দুই তিন হয়ত আমি উঁচু দেয়াল ঘেরা সেন্ট্রাল জেল থেকে সকাল দশটায় সরকারি জিপের সামনে বসে বংশাল আর নওয়াবপুরের লোকজনদের প্রত্যেককে নিজের একেবারে পরিচিত এবং আত্মীয়সম বোধ করার অনুভূতি নিয়ে ঢাকার আদালতে যাতায়াত করতে পেরেছিলাম। তারই শেষ দিনের বাদী আর বিবাদী পক্ষের জেরা-জবানবন্দীটি ছিল নিম্নরূপ : বাদী পক্ষে জেল কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত জেলার জবানবন্দী করলেন, সরদার ফজলুল করিমের মুক্তির আদেশ ছিল না, আদেশ ছিল ভিন্নতর ফজলুল করিম সরদারের। কিন্তু সরদার ফজলুল করিম ভুল পরিচয় দানে জেল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন! বিবাদী, মানে অভিযুক্ত আমার আইনবিদ আতাউর রহমান খান অতিরিক্ত জেলারকে জেরা করলেন : ভালো কথা, সরদার ফজলুল করিম মিথ্যা পরিচয়ে জেল থেকে চলে এসেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, তিনি কি জেল গেটে বসে থাকতেন, না তাকে কড়াকড়িভাবে জেলের ভেতরে সেলের মধ্যে আটক রাখা হত?

: হ্যা, এ কথা ঠিক, তিনি জেলের ভেতরে সেলে থাকতেন।

: তাহলে তিনি সেল বা ডিগ্রি থেকে জেল গেটে এলেন কী করে?

: আমরা ডেকে এনেছিলাম।

: ডেকে এনেছিলেন? কী নামে? আপনি কি সরদার ফজলুল করিমকে চিনেন?

: হ্যাঁ, আমি চিনি। উনি সরদার ফজলুল করিম।

: আর অপর যে ফজলুল করিম সরদার, তিনি কি ঢাকা জেলে এই সময়ে বন্দি ছিলেন?

: না, তিনি রাজশাহী জেলে ছিলেন।

: তাহলে তার মুক্তির আদেশ ঢাকা জেলে এল কী করে?

: স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে পাঠিয়েছে।

: তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কী? আপনারা, মানে জেলের অফিসাররা সরদার ফজলুল করিমকে জেলের ভেতর থেকে ডেকে গেটের অফিসে আনলেন, তার নিজের স্বাক্ষরাদি গ্রহণ করলেন, তাকে সসম্মানে অপর কয়েকজন রাজবন্দীর সঙ্গে মুক্তি দিলেন। তিনি মুক্তি পেলেন। এখন তার বিরুদ্ধে ভিন্ন পরিচয়ে জেল থেকে বেরিয়ে যাবার অদ্ভুত অভিযোগ আসে কেমন করে? অতিরিক্ত জেলার সরল মানুষ। এবার তিনি ভেঙে পড়লেন।

: স্যার, আমি কি করব? 'হোম থেকে হুকুম দিয়েছে, সরদার ফজলুল করিমের নামে কেস একটা করতে হবে। তা আমি কেস করেছি। ... কোর্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাকিম ব্যাপারটাকে আর অগ্রসর হতে দিলেন না। বললেন, যাই হোক, ভুল হয়ে গেছে। কিনতু এ ব্যাপারে সরদার ফজলুল করিম জড়িত হতে পারেন না। মোট কথা, এ নালিশ থেকে কোর্ট আমাকে মুক্ত করে দিল। কিন্তু তাতে কি? নিরাপত্তা আইনের সীমাহীন সময়ের বিধান তো রয়েছেই। তাই এমন অদ্ভুত অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েও আমাকে ফিরে যেতে হলো আমার পরিচিত জগত, বন্দী নিবাসে।

তবু অতিরিক্ত জেলারের উপরওয়ালা, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র বিভাগ সব দায়িত্ব চাপাল ঐ অতিরিক্ত জেলারের উপরই। তিনি নাকি তাঁর দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখিয়েছেন। তিনি আমার পিতার নাম ইত্যাদি নাকি জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখিত পরিচয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেননি। আর সেই অপরাধেই হলো তার সাসপেনশন। অথচ আমার এই আলোচ্য ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলারের আদতেই কোনো দোষ ছিল না। তখন যুক্তফ্রন্টের আমলে এসে গেছে রাজবন্দীদের মুক্তির পালা। আজ কয়েকজনের মুক্তি তো, কাল অপর কয়েকজনের। আবু হোসেন সরকার যে একদিনেই সাধারণ মুক্তি ঘোষণা করে সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিবেন, সে সাহস তার ছিল না। অপর দিকে যুক্তফ্রন্টের একেবারে প্রথম দফায় ঘোষিত অঙ্গীকার, 'সকল রাজবন্দীর মুক্তি'—তাকেও তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারছিলেন না। তাই কোনো পরিচিতি রাজবন্দীকে মুক্তি দিলে তিনি আবার তাকে পরামর্শ দিতেন, দেখবেন ভাই, আপনাদের রিলিজের খবরকে যেন কাগজে আবার বড় করে না ছাপে। তাহলে করাচীর চাপে আবার অঘটন ঘটবে।

সে যা হোক, দু'একদিন অন্তর দলে দলে এই মুক্তির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এসেছিল আমার মুক্তির কথাটি। অতিরিক্ত জেলার ভদ্রলোকের নিজের জবানীতে : আমার দোষ কোথায় বলুন। আমি কী করব? আপনারা যেদিন মুক্তি পান সেদিন দুপুরে 'হোম (অর্থাৎ হোম ডিপার্টমেন্ট) থেকে আমাকে ফোন করা হলো : 'আজ বিকেলে কয়েকজন রাজবন্দী ছাড়া পাবেন। আপনি তাদের নাম লিখে নিন এবং তাদেরকে রিলিজের জন্য রেডি করুন। আর যে নামগুলি 'হোম' থেকে ফোনে বলেছিল তার প্রথমেই ছিল ফজলুল করিম-এর নাম। আমি তখনি জিজ্ঞেস করেছিলাম ফোনে : উনি 'সরদার ফজলুল করিম' তো? জবাবে হোম বলেছিল : ঢাকা জেলে এই নামে আর কেউ নাই তো? আমি বলেছিলাম, 'না, সরদার ফজলুল করিমই আছেন। তাকে আমরা চিনি। তিনি এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন?' আর এর জবাবে হোম বলেছিল, 'তবে উনিই রিলিজড হবেন।'

এই কারণেই আমাদের রিলিজের সময়ে ভদ্রলোক অত খুঁটিনাটিভাবে কাগজপত্র মেলাননি। কিন্তু এটা তো মারাত্মক ব্যাপার কিছু নয়। সকলেই আগে পরে মুক্তি দেওয়া হচ্ছিল। আসলে এই ভুলের সুযোগ নিয়েই আবু হোসেন সাহেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করাচীর হুকুমে আমার বিরুদ্ধে একটা নির্দিষ্ট অভিযোগের কেস করে করাচীকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। আর করাচী কর্তৃপক্ষ গণপরিষদকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, রাজনৈতিক কারণে নয়, বিশেষ অভিযোগের কারণে সরদার ফজলুল করিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দেশের সমাজ ব্যবস্থা, এমন কি কোনো সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনে জড়িত কোনো রাজনৈতিক কর্মীর জন্য এ রকম হাস্যাস্পদ অভিযোগে (এর চেয়েও হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য কত অভিযোগে কত কর্মী অভিযুক্ত হয়েছেন।) অভিযুক্ত হওয়া কোনো অভিনব ব্যাপার নয়। এ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করারও কিছু নেই। আমি সে চিন্তা করিওনি। মোটকথা আমার গ্রেফতারটা একেবারেই রাজনৈতিক, আমাকে যে আদৌ মুক্ত জগতে থাকতে দেওয়া হবে না, এমন কি আমি গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, তা এতেই প্রমাণ হলো যে এই মিথ্যা অভিযোগ থেকে বিচারালয় আমাকে মুক্তি দিলেও সরকার নিরাপত্তা আইনে আমাকে আটক করে রাখতে থাকলেন এবং আমার পক্ষে আর গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান তৈরির বিতর্কাদিতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হলো না। এই গল্পটাই একটু বিস্তারিতভাবে 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' কবি ফয়েজকে তার আগ্রহাতিশয্যে একদিন আমি বলতে বাধ্য হলাম। ফয়েজ শেষে প্রশ্ন করলেন : তাহলে আপনি সত্যি সত্যি ছাড়া পেলেন কবে?

: কেবল আমি নই, আমরা সকলে, অর্থাৎ রাজবন্দী সকলে মুক্তি পেলাম আওয়ামী লীগ যখন ১৯৫৬ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারে আসীন হলো এবং আতাউর রহমান খান শেখ মুজিবকে নিয়ে তার মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তখন তারা প্রথমেই নিরাপত্তা আইন একেবারে বাতিল করে দিলেন এবং আমাকেসহ সকল রাজবন্দীকে কারাগার থেকে সংবর্ধনা জানিয়ে মুক্ত করে নিয়ে এলেন। পূর্ব পাকিস্তানে সরকারের এই পরিবর্তন অবশ্য কেন্দ্রের পরিবর্তনের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। বিভিন্ন দলের সমঝোতার মাধ্যমে ইসকেন্দার মীর্জা প্রেসিডেন্ট হন। এ সময়েই আওয়ামী লীগ এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান পার্টির সরকার গঠিত হয় (অক্টোবর, ১৯৫৬)।

"কিন্তু তারপরও তো আপনি আবার গ্রেফতার হয়েছেন?" ফয়েজ আবার প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম : হ্যাঁ সে আর এক পর্যায়ে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ইসকেন্দার মীর্জা এবং আইয়ুব খান যখন গণতান্ত্রিক সকল ব্যবস্থা বিনষ্ট করে দেশব্যাপী সামরিক আইন জারী করল, পার্লামেন্ট ও আইন সভাগুলি ভেঙে দিল, সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল, তখন। কিন্তু কেবল তখনই নয়। পাকিস্তানের শেষ দশাতে সেই ১৯৭১ সালের ভয়াল বছরে আবার পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক বাহিনী অপর সকলের মতো আমাকেও গ্রেফতার করে নিক্ষেপ করেছিল বন্দীশালায়। কিন্তু সে কাহিনী আজ নয় (১৬.০৩.৮১)।

কয়েকদিন আগের 'বিচিত্রায়' দেখলাম ফয়েজ তার মধ্যরাতের অশ্বারোহী সিরিজের একটি লেখাতে আমার বলা এ কাহিনীটির সারমর্ম উল্লেখ করেছেন। তিনি অবশ্য তার সরস হাতে এর চমৎকারিত্বের দিকটাতেই জোর দিয়েছেন। কত বিচিত্র রকমে জেলাগমন এবং জেল থেকে নিষ্ক্রমণ হয় এবং হয়েছেন, তার অন্যান্য দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমার কাহিনীটিও উল্লেখ করেছেন। তবে এ রকম কাহিনীর মূল মর্ম এর চমৎকারিত্ব নয়। আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক কর্মীর উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের আইনহীন, নীতিহীন হয়রানি ও নির্যাতনের দৃষ্টান্ত হিসাবেই এর তাৎপর্য (২৬.০৪.৮১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশ থেকে একুশ

মনোবিজ্ঞানে 'ফিকশেসন' বলে একটি কথা আছে। বাংলাতে একে আমরা বলতে পারি 'আবদ্ধতা'। কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে বললে 'খুঁটা গাড়া'। এর অর্থ, আমাদের মন অনেক সময়ে একটি ব্যক্তি, বিষয় বা বস্তুতে এমনভাবে আকর্ষিত বা আসক্ত হয়ে পড়ে যে, সে আর তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। বাস্তব অবস্থা বা নিজের দৈহিক বয়স হয়ত এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, এমন আবদ্ধতা আর ব্যক্তির পক্ষে মানানসই থাকছে না, তবু ব্যক্তি সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। বলা চলে ব্যক্তি হয়ত বুঝছেই না যে, তার এই স্থানুবৎ আবদ্ধতা আর তাকে মানায় না। এমন হলে ব্যাপারটি অন্যের চোখে রোগ বলে মনে হয়। মনোবিজ্ঞানে এ রোগের নিরাময় বিধি কী তা আমি জানিনে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির ক্ষেত্রে আমারও যেন তেমনি একটি আবদ্ধতার ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাপারটির একটি মনোবিশ্লেষণেও আমি চেষ্টা করেছি। একুশে ফেব্রুয়ারি ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বোধ হয়েছে একটি রহস্য-পুরুষ হিসাবে। তাকে প্রথম ভেবেছি রহস্য-শিশু হিসাবে যার জন্ম হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি ৫২ সালে। তারপরে তাকে মনে হয়েছে বর্ধমান তরুণ হিসাবে। এখন তো সে বয়সের দিক থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকই নয়, প্রায় ত্রিশ বছরের পুরো মানুষ। এমন বোধের কারণ হয়ত এই যে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমি নিজে চোখে দেখিনি। তবু সে যেভাবে পূর্ববাংলার মানুষকে আপাদমস্তক আন্দোলিত করেছিল তাতে তাকে রহস্যময় এক শক্তি বলে আমার মনে হয়েছে যার সঙ্গে ইতোপূর্বে আমার তেমন সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমার,—মানে সেই পঞ্চাশ দশকের বামপন্থী অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্মী, বিশেষ করে পাকিস্তানের নিচ্ছিদ্র কারাগারগুলোতে বন্দী মানুষের—ব্যক্তিগত ঋণেরও কিছু ব্যাপার আছে। সে অনুভূতির কথা স্থানান্তরে এবং বারান্তরে আমি কিছুটা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু গেল কয়েক বছর আমার একটা বিশেষ আগ্রহ ও আবদ্ধতা এই দাঁড়িয়েছে যে, প্রতি একুশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিপালনকে আমি বিশেষ উৎসাহ নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। আবার সকলের সঙ্গে একুশের রাত্রিতে বা প্রত্যুষে নগ্নপায়ে পথে নেমেছি, শহীদ মিনারের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করেছি, বাংলা একাডেমির কবিতা পাঠ বা গানের আসরে হাজির থেকেছি। এমন কি কোন সভাতে অন্য সাথীদের সঙ্গে বক্তৃতাও করেছি। এবং প্রতি একুশের সন্ধ্যাতে সেই একুশের স্মৃতিচারণ করে রোজনামচা লিখেছি। পুরনো খাতার পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে দেখলাম, এ রকম একুশের বিবরণ একাধিকই জমা হয়ে গেছে। একুশের উপর এমন রোজনামচা তৈরির তাগিদ আমার এসেছে প্রধানত এদিক থেকে যে, আমি বড় দুর্বল স্মৃতির মানুষ। আমি কিছুতেই গতকালকার বাজারের হিসাব লিখতে বসে মনে করতে পারিনে, এক সের ডাল এগার টাকায় কিনেছি না সাড়ে দশে পেয়েছি, কিংবা এক সের তেল সয়াবিন এনেছি, না ভালো তেল এবং তা কততে, কিংবা ডিমের দাম কী ছিল অথবা এক সের টমেটো বা তিতে এখনো ছটাকা না চার টাকা। এই আশঙ্কা একুশকে নিয়েও। পাছে আমি ভুলে যাই এবারকার একুশের পথযাত্রার কথা, কে কেমনভাবে নিল এবারের একুশকে। এ কথা মনে রাখার কি কোন তাৎপর্য নেই? আমার মনে হয় আছে। একুশ থেকে একুশ বা ফাল্গুন থেকে ফাল্গুনে কেবল একুশের বয়স বৃদ্ধি নয়, আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনেরও বিকাশ ও বিবর্তন। সে কোন দিকে? তার আভাস অন্য কোন দিনের উদযাপন না হোক একুশ থেকে একুশে একুশের উদযাপন তার আভাসে নিশ্চয়ই কিছু ভেসে ওঠে। আর সে চিন্তা থেকেই আমার পুরনো খাতা থেকে '৭৭ আর '৮০ : এই দু বছরের 'একুশে ফেব্রুয়ারি'কে পাঠকদের কাছে পেশ করার একটা আকর্ষণ বোধ করছি।

'৭৭-এর একুশ

২১-২-৭৭ ॥ সাতাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান আজ শেষ হলো। আমি আমার ছোট ছেলে তিতুকে নিয়ে সকালে সাড়ে ছটার দিকে বেরিয়েছিলাম শহীদ মিনারে কেমন জন-জমায়েত হয়েছে তা দেখার জন্য। রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলান্টিয়ার বাহিনী এবং সরকারি পুলিশ সকালে জন-জমায়েতকে আজিমপুরে গোরস্থানমুখী করে দিচ্ছে। সোজা শহীদ মিনারে যাওয়ার উপায় নেই। আজিমপুর গোরস্থান হয়ে যেতে হবে। শহীদ মিনারে সোজা যাওয়ার সব পথ বন্ধ। এ নির্দেশের একটা তাৎপর্য ভালো বলে বোধ হলো। আজিমপুরে ভাষা আন্দোলনের দুজন শহীদের বাঁধানো কবর আছে। একজন বরকত। অপর জন শফিক। অন্যান্য বছর প্রতিষ্ঠানগতভাবে অনেকে গোরস্থানে এসে এঁদের কবরে ফুল দিয়ে যেতেন। আবার অনেকে সোজা শহীদ মিনারে যেতেন। এবার আর তা হবার উপায় নেই। সকলকেই গোরস্থানের মধ্য দিয়ে শহীদ বরকত-শফিকের কবর হাতের ডানে রেখে আজিমপুরের রাস্তা ধরে শহীদ মিনারের দিকে এগুতে হয়েছে। আমরা দুজনও গোরস্থান হয়ে ছাত্র-কিশোর-কিশোর-কিশোরী-শিশু এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনতার লাইনে দাঁড়িয়ে আজিমপুর রাস্তা ধরে শহীদ মিনারের দিকে এগুলাম। দু লাইনে। কিন্তু শহীদ মিনারের কাছাকাছি আবার এক লাইন হয়ে এগুবার নির্দেশে সময় এত অধিক লাগছিল যে, মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা একাডেমিতে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম বাংলা একাডেমিতে বিরাট শামিয়ানার নিচে কবিতা পাঠের আসর বসে গেছে। এর পরে শুনলাম, শহীদ মিনারে কাউকে দাঁড়াতে দেয়া হয়নি। এমনকি মিনারের বিপরীতে যে সমস্ত বাণীর ফেস্টুন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে পড়ার সুযোগও দেয়া হয়নি। মোটকথা কয়েক বছর যাবত একুশে অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করার যে চেষ্টা চলেছে তাতে এবার আর কোনোদিকে কোনো ব্যতিক্রম ঘটতে পারেনি। আগের দিনে শহীদ মিনারে স্বতঃস্ফূর্ত জনজমায়েত হত। শহীদ মিনারে রাত বারোটা থেকে শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জমায়েত হতে আরম্ভ করত। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত। হয়ত কোনো সঙ্গীতের আসর বসত। পোস্টারের প্রদর্শনী হত। তাই দেখত। শহীদ মিনারের কাছে একটি বিষাদ কিন্তু উদ্দীপনার আবেগ তৈরি হত। তা থেকে সহজে কেউ সরে আসতে চাইত না।

এখন আর সে আবেগের কোন অস্তিত্ব নেই। সবই সুশৃঙ্খলিত। তবু একুশের একটা টান আছে। সেই টানে রাজনীতির বাইরে যারা আছে তারাও পথে বেরিয়ে এসেছে। এই নিয়ন্ত্রণকে মেনেই শহীদ মিনারে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। রাজনীতির দল-উপদল নিজেদের অস্তিত্বও যে কিছু পরিমাণে এ উপলক্ষে প্রকাশ করার চেষ্টা না করেছে, তা নয়। গত রাতে কোন ছাত্রদলের শহীদ মিনারের উপরের চত্বরে ওঠা নিয়ে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে নাকি বিরোধ ঘটেছে। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে এ একুশ নিয়ন্ত্রিত ও আবেগহীন আনুষ্ঠানিকতার একুশ। একজন রিকশাওয়ালা দুপুরে শহীদ মিনার থেকে প্রত্যাগতদের পায়ের জুতোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'শুধু এখন নয়। সকালেও অনেকের পায়েই জুতা ছিল। সাহেব, সে একুশ আজ আর নাই। আর বছর দুই যাওবা থাকবে, তারপরে আর তাও থাকবে না।' এক বন্ধু বললেন, নিয়ন্ত্রণকারী এক স্বেচ্ছাসেবক নাকি শহীদ মিনারের পাদপীঠে নিজে স্বজুতায় থেকেই অপরকে জুতা খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। একুশ উপলক্ষে সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রধানত বাংলা একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। বাংলা একাডেমিতে জনসমাগম কম হয়নি। তাদের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল সন্ধ্যাবেলার নাট্যানুষ্ঠান কিংবা সঙ্গীতানুষ্ঠান। এর সাথে কিছু আলোচনাও ছিল। ছোটদের বিতর্ক ছিল। '৭৬ সনের জন্য বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে গতকাল। ছটি ক্ষেত্রে এঁরা সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে থাকেন। এবার অনুবাদে আমার নাম এঁরা এঁদের এই নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটা আমাকে বিব্রত করেছে বেশি। বেশ কয়েকজন অভিনন্দন জানিয়েছেন আমাকে। আমি নিজেও একদিন বাংলা একাডেমির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মচারী হিসাবে এই সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সংগঠনগত ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এরূপ পুরস্কার প্রদানের আদৌ কোনো যৌক্তিকতা নেই, এমন কী মনে করিনে। কিন্তু বছর থেকে বছরে এই সাহিত্য পুরস্কারের নির্বাচন এমন সব অ-সাহিত্যিক বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে যে এ পুরস্কারের উদ্দীপনামুলক চরিত্র অনেকখানি বিনষ্ট হয়েছে। আর তাছাড়া কোন পুরস্কারের লক্ষ্য নিয়ে আমি আদৌ কোনো কাজ করি নি। আমার কাজেরও তেমন বৃহৎ কোন পরিমাণ নেই। আমি পেশাগত সাহিত্যিকও নই। নিজের অনুভূতিতে যে কাজ করা আবশ্যক বোধ করেছি নিজের শক্তিমতো তা করার চেষ্টা করেছি। আগামীতেও তা করব। এ সব পুরস্কার প্রদান অনেক ক্ষেত্রে নানা ঈর্ষা এবং কটূক্তি বা বক্রোক্তির উদ্রেক করে। সেদিন থেকে আমাকে একুশের সাহিত্য পুরষ্কারের জন্য নির্বাচিত না করলেই আমি অধিকতর উপকৃত বোধ করতাম। কিন্তু এ নির্বাচনে আমার কিছু করণীয় ছিল না। আমাকে পূর্বাহ্নে জিজ্ঞেস করলে আমি সবিনয়ে এটি নাকচ করতাম। কিন্তু আজ প্রকাশ্যভাবে বিবৃতি দিয়ে এটি প্রত্যাখ্যান করার তাৎপর্য ভিন্নতর। সে তাৎপর্যকে আমি বুঝি। কিন্তু তেমন রাজনীতিক পদক্ষেপ নেয়াও এক ধরনের বাড়াবাড়ি বই আর কিছু নয়। এরূপ উদাহরণ যে ইতোমধ্যে কিছু তৈরি না হয়েছে তা নয়। বদরুদ্দীন উমর বছর দুই আগে তাঁকে প্রদত্ত বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার বিবৃতি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর তাঁর প্রতিবাদী অভিমতের জন্য বেশ আলোচিত সাহিত্যিক ও ব্যক্তিত্ব। মতামতের জন্য উঁচু অধ্যাপনা পরিত্যাগ করেছেন। সাহিত্য দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্র সাহিত্যিকদের ক্রয় করার চেষ্টা করে। তিনি সেভাবে ক্রীত হতে চাননি। তাঁর এ কথায় জোর যে নেই তা নয়। কিন্তু এ রাষ্ট্রযন্ত্র জনসাধারণের টাকাতেই চলছে। এর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান। তার কাগজ, বেতার, টেলিভিশন এবং নানা শিক্ষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ টাকার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যাখ্যানের নীতিতে এর সবগুলিকেই প্রত্যাখ্যান করতে হয়। কিন্তু সেরূপ প্রত্যাখ্যানের একটি নৈরাজ্যিক অর্থ যে রয়েছে সেটিও অস্বীকার করা চলে না। এবার আর যাঁদেরকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দেয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে কবিতায় রয়েছেন মতিউল ইসলাম, ছোটগল্পে সুচরিত চৌধুরী, নাটকে মমতাজউদ্দীন, উপন্যাসে দিলারা হাশেম, প্রবন্ধে সিরাজ উদ্দিন কাসেমপুরী এবং শিশু সাহিত্যে ফয়েজ আহ্‌মদ।

'৮০-এর একুশ

২৪.০২.৮০ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল পাঁচটায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে একুশের স্মরণে আলোচনা সভা ডেকেছিলেন। গোড়ার দিকে উপস্থিতি হয়ত দশজনও ছিল না। পরের দিকে হয়ত পঁচিশ জনে পৌঁছেছিল। সেখানেও সংগঠকদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে কিছু বলতে হয়েছিল। যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বভাব বক্তা নয়, ভিতর থেকে বক্তৃতার বেগ যারা বোধ করে না তাদের জন্য এমন অনুরোধ বড় বিব্রতকর। তবু আমাকে কিছু বলতে হয়েছিল। প্রথমে বলেছিলেন ড. মহব্বত আলী, শরীফ উল্লাহ ভুঁইঞা, ড. অজয় রায়, ড. শামসুল হক মোল্লা, জনাব আবুল কালাম আজাদ—এঁরা। আমার ব্যক্তিগত কিছু আবেগের প্রকাশ ব্যতীত বলার আর কিছু ছিল না। আমি রাজনৈতিক কর্মী, বিপ্লবী বা নেতা নই। একুশে ফেব্রুয়ারির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাও আমার নেই। তবু বয়সের দিক দিয়ে পঞ্চান্ন বছরে পা দিয়ে কারুর অনুরোধ উপেক্ষা করার যেমন ক্ষমতা নেই, তেমনি বলতে গেলেও বয়সগত অভিজ্ঞতার কিছু স্মৃতিচারণ ব্যতীত তেমন বলারও আমার কোনো পুঁজি নেই। সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলার চেষ্টা করলাম : ১৯৪৮ সালের প্রথমে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি এবং '৫২ সালের বন্দীদশার কথা। বন্দীদের মনে '৫২-এর একুশ কী আশা ও ভরসার কথা শুনিয়েছিল, কীভাবে একুশ শত শত রাজনৈতিক বন্দী, যারা বছরের পর বছর ধরে অন্ধকারগুহায় নির্যাতনে, নিষ্পেষণে, নিরাশায় মুষড়ে পড়ছিল তাদের কিভাবে একুশ নবজীবন দান করেছিল, তার কথা। একুশের সপ্তাহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পালিত হচ্ছে। গত কয়েকদিনের আলোচনায় অন্য সবার মতো আমিও আজকের একুশের অনুষ্ঠান সর্বস্বতায় দুঃখ প্রকাশ করেছি। তথাপি শিক্ষক সমিতির আলোচনায় আমি যখন বলেছি যে, তথাপি একুশ এখনো আমাদের উদ্বেগের বিষয়, আমরা চেয়ে থাকি উদ্বেগাকুল, চিন্তান্বিত, শঙ্কিত মন নিয়ে আগামী একুশ কেমন করে আসবে এবং একুশ পার হয়ে গেলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, সরকার থেকে আরম্ভ করে প্রতিষ্ঠান, সমাজব্যবস্থার সকল প্রতিষ্ঠান—তখন আমি নিজের একটি অনুভূতির কথাই বলেছি। একুশ এখনো আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন, একটি জিজ্ঞাসা। সরকার থেকে শুরু করে নানা রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত নিজ নিজ ইচ্ছা ও কামনা থেকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে চায়। তবু আশঙ্কা থাকে, এবারের একুশ জীবনের কী সত্যকে উদঘাটন করবে?

এবার রাত বারোটার পর থেকে 'আমার ভাই-এর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'—হৃদয়ের বেদনার্ত এ সুরের গুঞ্জন আমার বাসার পাশের প্রধান সড়কটিতে যত না শুনেছি তার চেয়ে বেশি শুনেছি নানা রাজনৈতিক দলীয় শ্লোগান : 'জেলের ভেতর গুলি কেন,—জবাব চাই, জবাব চাই,' 'জিয়া শাহীর গদিতে—আগুন জ্বালো এক সাথে' কিংবা সরকারি দল বিএনপির শ্লোগান, 'জিয়া আছে যেখানে আমরা আছি সেখানে।' রাতে আমি নিজে বেরুইনি। মেয়ে স্বাতী রাতের প্রথম দিকেই চলে গেল তার মেডিকেল কলেজ হস্টেলে। বারোটার পরে সে তার বান্ধবীদের নিয়ে শহীদ মিনারে যাবে ফুল দিতে। ছোট ছেলে তিতুকে নিয়ে মেয়েকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে মিনারের সামনে একুশকে আবাহনের সাজসজ্জার আয়োজন দেখলাম। বেশ কিছু ফেস্টুন কবি-সাহিত্যিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে টানিয়ে দিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনারের উল্টোদিকের চত্বরে। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার যে চরণের উদ্ধৃতি দিয়েছে তাতে ভুল রয়েছে বলে নজরে পড়ল। তিতুও বলল : আব্বা, এ লাইন তো হবে 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ,' অত্যাচারের তো নয়।' আমারও মনে হলো, তাই। কোথাও দেখলাম, শব্দের বানানে ভুল আছে। তবু লাল নীল কালিতে বড় বড় পোস্টার এবং তার উপর প্রক্ষিপ্ত উজ্জ্বল আলো চত্বরটিকে ভরে তুলেছে। জাসদের কর্মীরা দেখলাম আবদুর রব এবং মেজর জলিলের ছবি টাঙিয়ে দিচ্ছে দুদিকে দুটো গাছের সঙ্গে আর তার প্রশ্ন : রব-জলিল জেলে কেন? শহীদ মিনারের চূড়ায় দেখলাম শেখ মুজিবের একটি ছবি টানানো হয়েছে। তাঁর পাশে জাসদের ফাঁসিতে নিহত কর্নেল তাহেরের ছবিও রয়েছে। একুশের পূর্বে শহীদ মিনারের ব্যবস্থাপনায় থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কমিটি। এবার সে কমিটির নেতৃত্ব নির্বাচিত ছাত্র সংসদ 'ডাকসুর' হাতে। ডাকসুর নেতৃত্ব প্রধানত জাসদ কর্মীদের হাতে। তাদের কর্মী এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না এবং সাধারণ সম্পাদক আখতার-উজ্জামান দুজনেই প্রথম শ্রেণীর বাগ্মী এবং সংগঠক। কিন্তু শহীদ মিনারের চত্বরে ও চারপাশে যে জনতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সে হচ্ছে লোহার টুপি পরা সুসজ্জিত পুলিশ বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনীও বোধহয় মজুদ আছে। অনেকে বলেছেন, এবার শহীদ মিনারের যত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে তেমনটি ইতোপূর্বে আর কখনো করা হয়নি। পুলিশ বাহিনী থাকুক বা না থাকুক দেশের রাজনৈতিক দলের মধ্যে, বিশেষ করে সরকারি দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে না কোনো সংঘাত বেঁধে যায়—এ আশঙ্কা সবার মনে ছিল। কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। একুশের সকালে আগের রাতের যে বিবরণ পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল যে, বারোটার পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর মন্ত্রীবর্গ নিয়ে শহীদ মিনারে গিয়েছিলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ পুষ্পমাল্য স্থাপন করে চলে যান।...

ছোট ছেলে তিতু সকাল ছটার দিকে বাসা থেকে বেরিয়ে ঘুরে এল। আমাদের বাসার পাশ দিয়ে নীলক্ষেত সড়ক দিয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল আজিমপুর কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেখান হয়ে সমস্ত সংঘবদ্ধ মিছিল শহীদ মিনারে এসে শেষ হবে। কখন কোন মিছিল রাত বারোটা থেকে গিয়েছে এবং তাদের জমায়েতের কোনটি কী রূপ ধারণ করেছিল তা আমি দেখিনি। আমি রাস্তায় বেরিয়েছি সকাল সাতটায়। খালি পায়ে একটি ব্যাগ হাতে পশ্চিম দিকে এগুতে গিয়ে দেখলাম, পেছন থেকে একটি শোভাযাত্রা আসছে। সেটি দেখার জন্য নীলক্ষেত আর পুরাতন রেল সড়কের রাস্তার চারমাথায় দাঁড়িয়েছিলাম। তখনি বেশ কয়েকটি মিছিল দেখলাম। প্রথমটি জাসদ, মানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং তাদের ছাত্র শাখা ছাত্রলীগ সহ অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের ফেস্টুনসহ মিছিল। তারা সবাই শ্লোগান দিচ্ছিল। এর পরে এল আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গসংগঠনসমূহের মিছিল। এ মিছিলের সামনেও আমার পরিচিত কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতাকে দেখলাম। আবদুল মালেক উকিল, মহিউদ্দীন আহমদ—এঁদেরকে দেখলাম। ড. কামাল হোসেন শেখ সাহেবের মন্ত্রিসভার বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। '৭৫ এর আগস্টের পরে বিদেশে ছিলেন। সম্প্রতি বুঝি দেশে ফিরেছে। আওয়ামী লীগের পরে এল চৌধুরী হারুনুর রশীদের ন্যাপ। ন্যাপ এখন অনেক উপদলে বিভক্ত। হারুনুর রশীদ সাহেবকে দেখে বুঝলাম, এটি তাঁর ন্যাপ। এর পরে মনি সিংহের নেতৃত্বে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং আরো কয়েকটি গণসংগঠনের কর্মীরা এলো। তাদের নিজ নিজ নামের ফেস্টুন দেখলাম। জেনারেল ওসমানী সাহেবকে দেখলাম, তাঁর দলের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। হাসপাতাল কর্মীদের, বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের মিছিলের দৃশ্যটিও চোখে পড়ল। মোট কথা মারামারি না করে একের পর এক নিজেদের দলীয় বা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগের আওয়াজ এবং ফেস্টুনসহ আজিমপুরের মাজার হয়ে শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসর হওয়ার এই দৃশ্য আমার ভালো লেগেছে। অন্তত বিরোধী কিছু দল যে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের দাবিদাওয়া ও অভিমত দেশের সামনে পেশ করতে চাচ্ছে, তার একটি আভাস শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান এই মিছিলে প্রকাশ পেয়েছে।

আমিও কিছু রাস্তা ঘুরে শহীদ মিনার হয়ে বাংলা একাডেমির কবিতা পাঠের আসরের দৃশ্য দেখতে গিয়েছিলাম। শহীদ মিনার পার হওয়ার সময়ে দেখলাম, মাহমুদুর রহমান মান্না তাঁর আকর্ষণীয় কণ্ঠে দক্ষতার সঙ্গে অক্লান্তভাবে বিভিন্ন মিছিল ও জন-জমায়েত সম্পর্কে ধারা বিবরণী দিয়ে যাচ্ছেন। মাহমুদুর রহমান মান্নার বিভিন্নমুখী পারদর্শিতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বাংলা একাডেমিতেও বিরাট শামিয়ানার নিচে কবিতা পাঠের আসর অন্যান্য বছরের মতোই বসেছে। মঞ্চে কবি আবুল হোসেন সভাপতিত্ব করছেন। প্রধানত তরুণ কবিরা তাঁদের কবিতা পড়ছেন। নির্বাধ পাঠ। কারুরই পাঠ করতে কোনো অসুবিধা নেই। একাডেমির পক্ষ থেকে কারুরই কোন অভিমতে আপত্তি নেই। এ ঐতিহ্যটি ভালো তৈরি হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। হয়ত অনেকের কবিতা অনেকে শুনছে না। হয়ত অনেক কবিতাই দুর্বল। তবু আজকের দিনের কোনো কবিতা বক্তব্যহীন নয়। এবং সাধারণ শ্রোতা-দর্শক সপ্রশংসভাবে গ্রহণ করছে কবিদের সব প্রকাশকে। বক্তব্যের প্রধান সুর : অন্যায়, অবিচার বা শাসনের অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী সুর। কবি সানাউল হকের সঙ্গে দেখা হলো। এখন তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তরুণ কবিদের এই তেজী মনোভাবে সানাউল হক দেখলাম বেশ উজ্জীবিত বোধ করছেন। সানাউল আমার শিক্ষা জীবনেরও সাথী, যদিও আমার চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন আমার আগে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে 'তুমি' সম্বোধনে হৃদ্যতা বিদ্যমান। সানাউল ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের একুশের সপ্তাহ উদ্বোধনে বাংলা একাডেমিতে বেশ জোরালো বক্তব্য রেখে সকলের প্রশংসা পেয়েছেন। আজ যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকে শাসনযন্ত্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল মহৎ ঐতিহ্য ও চেতনাকে বিকৃত করার একটা অপচেষ্টা চলছে, সানউল হক তার প্রতি তীক্ষ্ণভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

* * *

গতকাল মানে ২৩ তারিখের বিকেলে সাংবাদিকতা বিভাগের একুশের আলোচনাতে যোগদানের জন্য আমার প্রতি আহ্বান আমার কাছে বেশ আকস্মিকভাবে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগই একুশকে যে তেমন গুরুত্ব সহকারে পালন করে, তার কোন পরিচয় নেই। সবাই অপর সব অনুষ্ঠানের অযুহাত দিয়ে নীরব থাকে। কিন্তু একুশ তারিখে কিংবা বাইশ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের সহযোগে বিভাগে বিভাগে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। এটি বিভাগীয় কাজ হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এর কোন আগ্রহ কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে তো নয়ই। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখলাম সাংবাদিকতা বিভাগে। তাঁদের কী একটি ক্লাব (গণ-সংযোগ ক্লাব বোধহয়) আছে। তাঁদের তরফ থেকে ২৩ তারিখ বিকেলে বিভাগীয় একটি কক্ষে তাঁরা আয়োজন করেছিলেন 'আমাদের সংস্কৃতি চেতনা ও একুশ'—নামে একটি আলোচনার। বিভাগীয় সংগঠকগণ, বিশেষ করে ছাত্র-কর্মীরা গত দুদিন ধরেই আমাকে খুঁজে বার করে বারবার অনুরোধ করেছেন, আমি যেন আলোচনাটিতে যোগদান করি। তাঁদের এমন ঐকান্তিক আমন্ত্রণ এবং অনুরোধ আমাকে বিব্রত করেছে। কেন যে আমার উপর তাঁদের দৃষ্টি পড়ল, তা আমি এখনো বুঝতে পারছিনে। একটি কারণ হয়ত এই যে, এমন একটি ধারণা তাঁদের হয়েছে যে, লোকটি দুর্বল এবং কোন অনুরোধ বা আদেশ অমান্য করতে পারে না। এ ধারণা যথার্থ।

তাই মনের অস্বস্তি সত্ত্বেও আমি তাঁদের আলোচনাটিতে যোগ দিয়েছিলাম। আলোচনায় ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক আহমেদ হুমায়ুন, অবজারভার পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব নজরুল ইসলাম, বিভাগীয় অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, ওয়াজির হোসেন। তাছাড়া ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এবং এই বিভাগেরই ছাত্র সুবক্তা আখতারউজ্জামান এবং আরো কয়েকজন আলোচনা করলেন। আহমেদ হুমায়ুন সংক্ষিপ্তভাবে ও সুনির্দিষ্ট করে বললেন, একুশের মূল চরিত্র হচ্ছে জনগণের সার্বিক মুক্তি। সে মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত একুশ সার্থক হয়েছে বলা চলে না। এবং বললেন যে, এটাও লক্ষণীয় যে, সেই '৫২ সালের আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপকতম জনতা যতটা সম্পৃক্ত ছিল আজ একুশের আবেদনে তারা যেন ততটা উদ্বুদ্ধ বা সম্পৃক্ত নয়। যেন একটা দূরত্ব দাঁড়িয়ে গেছে একুশের শহরভিত্তিক উদযাপন আর শ্রমিক কৃষক জনতার দূর থেকে নিস্পৃহ দর্শনের মধ্যে। কথাটি ঠিক। কয়েকজন আলোচক বাংলা ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচলন বা শিক্ষা প্রসঙ্গে ইংরেজি অবহেলিত যেন না হয় এবং ইংরেজি অবহেলিত হওয়ার পরিণাম সম্পর্কেও বললেন। আখতারউজ্জামান বললেন, একুশের স্মৃতিচারণের যে আবর্তে আমরা আবর্তিত হচ্ছি তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে একুশ তাঁর সার্থকতা লাভ করতে পারবে না। সংগঠকরা আমাকে উপস্থিত করতে গিয়ে 'প্রধান অতিথি' ইত্যাদি বলে আমার অবস্থা আরো সঙ্গীন করে তুললেন। আমার বক্তব্যের পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা বলেছিলেন তাঁদের সকলের বক্তব্যই আমার বেশ ভালো লেগেছিল। সেদিক থেকে আলোচনাটি বেশ ভালো হয়েছিল। আমি সেজন্য সংগঠকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমার নিজের বক্তব্য বলতে গিয়ে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বললাম। বললাম : আমার অনুভূতিতে একুশ নিজেই একটা নতুন সংস্কৃতি, এর পূর্বে আমাদের ছিল না। বাংলাদেশের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক দীনতার ফাঁককে একুশের চেতনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনেকখানি পূর্ণ করে দিয়েছে। কিন্তু একুশ ভাষা আন্দোলনের হলেও একুশ অবশ্যই একটি প্রতীকী আন্দোলন। ভাষার জন্য ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। ভাষা মানুষের জীবনের মুক্তি এবং প্রকাশের জন্য। তাই মানুষ মাত্রের যে স্বপ্ন, একটি সুখী জীবন যাপন করার স্বপ্ন এবং সমাজ রাষ্ট্রগতভাবে একটি সঙ্গতিপূর্ণ সুখী সমাজ গঠন করার স্বপ্ন তা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একুশের সংগ্রামী তাৎপর্য নিঃশেষিত হবে না। অবশ্য সরকারের পর সরকার এসেছে ও গেছে এবং তাদের চেষ্টা হয়েছে ক্ষমতায় আসার পূর্বে একুশের সংগ্রামী শক্তিকে ব্যবহার করে ক্ষমতাকে লাভ করার এবং ক্ষমতা লাভের পরে একুশকে অনুষ্ঠানে মাত্র সীমাবদ্ধ করে রাখার। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই একুশ অগ্রসর হয়ে এসেছে। এবং সেদিক থেকে এবারের একুশ কোন ব্যতিক্রম নয়। এবারের একুশকেও প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিরোধী শক্তির চরিত্র। আর তাই আমি নিজে তমাশা বোধ করছিনে চারদিকের একুশের অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান সর্বস্বতায়। একুশে অবশ্যই সংগ্রামী তরুণ তার অনুষ্ঠান সর্বস্বতার আবর্ত থেকে বার করে নিয়ে আসবে এবং তরুণদের সেই সংগ্রামী প্রয়াস আগামী একুশেতে আবার কিভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে তা দেখবার দুর্বার আগ্রহ অপর সকলের ন্যায় আমারও। সেদিক থেকে শুধু অতীতে নয়, বর্তমানও এক একুশ থেকে আর এক একুশকে দেখার আগ্রহ এবং আকর্ষণও আমাদের এই কষ্টকর জীবনে বেঁচে থাকার প্রেরণা বিশেষ। আর তাই একুশ আজো আমাদের জীবনের সঞ্জীবনী। বক্তব্যটি এভাবে বলার চেষ্টা করে সংকুচিতভাবে আমি বসে পড়লাম। সংগঠকগণ ও সমবেতরা সহর্ষে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। আমার নিজের প্রসন্নতা এখানে যে, তাঁদের এই আকস্মিক আমন্ত্রণের দায়িত্ব আমি যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করেছি।

১৯৮১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূহের কিশতি

৮ সেপ্টেম্বর '৮৮ : আমার এ রচনা নূহের কিশতির উপরে বসে রচিত। নূহের কিশতির তলদেশে ফুটো ছিল কি? থাকলে আর জোড়ায় জোড়ায় জীব আর জীবনের নমুনা টিকে থাকত না। কিন্তু আমার কিশতির তলায় আর ডাইনে বাঁয়ে ফুটো। একজন অনুগতকে সংগ্রহ করেছি। সে কিশতির পানি মিনিট ধরে কেবল সেঁচে চলেছে। একটি ঘরের দুই দরজায় জেদী, অবুঝ বড় ছেলের দাবীতে ইটের পরে ইট গেঁথে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এক ইঞ্চি করে পানি যত বেড়েছে, তার সে বাঁধ তত উঁচু হয়েছে। এখন সে মেঝে থেকে তিনফুট তো বটেই। ঘরের বাইরে উঠানে পানির উচ্চতা প্রায় পাঁচফুট। উঠান পেরিয়ে রাস্তায় উঠতে হলে তার উচ্চতা আরো বেশি। রিকশার বাচ্চারা ডাকে : 'পানি পার', 'পানি পার'। এই রাস্তার পাশের বাসাগুলো থেকে লোকদের বড় রাস্তায় উঠিয়ে দেবে। কয়েকশ গজের দূরত্ব। ভাড়া ট্রিপ বা জনপ্রতি পাঁচ টাকা। তবু এতে ওদের কিছু হয়।

আমার কিশতিকে আমি বলি এক মাল্লার ফুটো কিশতি। এক মাল্লা তথা এক মাঝি। সে আমি। মাঝে মাঝে একেবারে অসহায় বোধ হয়। আমার সংসারের বাক্স-পেটারা, আলমারী, জিনিসপত্র সব ডুবে গেছে। আমার বই৩ আলমারীর এ তাক, ও তাক থেকে বই সরাবার উপায় থাকে নি। কোথায় সরাব? কেমন করে সরাব? কেবল ভেবেছি, সেই ১ তারিখ থেকে : পানি আর বাড়বে না, পানি আর বাড়বে না। কিন্তু উত্তর থেকে নেমে আসা পানির চাপে মধুবাগের বিলের পানি উল্টো ধাক্কা দিয়েছিল আমাদের বাসার নিষ্কাষণী ড্রেনগুলোতে প্রায় দশদিন আগে। যে ড্রেন দিয়ে আমার ধোয়ামোছার পানি বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যেত রাস্তার ড্রেনে, এবং রাস্তার মাটির নিচে ড্রেন সে পানি নিয়ে ফেলত মধুবাগের বিলের সাথে সংযুক্ত বড় ম্যানহোলের ড্রেনে, সে ড্রেন আট দিন আগেই উল্টো পানির চাপে ফুসে উঠে নিচের পানি রাস্তায় এবং আশ-পাশের বাসায় উগড়ে দিচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলামত খারাপ ছিল। কিন্তু তার পরিমাণ কি, কতদিনে তার চরম এবং শেষ, তা বুঝার উপায় কি? আর তা থাকলেই আমার মতো অসহায় ব্যক্তি তার স্ত্রী, পুত্রসহ বাসার আসবাবপত্র মাথায় করে কোথায় গিয়ে উঠব? কেমন করে উঠব? ধানমন্ডি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বহুতলের দালানে বাস করা লোক নই আমি। নিম্নাঞ্চলীয় এলাকায় কোনো রকমে নিচু জমিতে আধা-কাঁচা একটি টিনের ঘর করে তাতে স্ত্রী-পুত্রদের উঠিয়ে এনেছিলাম বছরখানেক আগে। ভেবেছিলাম, বাৎসরিক সাধারণ বন্যার ধকল কোনো রকমে সামলানো যাবে। দুএকদিনের ব্যাপার হবে। খাট আর আলমারীর নিচে দুএকখানা ইটের গোঁজ দিয়েই বাঁচা যাবে। কিন্তু সে কল্পনা আমার অবাস্তব এবং অনভিজ্ঞতার কল্পনা।

কিন্তু আমি কল্পনাই বা আর কত করতে পারি? আটচল্লিশ বছরের উপর ঢাকায় আছি। বন্যা আগেও হয়েছে। কিন্তু এমন উচ্চতায় তার পানির ঢল পৌঁছেনি কখনো। এবং এত দীর্ঘস্থায়ীও হয়নি। এখন বুঝতে পারছি, আগামীতে এবারের উচ্চতাও ছাড়িয়ে যাবে।

আমি এরশাদ সাহেবের দোষ দিইনে। টেলিভিশনে আর দৈনিক কাগজে প্রচারিত তাঁর ছবি দেখে বুঝতে পারি; তিনি খুব পরিশ্রম করছেন। হেলিকপটার নিয়ে দেশের এখান, ওখান সবখানে যাচ্ছেন। শুকনো জায়গা পেলেই নামছেন। কিন্তু শুকনো জায়গা পাচ্ছেনই নাকি খুব কম। রাস্তা বা বাঁধের ওপর আশ্রয় নেওয়া মানুষকে কেবল বলছেন : 'তাওক্কালাল্লাহ্ : আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখুন। আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকলে এ দুর্যোগ আর বিপর্যয়ের মোকাবেলায় আমরা অবশ্যই কামিয়াব হব।'

তিনি আর কী বলতে পারেন? রাজনৈতিক দলগুলোও তাঁকে দোষারোপ করে গণতান্ত্রিক সরকারের দাবীর পুনরুক্তি ছাড়া আর কী করতে পারে? তাই তারা করছে।

কথাটা নিয়ে চারদিকের জনসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত জ্ঞানের দ্বীপ ঢাকা ইউনিভার্সিটির চূড়ায় আরোহণ করে আমরা শিক্ষকরা বিমর্ষভাবে আলাপ করছিলাম। এক সহযোগী বলছিলেন : 'ড্রেজিং বাদে যেখানে কোনো বিকল্প নাই, সেখানে সেই ড্রেজিং এর মহাপরিকল্পনার কথা কোনো কালের কোনো সরকারই করল না।' অপর একজন বললেন : 'একি মুখের কথা! আর একি এই অঞ্চলের কোনো একটি রাষ্ট্র বা সরকারের ব্যাপার? এ জন্য এ অঞ্চলের ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ : সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আবশ্যক। সম্মিলিত পরিকল্পনার প্রয়োজন।' আর একজন বললেন : 'তেমন পরিকল্পনা কেমন করে হবে? নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রয়োজনে একে অপরকে অহরহ অভিযুক্ত করব, নিজের ব্যক্তিত্ব রচনায় অপরকে হেয় করব এবং আবার এক টেবিলে বসে যথার্থই এ এলাকার সকল রাষ্ট্রের সকল মানুষের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহকারে পরিকল্পনা করব এবং রাষ্ট্রের কৃত্রিম সীমানা উপেক্ষা করে এক মহাপরিকল্পনা কার্যকর করব : এমন চিন্তাই তো অবাস্তব।'

এ কথার তো কোনো জবাব নাই।

ভূগোল প্রাকৃতিক। রাষ্ট্র কৃত্রিম। হিমালয়ের পাদদেশ এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তারিত জনপদ : তার নদ-নদী, খাল-বিল প্রাকৃতিক। কিন্তু সেই নদ-নদীকে আমার গঙ্গা, আমার পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র নাম দিয়ে, তার এপাড় থেকে ওপাড় যাওয়াকে নিষিদ্ধ করে আবেগের ভিত্তিতে রাষ্ট্র তৈরি করা কেবল যে কৃত্রিম, তাই নয়। মানুষের এই কৃত্রিম আচরণে, বন উজাড় করা থেকে আরম্ভ করে, অপরের তোয়াক্কা না করে নিজের জমিতে বাঁধ দেওয়া, সে বাঁধে পানি আটকানো আর ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদিতে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, অপ্রাকৃতিক এই অবস্থা তার সর্বমোট প্রতিক্রিয়ায় এই অঞ্চলের জনজীবনে বছর থেকে বছরে সৃষ্টি করছে অকল্পনীয় বিপর্যয়। হাজার হাজার মানুষ মরছে। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি ধসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে। বছর থেকে বছরে এই প্রক্রিয়ার বেগ এবং বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। গভীরতর হচ্ছে। মানুষের কৃত আচরণের এই ফলাফল নিয়ে মানুষ রাজনীতি করছে। চূড়ার নেতা মনে করছে : হাজার মানুষ মরলেও আমি তো মরছিনে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত বাঁচাকে অতিক্রম করে একদিন, এই অবস্থা চলতে থাকলে, এই অঞ্চলের সমগ্র জনপদ যে বিপুলভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যবে, সে অনুমান আজ আর অকল্পনীয় নয়। কিন্তু এমন সাধারণ তথা বৃহৎ সত্যর উপলব্ধি সাধারণভাবে ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ : রাষ্ট্রসমূহের বর্তমান কিংবা আগামীর কোনো নেতৃত্বের মধ্যে যে গুরুতরভাবে আসবে, সে আশা অকল্পনীয়।

কিন্তু এসব বড় কথা থাক। নিজের ফুটো কিশতির কথা বলি।

ফুটো কিশতির পানি সেঁচে কি কিশতি বাঁচানো যায়? আমি জানি, তা যায় না। পাশের দুটো ঘর একেবারে ডুবে গেছে। কিন্তু বড় ছেলের জিদ, তার ঘর বাঁচাতে হবে। দরজার মুখ সে বন্ধ করেছে। কেন পানি আটকাবে না? কিন্তু আমার দুর্বল কাঠামোর বাড়ির মেঝে আর দেয়াল ভেদ করে এখন পানি ঢুকছে। সে পানি সেঁচে আমি কুলাব কী করে? তবু অনগত কাজের লোকটিকে বারবার তাগাদা দিই : 'বাবা, ফেল, পানি ফেলে একটু বাঁচিয়ে রাখো।'

তবে মনে একটু সান্ত্বনা এই যে, রাত দুটো কিংবা তিনটাতেও শুনতে পাই, আশ-পাশের ডুবন্ত বাড়ির নিচতলা থেকে আমার ঘরের মতোই পানি সেঁচার শব্দ।

সেপ্টেম্বর '৮৮-এর এক তারিখ থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত পানি রোজই বেড়েছে। রেডিও আর টিভি বলেছে ৭ তারিখ থেকে বুড়িগঙ্গা আর শীতলক্ষ্যার পানি কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। সে কথা শুনে ইতোমধ্যেই নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত—আমার মনেও কিছুটা ভরসার উদ্রেক হয়। কারণ ভয় হচ্ছিল, কোন্ উঁচুতে পানি উঠবে, তার হদিস কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আমার এই মগবাজার-মধুবাগ-নয়াটোলা এলাকার নিচু জমির বাড়িঘরের পানি হ্রাস পাওয়ার লক্ষণ এখনো পরিষ্কার নয়। বরঞ্চ পানিতে ডোবা ম্যানহোলের একেবারে অন্তর থেকে এবার কয়লার খনির চাইতেও কালো গাঁদ বেরিয়ে আসছে। যে-পানির রং এতদিন কিছুটা পরিষ্কার বা সবুজে ছিল, সে পানির রং এখন একেবারে নিকষ কালো এবং তার দুর্গন্ধ বর্ণনার উর্ধ্বে। এর মধ্যেই নিজের 'চালে' বসে নিজের ঘরকে পাহারা দিচ্ছি। আগে কোনো জায়গাতে দাগ টানতে না টানতে সাপের পিচ্ছিল দেহের গতিতে সে দাগ মুছে গিয়ে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, কাল থেকে, চিহ্ন দেবার চেষ্টা করছি, কোন্ দাগ থেকে পানি কতটুকু হ্রাস পাচ্ছে, তা পরিমাপ করার। দেয়াল যুৎসই কোন জায়গা পাচ্ছিনে যার দিকে দিনেরাতে চোখ রাখতে পারি। অবশেষে দেখলাম, পানির হ্রাস-বৃদ্ধি মাপতে হয়তো সামনের দেয়ালে এক যায়গায় আস্তরের রেখায় ভেসে ওঠা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বের ঐ কোন্‌টা ধরেই মাপা দরকার। ওখানেই চোখ রাখি। দেখি, ওখান, থেকে পানির পরিমাণ দক্ষিণ তথা নিচের দিকে কতটা সময়ে কি পরিমাণ হ্রাস পায়।

কিন্তু এই হ্রাসের পরিমাণ যে বৃদ্ধির মত দ্রুত নয়, তা বুঝতে পারি। তাই দিনরাত মনের উদ্বেগ আর প্রশ্ন : কবে, কতদিনের দেখা যাবে তীর, পাওয়া যাবে শুকনো মাটিতে পা রাখার একটু স্থান। নূহের কিশতি কতদিনের ভিড়েছিল তীরে?

এর মধ্যেই আবার আশঙ্কা : রাহাজানি, ছিনতাই-এর। কী সমাজ আমাদের! কী তার ব্যবস্থাপনা! এতদিন খবরের কাগজেই দেখেছি, দুই চারটি ঘটনার কথা।

আজ ইউনিভারসিসিটির কমন রুমে আনিসের (অধ্যাপক আনিসুজ্জামান) কাছ থেকে পলাশী বাজারের পথে তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে সকাল ন'টায় বালা আর আংটি ছিনিয়ে নেবার খবরে একেবারে মর্মাহত হলাম।

আনিস আগে বললেন, তিনি আমার বাসায় যাবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই কথা। তাঁর সেই খবরে আমি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হলাম। আত্মীয়জনদের মধ্যে তেমন কেউই তো আমার ডুবে যাওয়া বাড়ির দোরগোড়ায় যাওয়ার চেষ্টা করে নি। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। এমন চেষ্টা করা সহজ নয়। মগবাজার-মধুবাগের পথে একাধিক জায়গায় হাঁটুর উপরে পানি। তারপরে যে গলিতে আমার বাসা সেখানে পানির পরিমাণে রিকশার পাদানি ডুবে যায়। তবু এর মধ্যে আনিস গিয়েছিলেন আমার অবস্থা জানতে। আমি আগে সে খবর পাই নি। আজ সেকথা বলতেই মাত্র বুঝলাম।

কিন্তু তারপরে নিজের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে বললেন : তাঁর স্ত্রী সকাল নটায় নীলক্ষেতের বাসা থেকে পলাশী বাজারে যাচ্ছিলেন বাজার করতে। পথে ব্রিটিশ কাউনসিলের কোণায় কয়েকটি যুবক তাঁর রিকশা থামিয়ে ছোরা আর পিস্তল উঁচিয়ে হাতের বালা আর আঙ্গুলের আংটি ছিনিয়ে নিয়েছে। পথের মানুষ দাঁড়িয়ে দেখেছে। কেউ কিছু করতে পারে নি। ডাকাতি হয়েছে তাঁর আর এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়ের বাড়িতেও। সামাজিক-রাষ্ট্রীক অবস্থার কী নিদারুণ পরিচয়-বাহক সব ঘটনা। কোন প্রতিরোধ নাই। কারুর যেন কোন উপায় নাই, আত্মধ্বংসী এরূপ নীতি, ঘটনা, দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করার। সরকার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলসমূহ পর্যন্ত সকলেই যেন ভবিতব্যের সামনে অসহায়। ভবিতব্য এই বন্যা। ভবিতব্য সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার এবং ধ্বংস হওয়ার প্রক্রিয়া। ভবিতব্য শেখ মুজিবুরের হত্যা। ভবিতব্য জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়া। ভবিতব্য জেনারেল এরশাদের প্রেসিডেন্ট হওয়া। ভবিতব্য তাঁর উজ্জীবনী গান সচিত্রভাবে টেলিভিশনে প্রচারিত হওয়া। ভবিতব্য একমাত্র সেই গান দ্বারা আমাদের উজ্জীবিত হওয়ার চেষ্টা করা। এবং ভবিতব্য আমরা যে-অসহায় শিক্ষক : আমাদের সন্তানদের মস্তান হয়ে যাওয়া। সকাল নটায় রাস্তার উপরে মায়ের হাত থেকে ছুরি হাতে সন্তানের দ্বারা বালা আর আংটি ছিনতাই হওয়া। এবং চারপাশের মানুষের তাকিয়ে থেকে তাই দেখা।...

তবু নূহের কিশতি তীর একদিন নিশ্চয়ই পাবে। শান্তির পায়রা কিশতি থেকে উড়ে গিয়ে দূর দিগন্ত থেকে ফিরে এসে অভয় বাণী শোনাবে। ক্ষতি, মাশুল তো কত ঘটবে : আমার এবং আনিসের এবং কত আত্মজন, বন্ধুজনের। কত জন্ম এবং জনপদ ধ্বংস হবে তবু অদম্য আশা নিয়ে মানুষকে এই অনুভূতিকে লালন করতে হবে; মানুষই প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের ভিতরে উপর মানুষের সমাজ-সভ্যতাকে তৈরি করেছে। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় বারংবার তার ধ্বংসও ঘটেছে। তবু আবার ধ্বংসের মধ্যদিয়ে মানুষের সুবিবেচনা, সততা আর বিবেক মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। দাঁড়িয়েছে। মোকাবেলা করেছে অসতের, অন্ধকারের। যদি মানুষের ভবিতব্য কিছু থাকে তবে সে তার এই অনিবার জীবনাভিযানের উঠতি-পড়তির ভবিতব্য। চরম পরাজয়ের ভবিতব্য নয়। ... পুনশ্চ : আজ রাতের টেলিভিশনের খবর : ত্রাণ শিবিরে দুটি শিশুর জন্ম হয়েছে। একটি কোনো জননীর কন্যা অপরটি কেনো জননীর পুত্র। শিশুদের পিতা-মাতা সকৃতজ্ঞভাবে একটির নাম রেখেছে প্রেসিডেন্ট এশাদের শিশুকালের ডাকনাম : 'পেয়ারা'। অপর কন্যা সন্তানটির নাম রাখা হয়েছে 'ফার্স্ট লেডী' বেগম এরশাদের শিশুকালের ডাক নাম, 'ডেইজী'।

খবর শুনতে শুনতে আমি ভাবি ; শিশ দুটির কি ভাগ্য!

০৮.০৯.৮৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

’৮৫-র ‘রক্ত খরচ’

গরীবের কবির এই এক গুণ, সে নিজের জীবনবোধ থেকে যে বাণী উচ্চারণ করে তার মর্মার্থ যে তখনি আমরা সাধারণেরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, তা নয়। তাহলে আর আমাদের উপলব্ধির সঙ্গে কবির উপলব্ধির কোন তফাৎ থাকে না। কিন্তু নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ক্রমান্বয়ে নিজেদের মিত্র সেই কবির বাণীর অর্থ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সে উপলব্ধি তখন নিজেদের দৈনন্দিন মর্মান্তিক জীবনের সহায়—সাথী হয়ে মনে অনুপ্রেরণা যোগায়।

কিশোর দরিদ্র, কবি সুকান্ত লিখেছিল :

> হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
> দেখেছি লিখিত—‘রক্ত খরচ’ তাতে। ...

সুকান্তের এ বাণী যে কত মর্মান্তিকভাবে সত্য, তা এই আমি, যে-বাংলাদেশের একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষক-কর্মচারী, সেও অনুভব করছি এই ’৮৫-র যবনিকাতে, ১৬ ডিসেম্বর, বিজয় দিবসের বাজারের খাতাটি হাতে নিয়ে।

যে দুতিনটি সন্তান আছে, তারা বিজয় দিবসের আর কিছু মর্ম বুঝে না। তারা মাইকে গানবাজনার আওয়াজ শুনেছে। দোকানপাটে, বাড়িতে লাল নীল পতাকা মালা দেখছে। আনন্দের দিন। বিজয়ের দিন। কার উপর বিজয়? কার বিরুদ্ধে লড়াই? কীসের বিজয়? তার কথা তাদের না বুঝাই স্বাভাবিক। ১৬ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় বাণীতেও সে ইতিহাসের ইঙ্গিতেরও কোন সাক্ষাৎ তারা পায় না। ’৭১-এ হয়ত এদের মধ্যকার কনিষ্ঠটির জন্মও ঘটেনি। কিংবা ’৭১-এ সে ছিল ৫-৬ বছরের শিশু। কিন্তু তার এই আনন্দের দিনে দাবী একটু ভালো খাবারের। তাই হুকুম করেছে, পোলাউ-এর চাল আনতে হবে। মোরগের কোরমা করতে হবে। টমেটোর সালাদ বানাতে হবে। মিষ্টি দইও আনতে হবে।

সেই বাজারেরই হিসাব। হিসাবের একটা অভ্যাস প্রায় স্বভাবগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোজ বাজার থেকে ফিরে হিসাবের খাতায় খরচ লিখি। এমন খরচের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাতা খোয়া যেতে যেতেও অন্তত : বছর দশেকের আছে। তা নিয়ে গবেষণা চলে। কিন্তু সে গবেষণা আজ থাক।

আজকের বাজারে একটি ছোট কিসেমের মোরগ কিনেছি ৪০ টাকা দিয়ে। ঘরের মানুষের আপত্তি। এতে তো একবেলাও হবে না। এর কোনো পাল্টা জবাব আমি দিতে পারি নি। সের দুই একটু ভালো চাল কিনেছি। তার সের দর সতের টাকা। দুই সেরের দাম ৩৪ টাকা। ঘি জাতীয় একটু সাদা রংএর কিছু লাগে। গাওয়া ঘি নয়। তার সের ১৬০ টাকার কম নয়। তারও বেশি আছে। আমি এনেছি আমেরিকান বাটার অয়েল। তারমধ্যেই মানামানের ব্যাপার আছে। আমার নিম্নমানেরটি দোকানদার দিয়েছে ৫২ টাকা সের দরে। সর্ষের তেল নয়। সয়াবিন দিয়েছে ২৮ টাকা সের দরে। এক সের। কয়েকটি টমেটো এনেছি। সের একটু নাকি কমেছে। ষোল টাকা হিসাবে। রসুনও একটি উপাদান। এনেছি দু'ছটাক। তার দামের সের পড়েছে ৩২ টাকা। চিনি আধা সের। দাম ১৩ টাকা। বলে কয়ে একটাকা কমিয়েছি। সের ২৬ টাকা। মশুরের ডাল একসের ২০ টাকা। মিষ্টি দইএর কথা বলছিলাম। তার একসেরের একটি মাটির ভাণ্ড আনতে খরচ হয়েছে ৩০ টাকা। এখানে যোগ দিয়ে লাভ নেই। খাতায়ও যে রোজ যোগ দিই, তা নয়। খরচ করি। সাধ্যমত খরচ করে যাই, স্ত্রীপুত্রদের দাবীতে। এ খরচের রসদ সংগ্রহের ইতিকথা থাক।

সাংবাদিক বন্ধুদের একটা পেশাগত অনুষ্ঠান আছে, সালতামামীর। '৮৫ সালটা কেমন গেল। '৮৪-র তুলনায়। রাজনীতিক নেতাদের এক হিসাব। সাহিত্যিকদের হয়ত আর এক হিসাব। আমি না সাহিত্যিক, না রাজনীতিক। তবু জীবনের হিসাব নিকাশের একটা ব্যাপার তো থাকে। কেবল চাল-ডালের হিসাব নয়। হিসাব মিটিং মিছিলের। গুলি গোলার। বোমা পটকার। এলএমজি, এসএমজির। সে হিসাবে হয়ত বলা যাবে, '৮৪-তে যদি বুকে গুলি বেশি বিদ্ধ হয়ে থাকে, '৮৫-তে তা বেশি হয়ত বিদ্ধ হয়েছে হাঁটুতে, পায়ে। '৮৪-তে বেশ বেরিয়েছিল। মিছিল করেছিল মানুষ। '৮৫-তে সে দৃশ্য হয়ত কম। ছাত্র-পোলাপানরা তো প্রায় পাঁচ মাস তাদের বড় মাদ্রাসা তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তালাবদ্ধ থাকাতে বাড়ি ঘরে বা ময়দানে মাঠে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে। সেই যে ১লা মার্চ তারিখে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, ইংরেজিতে বলেছিল, 'ক্লোজড সাইনিডাই' তার মেয়াদ জুলাই শেষ হওয়ার আগে ফুরিয়েছে বলে স্মৃতিতে বলে না। এক রিকশাওয়ালা নিউমার্কেট থেকে আমাকে রিকশায় তুলে ইউনিভার্সিটির পাশে এসে জিজ্ঞেস করেছিল : 'সাব, কদিনের বন্ধ?' আমি ইংরেজি বাক্যের কী বাংলা করব? বলেছিলাম, অনির্দিষ্টকাল। রিকশাওয়ালাই আমাকে সংশোধন করে বলেছিল : 'তার মানে, জন্মের মতো' তার মারাত্মক কথাটার তাৎপর্যের মধ্যে আর আমি এগুতে সাহস পাই নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উড়ির চরের প্লাবনে হাজারে হাজারে মানুষ ভেসে গেছে। তাদের সে ভাসমান লাশ আর চর-চালার দৃশ্য দেখতে আগত বৈদেশীকদের মধ্যে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁরা খাতিরটা একটু বেশি চোখে ঠেকেছিল। আমার সব চাইতে বেশি চোখে ঠেকেছিল আচম্বিতে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা তাঁর দাঁতের পাটি আর উচ্চ কণ্ঠের হাসি : হা! হা! হা! সে হাসিতে আমার বুকটা জনিনে কেন, সেদিন কেঁপে উঠেছিল। 'সার্ক' সম্মেলনে দেখলাম, সাভার স্মৃতি সৌধে নীত হলে, সৌধের সামনে অপর সকলে যদিবা প্রলম্বিত হস্তে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক নিজের ডানহাতখানি নিজের বুকের উপর আড়াআড়ি চেপে ধরে দণ্ডায়মান ছিলেন। হয়ত অপরের থেকে ব্যতিক্রমী হবার জন্যই। কিংবা হয়ত তাঁর বুকে একটা ব্যথা বোধ হয়েছিল। কীসের ব্যথা?

আমরা সাধারণ মানুষ। রাজনীতিকেরা রাজনীতির খেলা খেলেন। নাটক দেখান। তাঁদের মিটিং মিছিলে ডাক দিলে যেতে মন চায়। কারণ তখন তাঁদের উদাত্ত ভাষা এবং হাত পায়ের সঞ্চালন একটা নাটককে তৈরি করে। সে দৃশ্যে নানাভাবে মন মোহিত হয় দর্শক এবং শ্রোতাদের। এবং সে নাটক দেখতে সিনেমা হলের মতো পয়সা দিয়ে টিকেট কিনতে হয় না। ফ্রি! কিন্তু একেবারে কি ফ্রি? কখন কোনখান দিয়ে কার মিটিংএ সাপ দৌড়াবে, কি বোমা ফাটবে বা বন্দুক ছুঁটবে, তার নিশ্চয়তা কি? তাই মন টানলেও অনেক সময়ে জীবনের আশঙ্কায় এমন বিনা পয়সার নাটকেও সামিল হতে পারিনে।

তবুও দ্বিধান্বিত পায়ে পায়ে এবং নানা আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়েও আমরা সাধারণেরা আওয়াজ পেলে অগ্রসর না হই, তা নয়। এক, দুই, তিন করে মানুষের যে জমায়েত হয়, সে জমায়েত যে আর এক রকম বুক কাঁপানোর দৃশ্যেরও তৈরি করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত '৮৪-তে একাধিক ঘটেছিল। পঁচাশিতে তেমন নয়। হয়ত তেমন দৃশ্যে এমন আওয়াজের পক্ষবিপক্ষ—উভয়ই কিছুটা চমকে গিয়েছিল। তাই এক পক্ষ যদি এবার দড়ি হ্রস্ব করেছে, অপরপক্ষে তাকে দীর্ঘ করার তেমন বেপরোয়া কোন চেষ্টা করেনি। কিন্তু এমন কথায় রাজনীতিক বিশ্লেষণের কথা আসে। আমি তাতে যাবো না।

জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক ঘটনা জাতির মনকে এখনো শোকাভিভূত করে রেখেছে। কিন্তু এই ঘটনার এই প্রতীকী তাৎপর্যকে তো অস্বীকার করা যায় না যে, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন অবকাঠামোর অন্তঃসারশূন্যতা। এই অবকাঠামোর সমূল পরিবর্তন যে আরো কত বলির মাধ্যমে ঘটবে, তার ইয়ত্তা কোথায়। কতো ঘটনার সাক্ষী জগন্নাথ হলের এই মিলনায়তন! এই মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাজ জগন্নাথ হলের উদ্যোগে স্বাগত সংবর্ধনা জানিয়েছিল ১৯৪৬ সনে আন্দামানের নির্বাসন থেকে প্রত্যাগত মুক্তিপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক সংগ্রামী রাজবন্দী গনেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং তাঁদের সাথীদের; এই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে পূর্ববঙ্গের আইন পরিষদের সভা : আর সামনে '৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের ছাত্র মিছিল গিয়ে হাজির হয়েছে ভাষার দাবি নিয়ে, হল থেকে বেরিয়ে এসেছেন বর্ষীয়ান নেতা এ, কে, ফজলুল হক; ৫২ সনে এই পরিষদে আগমনের পথে শহীদ হয়েছেন বরকত-সালাম, জব্বাররা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আওয়াজ মুখে নিয়ে; '৫৬ সনে এই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশনে জনাব শহীদ সরওয়ারদী যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেছেন, আবার ১৯৫৮ সনে এই মিলনায়তনে পরিষদের সদস্যদের মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ ঘটেছে। ... এবং এই জগন্নাথ হলের প্রায় অর্ধশত তরুণ এই মিলনায়তনে অকালে তাদের প্রাণের মর্মান্তিক ডালি দিয়ে স্মৃতির আর এক সৌধ তৈরি করে গেল ১৯৮৫ সনের ১৫ অক্টোবর তারিখে!

তবু আমি বলব : সব সত্ত্বেও আমরা দশকোটি মানুষের দেশ। জীবনের চরম চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদের জন্ম। একটা সঙ্গতিপূর্ণ সুখ দুঃখ ভাগ করে খাবার যৌথ সমাজ তৈরির চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জের ফয়সালা একটা চুরাশি কিংবা পঁচাশিতে হতে পারে না। হয় না। তেমন হ্রস্ব দৃষ্টির সালতামামীতে মুর্খরাই উচ্ছ্বসিত হয়। আবার দূরদৃষ্টিশূন্য বুদ্ধিহীন আমরাই হতাশ হই। বাংলাদেশের 'অবুঝ' কৃষকও যখন তার জমির আলে একটি তালগাছের চারাকে রোপণ করে, তখন সে তার ফসলকে বছরের হিসাবে পাওয়ার কথা চিন্তা করে না। চেতন, অচেতন, তথা স্বভাবগতভাবেই সে বিশ্বাস করে যত্ন করলে এ চারাটি, যুগের পর যুগ যখন অতিক্রান্ত হবে, তখন সে ফল দিবে, ফসল দিবে এবং তখন সে ফসলকে তার সন্তানেরা, মানুষের সন্তানেরা ভোগ করবে। সেই বিশ্বাসেই তালগাছের চারাটিকে আজ সে রোপণ করছে।

তাই '৮৫-র সালতামামীর তেমন কোন অর্থ নেই। কাল নিরবধি, অনন্ত। সেই অনন্তকালের জীবনের স্রষ্টা মানুষ। অনন্তকাল ধরে বহমান সেই অপরাজেয় মানুষের স্রোতের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ। অনন্তকালের ইতিহাস তার পক্ষে।

আমাদের সন্তানদের উপর আমাদের অসন্তোষ আর নিন্দার শেষ নাই। তবু ওদেরই একটি যখন দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে আবার '৮৫-তে সন্তর্পণে হাতের তুলি দিয়ে খোদাই করে :

সময়ের সাহসী সন্তানেরা
বারে বারে আসে
বারে বারে
যুদ্ধে যায়।

তখন তার প্রতি আমার মন কৃতজ্ঞাতায় ভয়ে ওঠে, প্রৌঢ় বয়সের চোখের কোণও তখন বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে।

১৬.১২.৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘সোভিয়েত সাম্যবাদ : এক নতুন সভ্যতা’

১৯১৭ সালে আমার জন্ম ঘটে নি। ১৯১৭ সালে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা, একটি নতুন সভ্যতার জন্ম ঘটেছিল। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা। ১৯৪০-এর দশকে ১৯১৭-তে জাত সেই সমাজব্যবস্থা আমাকে নতুন এক জীবন দান করেছিল। শুধু আমাকে নয়। সেকালের প্রজন্মকে। কিন্তু সোভিয়েত বিপ্লবের কাছে আমার নিজের ব্যক্তিগত ঋণের কথা বলছি। ১৭ কি ১৮ বছরের এক তরুণ। চল্লিশের দশকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দূর ইউরোপে মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সে যুদ্ধের বীরপুরুষ এ্যাডলফ্ হিটলার। তার স্বস্তিকা, তার অদ্ভুত মুখাবয়ব আর তার অনুচর এবং সদম্ভ সশস্ত্র বাহিনীর ‘হেইল হিটলার’ বলে উত্তোলিত হস্তের ছবিতে দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ থাকে। ৪০ থেকে ৪২ সালের কথা। দিগ্বিজয়ী হিটলার। উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে তা অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব অপরাজেয়। ১৭৮৯-তে আধুনিককালের উন্মোচনকারী বিপ্লবের ধাত্রী ফরাসীদেশ এই হিটলারের পদানত। রাজধানী প্যারিসে গঠিত হয়েছে হিটলারের পদলেহনকারী পেঁতা সরকার। ফরাসীদের আকাশে বাতাসে স্বস্তিকার আন্দোলন। জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীর মার্চপাস্ট। পরাধীন ভারতের তখন মূল প্রশ্ন স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু সে সংগ্রাম নানা মত ও পথে বিভক্ত। সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ঘাত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। এমন পরিবেশে আমার প্রজন্মের তরুণ মন বিভ্রান্ত। মানুষের সমাজের বিবর্তন কোন্ লক্ষ্যে? কে তার চালক? সে কি হিটলার? হিটলারকে মনে হচ্ছে অজেয়। হিটলার কার প্রতিনিধি? কোন্ সমাজব্যবস্থার? সমাজব্যবস্থা কাকে বলে? এই সব জিজ্ঞাসায় আকীর্ণ মন। ’৪১-এর ২২ জুন হিটলার আক্রমণ করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে। সে আক্রমণের খবর নিশ্চয়ই কাগজের পৃষ্ঠা জুড়ে বার হয়েছিল। কিন্তু তার তাৎপর্য সেই মুহূর্তে, মুসলিম সমাজভুক্ত একটি মধ্যবিত্ত তরুণ ছাত্রের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি। তখনো তার মনে হিটলারের বিক্রম। কিন্তু ৪২ শেষ হয়ে ৪৩-এ না পড়তেই এক নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময় সেদিনের তরুণের মনকে আবিষ্ট করতে লাগল। কোন এক বীরের বিক্রম নয়। একটা সমগ্র দেশের বিক্রম। কিন্তু শুধু দেশ বললেই কি জবাব মিলে? দেশ তো ফ্রান্সও ছিল। শৌর্যে, বীর্যে, ঐতিহ্যে তো ক্ষুদ্র নয়। কিন্তু সে আত্মসমর্পণ করল কত সহজে। কিন্তু রাশিয়া কেমন করে ঠেকিয়ে দিচ্ছে সমগ্র পরাজিত ইউরোপের শক্তির মাথায় চড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে ফ্যাসিস্ট বাহিনী, তাকে? পিছু যে হটছে না সোভিয়েত বাহিনী, তা নয়। ছেড়ে দিতে হচ্ছে এলাকার পর এলাকা। লেনিনগ্রাড অবরুদ্ধ। নেপোলিয়নের মতো হিটলারের বাহিনী মস্কোর অদূরে উপস্থিত হয়েছে। পিছু হটছে লাল ফৌজ। তবু আত্মসমর্পণ করে নি সোভিয়েত বাহিনী। আত্মদান করেছে। হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে। হিটলার-বাহিনীর অগ্রসরের কাহিনী যেমন পৌঁছেছিল সেদিন আমাদের কাছে, তেমনি পৌঁছেছিল সোভিয়েত মানুষের আত্মদানের কাহিনী। এই আত্মদানের কাহিনীই সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাকে আমাদের মনের সামনে সেদিন উপস্থিত করে দিয়েছিল। নতুন বিস্ময়ভরা মন আর চোখ নিয়ে আমরা সেদিন তাকিয়েছিলাম মরণপণ সংগ্রামরত এই সোভিয়েটের দিকে। বীর হিটলারের অপচ্ছায়া ক্রমান্বয়ে আমাদের মন থেকে ইতিহাসের নারকীয় কীট হিসাবে অপসৃত হচ্ছিল।

একটি নতুন জীবনবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সেদিন আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করছিল। সেই ৪০-এর দশকে। ৪২ থেকে ৪৫ সালে। এ একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপার। একদিনের ব্যাপার নয়। কোন একটি ঘটনার ভিত্তিতে তাকে আজ ৪০ বছর পরে স্মৃতির পটে তুলে আনা যায় না। তবু নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসেও সেই সময়টি যে নতুন চেতনা লাভে, অনুপ্রেরণায় পূর্ণ হয়ে উঠছিল, তাকে স্মরণ করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

এই চেতনা সৃষ্টিতে নানা সুহৃদ, সুজন সেদিন সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের কারুর নাম হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো, চোখ বুঁজে মনের দিকে তাকালেই, ঝলসে ওঠে।

এমন কয়েকজন সুজনের মধ্যে বৈদেশিক একটি নাম ছিল : সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েব। এ একটি নাম যেমন। তেমনি একটি নয়। দুটি নাম। আজকের যুগের তরুণদের কাছে এ নাম দুটি হয়ত নিতান্ত গবেষণার বিষয়। কিন্তু সেকালের ইংল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং চিন্তার ক্ষেত্রে এ দুটি নাম ছিল যেমন সুপরিচিত, তেমনি বামপন্থী মহলের প্রিয় নাম। না, এঁদের কাউকে আমি দেখি নি। তাঁদের রচনার কোনো একটি যে পাঠ করেছি, তাও হয়ত নয়। কিন্তু তাঁদের বিপুল সংখ্যক রচনার মধ্যে 'সোভিয়েত কমিউনিজম্ : এ নিউ সিভিলিজেশন : সোভিয়েত সাম্যবাদ, এক নতুন সভ্যতা' শিরোনামের গ্রন্থখানি সেকালে পঠিত, অ-পঠিতভাবে আমাদের মতো তরুণদের কাছে পরিচিত এবং প্রিয় ছিল। সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েব তথা ওয়েব দম্পতির এই গ্রন্থের নামের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা সেদিনই শুনেছিলাম। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা মাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তার নতুন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা সারা পৃথিবীর উৎসুক দৃষ্টির সামনে পরীক্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী তার শত্রু। তার বিরুদ্ধ প্রচারক। বলশেভিকদের রাজত্ব। বলশেভিক মানে তো বুনো দৈত্য। এবং সেই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের মর্মকথা, সোভিয়েত বিপ্লবের নতুন মানবতাবাদী তাৎপর্যের কথা যে সব লেখক ও চিন্তাবিদ সেদিন বিবৃত এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েব। তাঁরা নাকি তাঁদের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে শিরোনামের সামনে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখেছিলেন। অর্থাৎ বিশের দশকে প্রকাশিত সে গ্রন্থে তারা যেন তখনো নিঃসন্দেহ নন, সোভিয়েত সাম্যবাদ একটি নতুন সভ্যতা কিনা। কিন্তু ত্রিশের দশকে তাঁদের গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে ওয়েব দম্পত্তি তাঁদের গ্রন্থের শিরোনামের সামনের সেই প্রশ্নবোধক চিহ্নটিকে মুছে দিয়েছিলেন। এবার গ্রন্থখানির শিরোনাম দাঁড়িয়েছিল, নিঃশর্তভাবে : 'সোভিয়েত কমিউনিজম : এ নিউ সিভিলিজেশন : সোভিয়েত সাম্যবাদ : এক নতুন সভ্যতা।' ওয়েব দম্পতির এই গ্রন্থ পাঠ করার ক্ষমতা আমার তখন হয়ত ছিল না। হয়ত এ গ্রন্থ আমি পাঠ করতে পারি নি। কিন্তু এ গ্রন্থ যে সেকালে আমাদের মধ্যে বিপুলভাবে আলোচিত গ্রন্থ ছিল, তা স্মৃতির পটে এই অমলিন রেখাটি থেকেই বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু আর একজন সোভিয়েত সুহৃদ এবং শিক্ষাবিদ, প্যাট স্লোনের 'রাশিয়া উইথ আউট ইলিউশন' বা 'মোহমুক্ত দৃষ্টিতে রাশিয়া' আমি যে পাঠ করেছিলাম, সেটি নিশ্চিত। আর একখানি বই ছিল জসুয়া কুনিজের 'ডন ওভার সমরকন্দ'। মধ্য এশিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে সোভিয়েত বিপ্লবের সাহায্য এবং সহযোগিতায় নতুন জীবনে প্রবেশের কাহিনী। এ বইএর রচনারীতিটি যেমন নাটকীয় ও রোমাঞ্চকর ছিল, তার আবেদনও তেমনি আমাদের মনের উপর ছিল গভীর। পরবর্তীকালে আমাদের প্রখ্যাত লেখক বিনয় ঘোষ এ বইএর বাংলা রূপান্তরও করেছিলেন।

কেমন করে আমরা সোভিয়েটের কথা, ১৯১৭ সালের বিপ্লবের কথা, সোভয়েট সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের কথা সেদিন জেনেছিলাম তা স্মরণ করতেই এইসব বইএর কথা মনে ভেসে ওঠে।

একটা আফসোসের ব্যাপার, আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির যা বর্তমান পরিবেশ তাতে পুরোন এমন গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ ঘটে না। এমন কোনো নিশ্চিত ভাণ্ডার নেই যেখানে গেলে এ সব গ্রন্থের সঙ্গে আবার আমরা পরিচিত হতে পারি। কেবল সেকালের আমাদের কথা নয়। একালের তরুণদেরও প্রয়োজন রয়েছে এইসব পুরোন গ্রন্থ পাঠ করার। কেননা এসব গ্রন্থেই নতুন চিন্তা ও সভ্যতার ভিত রচিত হয়েছিল। সেদিনকার প্রগতিশীল মানবসভ্যতার শুভার্থী এই চিন্তাবিদদের দূরদৃষ্টিকে ইতিহাসের পরবর্তী বিকাশ কীভাবে বাস্তব সত্য বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণিত করেছে তার উপলব্ধি তাঁদের গ্রন্থ এবং চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাদে তৈরি হতে পারে না।

আমি এমন একটি চিন্তা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রথমে খোঁজ করেছিলাম তার বইএর তালিকায় এসব বইএর নাম আছে কিনা। এসব বইএর কিছু নাম তালিকায় অবশ্য আমি পেলাম। কিন্তু সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েবের সেই 'সোভিয়েত সভ্যতা' নামক গ্রন্থ কিংবা জসুয়া কুনিজের 'ডন ওভার সমরকন্দ'কে খুঁজে পেলাম না। অথচ এ সমস্ত বইএর পুনর্মূদ্রণ ও আমাদর চিন্তার শক্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

প্যাট স্লোনের 'রাশিয়া উইথ আউট ইলিউশন'ও পেলাম না। তবে দুঃখ একটু কমল যখন পুরোন বই তল্লাশ করতে করতে প্যাট স্লোনের ১৯৩৭ সালে ভিক্টর গলান্‌জ কর্তৃক প্রকাশিত 'সোভিয়েত ডিমোক্রাসি' বা সোভিয়েত গণতন্ত্র শিরোনামের গ্রন্থখানিকে হাতে নিতে পারলাম।

প্যাট স্লোন নিজে ছিলেন অধ্যাপক। বিংশ শতকে উদ্ভূত মানব ইতিহাসের মহত্তম বিস্ময় সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তিনি সোভিয়েত রাশিয়াতে শিক্ষকতা করেছেন ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর বক্তব্য যেমন প্রাঞ্জল এবং জোরালো, তেমনি পাঠকের মনে প্রত্যয় সৃষ্টিকারী। ২৮৮ পৃষ্ঠার এগ্রন্থের কলেবর হয়ত তেমন বৃহৎ নয়। কিন্তু অধ্যাপক স্লোন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার উদাহরণ সমৃদ্ধ প্রাঞ্জল সংক্ষিপ্ত প্রকাশে সোভিয়েত সভ্যতার তিনটি মূল বৈশিষ্ট্যকে উপস্থিত করেছেন। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা যে মানুষের ইতিহাসে একটি 'নতন জীবনের' উদ্বোধন, এ কথা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর গ্রন্থের প্রথম ভাগে : 'নতুন জীবন' শিরোনাম দিয়ে। দ্বিতীয় ভাগ, 'নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা' শিরোনামে লেখক সোভিয়েত রাষ্ট্রকাঠামোর মূল চরিত্রগুলি উপস্থিত করেছেন। 'সোভিয়েত কাকে বলে', 'শ্রমিকের রাষ্ট্র কি', 'গণতান্ত্রিক প্রতিরক্ষা তথা লালফৌজের বৈশিষ্ট্য', 'জাতিসমূহের রাষ্ট্র', 'সমাজতান্ত্রিক সংবিধান', 'পার্টি বা দলের কথা', 'গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা এবং বিরাধিতার স্বাধীনতা' : এই সব শিরোনামের অধ্যায়ে তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থার চরিত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের শেষ ভাগটির তিনি নাম দিয়েছেন : 'এ এক নতুন গণতন্ত্র : এ নিউ ডিমোক্রাসি'।

প্যাট স্লোনের এই গ্রন্থখানির ভূমিকার দু একটি অংশ এখানে আমি অনুবাদ করে দিলাম। লেখকের ভূমিকার এই কথা কয়টি আজকের দিনেও এমন বইএর প্রয়োজনের বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তুলবে।

"... গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র : ডিমোক্রাসি এ্যান্ড ডিক্টেটরশিপ : এ বিষয়টি কী? গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরশিপ সম্পর্কে আজকাল বিস্তর যেমন লেখা হচ্ছে, তেমনি বিস্তর আলোচনা আমরা শুনতেও পাচ্ছি। গণতন্ত্রকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষা করতে হবে। এ আওয়াজ অহরহই উচ্চারিত হচ্ছে। আর যে-একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। কিন্তু একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যখন একনায়কতন্ত্র হিসাবে দেখানো হচ্ছে, তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের এমন প্রখ্যাত চিন্তাবিদও আছেন যাঁরা তাঁদের বক্তব্যতে বলছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের যে শাসনব্যবস্থা তার মধ্যেই রয়েছে গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি।

"গণতন্ত্রের সবচাইতে জনপ্রিয় সংজ্ঞা হচ্ছে আব্রাহাম লিংকনের দেওয়া সংজ্ঞা। তাতে তিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন : গণতন্ত্র হচ্ছে "জনগণের সরকার, জনগণ দ্বারা পরিচালিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার : গভর্নমেন্ট অব দি পিপল, বাই দি পিপল, ফর দি পিপল।"

"আমরা এখানে সরকার ব্যবস্থার সুপরিচিত গবেষক, লেখক সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েবের বক্তব্যের কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

"সোভিয়েত রিপাবলিকসমূহের রাষ্ট্র সংস্থা এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা নয় যেখানে সরকার এবং জনগণ পরস্পরের বিরোধী পক্ষ হিসাবে পরিগণিত হয়। ... অথচ সমস্ত পরিচিত রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই ব্যাপারটা এরকম : যেন দুটো পক্ষ : সরকার এবং জনগণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার হচ্ছে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত সরকার। এই পরিচালকরা সংগঠিত হয় নানা প্রকারে : নানা ধরনের কালেকটিভ বা যৌথ সংস্থায়। তাদের নানা দায়িত্ব। এবং সে দায়িত্বের অন্যতম হচ্ছে একটি একেবারে নতুন প্রকারের অর্থনীতির দ্বারা সমগ্র দেশের সম্পদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদনা করা।" (সোভিয়েত কমিউনিজম : পৃষ্ঠা ৪৫০)

"ওয়েব দম্পতির এই বিবরণ সঠিক হলে বলতে হয়, সোভিয়েতই হচ্ছে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সবচাইতে জনপ্রিয় সংজ্ঞার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। অবশ্য এমন কথা কেউ বলতে পারেন যে, সিডনী বিয়েট্রিস ওয়েব সুপরিচিত সমাজতন্ত্রী লেখক। কাজেই তাঁদের দেওয়া বিবরণের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব থাকা সম্ভব। এবং সে জন্যই আর একজন লেখক, যিনি জারের রাশিয়াকে দেখেছেন এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি যাঁর কোনো দিন কোনো সহানুভূতি ছিল না, তিনি যখন ওয়েব দম্পতির বর্ণনাকে সত্য বলে অভিহিত করেন, তখন কথাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

"আমি স্যার বারনার্ড প্যারেস-এর কথা বরছি। স্যার বারনার্ড প্যারেস জারের রাশিয়াতে বাস করেছেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে সোভিয়েত সরকার স্থাপিত হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে রাশিয়াতে কাজ করেন। ব্রিটিশ সরকার তখন সশস্ত্র হস্তক্ষেপে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার আশা নিয়ে একশ মিলিয়ন পাউন্ড নিয়োগ করেছিল। ১৯১৯ সালে স্যার বারনার্ড ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন এবং ইংল্যান্ডে বলশেভিকবাদ প্রবর্তনের প্রচারের বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবাবদানের জন্য ইংল্যান্ডের প্রত্যেকটি কাউন্টিতে প্রকাশ্য বক্তৃতা দানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

"১৯৩৫-এর শেষের দিকে আমরা দেখি স্যার বারনার্ড আবার সোভিয়েত গেছেন। এবার তিনি যান রাশিয়াতে। এবং রাশিয়া হচ্ছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিকসমূহের ইউনিয়নের সবচাইতে বড় অঙ্গরাষ্ট্র। দেশে ফিরে এসে এবার তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার উপর ক্ষুদ্রাকার একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেখানে এই প্রশ্নটিকেই উত্থাপন করেন : সোভিয়েত সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে কতখানি ব্যবধানে অবস্থিত?

"প্রশ্নটির জবাব দিয়ে স্যার বারনার্ড এবার বলেন : "জারের আমলে আমি দেখেছি, সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে কী চরমভাবে বিচ্ছিন্ন। সেকালের সরকারি মন্ত্রীদের এবং বিশেষ করে জারতন্ত্রের শেষ দিনগুলোর মন্ত্রীদের নিযুক্ত করা হত সমাজের একটি একেবারে সংকীর্ণ গোষ্ঠী থেকে। কোনো নীতি বা নিয়মশূন্যভাবে। আমার মনের কামনা ছিল, রাশিয়ার জনসাধারণ যেন তাদের সরকারের দ্বারে এসে দাঁড়াতে পারে। ১৯১৭-তে কিছুকালের জন্য আমি দেখেছিলাম, জনসাধারণ যেন সরকারের নিকটবর্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তখনো আমার মনে হয়েছে যেন, স্পষ্টভাবে না হলেও রুশ জনতা আর রুশ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে একটা ব্যবধান থেকে গেছে। ... কিন্তু আজ সোভিয়েটে আমি যা দেখেছি তাতে বলতে পারি : সেই ব্যবধানের আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি সরকারি অফিস বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি সরকার এবং জনসাধারণ, এদের উভয়ের উৎস অভিন্ন" (স্যার বারনার্ড প্যারেস-এর বই : 'মস্কো এ্যাডমিটস এ ক্রিটিক : মস্কো সমালোচককেওস্বাগত জানায়, পৃষ্ঠা ৩৫)

"কাজেই ওয়েব দম্পতির বক্তব্য যে, 'সোভিয়েত রাষ্ট্রের সরকার পরিচালিত হয় তার সকল বয়ঃপ্রাপ্ত নাগরিকদের দ্বারা', সে বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে স্যার বারনার্ড প্যারেস-এর অভিজ্ঞতা দ্বারা। এঁরা উভয়ই বলছেন, সোভিয়েত সরকারের রয়েছে এমন সব বৈশিষ্ট্য যাকে আমরা এক নায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করি নে। যাকে আমরা বিবেচনা করি গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলে।" ... (প্যাট শ্লোন : সোভিয়েত ডিমোক্রাসি : পৃ. ৮-১১)

১৯৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নির্বাসিতের আত্মকথা'

আমার মতো সংকটাপন্ন রুগীর জন্য বিশ্বাসের এই আলোহাওয়াটুকুর প্রয়োজন ছিল।

১২ সেপ্টেম্বর '৯২ তারিখের 'ভোরের কাগজ' সংখ্যায় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা'-র উপর আমার ব্যক্তিগত রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। ভারত ভূখণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে অকুতোভয় জীবনদানের পর্যায় ছিল ১৯০৫ থেকে শুরু করে ত্রিশের দশক পর্যন্ত। এই পর্যায়ের সূচনা পর্বের বিপ্লবী এক নেতা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৭ সালে আলীপুর বোমার মামলায় শ্রী অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে অভিযুক্ত হন উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। ১৯০৯ সালে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে নির্বাসিত হন আন্দামানে সেলুলার বন্দীশালায়। কালাপানির আন্দামান। যেখান থেকে কোনো বন্দী কোনদিন ফিরে আসতো না বলেই প্রবাদ তৈরি হয়েছিল। আন্দামান সেলুলার জেলে ১২ বছর বন্দী ছিলেন শত শত রাজবন্দীর সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ। কোনোদিন দেশে জীবিত ফিরে আসতে পারবেন, তিনিও ভাবেন নি। তবু স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তার, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় নতুন ধরনের বিপ্লবের সংঘটন : সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে আন্দামানের রাজবন্দীদেরও ১৯২১ সালে দেশে ফেরত নিয়ে আসতে এবং মুক্তি দিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারত সরকার বাধ্য হয়েছিল।

মুক্তি পাওয়ার পরেই উপেন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর আন্দামান বন্দীজীবনের কাহিনী : 'নির্বাসিতের আত্মকথা'। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিকথার এক অনন্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ পাঠ করে বলেছিলেন : এমন বই বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয় নি।

এই বইএর নাম হয়ত শুনেছিলাম। কিন্তু পড়ি নি আগে। এই প্রৌঢ় বয়সে সে বইকে পড়তে পেলাম। এ সুযোগটি করে দিয়েছিল আমার স্নেহভাজন তরুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক, এম, এম, আকাশ। বইটি কোথা থেকে যেন সংগ্রহ কর সে আমাকে পড়তে দিয়েছিল। আমি এ বই পাঠ করে আমার কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে একটি রচনা তৈরি করেছিলাম এ জন্য, যেন আমাদের আর পাঁচজন সুহৃদ পাঠক বইখানির কথা জানতে পারেন। 'ভোরের কাগজ'কে ধন্যবাদ তাঁরা রচনাটি প্রকাশ করেছিলেন।

বইখানি ঢাকাতে পাওয়া যায় না বলে আমার রচনাটির শিরোনাম দিয়েছিলাম :

'যে-বই পাঠক কিনতে পারেন না।' 'ভোরের কাগজে' লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পরে বিভিন্ন বন্ধু ও পাঠকের কাছ থেকে আমার কাছে তাগিদ এসেছে : বইখানি কোথায়? বইখানি পাঠ করি কেমন করে? এ প্রশ্ন পাঠকরা অধ্যাপক আকাশকেও করেছেন। কেননা লেখাটিতে তাঁর নামের উল্লেখ ছিল। আমাদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে নাতিদীর্ঘ এই গ্রন্থ 'নির্বাসিতের আত্মকথার একটি সুলভ পুনর্মুদ্রণের আমরা উদ্যোগ নিতাম। আসলে এমন মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রকাশক যে আমাদের নেই, তা নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি : এই দুটি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই এরূপ মূল্যবান গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নিতে পারে। কিন্তু কেউ নিচ্ছে না, এটাই যা দুঃখের ব্যাপার।

আমার অপরাধের একটি দিক এই যে, যে-বই আগ্রহী একজন পাঠক বাজারে কিনতে পাবেন না, তেমন গ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করাটা আমার অন্যায় হয়েছে। এর ফলে আগ্রহী পাঠক নিশ্চয়ই আমার উপরে সন্তুষ্ট হওয়ার চাইতে ক্রুদ্ধ হয়েছেন অধিক যেমন আমি ক্রুদ্ধ হই সেই চিকিৎসকের উপর যিনি আমার কোনো রোগের নিরাময়ের জন্য এমন ওষুধের নাম লিখে প্রেসক্রিপশন দেন যে—ওষুধ ঢাকার বাজারে শত চেষ্টা করেও সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

'নির্বাসিতের আত্মকথা' পাঠ করার জন্য তার একটি কপি পাওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। আকাশ যখন তার কপিটি আমাকে পড়তে দিয়েছিল তখন একবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল, তার কপিটি আমি একেবারেই রেখে দেব। কথ্য ভাষায় : 'মেরে দেব'। কিন্তু আমার এই বয়সে সেটা মানাবে না এবং আকাশের প্রতি আমার স্নেহ-মমতা থেকে আমার পক্ষে তা করাও সম্ভব নয়।

তবু কিন্তু 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র একটি কপি আমি সংগ্রহ করেছিলাম, মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেষ্টাতেই এবং আকাশের কপিটি ফেরৎ দিয়ে আমার নিজের কপিটির উপরে নিচে-পাশে নানাভাবে দাগ কেটে, নানারকম চিহ্ন দিয়ে পৃষ্ঠার মার্জিনে 'আহ! উহু!' মন্তব্য লিখে পাঠ করছি।

কেমন করে? এ এক অলৌকিক রহস্যই বটে। এই রহস্যের একটি বর্ণনা আমার প্রথম লেখাটিতে ছিল বটে। কিন্তু স্থানের অভাবে যে বর্ণনা আর পাঠকদের জন্য পেশ করি নি। কিন্তু আজ তার একটু আভাস দেওয়া আবশ্যক। ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নির্বাসিতের আত্মকথা' নিউমার্কেটের কোনো দোকানে কি পাওয়া যাবে না? দেখি না চেষ্টা করে। তাই গিয়েছিলাম কয়েকটি দোকানে। দেখলাম, তাদের বইএর তাকে কোলকাতা থেকে আমদানী করা গল্প-উপন্যাসের অনেক বই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বেশ আকর্ষণীয় প্রকাশনা। আমি বললাম : উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' আছে? দোকানের বিক্রেতা তরুণ, প্রবীণ : সকলের কাছে এ এক অপরিচিত নাম। অপরিচিত গ্রন্থকার। তাঁরা মাথা নাড়লেন : না, এমন লেখক এবং তার বইএর নাম তাঁরা শোনেন নি।

আমি দেখলাম, বৃথা পরিশ্রম। তার চাইতে 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র দ্বিতীয় কপি একটি আমি তৈরি করি নে কেন? বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রযুক্তির কল্যাণে এখন আর, কিছু টাকা খরচ করলে বই বা প্রবন্ধ বা কোনো লিখিত জিনিসেরই মুহূর্ত-মধ্যে কপি করা আদৌ কোন কষ্টের ব্যাপার নয়। কোনো জ্ঞানের ব্যাপারও নয়। আগে বই বা কিছু কপি করতে হলে হাতে প্রতিটি শব্দ দেখে নকল করতে হত। (নিজে রাজবন্দী থাকাকালে জেলখানায় কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ ইশতেহারকে আগাগোড়া রাতের গভীরে নিষিদ্ধভাবে হাতে লিখে কপি করে সেই কপি নিয়ে সহবন্দীদের মধ্যে পাঠচক্র দাঁড় করেছিলাম। সেও এক স্মৃতি বটে!) কিন্তু এখন মিনিটের মধ্যে ফটোস্ট্যাট।

আমি ভাবলাম, 'নির্বাসিতের আত্মকথা' আমি ফটোস্ট্যাট করে ফেলব। এর ফটোস্ট্যাট কপিকে আমি আমার গ্রন্থ সংগ্রহে রেখে আস্তে ধীরে রসিয়ে রসিয়ে তার প্রতি পৃষ্ঠাকে আমার মন্তব্যের আঁচড়ে অঙ্কিত করে পাঠ করব। এমন সুযোগ থাকতে চিন্তা কি?

আসলে করলামও তাই। বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে বলি, নীলক্ষেতের বাকুশা মার্কেটের ফুটপাত প্রায় ফটোস্ট্যাটের বাজার বসে গেছে। গুনে দেখলাম মাত্র কয়েক হাতের মধ্যে অন্ততঃ ৩২টি ফটোস্ট্যাট মেশিন। আমি সে বাজার থেকে ঘন্টাখানেক সময়ে মোট ৫৫ টাকা খরচ করে ১৪০ পৃষ্ঠার 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কপি ও বাঁধাই করে দস্তুরমত বই ছাপিয়ে হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। এ এক অলৌকিক ব্যাপার বটে। অবশ্য আমাদের লেখাপড়ার পরিবেশে এর ভালোমন্দ : দুইই আছে। কিন্তু সে আলোচনা আজ থাক। ...

এই কপিটির উপর ভর করেই আমি আমার লেখাটি তৈরি করেছিলাম। 'ভোরের কাগজে' সেটি পাঠ করে হাসপাতালের বেডে শায়িত অসুস্থ বন্ধু খবর পাঠিয়েছিলেন : সরদার, আমাকে বইখানি একটু পড়তে দেবে? আর এক অধ্যাপক বন্ধু ফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন, কোনো দোকানে বললে কি বইখানি আনিয়ে দিতে পারবে না? ...

আমি আশা করব, আজ হোক, কাল হোক এমন অমূল্য দুষ্প্রাপ্য বইএর পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা আমাদের দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে করা হবে। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমার কেবল ইচ্ছা হচ্ছে, গোটা বই না হোক, আমার সেই অসুস্থ হাসপাতালের শয্যায় শায়িত বন্ধুর জন্য 'নির্বাসিতের আত্মকথা'-র কয়েকটি পৃষ্ঠাকে উদ্ধৃত করে দিই।

* * *

"যাক্—এদিকে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। যুদ্ধের পূর্বে যখন ছাড়া পাইবার আশা-ভরসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মরণের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম, তখন দুঃখের মাঝখানে দিন একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু যুদ্ধের পরে আবার কয়েদী ছাড়িবার কথা উঠিল। তখন আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় দিন কাটানো ভার হইয়া উঠিল। একদিন সংবাদ আসিল যে, যে-সমস্ত যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পিনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী নয় তাহারা জেলখানায় যদি সাত বছর কাটাইয়া থাকে ত তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমাদের সাত বছর ছাড়িয়া দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, সুতরাং প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, যে সমস্ত কয়েদীর মুক্তির জন্য ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে নাম পাঠান হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে আমাদের নামও গিয়াছে; এখন গভর্নমেন্ট তাহা মঞ্জুর করিলেই নাকি আমরা নাচিতে নাচিতে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি।

"এ পর্যন্ত কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পোর্ট ব্লেয়ারে হইতে বাঁচিয়া ফিরে নাই। ১৮৫৭ সালে যাহারা সিপাহী বিপ্লবের পর পোর্ট ব্লেয়ার গিয়াছিল তাহাদের সকলকেই সেখানে একে একে দেহরক্ষা করিতে হইয়াছে। থিবর সহিত যুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্রহ্মদেশীয় কয়েদী আসিয়াছিল তাহারাও কেহ ছাড়া পায় নাই। আজ আমাদের জন্য যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে একথা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। কিন্তু না বিশ্বাস করিয়াই বা করি কি? প্রাণ যে ফুলিয়া ফুলিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে।...

এই সময় জেলে কমিটির পোর্ট ব্লেয়ারে আসিবার কথা ছিল। আমি স্থির করিলাম যে আমাদের যা কিছু বক্তব্য সমস্ত জেল কমিটির নিকট গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া বলিয়া দিয়া তাহার পর কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িব। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? জেল কমিটি চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই একদিন প্রাতঃকালে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসিয়া আমাদের সংবাদ শুনাইয়া দিলেন যে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আমাদের আলীপুর জেলে পাঠাইয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন; সেখানে হইতে আমাদের মুক্তি দেওয়া হইবে।

অল্পদিনের মধ্যে গভর্নমেন্টের মতিগতি কি করিয়া পরিবর্তিত হইল সে রহস্য উদ্ঘাটন করিবার কৌতূহল মনের মধ্যেই চাপা পড়িয়া রহিল। লম্বা হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া স্ফূর্তিতে কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল, কেহ গান জুড়িয়া দিল। একজন বিজ্ঞ বন্ধু সকলকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একটু স্থির হও দাদারা; এ বাড়িতে ফলারকরতে এলে না আঁচানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। শেষে মাঝ দরিয়ায় না জাহাজ ডুবিয়ে দেয়!"

জাহাজে চড়িবার আর দুই দিন বাকি। রাত্রে চোখে নিদ্রা নাই। আহারে প্রবৃত্তি নাই। কল্পনার শত চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। বহুদিন-বিস্মৃত সুপরিচিত মুখগুলি আবার মনের মধ্যে ফুটিতেছে। যাহাদের সহিত ইহকালের সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার স্নেহের শতডোরে বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুইদিন কাটিয়া গেল। দল বাঁধিয়া ছাব্বিশজন জেল হইতে বাহির হইলাম। তখনও কাহারও কাহারও পায়ে বেড়ি বাজিতেছে।...

তাহার পর জাহাজে চড়িয়া একবার পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম।...

জাহাজ তিনদিন ধরিয়া ছুটিয়াছে; মনটা তাহার আগে ছুটিয়াছে ঐ সাগর দ্বীপে বাতি জ্বলিতেছে, ঐ রূপনারায়ণের মোহনা। আজই খিদিরপুরের ঘাটে জাহাজ গিয়া পৌঁছিবে।

না, জাহাজ ত কই ডুবিল না। এ যে সত্য সত্যই ঘাটে আসিয়া লাগিল। পুলিশ প্রহরী আমাদের সঙ্গে লইয়া আলীপুরের জেলের দিকে চলিল।...

ঘণ্টাখানেক জেলে থাকিবার পর সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন শনিবার। আমরা ভাবিয়াছিলাম সেদিন ও তাহার পরদিন বুঝি আমাদের জেলেই থাকিতে হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা বোধ হয় আজই বাহিরে যাইতে চাও? কলিকাতায় তোমাদের থাকিবার জায়গা আছে?" বাহিরে যাইবার নাম শুনিয়া আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। মুখে বলিলাম—"জায়গা যথেষ্ট আছে," আর মনে মনে বলিলাম—"জায়গা না পাই রাস্তায় শুয়ে থাকবো; একবার ছেড়ে দাও।"

সে রাতে হেমচন্দ্র, রবীন্দ্র ও আমি ছাড়া পাইলাম। কিন্তু যাই কোথায়? শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশের বাড়ি গিয়া দেখিলাম তিনি বাড়িতে নাই। তখন সেখান হইতে ... বাহির হইয়া দেখিলাম যে কলিকাতার রাস্তাঘাট সব ভুলিয়া গিয়াছি।... শ্যামবাজারে শ্বশুরবাড়ি। ভাবিলাম সেখানে গিয়া রাত কাটাইয়া দিব। শ্যামবাজারে যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ির দরজা বন্ধ। দুই চারবার কড়া নাড়িয়া যখন কোন সাড়া পাইলাম না, তখন ভাবিলাম, "কুচ পরোয়া নেহি; আজ রাতটা কলিকাতার রাস্তায় না হয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব।" প্রাণে একটা নূতন রকম আনন্দ দেখা দিল। আজ বারো বৎসর পরে খোলা রাস্তায় ছাড়া পাইয়াছি। সঙ্গে জেলার নাই, পেটি অফিসার নাই, একটা ওয়ার্ডার পর্যন্ত নাই। অতীতের বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে, নূতন বন্ধন এখনো দেখা দেয় নাই। আজ সংসারে বাস্তবিকই আমি একা। কিন্তু এই একাকিত্ববোধের সঙ্গে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন বিষাদের কালিমা জড়িত নাই; বরং একটা শান্ত আনন্দ উহার তালে তালে ফুটিয়া উঠিতেছে।

শ্যামবাজার হইতে সার্কুলার রোড ধরিয়া শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। বারো বৎসর জুতা পরা অভ্যাস নাই, সুতরাং আজ নতুন জুতায় পা একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। জুতা খুলিয়া বগলে পুরিয়া চলিতে লাগিলাম। বগলে পুঁটুলি দেখিয়া রাস্তার এক পাহারাওয়ালা ধরিয়া বলিল, কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় যাইব, ইত্যাদি ইত্যাদি! একবার মনে হইল, সত্য কথা বলিয়াই দিই যে আমি কালাপানির ফেরত আসামী। ... তাহার পর ভাবিলাম, আর সত্যনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি করিয়া কাজ নাই। একবার সত্যকথা বলিতে গিয়া ত বারো বৎসর কালাপানি ঘুরিয়া আসিলাম।

শেষে বলিলাম, "আমি কালিঘাট হইতে আসিতেছি। শিয়ালদহ স্টেশনে যাইব।"

কনস্টেবল সাহেব আমাদের বগলের পুঁটলি পরীক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কি উড়ে?"

বহু কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলাম—'হ্যাঁ' ...

২০.১০.৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিষাদ-সিন্ধু' এবং একটি কিশোর

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের 'বই'-এর সম্পাদক অনুরোধ করেছেন, বই পাঠের স্মৃতিচারণ করতে । অনুরোধটি স্বাভাবিক । 'বই' পত্রিকার প্রয়াস হচ্ছে বইকে নানাভাবে তার পাঠকদের সামনে তুলে ধরা । দেশ ও বিদেশের নানা বইএর তাঁরা খবর সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন । দেশের সমকালীন প্রকাশনাক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের আলোচনা পেশ করেন ।

'বই পাঠের স্মৃতিচারণ' শিরোনামে ইতোমধ্যে 'বই' নিশ্চয়ই আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী : এঁদের অনেকের বই পাঠের স্মৃতিচারণ প্রকাশ করেছেন । আমি তাঁদের সে স্মৃতিচারণ হয়ত পাঠ করি নি ।

কিন্তু নিজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দেখছি, বিষয়টি তেমন সহজ নয় । নিজেকেই জিজ্ঞেস করেছি : আমি কি আমার সচেতন কিশোরকাল থেকে নানা রকম বই পড়ি নি? তবে তাদের কারুর আচার আচরণ, আমার জীবনে তাদের দান অবদানকে আমি স্মরণ করতে পারছি নে কেন ।

বই পাঠের স্মৃতিপটকে ধূসর এবং প্রায় শূন্য দেখে আমার মনটা বিষাদে ভরে উঠল । নিজেকে যথার্থ কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ বলে বোধ হতে লাগল । বন্ধুর দানকে স্মরণ না করার অকৃতজ্ঞতা । তাকে বিস্মৃত হওয়া । তবে কি কৃতজ্ঞতার চাইতে কৃতঘ্নতাই মানুষের অধিকতর স্বাভাবিক প্রবণতা? সচেতনভাবে কথাটা স্বীকার করতে দ্বিধা এলেও, সত্যটা অস্বীকার করা যায় কেমন করে?

মানুষের এই এক চরিত্র যে, সে যার কাছ থেকে সবচেয়ে অধিক পায় এবং সব সময় পায়, তাকে নিয়ে তার আদৌও কোন চিন্তা-ভাবনা এবং সচেতন কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশিত হয় না ।

আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে নিয়ে ভাবি নে । আলো-হাওয়াকে নিয়ে ভাবি নে । প্রতিবেশ-পরিবেশকে নিয়ে ভাবি নে । তেমনি আমরা বই নিয়ে ভাবি নে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব কিছুকেই আমরা যেন 'পথে পড়ে পাওয়া' বিষয় বলে মনে করি। ইংরেজিতে বললে : 'থিংস টেকন ফর গ্রান্টেড' : আছে তো, এ নিয়ে আর চিন্তা কি? এদেরকে সৌভাগ্য বলে জ্ঞান করি নে। কিন্তু আমাদের অর্বাচীনতা এবং অজ্ঞতায় এদের কারুর অবদানই তো মিথ্যে হয়ে যাবে না। সে কথা যেমন সত্য, তেমনি এদের অবদান সম্পর্কে যদি চিন্তা করি তবে সেই চিন্তাই আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি উপাদানের অবদানকে দৃঢ়তর করে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারে। সে কথাও তো অনস্বীকার্য।

এমন দার্শনিক কথাবার্তার ব্যাখ্যা বারান্তরে করা যাবে। আজ সত্য আমি চক্ষু বন্ধ করে আমার আপাতঃ বিস্মৃত কিছু বন্ধুর নামকে স্মরণ করার চেষ্টা করেছি। বইএর নাম। বই-ই বন্ধু। সেই বন্ধুদের নাম। একথা অপর কেউ না জানুক, আমি তো বুঝি, যাদের নাম ও পরিচয় আমি এখন ভুলে গেছি তারাও আমার জীবনের বোধবুদ্ধি, সত্য-মিথ্যা ভেদের জ্ঞান লাভ, জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম, ভালোবাসার অনুভূতি তৈরিতে তাদের অবদান যুগিয়েছে। যদি সম্ভব হত, যদি আমদের জীবনে সেই শৃঙ্খলাপরায়ণতা থাকতো যার দ্বারা কিশোরকাল থেকে যখন যে বইকে আমি পাঠ করেছি তার নাম পরিচয়টি আমি শুধু মনের পৃষ্ঠায় নয়, কাগজে কলমে লিখে রাখতাম, তবে তাতে যে সৌধ তৈরি হত, সে সৌধই আমার জীবনের আর এক রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করত। কিন্তু সে অক্ষমতার ক্ষতিকে পূরণ করার কোন উপায় নেই।

কিন্তু আজ এইক্ষণে যাদের নাম স্মরণ করতে পারছি, তাদের পরিচয়, যত অল্পই হোক না কেন, অপর কোনো আগ্রহী পাঠকের কাছে বলার একটা দায়িত্ব আমার আছে। সেই দায়িত্বের চিন্তা থেকেই বর্তমানের এই প্রয়াস।

কিশোরকাল থেকে স্মৃতির পাতা উল্টাতে গেলে প্রথমেই আমার মনে পড়ে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র কথা।

কিশোরকাল তো বটেই। স্কুলের ষষ্ঠ থেকে বড়জোর অষ্টম শ্রেণীর বয়স। 'বিষাদ-সিন্ধু' কেমন করে হাতে এসেছিল, তা স্মরণ করতে পারছি নে। আসলে সেকালে : আজ থেকে পঞ্চাশ বছরের অধিককাল পূর্বেও 'বিষাদ সিন্ধু' পাওয়ার কোনো সমস্যা ছিল না। অল্পবিত্ত কৃষক পরিবারেও, যে পরিবারের দু একটি ছেলে মেয়ে স্কুলে, মাদ্রাসায় পড়ছে, তেমন পরিবারেও 'বিষাদ সিন্ধু' ছিল প্রায় সার্বজনীনভাবে প্রাপ্য বই। 'বিষাদ সিন্ধুকে আজ এই পড়ন্ত বেলায় পাঠ করলে কতটুকু আনন্দ পাব এবং কাহিনীর আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠব, তা বলা মুশকিল। বর্তমানের কিশোর কিশোরীরা কি 'বিষাদ-সিন্ধু' পাঠ করে? 'বিষাদ-সিন্ধু'-র জায়গাতে আধুনিক গল্প-রূপকথা স্থান নিয়েছে। কিন্তু সেদিন এই 'বিষাদ-সিন্ধু' পাঠ করে যে রোমাঞ্চ এবং আবেগ বোধ করেছিলাম তার স্মৃতিতে আমার মন আজো আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহের বয়স হয়। মনেরও কি বয়স হয়? আমি জানি নে। কেবল আফসোস, কালের গতি একমুখো। অতীতকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনা চলে না। তাকে স্মৃতিপটেই কেবল ভাসিয়ে তোলার চেষ্টা করা যায়।

ত্রিশের দশকের শেষ। '৩৬ থেকে, ধরা যাক, '৪০ সালের কথা। একটি গরীব কৃষক পরিবার। আমি হয়ত তখন নিজের বাড়ি ছেড়ে অভিভাবক বড় ভাইএর সঙ্গে তাঁর চাকুরির স্থানে থেকে সেভেন, এইট কিংবা নাইনে পড়ছি। বাড়িতে এলে খুব আদর পাই। আমার সাংসারিক কোন গুণ ছিল না। বাজার করার নয়। গরুকে ঘাস খাওয়াবার নয়। কিন্তু আত্মীয়জনেরা নাম ধরে বলেন : ও বেশ পড়তে পারে। বাংলা বই পড়তে পারে। তাঁরা আমার প্রশংসা করতেন। সেই প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি শুধু 'বিষাদ-সিন্ধু' পড়েছি, তাই নয়। আমি মজলিস করে উঠানের চারপাশের ঘর থেকে মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচীকে ডেকে 'বিষাদ সিন্ধু' পাঠ করে শুনিয়েছি।

'পাষণ্ড সীমার খঞ্জর হাতে ইমাম হোসেনের বুকের উপর চেপে বসেছে। খঞ্জর চালাচ্ছে। কিন্তু হযরতের চুম্বনসিক্ত কণ্ঠকে সে খঞ্জর ভেদ করতে পারছে না।' আহা সে কি কাহিনী! আমার মুখে পাঠ শুনে মা, চাচী, ভাইএরা তাঁদের চোখের পানি রোধ করতে পারতেন না।

পঁয়ষট্টিতে এসে পেছনের দিকেই তাকাতে হয়। সামনের দিকে তাকালে নিম্নমুখী কাউন্ট ডাউনের টেকঅফের ক্রান্তি বিন্দুটিতে দ্রুত পৌঁছে যাবার আশঙ্কায় মনে বিষাদ জাগে। ভয় নয়। আমার মনে আফসোস জাগে। অপ্রাপ্তির আফসোস নয়। দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যথা, বিচ্ছেদ, বিপর্যয়, রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান-পতন, আদর্শের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, তার জন্য লড়াই, হত্যাযজ্ঞ : প্রাপ্তির কি অচিন্ত্যনীয় বৈচিত্র্য। আসলে একটা জীবন এমন বিপুল বৈচিত্র্য ধারনের জন্য কত ক্ষুদ্র! আগে পরকালের কথা ভাবতাম না। কিন্তু এখন ভাবতে শুরু করেছি। ইহকাল আর পরকাল। ইহকাল তো অচিরেই শেষ হবে। বস্তুবাদী বলে, আমার ইহলোক ত্যাগের সঙ্গে সব কিছু অর্থহীন হয়ে যাবে, এমন ভাবনা ভাবি কী করে? পরিবার, পরিজন, লোক-লোকালয় থাকবে। শুধু এতটুকু বুঝেই অনিবার্যভাবে প্রস্থানোম্মুখের মনে কোনো আনন্দের সঞ্চার হওয়ার কথা নয়। তাই যদি হয়, তবে আমিই বা পরকালকে এত সহজে পরিত্যাগ করি কেন? যৌবনে পরকালের প্রয়োজন পড়ে নি। প্রয়োজন বাদে কে ভাবে? এখন তো প্রস্থানের মুহূর্তটি সন্নিকটে। এখনই তো প্রয়োজন।

মানুষের জীবন নানা ইচ্ছা, বাসনা, কল্প কাহিনীতে ভরা। সেই সব কল্প-কাহিনী নিয়ে মানুষ বাঁচে। এবং তারই সম্ভার নিয়ে মহাকালের পথে একাল থেকে সে যাত্রা শুরু করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও তেমনি কল্পকাহিনী রচনা করি। আমি ভাবি, একালে না হলেও আগামীকালে আবার আমি ফিরে যেতে পারব আম, জাম, তাল, তেঁতুল, বাঁশঝাড় ঘেরা সেই গ্রামটিতে, যেখানে আমার মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোনেরা আমার আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। আমি সন্তর্পণে তাঁদের মাঝখানে গিয়ে আচম্বিতে তাদের চমকিত কের বলে উঠব : এই যে আমি এসেছি! ভাই বোন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার নাম ধরে বলে উঠবে : তুই এসেছিল : তোর জন্যই আমরা অপেক্ষা করে আছি। তোর মতো করে তো আমরা পড়তে পারি নে। এই নে, তোর 'বিষাদ-সিন্ধু'। তুই পড়ে শুনা, ইমাম হোসেন ফোরাত নদীর কুলে কেমন করে যুদ্ধ করে ঢলে পড়েছিলেন। কেমন করে সীমার তাঁর বুকের উপর চেপে খঞ্জর চালিয়েছিল।...

তাদের দাবীতে, আদরে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে উঠব এবং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে কণ্ঠের স্বরকে আরো উচ্চ করে আমি পড়তে শুরু করব :

"... সীমার, আমি এখনই মরিব। বিষাক্ত তীরের আঘাতে আমি অস্থির হইয়াছি। বক্ষের উপর হইতে নামিয়া আমায় নিঃশ্বাস ফেলিতে দাও। একটু বিলম্ব কর। একটু বিলম্বের জন্য কেন আমাকে কষ্ট দিবে? আমার প্রাণ বাহির হইয়া গেলে আমার মাথা কাটিয়া লইও। দেহ খণ্ড খণ্ডে খণ্ডিত, করিতে ইচ্ছা হয়, খণ্ডিত করিও। একবার নিঃশ্বাস ফেলিতে দাও। আজ নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু। এই কারবালা প্রান্তরেই হোসেনের জীবনের শেষ কার্য সমাপ্ত। জীবনের এই শেষ কারবালায়। ভাই সীমার! তুমি নিশ্চয়ই আমার মাথা কাটিয়া লইতে পারিবে। আশীর্বাদ করিতেছি, এই কার্য করিয়া তুমি জগতে বিখ্যাত হইবে। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।"

"অতি কর্কশ স্বরে সীমার! কেন এ সময়ে বারংবার আমাকে কষ্ট দিতেছ? শীঘ্র মাথা কাটিয়া ফেল। আর সহ্য হয় না। অনর্থক আমাকে কষ্ট দিয়া তোমার কী লাভ হইতেছে? বন্ধুর কার্য কর। শীঘ্র আমার মস্তক কাটিয়া ফেল।"

"আমি ত কাটিতে বসিয়াছি। সাধ্যানুসারে চেষ্টাও করিতেছি। খঞ্জর না কাটিলে আমি তার কী করিব? এমন সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর তোমার গলায় বসিতেছে না, "আমার অপরাধ কী? আমি কী করিব?' ... "সীমার গাত্রের বসন উন্মোচন করিয়া হোসেনকে দেখাইল। নিজেও দেখিল। হোসেন সীমারের বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুই হস্তে দুই চক্ষু আবরণ করিলেন! সীমার সজোরে হোসেনের গলায় খঞ্জর দাবাইয়া ধরিল। "এবারেও কাটিল না। বারংবার খঞ্জর ঘর্ষণে হোসেন বড়ই কাতর হইলেন। পুনরায় সীমারকে বলিতে লাগিলেন, "সীমার, আর একটা কথা আমার মনে হইয়াছে, বুঝি তাহাতেই খঞ্জরের ধার ফিরিয়া গিয়াছে, তোমারও পরিশ্রম বৃথা হইতেছে, আমিও যারপরনাই কষ্ট ভোগ করিতেছি। সীমার। মাতামহ জীবিত অবস্থায় অনেক সময় স্নেহ করিয়া আমার এই গলদেশ চুম্বন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতেন। সেই পবিত্র ওষ্ঠের চুম্বন মাহাত্ম্যেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমার মস্তক কাটিতে আমি তোমাকে বারণ করিতেছি না; আমার প্রার্থনা এই যে, আমার কণ্ঠের পশ্চাদভাগে, যেখানে তীরের আঘাতে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সেইখানে খঞ্জর বসাও, অবশ্যই দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে।"

জীবনে এমন আবেগ আর অনুপ্রেরণাবোধ, জীবনকে সার্থক ভাবার বোধ যে-বন্ধু আমার কিশোর মনে উপ্ত করে দিয়েছিল, সেই 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাছে আমার ঋণের কি কোনো শেষ আছে? তার কি কেনো পরিমাপ হয়?

০৬.০৫.৯০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনারাই আমাদের ডুবাবেন!'

আগের দিনও খেয়াল ছিল না। মাসের ২১ তারিখ মানে তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হচ্ছে। গ্যাসের বিল দিতে হবে। গ্যাসের বিল বইএর ভিতরে লেখা আছে : তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে আগের মাসের বিল পরিশোধ করা না হলে, প্রতিমাসে ২ বার্নারের জন্য ১০ টাকা এবং ১ বার্নারের জন্য ৫ টাকা করে সারচার্জ মানে জরিমানা দিতে হবে। এই ১০ টাকা অচিরেই হয়ত ২০ টাকা হয়ে যাবে। কিন্তু এই দশ টাকাও আমার জন্য কম নয়। নির্ধারিত ব্যাংকে দৌড়াতে হবে। গতমাসের গ্যাসের বিলটা ব্যাংকের কাউন্টারে জমা দিতে হবে।

দশটার দিকে রিকশা করে ব্যাংকের জন্য যাত্রা করতে আর একটা কথা খেয়াল হলো। হায় আল্লাহ! আজকে তো বৃহস্পতিবার! তার মানে ১১টার মধ্যে ব্যাংকে বিল দিতে হবে। কিন্তু সেখানে কি গ্যাস, বিদ্যুৎ, আর পানির বিলের জন্য আমি একা গিয়েই হাজির হব? না, তা নয়। আজকে নিশ্চয়ই গ্যাসের চাপ পড়বে বেশি। দিতে পারব কিনা, তাই বা কে জানে। তবু দৌড়ালাম ব্যাংকের দিকে। গিয়ে দেখি, আমার আশঙ্কাই ঠিক। এগারটার কিছু বাকি আছে বটে। তবু ব্যাংকের কাউন্টারে শতের অধিক বিলদাতা বিল পরিশোধের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে। আমি যে চটকরে বিল হাতে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে যাব, তারও উপায় নেই। এক কাউন্টার থেকে স্ক্রল নম্বর নিতে হবে। লাইনে যাঁরা ইতোমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছেন তাঁদের একজন বললেন : ঐ কাউন্টারে যান, ঐ যে চশমা চোখে মহিলা, ওনার কাছ থেকে আগে স্ক্রল নম্বর নেন, তারপরে লাইনে দাঁড়ান।

আমার হাতে দুটো বিল। তা তেমন বেশি নয়। অনেকের হাতে ৪টা, ৫টাও থাকে। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম সেই কাউন্টারের লাইনে। এখানেও বেশ কয়েকজন লাইন করে দাঁড়িয়েছেন একটা ভরসা, ১১টার আগে যখন ব্যাংকের গেট দিয়ে ঢুকেছি, তখন বিল দিতে কোনো অসুবিধে হবে না। স্ক্রলের লাইনে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসার সময় হলে আমার বিল বই দুটো মহিলার সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে দিলাম। চোখে চশমা। বয়স মাঝারি। উনি বিল নিয়ে ব্যাংকের রেজিস্টারে বিলের নম্বর আর টাকার অংক তুলে নিয়ে বিলের উপরে একটা ক্রমিক নম্বর দিয়ে দিচ্ছেন। প্রথম বইটা শেষ হলে দ্বিতীয়টা এগিয়ে দিতে একটু ধমকের চোখে বললেন, এক সাথে দিতে পারেন না? আমি নরম গলায় বললাম : এক সাথেই তো দিয়েছিলাম, আপনি নিলেন না। যাহোক, দ্বিতীয়টাও নিলেন এবং নম্বর দিলেন। এই নম্বর দেওয়ার কাজ করছেন। আবার বেশি ভীড় পড়েছে বলে পাশের সহকর্মী, যিনি টাকা নেন, তাঁর কাছ থেকে বিল বইগুলো এনে রাজস্ব টিকেটও লাগাচ্ছেন এবং ব্যাংকের সিল মেরেও তাঁকে সাহায্য করছেন। চোখে চশমা। গায়ে একখানি ওড়না আছে। মুখখানি হাসি হাসি, তাই তাঁর আগের ধমকটিতে আমি 'মাইন্ড' করলাম না। স্ক্রল নম্বর নিয়ে এবার টাকা দেওয়ার লাইনে এসে দাঁড়ালাম। কখন এখান থেকে ছুটি পাব তার ঠিক নেই। টাকা নেওয়া, স্ট্যাম্প লাগানো, সিল দেওয়া, খাতায় তোলা, সেই খাতা পেছনে বসা উর্ধ্বতন অফিসারের টেবিলে দেওয়া, তার আবার স্বাক্ষর দেওয়া, বিলের এক অংশ ছিঁড়ে রেখে বই ফেরৎ দেওয়া : প্রক্রিয়াটি খুব ছোট নয় এবং সময়ও কম লাগছে না। আমার সামনে দেখলাম অন্তত ১৫-২০ জন তো বটেই। পেছনেও লাইন লম্বা হচ্ছে। একজন স্ক্রল নম্বর বসিয়ে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই, জায়গাটা একটু রাখবেন, আমি একটু ঘুরে আসি। আমি বললাম, আমি কেমন করে রাখব? আপনার পেছনে যিনি দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে বলুন। লাইনের চোখ তো সামনে দিকে। আমি লক্ষ রাখছি, আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁর দিকে। আর কেউ যেন তাঁর আর আমার মাঝে এসে দাঁড়াতে না পারেন। তাহলে আমি আরো একজনের পেছনে পড়ে যাব।

কাউন্টারে কাজটা যদি চটপট হতে পারত, এবং সবাই যদি ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়াত তাহলে এই নিয়মে বিল পরিশোধে কোন চিন্তা হত না। কিন্তু আমাদের সকলেরই চেষ্টা থাকে সবার আগে নিজের কাজটা করিয়ে নেওয়ার। নিজের বিলটা আগে দেওয়ার। তাই লাইনে না দাঁড়িয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে ভীড় জমায়। তাতে কাজ আরো পিছিয়ে যায়। সময় লাগে বেশি অনেক সময় ঝগড়া-ঝাটিও বেঁধে যায়। মনটা অনেক সময় আমারও খারাপ হয়ে যায় যখন দেখি ভিতরে কোন বিশেষ ব্যক্তির বিল অফিসার আগে নিয়ে বিদায় করছেন। এমন ব্যক্তি পুরুষ হলে আমরা কাউন্টারের বাইর থেকে চীৎকার করি : 'ভিতরে কারুর বিল আগে নেওয়া চলবে না।' কিন্তু ভিতরের সেই ব্যক্তি কোনো কোনো সময়ে একটি তরুণী বা গৃহিণী হয়ে পড়েন। বিল দিতে এসে ব্যাংকের লাইনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশকে যেন কিছুটা টের পাই। কোনো কোনো সময়ে দেখেছি, কোন তরুণী বা মধ্যবয়সী গিন্নী গ্যাস, পানি বা বিদ্যুতের বিল নিয়ে ভিতরে গিয়ে বিল বই কাউন্টার কর্মচারীর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। অনেকে অবশ্য সঙ্কোচের সঙ্গেই দেন। আমরা যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি লাইনে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে ব্যাপারটা ভালো না লাগলেও মেয়ে বা মহিলা বলে কোনো আপত্তি তেমন করি নে। মনের মধ্যে ক্ষোভ যে একটু না জমে তা নয়। সময়ের সমস্যা তো সকলেরই আছে। মেয়েদের চাইতে পুরুষদের সমস্যা কি কম? সকলেরই সময়ের দাম আছে। তবু এখনো মেয়েদের লক্ষ্য করে রুক্ষ স্বরে আমরা বলি নে : 'আরে ভাই, লাইনে এসে দাঁড়ান।' এই মেয়েদের বাসায় হয়ত বিল দেওয়ার লোক নেই। বাবা বা স্বামী অফিসে গেছেন্ মানে, বাইরের কাজে মধ্যবিত্ত মেয়েদেরও বেশ একটা অংশ এসে যাচ্ছে। বাইরের দায়িত্ব পালন করছে।

লাইনে না দাঁড়িয়ে অফিসারের কাছে গিয়ে কোন বিশেষ পরিচয়ে বিল দেওয়ার সুযোগ নিতে আমার খুবই সংকোচ হয়। আমি কেবল লাইনে দাঁড়াতে পারলই খুশি। লাইনে দাঁড়াতে আমার কোন সংকাচ নেই। সংকোচ থাকার মতো বৃহৎ লোক আমি নই। কেউ আমাকে ধাক্কা না দিলে লাইনে দাঁড়িয়ে গুটি গুটি পায়ে সামনে এগুই। যখন আমার সময় আসে তখন আমি আমার বিল বই কাউন্টারে এগিয়ে দিই।

কিন্তু এই মনোভাব সকলের নয়। বয়স্ক যাঁরা তাঁরা সাধারণত লাইনকে মেনেই চলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে এই মধ্যবিত্ত ঘরেরই দুএকটি যুবককে পাওয়া যায় যে অবুঝের মতো লাইনে না দাঁড়িয়ে ভেতরে গিয়ে কিংবা লাইন ভেঙে সামনে গিয়ে নিজের কাজ আগে উদ্ধার করতে চায়। একবার একটি যুবককে বলেছিলাম : আরে বাবা, আপনি না লাইন রাখতে সাহায্য করবেন? আপনি নিজে লাইন ভাঙলে আমরা যাই কোথায়? তবু সহজে সে লাইনে আসে নি। কেবল বলছিল : 'আমার তো মাত্র একটি বিল।' আমি বললাম, 'আমারও তো বেশি নয়। মাত্র দুটো বিল।" লাইনের বাকি সবাইও যুবককে বাধা দিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই যুবক লাইনে, আমাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি বেলাইনে যে বিল দিই নে, সে কথা আবার একেবারে সত্য নয়। একটা স্বস্তি নিয়ে ব্যাংকে ঢুকি, কেউ আমাকে চিনবে না। বেশির ভাগই তো তরুণ কর্মী। অফিসার। আমার মতো বৃদ্ধকে কে চিনবে। তাই সংকোচের কি আছে? কিন্তু দুএক সময়ে এমন বিস্ময়ও ঘটে যে, হঠাৎ কোনো টেবিল থেকে এক তরুণ অফিসার উঠে এসে বলেন, 'আরে স্যার! আপনি এখানে? আপনি আমার টেবিলে এসে বসুন। আমি বিলটা দিয়ে দিচ্ছি।' এমন অবস্থায় যথার্থই সংকোচ জাগে। বিব্রত বোধ করি। আমি যতোই বলি, না, না, আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, এই তো হয়ে যাবে, তিনি তত বলেন : 'স্যার, আমি আপনার ছাত্র। কিংবা স্যার, আমি আপনাকে চিনি।' এই বলে লাইনের আর সব মানুষের বিস্মিত এবং নিশ্চয়ই কিছুটা ক্ষুব্ধ দৃষ্টির সামনে বিব্রত আমাকে সেই অফিসার ধরে নিয়ে তাঁর টেবিলের সামনে বসান। চা খাবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি চিনি নে। ছাত্রকুলের কাউকে মনে রাখা কঠিন। কত ছাত্র। কিন্তু তিনি আমাকে চিনেন। দুএকটা ঘটনার উল্লেখও করেন। আমার বিল বইটা কাউন্টারে দিয়ে বলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'স্যারের বিলটা একটু নিয়ে নিন।' এমন সুযোগ নিতে আমি যথার্থই বিব্রত বোধ করি। এর আগে একদিন পাড়ার বন্ধু আবুল হুসেন তো লাইন থেকে জোর করে ধরে নিয়ে অফিসারের টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়ে অফিসারের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী কথা যেন বললেন। অফিসার বললেন : 'স্যারকে আমরা চিনি। কিন্তু উনি যে আইনের মানুষ। লাইন ছাড়া বেলাইনে সুযোগ নিতে চান না।' এমন কথাতে আবার একটু আনন্দও বোধ হয়। যাহোক, এই প্রশংসাটুকু খারাপ নয়। সেই বন্ধুবর আবুল হুসেন কিন্তু যথার্থই বুঝদার আর আইনী মানুষ। আমাকে ভিতরে বসিয়ে নিজে তাঁর বিল দেওয়ার জন্য লাইনের গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি আবার বললাম, আমি লাইনে যাই, আপনি এখানে দিন, তিনি তা শুনলেন না।

লাইনের একবার দাঁড়াতে পারলে আশেপাশে চোখ বুলাতে আমার বেশ ভালো লাগে।

মুসলিম-প্রধান বাংলাদেশের এককালীন সংকুচিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ষাটের দশকের দিক থেকেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মেয়েরা ঘরের বাইরে জীবিকার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, অধ্যাপনা ছাড়াও ব্যাংকে ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, সরকারি অফিসে আজকাল বেশ সংখ্যক মেয়েদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সমস্ত জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে পুরুষ সহযোগীদের সঙ্গে এই মেয়েদের দায়িত্ব পালনে যে-স্বাভাবিকতা আমার চোখে পড়েছে, তা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এদের দেখলেই আমার মনের চোখ চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছরের পূর্বের জীবনে ফিরে যায়। আমার নিজের পরিবার পরিজন, প্রতিবেশি, গ্রামবাসী, তাদের সামাজিক, পারিবারিক জীবন কী ছিল এবং সেই জীবনে আজ যে তুলনামুলকভাবে একটা গতি এবং শ্রমময়তা এসেছে, এটা আমাকে আনন্দিত করে তোলে।

এই ২১ তারিখেও গ্যাসের বিল দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে আমি এপাশ ওপাশে দৃষ্টি বুলাতে লাগলাম। ইতোমধ্যে ১১টা বেজে গেছে, ব্যাংকের লোকরা গেট বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। সামনের কাউন্টারের কর্মচারীরা বললেন, আর তাঁরা বিল নিবেন না। আজ ইতোমধ্যেই বেশি গ্রহণ করা হয়ে গেছে। অথচ বেশ কিছু মানুষ ব্যাংকে ঢুকে অপেক্ষা করছেন। তাদের বিল বইতে সামনের স্ক্রল-মহিলা স্ক্রল নম্বর দিতে চাচ্ছেন না। এটা নিয়ে একটু হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবে অপেক্ষমানরা বললেন : ১১টার মধ্যে ব্যাংকে ঢুকেছি, বিল কেন নেওয়া হবে না? আমি নিজেও তাই মনে করলাম। বৃহস্পতিবার ১১টায় লেনদেন বন্ধ। একথা ঠিক। কিন্তু যাঁরা ১১টার মধ্যে ব্যাংকে ঢুকেছেন তাঁদের বিল তো নেওয়া উচিত। যে-ব্যাংকে বিল দিচ্ছিলাম তার সেই শাখার উচ্চপদস্থ অফিসার বা ম্যানেজারের প্রথম থেকেই হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল। এক যুবক, দেখলাম, বারবার আমাদের সামনের সেই স্ক্রল দেওয়ার মহিলাকে বলছেন : 'আপা, বিলটা নিয়ে নিন।' মহিলা মাথা ঘুরিয়ে থাকছেন, তেমন কোনো জবাব, প্রতি-জবাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে চাচ্ছেন না। এটা তাঁর নিশ্চয়ই নতুন অভিজ্ঞতা নয়। বিলের ব্যাপারে প্রতিরোজই হয়ত এমন কিছু কথাবার্তা ঘটে থাকে। একবার শুনলাম, যুবক মহিলাকে বলছেন : আপা, আপনি একেবারে কি কসম কেটেছেন, আমার বিলটা নিবেনই না? এর মধ্যে আমার বিলটা পরিশোধের সুযোগ এসে গেছিল। সামনের লাইন অনেক কমে গেছে। আমার বিলটা পরিশোধ করে বিল বই নিয়ে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এলাম। ঐ যুবকও নিশ্চয়ই সেদিন তাঁর বিল দিতে পেরেছিলেন।

মেয়েদের, এমন হৈ হাঙ্গামার মধ্যে কাজ করার এবং মেজাজ রক্ষা করার ক্ষমতাটি যথার্থই প্রশংসনীয়। ব্যাংকের চাপ অবশ্য বৃহস্পতিবার ১১টা এবং অন্যান্যদিন একটা পর্যন্ত বেশি থাকে।

প্রায় ব্যাংকেই বেশ কিছু মহিলা কর্মীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কেউ দেখছি টাকা গ্রহণ করছেন, কেউ বিল নিচ্ছেন, কেউ চেক বই তৈরি করছেন। কোনো কোনো শাখায় মহিলা ম্যানেজারও রয়েছেন। ব্যাংকের কোনো কোনো শাখা আবার 'মহিলা শাখা' বলেও নির্দিষ্ট হচ্ছে। কেবল মহিলা শাখার কী উপকার, তার আমি জানি নে। মহিলা শাখায় নিশ্চয়ই মহিলা গ্রাহকদেরই লেনদেনের সুযোগ। কিন্তু মহিলা শাখায় সকল কর্মচারী মহিলা হবেন, এমন কোনো কথা নেই।

আসলে ছেলে-মেয়ে, তথা পুরুষ-মহিলাদের, বাইরের কর্মক্ষেত্রে এরূপ স্বাভাবিকভাবে জীবিকা নির্বাহ করা, দায়িত্ব পালন করা : এটা আমার কাছে যথার্থই একটা সমাজ বিপ্লবের সূচক। আমাদের সমাজ জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মেয়েদের অবরোধ থেকে মুক্ত করার জন্য মুসলিম সমাজে সেই বিশের দশকে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং সে সংগ্রাম তখন থেকে পরিচালনা করে আসছেন তাঁর ভাবশিষ্যারা : বেগম সফিয়া কামাল এবং তাঁর সঙ্গিনীরা। বেগম সুফিয়া কামাল আশির উর্ধ্বে এই বয়সে এখনো সেই সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। নিজেদের আরব্ধ সংগ্রাম সে যুগের তুলনায় অনেক বিকশিত হয়েছে। এই সমাজের নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধের মধ্যেও মেয়েদের শিক্ষার কিছুটা বিস্তার ঘটেছে। মেয়েরা কর্মের জগতে ঘরের সঙ্কোচ আর বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু মেয়েদের উপর নির্যাতন আর অবিচারের শেষ এখনো হয় নি। বেগম সুফিয়া কামাল তাই তাঁর যে কোনো ভাষণে দুঃখ করে বলেন : এত যে অগ্রগতির কথা তোমরা বলছ, কই, আমাদের মেয়েদের উপর নির্যাতনের তো এখনো শেষ হলো না। এ আফসোস তাঁর স্বাভাবিক। সমাজ-বিপ্লব চলছে। কিন্তু তা সম্পন্ন হতে এখনো অনেক বাকি।

তবু আমার নিজের অতীত জীবনের পরিবেশের দিকে চাইলে বর্তমানের এই বিকাশে আমি আবেগে উদ্বুদ্ধ বোধ না করে পারি নে। বাইরে কর্মজীবনে নারী ও পুরুষের, ছেলে ও মেয়েদের এই পারস্পরিক সহযোগিতা, মিছিল, মিটিং দৌড়, সহজ হাসি আলাপ, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ভালোলাগা, ভালোবাসার স্বাভাবিক সম্পর্কটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আসছে এবং আরো আসবে বাঁধভাঙা এই মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্য থেকে শ্রমজীবী মহিলা ও পুরুষ : সমগ্র মানুষের সহযোগী যোদ্ধারা।

২১ তারিখে ব্যাংকের লাইনে দাঁড়িয়ে একটু স্বস্তির ভাব নিয়ে, লাইনের সামনের দিকে আস্তে আস্তে এগুতে এগুতে নিজের মনে এসব কথাই ভাবছিলাম। দেখলাম, একটু দূরে টেবিলের এপাশে, ওপাশে এক তরুণ ও আর এক তরুণী ব্যাংক কর্মী সরস কিছু আলাপ করছেন। কোনো বিষয়ে যেন হাল্কা সুরে তর্ক হচ্ছে। তরুণটি কী যে বলছেন। তরুণীটি তা মানছেন না। তখন তরুণটি বললেন : 'এই আপনারাই আমাদের ডুবাবেন!'

পরিহাসভরা বাক্যটি আমার কানে লাগল। শ্যামলকান্তি মেয়েটি স্মিত মুখে তরুণ বন্ধুর কথা পাল্টা কোনো জবাব না দিয়ে নিজের টেবিলে বোধহয় কাজে চলে গেছেন।

আমি তরুণের বাক্যটি নিয়ে ভাবতে লাগলাম : 'এই আপনারাই আমাদের ডুবাবেন।' কথাটির মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, তরুণীটির তরুণ সহকর্মী বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে মেয়েদের ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করেই উক্তিটি সরস কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন চলছে মেয়েদের রাজত্ব। এ কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। বাংলাদেশে আমাদের অভাবের কোনো অভাব নেই। কিন্তু সম্পদও যে আছে, তাকে স্বীকার করা আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। বেগম খালেদা জিয়া। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দলের এবং আওয়ামী লীগের সংসদীয় নেতা একজন মহিলা। শেখ হাসিনা। তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের বিকল্প প্রধানমন্ত্রী।

ভাবতে গেলে ব্যাপারটা আমাদের জীবনে অভিনব। সমাজ-বিজ্ঞানীগণ বলেন : মানুষের সমাজে এখন চলছে পিতৃতান্ত্রিক শাসন : প্যাট্রিয়ার্কাল ডমিনেশন। কিন্তু আদিতে সমাজের শাসন ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মেয়েরাই সমাজ জীবনের মূল শক্তি। শিশু কিংবা সন্তানের পরিচয়সূত্রই ছিল তার মা। পিতা নয়। তখন বাবা যদি অনিশ্চিত থাকত, তো মা নিশ্চিত ছিল। মাতৃতান্ত্রিক সেই সমাজ কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়েছে। সেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজই এখন চলছে। এখানে পুরুষের রাজত্ব, পুরুষের কর্তৃত্ব। নারীর উপর নরের মাতব্বরী। নারীর উপর নরের নির্যাতন।

কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সেই সমাজ কি দুশো বছর, একশ' বছর, এমন কি পঞ্চাশ বছর পূর্বের, মতো এখনো বহাল আছে? বহাল যে নেই তার প্রমাণ তো বাংলাদেশের সমাজ বিবর্তনেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর তাই বিশ বছর পূর্বেও যা আমরা কল্পনা করতে পারি নি, তাই আজ বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। বাংলাদেশের বিকল্প প্রধানমন্ত্রীও মহিলা। অন্যান্য স্তরের মহিলা রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, অফিস কর্মী, শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা; এদের কথা নাইবা বললাম। আমার ভাবতে অবাক লাগে, যে মুসলিম-প্রধান পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশের আমার কিশোর বয়সে আমার মা-চাচীকে ঘরের বার হতে দেখি নি, জাহাজ স্টীমার মটরে কখনো যাদের উঠানো যায় নি, তাঁদেরই মেয়েরা এবং সেই মেয়েদের এবং ছেলেদের মেয়েরা আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বত্র বিস্তারিত হয়ে পড়ছে।

এ বিপ্লব কেবল যে বাংলাদেশের বিশেষত্ব, এমন নয়। সমগ্র প্রাচ্যেই কিংবা এতদিনকার পিছিয়ে পড়া এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকাতে এই সামাজিক-রাজনৈতিক নবজাগরণ সংঘটিত হচ্ছে। একদিন ইউরোপের যে শিল্পবিকাশ ও চিন্তার উদারতা ও প্রগতিকে আমরা নব জাগরণ বা 'রি নাইস্যান্স' বলে চিহ্নিত করেছিলাম, সেই নবজাগরণ এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সর্বত্র আজ সংঘটিত হচ্ছে। সেই নবজাগরণ থেকে বালাদেশও যে মুক্ত নয়, সেটি আমাদের গর্বের বিষয় হওয়া উচিত।

একদিক দিয়ে দেখলে রাজনীতির এই বিশেষ ঘটনাতে বাংলাদেশের স্থান পৃথিবীর একেবারে শীর্ষে। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, ভারতেও মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা। শ্রীলংকাতেও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন শ্রীমাভো বন্দর নায়েক। নিহত বন্দর নায়েকের পত্নী। ফিলিপিনিতে সাম্প্রতিক কালে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কোরাজন আকিনো। নিহত আকিনোর পত্নী। বার্মাদেশেও ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী হবেন নিশ্চয়ই রাজবন্দীনী মহিলা নেত্রী অং সুচী। আউংসানের কন্যা। কিন্তু প্রাচ্যের কিংবা পৃথিবীর কোথাও প্রধানমন্ত্রী এবং বিকল্প প্রধানমন্ত্রী : উভয়ই মহিলা, এমনটির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। এমনকি গণতন্ত্রের সূতিকাগার যে গ্রেট ব্রিটেন সেখানেও বংশগত রাণী অনেক মিলেছে বটে : রাণী এলিজাবেথ, ১নং ভিক্টোরিয়া, রাণী এলিজাবেথ ২নং। কিন্তু মহিলা প্রধানমন্ত্রী একজনই হয়েছেন এ পর্যন্ত। মার্গ্যারেট থ্যাচার। কিন্তু সেখানেও বিকল্প প্রধানমন্ত্রী মহিলা ছিলেন না। হবেন, এমন আভাসও কেউ দিচ্ছেন না। পৃথিবীর এখন যে 'ইউনি-মোড়ল'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেখানে ডলারের গরম থাকলেও মহিলা নেতৃত্বের গর্ব তাদের নেই। দু একজন উপমহিলা মন্ত্রীকে যদিবা পাওয়া যায় এবং পুরুষ প্রেসিডেন্টের মহিলা পত্নী, কিন্তু মহিলা প্রেসিডেন্ট আসতে : এখনো দিল্লী দূর অস্ত!

কাজেই তলাবিহীন ঝুড়ির দিক থেকে নয়। যথার্থ গর্ব ও গৌরবের দিক থেকে : মহিলা প্রধানমন্ত্রী আর বিকল্প-মহিলা প্রধানমন্ত্রীর দিক থেকে, বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষতম।

তাই বলছিলাম, এককালের পিতৃ-প্রধান সমাজে ভাঙন ধরছে, ভাঙন ধরেছে। আর তার অন্যতম দৃষ্টান্ত বাংলাদেশেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বলে পৃথিবীর এবং বাংলাদেশের তাবৎ নরকুল কি এই বিপ্লবের তাৎপর্য অনুভব করে? নারী ও পুরুষের মিলিত সমাজে এই বিকাশকে কি তারা সকলে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানায়? একথার জবাব ইতিবাচক হলে সমগ্র পৃথিবীতে যথার্থই একটা মনুষ্য-যুগের সূচনা ঘটতে পারত। কিন্তু না, সেকথা বলা চলে না। তাই ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়। তাঁকে হত্যা করে পুরুষকুলেরই অর্বাচীন পুরুষ। পাকিস্তানের মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোকে অপসারণের ষড়যন্ত্র করে পুরুষকুল আকীর্ণ সামরিক-অসামরিক পুরুষকুল। যদিও একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রীকে অযোগ্য বলে অপসারিত করে কেনো সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা দেখাবার ক্ষমতা এই পুরুষকুলের নেই। ফিলিপিনের সাম্প্রতিক নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর বিজয় আসন্ন দেখে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করে পুরুষকুলেরই প্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলাদেশেও সমাজ বিপ্লবের এই দিকটিকে বাংলাদেশের পুরুষকুল যে নির্দ্বিধায় স্বাগত জানাচ্ছে, এমন কথা বলা যায় না। এবং এই বিপ্লবকে অস্বীকার করার উদ্যোগ কেবল যে প্রতিক্রিয়াপন্থী জামায়াত সংগঠনের, এমন কথাও বলা যায় না। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত পুরুষের চেতন-অবচেতনে এখনো বইছে এই সমাজ বিপ্লবকে অস্বীকারের প্রবণতা। আর সেই অবচেতনেরই প্রকাশ ঘটে বান্ধবীর প্রতি তরুণ সহকর্মীর পরিহাসভরা উক্তিতে : 'এই আপনারই আমাদের ডুবাবেন!'

তরুণের এমন পরিহাসভরা উক্তিটিকে একটু গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে আমি নিজের মনে বললাম : ওরা যদি ডুবায়, তার মূল কারণও হবো আমরা, পুরুষেরাই।

২৩.০৫.৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার ঘণ্টার প্যারোলে

২৩-১০-৯২ : শুক্রবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সকাল ৬টায় ওঠা, বাসার ওভারহেড ট্যাঙ্কে পানি তোলা, খবরের কাগজে চোখ বুলানো, ভোরের নাশতা খাওয়া, স্ত্রীর বাজারের স্লিপ হাতে বাসার কাছাকাছি মধুবাগ বাজারে যাওয়া, প্রথমেই ধনে পাতা, বড় ছেলের বাতিক ও হুকুম, নতুন উঠতে শুরু করেছে, দাম বেশি, ২ টাকায় হবে না, সে ভর্তা খাবে, ৩ টাকার ধনে পাতা, কাঁচামরিচ, দাম বাড়ছে, এখন আর হাতের আন্দাজে দেয় না, অন্তত ২ টাকার নিতে হবে, এক টাকার দেয় না, দুদিন আগে ২ টাকার কাঁচা মরিচের চেয়েও বেশি পাওয়া যেত এক টাকায়, দোকানী বলে ৫০ টাকা এক কেজি কাঁচা মরিচের দাম পাইকারী বাজারেই, পান ১ টাকা, সুপারী ৫০ গ্রাম ৫ টাকা, বাসার কাজের মেয়ের দাঁতের মাজন ১৪ টাকা, তেল ১ কেজি ৪০ টাকা, সাবান ২ পিস ১৩ টাকা, ডিমের হালি ১৪ টাকা, হাফ রুটি ৪ টাকা, আটা ১ কেজি ১২ টাকা। বাজার শেষ হলো। বেরুব বাসা থেকে? কিন্তু কাজ তো আরো বাকি। গোসলের আগে বড় ছেলের কাপড় ধোয়া, একটা বিছানার চাদর, ১টা প্যান্ট, ১টা গেঞ্জি, ১টা তোয়ালে, এক পিস ছেঁড়া কাপড়। আমাকেই ধুতে হবে। আর কেউ ধুলে হবে না। ধোয়া হলো। গোসল হলো।

১১টা বেজে গেছে। বেরুব? কোথায় যাব? এখন হয়ত ঘণ্টা চারেকের জন্য পালানো যায় : প্যারোলে 'পরিবার নহে কারাগার' থেকে। কোন্ লেখকের যেন বই, 'পরিবার নহে, কারাগার।' সুন্দর নাম। যুৎসই। কিন্তু 'প্যারোল' কাকে বলে? যে পাঠক সেই ব্রিটিশ রাজ থেকে পাকিস্তান রাজ হয়ে বাংলাদেশি হুকুমতে রাজবন্দী হন নি দীর্ঘদিনের জন্য তিনি 'প্যারোল' শব্দের অর্থ জানবেন না। তা স্বাভাবিক। কারাগারে ফিরে যাবার শর্তে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি। এই হচ্ছে 'প্যারোল'। এমন শব্দেও পাঠক বুঝবেন না। তাঁকে রাজবন্দী হতে হবে। তবু থেকে যাবে একালে, সেকালে তফাৎ। কিন্তু সে আলোচনা থাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিক যথার্থই আমি পালিয়েছিলাম এই কারাগার থেকে। এখন তারই স্মৃতি ঘাঁটন।

শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর। ইচ্ছা হচ্ছিল যাই কাশেমের কাছে। কলেজের বন্ধু কাশেম, ১৯৪২ সালের। কাশেমের ছোট ছেলেটিকে অনেকদিন দেখি নি। নাম বোধ হয় অনু। কিন্তু এমন দুপুরে কারুর বাসায় যাওয়া ঠিক নয়। তাকে বিব্রত করা হবে। যদিও কাশেমের স্ত্রী অত্যন্ত অতিথিবৎসল। মুখে হাসি লেগে থাকে। ...

প্রথমে গেলাম বায়তুল মোকাররমে। সব দোকান, অফিস বন্ধ। রাস্তায় ভীড় কম। একটু হাল্কা লাগে। চলাচল করা যায়। পত্রিকার দোকানে দাঁড়ালাম। অবুঝ বড় ছেলেটির আকর্ষণ রঙীন ছবির পত্রিকার দিকে। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার এলেই বলবে, 'চিত্রালী' নিয়ে এসো। আজকেও বলেছে। তাই প্রথমে খোঁজ করলাম, ২৩ অক্টোবর, শুক্রবারের তারিখ দেওয়া 'চিত্রালী'। অনেক সময় পাওয় যায় না। কিন্তু আজ পাওয়া গেল। তাতেও মন একটু ভালো লাগল। এখানে না পেলে আরো অনেক দোকানে খোঁজ করতে হত। 'ভোরের কাগজ'-এর একটা কপি দরকার। 'সৌজন্য সংখ্যা' হিসাবে একটা কপি তাদের পিয়ন দেয় বটে। কিন্তু মাঝে মাঝেই তার ফাঁক পড়ে। আজ ১১টা পর্যন্ত দেখলাম দেয় নি। 'ভোরের কাগজ' কেনার একটা ঔৎসুক্যও ছিল। দেখি, কয়েকদিন আগে দেওয়া আমার লেখাটি ছেপেছে কিনা। মাসুদ আমাকে বলেছিলেন, শুক্রবারেই ছেপে দেবেন। ড. মাসুদুজ্জামান। তরুণ সাংবাদিক, সাহিত্যিক। 'ভোরের কাগজ' যাঁরা চালান, তাঁদেরই একজন। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার লেখার তদারকী বোধ হয় মাসুদই করেন। আমার কাছ থেকে তাগাদা দিয়ে লেখা আদায় করেন। আমার কোনো লেখাই অবশ্য লেখা নয়। ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। কেউ এ লেখা পড়ে বলে আমার ধারণা হয় না। আসলে এখন এত পত্রিকা : দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, আর তাতে এত লেখা : প্রবন্ধ, রস-রচনা, রাজনীতিক আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে যে কারুর লেখা কেউ পড়ে বলেই আমার মনে হয় না। আমি তো বন্ধু-বান্ধবদের রসিকতা করে বলি : আমার লেখা কেবল আমিই পড়ি। দুবার। কপি কাগজে দেবার আগে একবার। আর কাগজে প্রকাশ হলে আর একবার। দ্বিতীয়বার পড়ি, ছাপা লেখায় কত ভুল মুদ্রণ রয়েছে, তা দেখার জন্য। যারা ছাপে তাদের কাছে লেখা, লেখা নয়। 'কপি'। কলাম মাপে কপি। দরকার যদি হয় তিন কলামের, আর লেখকের লেখা যদি হয় চার কলামের, তবে তাঁরা কাঁচি দিয়ে লেখার আগা-পাছা-কিংবা পেট থেকে এক কলাম কেটে সাইজ করে নেন। তাছাড়া বাক্যে যদি থাকে 'এ কথা আমি বলি নি', তবে ছাপা হবে, 'এ কথা আমি বলি'। 'নি' বাদ পড়ে যাবে নির্ঘাত। কেবল 'নি' বা 'না' নয়। 'হ্যাঁ'ও বাদ যাবে। 'পথিকৃৎ' হবে 'পাঠক'। এবং 'ভিস্তি' হবে ভিডিও'। নিজের মুদ্রিত লেখা নিজে পাঠ করেই আঁতকে উঠি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরে প্রবোধ দিই নিজেকে। এতে চিন্তার কি আছে? কোন পাঠক তো কষ্ট করে আমার লেখা পড়তে পড়তে 'পথিকৃৎ' পর্যন্ত আসবেন না। 'ভিত্তি' পর্যন্তও নয়। তাই লেখা প্রকাশের পরে কেউ ঠাট্টা করেও বলেন না। 'এখন কি ভিডিওর দোকান খুলেছেন?'

'ভোরের কাগজ' খুলে দেখলাম, আমার লেখাটি ছাপা হয়েছে : পুনরায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা'। কিনেই এক নজর দেখে নিলাম। দেখলাম, মোটামুটি পাঠযোগ্য। মারাত্মক কোনো ভুল চোখে পড়ল না। তাতে মনটা বেশ একটু হাল্কা হলো।

ঘড়িতে দেখলাম, প্রায় ১২টা বাজে। 'পরিবার নহে কারাগার।' সেখান থেকে আজ শুক্রবার যদি ঘণ্টা চারেকের মুক্তি পেয়েই থাকি, তবে এত সকালে আবার সেই কারাগারে ফিরে যাওয়া কেন? দরকার হয়তো বায়তুল মোকাররম থেকে হেঁটেই চলে যাব সদরঘাট। বুড়িগঙ্গার তীরে। অনেকদিন যাওয়া হয় নি।

অনেকদিন যাওয়া হয় নি। বুড়িগঙ্গা আমাকে টানে। এখন কি খুব শীর্ণ হয়ে গেছে? কতটুকু পানি আছে? দেখি না গিয়ে। এই দুর্লভ প্যারোলের মুক্তিটুকু ব্যবহার করে। তার আগে মানিব্যাগ খুলে দেখলাম, খুচরো রিকশা ভাড়া নেই। টাকা ভাঙাতে হবে। টাকা ভাঙাতে স্টেডিয়ামের প্রভিনশিয়াল রেস্টুরেন্টে চা খেতে বসলাম।

চা খেয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণের রাস্তা থেকে একটি রিকশায় দর করে উঠলাম। একজন বুড়ো মতো রিকশাওয়ালা। সদরঘাট কত, জিজ্ঞেস করতে বলল : ৬ টাকা। আমি আর বেশি দর করলাম না। দরাদরিতে মেজাজ অনেক সময় কথা, পাল্টাকথায় নষ্ট হয়ে যায়। আজ এখনকার এই হাল্কা আমেজটা আর নষ্ট করতে চাইলাম না। গুলিস্তান-সদরঘাটে রাস্তাও আজ বেশ চলাচলের উপযুক্ত। দুপাশের দোকানপাট সব বন্ধ। রিকশার উপরে রিকশার ধাক্কা, বাস আর টেম্পোর নিচে প্রায় চাপা পড়ার আশঙ্কা আজ নেই। দুপাশের এই শান্ত আর প্রায় নিঃশব্দ দৃশ্য দেখতে দেখতে রিকশায় চড়ে দক্ষিণমুখে এগুতে লাগলাম। দেখলাম গুলিস্তান সিনেমা হলের বিপরীতে রাস্তা আর পার্কের এ দিকটায় বেশ ভাংচুর চলছে। এখানকার রাস্তা আর বাসগুলো থামার জায়গার বোধ হয় পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা আছে। 'রেল লাইন' পার হয়ে? না, 'রেল লাইন পার হওয়া' পুরোন স্মৃতির কথা। এখন রেললাইনের সেই ক্রসিং-এ ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে উত্তর-দক্ষিণ, আর পূর্ব-পশ্চিমের মানুষ আর গাড়ির স্রোত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। নওয়াবপুরে ঢুকতে হাতের ডানে চোখ পড়তে মনে জিজ্ঞাসা এল : কোথায় সেই 'ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্ট'? না, তার কোনো চিহ্ন আজ আর নেই। সেকালে, এমন কি ষাটের দশকেও বোধ হয় ছিল রেস্টুরেন্টটি। তখনকার রাজনৈতিক যুবক, ছাত্র আর সাংবাদিকরা আসতেন চা খেতে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড্ডা দিতে। এখানকার চা পরোটার বেশ সুনাম ছিল। চল্লিশের দশকের সেই ফটোর দোকান 'ডস' কোম্পানিকে আর খুঁজে পেলাম না। দক্ষিণ দিকে যেতে হাতের বাঁয়ে ছিল। সেকালে এটিই ছিল নির্ভরযোগ্য বনেদি ফটো তোলার দোকান। বংশালের 'মানসী' সিনেমার নাম বোধহয় এখনো আছে। বংশালের রাস্তা এসে নওয়াবপুরের সঙ্গে যেখানে মিলেছে, সেখানকার মোড়ে পশ্চিম পাশে ছিল আলবার্ট লাইব্রেরি। প্রবাদকালের 'মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্ত ঢাকার কমিউনিস্ট নেতা গোপাল বসাকের বইএর দোকান। প্রধানত ইংরেজি এবং বিদেশি বইএর দোকান। এখন স্মৃতির কোন অতলে সেই প্রবাদপুরুষ, ছোট্ট-কৃশদেহের গোপাল বসাক এবং কোথায় ঢাকার বামপন্থী সাহিত্যিক রনেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত? এঁদের মিলনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল আলবার্ট লাইব্রেরি। 'এরা, আমাদের, মানে আমি, আব্দুল মতিন, সানাউল হক, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন : এঁদের পূর্বসূরি। আমরা এসে মিলেছিলাম বহমান প্রাণের এই স্রোতের সঙ্গে, চল্লিশের দশকের প্রায় মাঝখানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন চলছে এবং প্রায় শেষ হয়ে আসছে।...

নওয়াবপুরের পুল। সে ছিল ঢাকার হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের সীমানা। '৪৭-এরও আগে। সেই পুলের পশ্চিম পাশে ছিল একটি মসজিদ। সে মসজিদ আছে। কিন্তু সে পুল আর নেই। পুলের নিচের দোলাইখাল এখন লোহালক্কড়ের দোকান ভরতি সড়ক হয়ে গেছে। নওয়াবপুর ব্রিজের উত্তরের এলাকা ছিল হিন্দু প্রধান এবং দক্ষিণের এলাকা রায়সাহেবের বাজার মুসলমান প্রধান। আরো দক্ষিণে ছিল ঢাকা জেলা বোর্ডের মনোহর দোতলা বাংলো। সে দালানটি আছে বটে। কিন্তু আজ তাকে হতশ্রী মনে হচ্ছে। তার আঙিনা থেকেই তৈরি হয়েছে রাস্তা পারাপারের ওভারব্রিজ। রাস্তার ঠিক এই জায়গাটিতে, পূর্ব পার্শ্বে ছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের অফিস আর বইএর দোকান। একটি চারতলা দালানের নিচে। দালানটি এখনো আছে। তেমন মেরামত বা পুনর্গঠন চোখে পড়ল না। হয়ত একদিন ধসে পড়ে আর এক ইতিহাস তৈরি করবে। ইতিহাস ধসে পড়ার ইতিহাস।

একে ছাড়িয়ে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত অব্যাহত সিনেমা হলটিকে পাশ কাটিয়ে এগুতে মনের পাতায় অনেক স্মৃতি ঝলসে উঠল। 'মুকুল' সিনেমা। না, এখন আর 'মুকুল' নয়। এখন সে 'আজাদ'। কিন্তু এই 'মুকুলে' '৪২ সালে আই এ ক্লাশের ছাত্র আমি ঢাকা কলেজের হস্টেল থেকে নিজের সাহিত্য আর আনন্দ-প্রাণ বন্ধুদের নিয়ে শিবরাত্রির ফুল সিরিয়াল দেখেছি। এক সঙ্গে 'মুক্তি', 'দেশের মাটি' আর 'উদয়ের পথে'। এর দক্ষিণ পাশেই 'ওকে' রেস্টুরেন্ট। তারও নাম বদল হয়েছে, কাঠামো আছে। ভিক্টোরিয়া পার্ক এখন বাহাদুর শা পার্ক।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদরঘাট পৌঁছে দেড় টাকার টিকেট কেটে লঞ্চ টারমিনালে ঢুকে পন্টুনের উপর দাঁড়িয়ে দেখলাম : রাতে ছাড়বে যে লঞ্চগুলো, সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে নদীর মাঝে। ঢাকা-চাঁদপুরে যাতায়াতের দুটি বড় লঞ্চ দেখলাম সরবে যাত্রী ডাকছে। একটা দেড়টার দিকে ছেড়ে যাবে। পন্টুনের এ মাথা থেকে ও মাথায় ঘুরে আবার বেরিয়ে এলাম। এখান থেকে পশ্চিমে এগুলো বাদামতলী ঘাট। বরিশাল-খুলনা যাওয়ার রকেট স্টীমার এখনো ওখান থেকে ছাড়ে।

এগুলাম বাদামতলীর দিকে। শুক্রবার। বাদামতলীর ব্যস্ত চালের আড়তগুলো দেখলাম বন্ধ। রাস্তায় তেমন ভীড় নেই। হেঁটে হেঁটে ইসলামপুরের রাস্তায় উঠলাম। ইসলামপুর আর পাটুয়াটুলীর মোড়ে সেই ব্রিজটা আজ কোথায়? এর নিচ দিয়েই দোলাইখাল নয়াবাজার হয়ে বুড়িগঙ্গায় গিয়ে মিলেছিল। এই ব্রিজের গোড়াতেই ছিল সাহিত্যিক কাসেম সাহেবের 'মখদুমী এ্যান্ড আহসান উল্লাহ লাইব্রেরি'। এখন আর সে ব্রিজের চিহ্ন নেই। সমান রাস্তা হয়ে গেছে। মিটফোর্ড কলেজ (সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ) আর হাসপাতালের সামনে দিয়ে এই রাস্তাই চলে গেছে চকবাজার। একটা রিকশা নিলাম। ভাবলাম, পুরোন এলাকার রাস্তা দেখতে দেখতে নিউমার্কেট হয়ে মগবাজারের বাসায় যাব। মিটফোর্ডের সামনের রাস্তায় পড়তেই '৪৩ সালের (১৩৫০ সনের) দুর্ভিক্ষের সেই দৃশ্যটি চোখে ভেসে উঠল : মিটফোর্ডের এই রাস্তায় একটা দোকানের সিঁড়িতে অভুক্ত এক গ্রামবাসী এসে মরে পড়েছিল। হয়ত দুদিন যাবৎ পড়ে ছিল। কেউ সরায় নি। এখন আর সে লাশ নেই। তবু সেদিনকার ক্ষুধা আর দারিদ্র্য ব্যাপকতর হওয়া ছাড়া হ্রাস পেয়েছে, এমন তো বলা যায় না।

চক ছাড়িয়ে রিকশায় চড়ে ঢাকা জেলের পশ্চিম পাশ দিয়ে লালবাগের দিকে এগুতে রাস্তার নাম খোঁজ করতে দেখলাম : রাস্তার নাম হরনাথ ঘোষ রোড। কে ছিলেন এই হরনাথ ঘোষ? বিশের কিংবা ত্রিশের দশকের ঢাকার। ঢাকা শহরের। নিশ্চয়ই কোনো মান্যবর ব্যক্তি যাঁর নামে একটি রাস্তা হয়েছে। সে রাস্তার নামটি এখনো চালু আছে। কিন্তু তাঁর পরিচয় আমি কিংবা আমাদের ছেলেমেয়েরো, নতুন যুগের মানুষেরা কিছু জানে না। না জানাই স্বাভাবিক। রাস্তার নামের সঙ্গে হরনাথ ঘোষের জীবনী লেখা নেই। কিন্তু হরনাথ ঘোষের জীবনী তো নতুন যুগের গবেষকদের গবেষণা করে লেখা উচিত, জানা উচিত। বিশেষ করে হরনাথ ঘোষ, মদনমোহন বসাক রোডের মদনমোহন বসাক, এঁদের নাম, যারা সম্প্রদায়গতভাবেই ক্রমান্বয়ে ঢাকার শহর-জীবন থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ...

লালবাগ ছাড়িয়ে 'আজাদ' অফিসের পেছনে চওড়া রাস্তায় পড়তে নতুন শহরের আভাস পেলাম। শহরের চওড়া রাস্তায় কিছুটা নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। এ কথা ঠিক। বিশেষ করে ছুটির দিনে। যানবাহন আর মানুষের কিছুটা অল্প চলাচলের কারণে। তবু ছুটির দিনেও আমার ভালো লাগে নতুন শহরের চাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোন শহর। পুরোন গলি। তার সঙ্গেই নিজের জীবনের একটা আত্মীয়তার আবেগ যেন বোধ করি।

'পরিবার নহে, কারাগারের' দরজায় এসে হাতের ঘড়িতে সময় দেখলাম। ভয়, পাছে না সময় পার হয়ে গিয়ে থাকে। দেখলাম, না, সময় একবারে পার হয়ে যায় নি। তবু গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে কোন ধমক-ধামকই যে খাবো না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ...

মন্দ লাগল না, বহুদিন পরে 'প্যারোলের' এই কয়েকটি ঘণ্টা।

২৫.১০.৯২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ববঙ্গ : বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের বামপন্থী সমাজতন্ত্রী চিন্তার উদ্ভব এবং বিকাশের প্রসঙ্গ

(সম্প্রসারণ সাপেক্ষ কতিপয় কথা)

১. শিরোনামের কৈফিয়ত

'মুসলিম সমাজ' কথাটি এখনো বেশ চালু। অথচ 'মুসলিম সমাজের' বরাবরে যদি হিন্দুধর্মের কেউ বাংলার শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতির বিকাশে পরিচয়দানে 'হিন্দু সমাজে সাহিত্যের বিকাশ', 'হিন্দু সমাজে রাজনীতির বিকাশ', 'হিন্দু সমাজে বামপন্থী চিন্তার বিকাশ' কথা ব্যবহার করেন, তবে 'মুসলিম' শব্দের অতি-ব্যবহারকারীরাই আপত্তি তোলেন। একে সাম্প্রদায়িক বলে অভিযোগ তোলেন।

আমার শিরোনামের কথাটি যদি বলা যেত : 'পূর্ববঙ্গে বামপন্থী চিন্তার বিকাশ', তাহলে ভৌগোলিকভাবে এবং অধিবাসীদের সমগ্রের বিবেচনামূলক হিসেবে, কথাটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হতো। কিন্তু তেমন সামগ্রিক আলোচনা এ-পর্যন্ত যেমন সম্পাদিত হয় নি, তেমনি তা আমার সাধ্যের অতীত।

পাদটীকা : ৪.১১.৮৫ তারিখে সমাজে নিরীক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজিত সভায় আলোচনাটি উপস্থাপনার শুরুতে শ্রোতাদের উদ্দেশে সম্ভাষণমূলক বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ :

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক, প্রীতিভাজন ড. বোরহান, আজকের আলোচনার সভাপতি প্রীতিভাজন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী :

যে বিষয়ে এবং বিষাদময় পরিস্থিতিতে আমরা এখানে সমবেত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন পরিস্থিতিতে হালকা করে কথা বলা যায় না। তবু একটু ভণিতা না করলে আমি স্বস্তি পাচ্ছিনে। সে ভণিতা অক্ষমতার কারণে। তবু দায়িত্ব বা করণীয় থেকে অব্যাহতি পেতে মন চায় না। সাধ্যমত দায়িত্বপালনের চেষ্টার প্রতি কিছুটা আনুগত্য বোধ। সেই বোধ থেকেই এ-ভূমিকায় দণ্ডিত এবং দণ্ডায়মান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য একদিক দিয়ে দেখলে, 'পূর্ববঙ্গ' কথাটিও অনেকখানি কৃত্রিম :

পূর্ববঙ্গকে অন্তর্গত হতে হয় 'বঙ্গের'। কাজেই পূর্ববঙ্গ কথাটি যেমন আংশিক, 'মুসলিম সমাজ' কথাটি তার চাইতেও বেশি আংশিক এবং সাম্প্রদায়িক। এমন দিন অবশ্যই আসবে, যেদিন আর এমন আংশিক এবং সাম্প্রদায়িক শব্দের অতি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে না।

২. 'পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ' বললে এর বরাবর পূর্ব-বঙ্গের হিন্দু সমাজ, পূর্ব-বঙ্গের বৌদ্ধ সমাজ, পূর্ব-বঙ্গের খ্রিস্ট সমাজ কথাগুলো আসে। ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে বাঙালিদের এরূপ অস্তিত্ব বহুকালীয় হলেও, এর বিভাগমূলক আলোচনা আধুনিক। প্রধান ইংরেজ-শাসন পত্তনের পরের, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতকের।

৩. একটি সমগ্র বিভিন্ন অংশ বা উপাদান দিয়ে তৈরি। সমগ্র এবং উপাদান, উভয়ের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, বিবর্তনকে উপলব্ধির জন্য যেমন প্রয়োজন সমগ্রকে উপাদানে বিশ্লেষণ এবং উপাদানের আত্যন্তিক বিবেচনা, তেমনি প্রয়োজন উপাদানসমূহকে নিয়ে যে-সমগ্র, সেই সমগ্রের আলোচনা।

আধুনিক আলোচনাদির পরিভাষার একটি শব্দ হচ্ছে 'ম্যাক্রোস্টাডি বা বৃহৎ অধ্যয়ন : অপরটি 'মাইক্রোস্টাডি' বা অণু-অধ্যয়ন'। বঙ্গ সমাজ হচ্ছে 'ম্যাক্রো'। তার তাঁতি, জেলে, কামার-কুমার, কৃষক, শ্রমিক হচ্ছে তাঁর 'মাইক্রো'। কিন্তু যে পেশার উল্লেখ করলাম, কেবল সেই পেশাগত বিবেচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকা যায় না। ধর্মীয় বিশ্বাসগত 'মাইক্রো'র অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, এরাও বঙ্গ সমাজের মাইক্রো। এমন মাইক্রোর বৈশিষ্ট্যের বিচার-বিবেচনারও প্রয়োজন। কিন্তু 'ম্যাক্রো-মাইক্রো'র দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিষয়টি খেয়ালে না রাখতে পারলে উভয় বিবেচনাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যে-শিরোনাম বিজ্ঞাপিত হয়েছে, সে-শিরোনামের দায়িত্ব সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রের বা ড. বোরহানের নয়। তাঁরা আমার প্রতি তাঁদের প্রীতি থেকে বলেছেন : আপনি যা বলতে চান, তাই বলুন। কিন্তু তেমনভাবে দেখলে, 'আমার বলার কথা' বলে কিছু বলা যায় না। তেমন পণ্ডিত, তাত্ত্বিক কিংবা বক্তা আমি নই। বিনয়ের সাথে বলা যায় কিছু জানাবার কথা। যদি এমন কোনো ঘটনা আমি দেখে থাকি, বয়সের কারণে, যা আমার বয়োকনিষ্ঠ, তরুণ তথা বর্তমান প্রজন্মে বন্ধু এবং সমাজ প্রগতির কর্মীরা দেখেন নি এবং তাঁরা যদি কেউ হুকুম করেন : আপনি বলুন সেই ঘটনার কথা, তখন সে-ঘটনাকে জানাবার দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। যথাসাধ্য তাকে জানাবার চেষ্টা করতে হয়।

কিছুটা লিখিত আকারে খসড়া করা হয়েছে। ড. বোরহানের প্রতিক্রিয়া ছিল : অল্প হয়েছে, হ্রস্ব হয়েছে, দীর্ঘ করুন। আমি বলেছিলাম, দীর্ঘ করার দায়িত্ব তো বক্তাদের, আলোচক এবং শ্রোতাদের। তেমন আলোচনা আজকের সীমাবদ্ধতায় হয়তো সম্ভব হবে না। তাতেই আমার দুঃখ। তবু এ-শুধু খসড়া, প্রস্তাবনা। সম্প্রসারণের দায়িত্ব আপনাদের। আমার অনুরোধ থাকবে, আনুষ্ঠানিকতার বাইরে, পথে-ঘাটে যেখানে আমাকে পান, বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করে আমাকে উপকৃত করবেন।

এবার শিরোনামে আসি : 'পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বামপন্থী-সমাজতন্ত্রী চিন্তার উদ্ভব এবং বিকাশের প্রসঙ্গ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাক্রোর মধ্যে মাইক্রো : এবং মাইক্রো দিয়েই ম্যাক্রো। সমগ্রের মধ্যেই অংশ। এবং অংশ দিয়েই সমগ্র।

৪. একটি বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটিকে অধিকাংশ সময়েই আমরা বিস্মৃত হই।

৫. উনবিংশ শতকে বঙ্গ সমাজের যে চিন্তাবিদরা, সাহিত্যিকরা সমগ্র হিসেবে কথা বললেন, তাঁরা তার সব মাইক্রোকে চিনতেন না, জানতেন না। জানা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দৈহিকভাবে তাঁরা একটি 'মাইক্রো'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশেষ অংশভুক্ত ছিলেন। বঙ্গ সমাজের এই অংশগুলোর এটি আর এক বৈশিষ্ট্য যে সে কেবল জমিদার কিংবা কৃষক নয়। সে হিন্দু কিংবা মুসলমানও বটে।

পেশা বা জীবিকাগত এই বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় বিশ্বাস বা সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এক জটিল অস্তিত্ব বঙ্গদেশ এবং ভারতের বুকে তৈরি করেছিল। এই দ্বান্দ্বিক জটিলতা পূর্বে তত প্রকাশিত হয় নি। সেটি যেমন একটি উত্তম কথা বটে, তেমনি এ-সত্যেরও স্মারক যে পূর্বকালের ম্যাক্রো এবং মাইক্রো আধুনিককালের মতো তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল ছিল না। একথা অবশ্য কাল হিসেবে দেশ নির্বিশেষে সকল দেশের পক্ষেই সত্য। সে-কাল, এ-কালের মতো ক্রিয়াশীল ও জটিল ছিল না।

৬. উনবিংশ শতকের চিন্তা-নায়কদের সীমাবদ্ধগত ক্ষমতার ভিত্তিতে বঙ্গ সমাজের সীমাবদ্ধ সমগ্র-বিচার থেকেই বঙ্গ-সমাজের অন্যতম অপর অংশ বা উপাদান, মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত চিন্তাবিদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 'মাইক্রো' দৃষ্টিভঙ্গি তথা সাম্প্রদায়িক বিচার-বোধ তীব্রতা লাভ করে।

সম্প্রদায়ের বিচার অহেতুক নয়। এ-বিচার আবশ্যকীয় এবং অপরিহার্য। সম্প্রদায়গত বিচার-বিশ্লেষণ মাত্রই সাম্প্রদায়িক নয়। আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সম্প্রদায়ের সেই বিচার আংশিক, তথা সাম্প্রদায়িক, যে-বিচার সমগ্রের সঙ্গে তার অনিবার্য সম্পর্ককে বিস্মৃত হয়। রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের যুক্তিগত একটা ভিত্তি এই ছিল যে সে আন্দোলনে অংশের বিচারের একটি দিক ছিল। কিন্তু সে-বিচার সাম্প্রদায়িক তথা আংশিকতায় পর্যবসিত হলো তখন, যখন তার সঙ্গে সমগ্রের সম্পর্কটাকে বিকৃত করা হলো। অংশকেই সমগ্র ভাবা হলো।

৭. এমন আংশিক এবং সাম্প্রদায়িক বিবেচনার যবনিকাপাত ভৌগোলিক ভারত-ভূখণ্ডে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই ঘটে নি। আজকের আসামের 'বাঙাল খেদা' আন্দোলন, শিখিস্তানের আন্দোলন সবই মাইক্রো বিবেচনার সেই প্রকাশ। অধিকতার দোষে পাকিস্তান আন্দোলনের মতোই দুষ্ট।

৮. কিন্তু জীবনের কৌতুকজনক শিক্ষা এই যে আধিক্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যতীত, অধিকতার ক্ষতিকে রোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা বাদে 'পাকিস্তানত্বের' ক্ষতিকে ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯. কিন্তু পরবর্তীকালের এমন উপলব্ধিও আকস্মিকভাবে ঘটে নি। বীজ বাদে বৃক্ষ তৈরি হয় না। বুদ্ধি দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের যাঁরা সেদিন অংশের সঙ্গে সমগ্রকে মিলিয়ে চিন্তা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাঁদের সে প্রয়াস পরবর্তীকালের মোহমুক্তি এবং 'অংশের' বিকারকে অতিক্রম করার ব্যাপক প্রয়াস, আন্দোলন এবং সংগ্রামের সূচনা, তথা ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

১০. ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের মাত্র আট মাস পরে ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে, জিন্নাহ-বিরোধী বিক্ষোভের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে পূর্ববঙ্গের অতীতকালের ব্রিটিশ-বিরোধী জঙ্গি সংগ্রামের ঐতিহ্য যেমন (উনিশ শত বিশ শতকের রাজনৈতিক সশস্ত্র সংঘর্ষ, অনুশীলন, যুগান্তর পার্টির কার্যক্রম, ১৯০৫-এর তমিজউদ্দীন খান, আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী, ১৯৩০-এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ, রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামান নির্বাসন—১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৫-৪৬-এর নৌ-বিদ্রোহ, রশীদ আলী দিবস—দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলন, তে-ভাগা সংগ্রাম), তেমনি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী চিন্তার উদ্ভব এবং বিকাশ।

১১. পূর্ববঙ্গের যে-মুসলিম সমাজে বামপন্থী চিন্তার উদ্ভবকে গুরুত্বপূর্ণ বলা হচ্ছে, সে-মুসলিম সমাজ আদতে কৃষক সমাজ : কৃষক সমাজ থেকে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত সমাজ।

১২. অর্থনৈতিকভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজকেও নানা স্তরে বিভক্ত করা যায়। এমনভাবে সে বিভক্ত ছিল, জমিদার এবং বংশগৌরবে 'অভিজাত' মুসলিম সমাজ, কৃষক মুসলিম সমাজ।

অভিজাত বা উচ্চতর মুসলিম সমাজের বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের নাম আমরা উনিশের শেষে এবং বিশের গোড়াতে পেয়েছি : জাস্টিস আমির আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ, মীর মশাররফ হোসেন। এমন কি জননেতা এ কে ফজলুল হক। তিনিও কৃষক সমাজ-উদ্ভূত নন। তাঁর পরিবারও ছিল উচ্চস্তরের। এই সকল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিকের কর্মকাণ্ড দেশের সামাজিক বিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এঁদের অনেকের কথার লক্ষ্য ছিল, মুসলমান সমাজকে উন্নত করে তোলা। কিন্তু এঁদের চিন্তার মধ্যে মুসলমান সমাজের মধ্যেও যে-শ্রেণীগত বিভিন্ন স্তর রয়েছে, এবং এই স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক যে-মৈত্রীর নয়, মূলত বৈরীর এবং জীবিকার ক্ষেত্রে সংগ্রামের, এই চেতনার ওপর জোর প্রদানের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতো না। মুসলমান সমাজের মধ্যেও যে-মুসলমান জমিদার আছে, মুসলমান জোতদার আছে এবং মুসলমান কৃষকের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ধর্মের ঐক্য থাকলেও যে-জীবিকার স্বার্থের ঐক্য ছিল না, এই বিশ্লেষণ সে-কালের মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে ছিল না। তাঁরা মুসলমান সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়কে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই চেতনার বিকাশ সাম্প্রদায়িক পথে প্রকাশিত হয়েছিল। ধর্মনির্বিশেষে জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের উন্নতির কথা তাঁরা বলেন নি। হিন্দুদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে মুসলমানদের উন্নতির কথা বলেছেন। ভারত ভূখণ্ড নানা ধর্মের মিলন-ভূমি হওয়ার এই একটি কুফল কালে কালে প্রকাশিত হয়েছে যে এখানে মানুষের মূল যে-সমস্যা : বাঁচার সমস্যা, জীবিকার সমস্যা—সে সমস্যার বিচার আর্থিক শ্রেণীগতভাবে গোড়াতে সম্ভব হয় নি। সে-বিচার ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তাকে জটিল এবং দুর্বল করেছে। ধর্মে ধর্মে পাল্টাপাল্টি হয়েছে। সমস্বার্থের লোক সমস্বার্থের মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সমগ্র ভারতের গণ-আন্দোলনের বিকাশে এই জটিলতা এবং দুর্বলতার অবসান আজো ঘটে নি।

১৩. ইংরেজি শিক্ষিত, ইংরেজ সরকারের 'রাইটার্স বিডিং'-এ কর্মরত চাকরিজীবী এবং আইন-আদালতে আইনের পেশাজীবী, জজ ব্যারিস্টার উকিল, শিক্ষক, সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত। প্রধানত হিন্দু মধ্যবিত্ত। এই হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যেই উনিশের গোড়া এবং মধ্যভাগ থেকে আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিগত চিন্তা-ভাবনার সূচনা ঘটে।

১৪. কিন্তু বাংলার প্রধান যে-সমাজ—কৃষক সমাজ এবং পূর্ব-বঙ্গের যে-প্রধান সমাজ-প্রধানত মুসলমান, সেই মুসলমান কৃষক সমাজের মধ্য থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্ভব বর্তমান তথা বিংশ শতকের ত্রিশের দশকের পূর্বে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটে নি। 'মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত'—এই কথাটির প্রচলন ঘটেছে হয়তো চল্লিশের দশকে।

১৫. একথা ঠিক যে, পূর্ববঙ্গের কৃষক তথা মুসলিম কৃষক সমাজ সামাজিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্যবিহীন সমাজ নয়। উনিশ শতকের ধর্মীয় আন্দোলনগুলোরও একটা অর্থনৈতিক তাৎপর্য ছিল। তাছাড়া নীলকর এবং জমিদারদের শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংখ্যাহীন ছোট-বড় আন্দোলন, এমনকি বিদ্রোহের কাহিনী দিয়ে সে ইতিহাস পূর্ণ। তবু আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দর্শন, তার বিশ্লেষণ এবং সমাজবাদী সমাজ তৈরির জন্য বিপ্লবের কথা উচ্চারণ করেছে এই কৃষক সমাজ থেকে পরবর্তীকালে উদ্ভূত শিক্ষিত কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, কেরানি, কর্মচারী, উকিল, ব্যারিস্টার, তথা মুসলিম মধ্যবিত্ত : ত্রিশ এবং চল্লিশের দশক থেকে।

১৬. কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থী বলতে যে জঙ্গি ইংরেজি-বিরোধী মনোভাব এবং আন্দোলনকে বোঝায় এবং সমাজতন্ত্র বলতে যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝায়, তার সমর্থন ও আন্দোলন ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে মুসলিম এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত—ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, ব্যবসায়ীদের প্রধান আন্দোলন ছিল না। তাদের প্রধান আন্দোলন ছিল : পাকিস্তান আন্দোলন।

১৭. সেই ব্যাপক পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতেই মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যে পূর্ববঙ্গে জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রী চিন্তার প্রকাশ যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের চিন্তা বাংলাদেশের পরবর্তী বিকাশের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যের বিষয় বলে বোধহয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮. এই পর্যায়ে ব্যাপারটির আর একটু আলোচনার চেষ্টা করা যাক।

যে-শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে এই শতকের বিশের দশক থেকেই বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রী চিন্তার সূচনা ঘটে, তাদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে এদের অধিকাংশের পিতা-পিতামহ হয় ছোটখাট জমিদার ব্যবসায়ী, কিংবা সরকারি কর্মচারী, উকিল, ব্যারিস্টার বা শিক্ষক। অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের বামপন্থী এই মধ্যবিত্ত আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার দ্বিতীয় পুরুষ। এই মধ্যবিত্তের মধ্য থেকেই বিশেষ এবং ত্রিশের বাংলা সাহিত্যের তরুণতর স্রষ্টারা উদ্ভূত হয়েছেন : বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেন, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি বোধহয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখ। এঁদের কারুর পারিবারিক পরিচয় যে আমার জানা আছে, তা নয়। তবু এমনটিই আমার ধারণা। এ-ধারণার সত্যাসত্য নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে এই চিন্তা থেকে যে, শিক্ষিত দ্বিতীয় পুরুষ হিন্দু মধ্যবিত্ত এমন একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত পরিবেশে বিকাশ লাভ করেছিল, যে-পরিবেশ মুসলিম সমাজে এই সময়ে বিদ্যমান ছিল না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই পরিবেশের কারণে এই হিন্দু মধ্যবিত্ত সাহিত্য-সংস্কৃতি-কর্মীদের প্রকাশ অনেক পরিশীলিত ছিল। তাদের চিন্তার দিগন্ত উনবিংশের শেষ কিংবা বিংশের গোড়ার চাইতেও অধিক বিশ্বব্যাপী বিস্তারিত ছিল। বিশের দশকে তারা সোভিয়েত বিপ্লবের খবর মুসলিম সমাজের চাইতে অধিকতর সহজভাবে লাভ করেছে। ১৯২৯-৩০-এ রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' এই মধ্যবিত্তদেরই মন প্রথমে জয় করেছে। অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ—এঁদের কাছ থেকে সহজেই এসেছে গরিব-দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতিশীল কথা। তথাপি এই সঙ্গে এ-কথাটিও হয়তো স্মরণীয় যে, এঁরা কেউ না শ্রমিকের সন্তান (শ্রমিকের সন্তান এখন পর্যন্ত আমরা কেউ নই), না কৃষকের সন্তান। জীবনের তলদেশের মানুষের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক তাদের দুই পুরুষ আগেই ছিন্ন হয়েছে। ফলে তাদের সাহিত্যের রচনাশৈলীর পারিপাট্যের যতো সাক্ষাৎ মেলে, ততো নির্বিত্তদের জন্মগত আবেগের নয়।

কবি নজরুল ইসলামের জীবন এক অপার বিস্ময় ভরা জীবন। তাঁকে বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমার নেই। এবং নজরুল পূর্ববঙ্গে জাত নন। কিন্তু তাঁর পারিবারিক পটভূমির সঙ্গে তাঁর জীবনের আবেগের দিকটি কি সম্পর্কশূন্য? এবং তাঁর সুহৃদ, সহযোগী, সাথী অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—এঁদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পারিবারিক পটভূমি কি নজরুলের পটভূমির বরাবর তুলনামূলকভাবে আলোচনার যোগ্য ব্যাপার নয়?

মুসলিম সমাজ থেকে, এমনকি পাকিস্তান আন্দোলনের বৃত্তের মধ্যেও, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশের দশকেও যে-মুসলিম তরুণ স্কুল-কলেজে এসে লেখাপড়া শিখেছে, ঢাকা, চাটগাঁ, রাজশাহী শহরে এসেছে এবং এখানে এসে ভাষা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে মিটিং-মিছিল করেছে, পুলিশের গুলিবর্ষণে জীবন দান করেছে, সেই মুসলমান শিক্ষিত তরুণদের অধিকাংশ সাক্ষাৎ কৃষকের সন্তান : সে কৃষক উচ্চ, মধ্য কিংবা নিম্ন, যে পর্যায়েরই হোক। মোটকথা, পূর্ববঙ্গের এই শিক্ষিত তরুণ সমাজের সঙ্গে মাটির যোগটি তখনো ছিন্ন হয় নি। এদের অধিকাংশই আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের বংশের দ্বিতীয় পুরুষ নয়। প্রথম পুরুষ। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নয়। 'গেঁয়ো' মধ্যবিত্ত। এ বৈশিষ্ট্যটির নিশ্চয়ই ভালো-মন্দ—উভয় দিকেরই তাৎপর্য রয়েছে। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের কিশোর আর তরুণের পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনা পঞ্চাশের দশকে যে-শুধু ঢাকা শহরে সীমাবদ্ধ থাকে না, সে-যে সারা পূর্ব-বঙ্গের কৃষক সমাজের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের তরঙ্গ তোলে : এবং তার কারণ যে এই ছাত্রদের সঙ্গে তাদের কৃষক পিতার সাক্ষাৎ সম্পর্ক : এ-কথাটি স্মরণীয়। আবার সেই পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশকের মধ্যে পূর্ববঙ্গের এই শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে-একটি নিজস্ব শ্রেণী-স্বার্থসম্পন্ন ব্যবসায়ী, কেরানি, কর্মচারী, শিক্ষকের শ্রেণীতে পরিণত হয়ে পূর্ববাংলার কৃষক এবং তার জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বিতীয় পুরুষে পরিণত হয়েছে এবং সেরূপ বিকাশের কারণে আশির দশকে শহরের মধ্যবিত্তের কোনো ঘটনা যে-পঞ্চাশের দশকের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশের কৃষক এবং শ্রমিকের জাতীয় আবেগময় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে না, এ-সত্যটিও লক্ষণীয়।

কিন্তু ব্যাপারটির এ-কেবল উল্লেখ : পূর্ববঙ্গের কৃষক সমাজ থেকে উদ্ভূত মধ্যবিত্তের গোড়াকার বৈশিষ্ট্য এবং তার পরবর্তী বিকাশের উল্লেখ। ব্যাপারটির একটু আত্যন্তিক আলোচনার প্রয়োজন এবং গুরুত্ব যে-রয়েছে, সে-কথাটি বলার জন্যই এর অবতারণা। এর ইতিহাস দান গবেষণাসাপেক্ষ। আমার নিজের সাধ্যের ঊর্ধ্বে। সামজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রের মতো উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।*

১৯. আমি শুধু এ-আলোচনার উপান্তে আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশের একটি রেখাচিত্র, তথা 'আউট লাইন' পেশ করে একটি প্রস্তাবের ভূমিকামূলক এই আলোচনাটি শেষ করতে চাই। আজকালকার সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ভাষাতে এটিকে একটি 'কেস স্টাডি' তথা 'নমুনা দৃষ্টান্ত' বলে অভিহিত করা চলে। এই নমুনা যে-আদর্শ, তেমন কোনো কথা নয়। তবে এর কিছুটা যুগগত বৈশিষ্ট্য থাকা সম্ভব। সহযোগী সমাজবিদরা তার আলোচনা করবেন। এ-কালের এমন দৃষ্টান্তের অন্বেষণ, আহরণ এবং জ্ঞানের আবশ্যক হবে। একের সঙ্গে অপরের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য মিলিয়ে মোট সিদ্ধান্ত টানতে হবে।

* বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত এই আলোচনাটির রচনা ও প্রকাশকাল ১৯৮৫ হলেও বাংলাদেশের 'পাকিস্তানগত' পর্যায়টির কোনো বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনার অন্তর্গত নয়।—লেখক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০. আত্মজীবনীমূলক কিছু কথা—এই অংশটিতে প্রথমে যা বলা আবশ্যক, তা হচ্ছে এই যে, কেসটির বর্ণনায় 'উত্তম পুরুষ' ব্যবহৃত হলেও বস্তুত এ-আলোচনায় শ্রোতাদের মতো আমিও এর 'উত্তম পুরুষ', 'উত্তম পুরুষ' নই। এর কোনো সত্যকে স্বীকার-অস্বীকারের স্বাধীনতা আমার নেই। উত্তম পুরুষরূপে বর্ণনার শুধু এই অজুহাত যে, কেসটি সম্পর্কে আমি কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে জ্ঞাত। আর কিছু নয়।

একটি গরিব কৃষক পরিবার। বাবা নিজে গরিব কৃষক। বছরের পুরো খোরাক হয় কি, হয় না। গরিব কৃষক বাবা তার বড় ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়েছেন। মাদরাসায় নয়। হয়তো দশের দশকের মধ্যভাগের কথা। ষাট-সত্তর বছর আগের কথা। বড় ছেলের লেখাপড়ার নানা প্রকার উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা এসেছে হিন্দু ছোট জমিদার বা মধ্যবিত্ত নিকটবর্তী পরিবারসমূহের কাছ থেকে। ১৯২৯-৩০ সালে বড় ছেলে মুসলমান হিসেবে কিছুটা সাম্প্রদায়িক আনুকূল্যে একটি সরকারি চাকরি লাভ করেছে।

আমার বড় ভাইয়ের কথা বলছি। ধর্মভীরু মানুষ। চাকরি জীবনে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। নিজে ধর্মভীরু এবং সৎ বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন। হিন্দু পরিবারে পুত্রবৎ স্নেহ-প্রীতি লাভ করেছেন। আবার মুসলমান বলে চাকরি জীবনে কোনো কোনো সময়ে বিরূপ অভিজ্ঞতাও ভোগ করেছেন। ক্রমে রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাবে হিন্দুকে প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মুসলমানদের অধোগতির কারণ বলে মনে করেছেন। চল্লিশের দশক, বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপকতার কালে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছেন। ভাইদের মধ্যে একটি ভাই উল্টো ভাব-ভাবনায় আকৃষ্ট হচ্ছে দেখে উদ্বেগ বোধ করেছেন, তাকে মুসলমানদের 'দুশমন' বলে আখ্যায়িত করেছেন, তবু, স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেন নি। তাকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব পালন করেছেন।

এই বড় ভাইয়ের চরিত্রটিকে আর একটু উজ্জ্বল করা যাক।

১৯৩৪-৩৫ সালের সেই ছবিটি এখনো আমার চোখের ওপর ভাসছে। একটি গ্রামের ছবি। রহমতপুর। বরিশাল শহর থেকে মাইল আটেক পশ্চিমে। রহমতপুরের মধ্য দিয়ে গেছে 'রাজার বেড়' বা রাজার খাল। সেই উপকথার চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের পানসি নিয়ে ভ্রমণের নাকি ক্ষুদ্র পরিসর কিন্তু খরস্রোতা নদী ছিল একদিন। তারই পশ্চিম তীরে রহমতপুরের প্রায় ক্ষয়িষ্ণু একটি হিন্দু জমিদারবাড়ি। বাড়ির সামনে বাজার। বাড়ির দরজায় আটচালা টিনের ঘর। পুজোর সময়ে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। যাত্রা কিংবা কবির লড়াইয়ের আয়োজন হয়। অদূরে একটি হাই স্কুল। আমি সেই হাই স্কুলে পড়ি। বড় ভাই রহমতপুরের সাব-রেজিস্ট্রার।

বড় ভাই সেই তাঁর ছাত্রকাল থেকেই আচার-আচরণ-বিশ্বাসে ধার্মিক। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ। পাঁচওয়াক্ত নামায পড়েন। কিন্তু কেমন করে তাঁর ঘনিষ্ঠতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল এই হিন্দু জমিদার পরিবারটির সঙ্গে, তা বলা শক্ত। স্থানীয়ভাবে মান্য অফিসার। ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক এবং স্মিতমুখ আলাপী। এলাকার সব কিছুতে থাকেন।

জমিদারের নাম কালুবাবু। তাঁদের বয়স্ক কোনো পুত্রের অকাল বিয়োগ ঘটেছে হয়তো। বড় ভাই হয়তো গেছেন শোক প্রকাশ করতে। আমার বড় ভাইকে দেখে শোকাহত মা বলে উঠেছেন : বাবা, তুমিই আমার হারানো পুত্র। ভাই কালুবাবুর স্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে উঠেছেন। আপনি আমার মা।

তখন থেকেই যাতায়াত। ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু যে-কথা বলতে এই বিবরণ, সেই দৃশ্যটির কথা বলি। হিন্দু মধ্যবিত্তের বাড়ি। অন্য সময়ের কথা জানিনে। কিন্তু সন্ধ্যায় কাঁসর ঘণ্টা বেজে ওঠে। সন্ধ্যা আহ্নিকের আয়োজন হয়। কিন্তু কেবল সন্ধ্যা অহ্নিকের নয়। কালুবাবুর ধর্মভীরু 'মুসলমান পুত্র' যখন বিকেলে যান সে বাড়িতে বেড়াতে এবং যখন সূর্য-অস্তে তাঁরও মাগরেবের নামাযের সময় হয়ে আসে, তখন সে পুত্র বিনা আড়ম্বরে মাকে ডেকে বলে, 'মা আপনার ধোয়া কাপড়খানি দিন। সেখানি বিছিয়ে আমি নামায পড়বো।' এবং সত্যিই তাই। পাশের ঘরটি হয়তো সন্ধ্যা আহ্নিকের। এ-পাশের ঘরে আমার বড় ভাই তাঁর হিন্দু জননীর সোডায় কাচা শুভ্র কাপড়খানি ভাঁজ করে জায়নামায করে বিছিয়ে তাতে নিজের বিশ্বাসের নামাযটি আদায় করেন।

কতো বিপর্যয় বয়ে গেল জীবনে। সে হিন্দু বাড়ি এবং এমন কতো গ্রাম-পাড়া দেশ-ভাগের আবেগে, উত্তেজনায় পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪-তে পৌঁছে আবেগের বশে কালুবাবুর সেই বাড়ির অন্বেষণে গিয়ে শুধু জনশূন্য এবং বাড়িঘরের আভাসশূন্য উঁচু-নিচু কিছু ভিটের সাক্ষাৎ পাই। এতো যে উত্থান-পতন, তবু স্মৃতিপটে এই দৃশ্যটির লোপ ঘটলো না। বড় ভাইয়ের কতো পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু আজো যখন তাঁকে তাঁর যৌবনের সেই পরিবেশটির কথা বলি, তখন তাঁরও চোখের পাতা আবেগে সিক্ত হয়ে ওঠে।

সেই কিশোরকালের পরিবেশটির কথা বলার জন্যই ছবিটির উল্লেখ।

এই ভাইয়ের অভিভাবকত্বে আমার কিশোরকাল কেটেছে। ভাইয়ের চাকরিস্থলে ১৯৩৫-এ রাজা পঞ্চম জর্জের রজত জুবিলি উৎসব পালন করেছি। চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠকালে। তখনো স্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা শতে ৫ কিংবা ১০। হিন্দু কিশোর বন্ধুদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কের আভাস পেয়েছি। সহপাঠীর কাছ থেকে শুনেছি তার ভাই 'ডেটিনিউ' কিংবা 'থানা ইন্টারনি' : অন্তরীণে আবদ্ধ : রাজবন্দী। কথাগুলোকে অদ্ভুত মনে হয়েছে। রোমাঞ্চকর। মনে শিহরণ জেগেছে।

১৯৩৯-৪০-এ যখন বরিশাল জেলা স্কুলে নবম-দশম শ্রেণীতে পাঠরত, তখন স্কুলে কেবল হিন্দু ছাত্রদের আন্দোলন, পিকেটিং, বক্তৃতা দেখি নি। পাকিস্তান আন্দোলন তখনো গরম হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সহপাঠী মুসলমান ছাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোজাম্মেলকে একটু ভিন্ন ধরনের মনে হলো। আমারই মতো গরিব কৃষক ঘরের। সে আমাকে পড়তে দিল মুসলিম লীগ বা ছাত্রলীগের প্রচারপত্র নয়। সে পড়তে দিল 'প্রোসক্রাইভড়' 'পথের দাবী'। সমস্ত রাত্রি ধরে সংগোপনে নিষিদ্ধ বই 'পথের দাবী' পাঠের স্মৃতি আজো মনকে আলোড়িত করে। সেই সহপাঠীটি পড়তে দিলো লাল অক্ষরে মুদ্রিত বিপ্লবী ইশতেহার; স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের ইশতেহার। সে গোপনে বললো : সে যোগ দিয়েছে বেআইনি গুপ্তদলে। সে-দলের নাম বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল : আর. এস. পি।

রোমাঞ্চকর স্মৃতি : এক রাত্রিতে তিনশ' পৃষ্ঠার অধিক আকারের বই 'পথের দাবী' পাঠের। মোজাম্মেল সাবধান করে দিয়েছে : কেউ যেন না জানে। কেউ যেন টের না পায়। তাহলেই কিন্তু হাত-কড়া। অভিভাবক সকলের অলক্ষ্যে শুরু করেছি সেই পাঠ। কোথা থেকে কেমন করে সংগ্রহ করেছে মোজাম্মেল এ-বই, তা কে জানে। বইয়ের প্রতি পাতার নামাঙ্কিত অংশটি কাটা। একেবারে শেষের দিকে স্বাধীনতার সংগ্রামের উদ্বুদ্ধ সেই ভারতী, অপূর্ব, সব্যসাচীদের 'পথের দাবী' কথাটির উল্লেখ। কিশোর মনটিকে আচ্ছন্ন করে দিলো সেই রোমান্টিক বইয়ের আবহ। কতো হিন্দু বিন্দু উপাদান দিয়ে একটি চরিত্রের গঠন। চরিত্র নিজে কি তা সচেতনভাবে জানে? কিন্তু এখনো বিস্ময়। 'পথের দাবী' পাঠের সেই রাত্রির সম্মোহনী-স্মৃতিটির বিনাশ ঘটে নি।

মোজ্জাম্মেল হককে এ-কালের অ-সাংবাদিকরা হয়তো তত জানেন না। আগের 'দৈনিক পাকিস্তান', আজকের 'দৈনিক বাংলা'য়* তাঁর একটি প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে। ১৯৬৪-তে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান লাইনের যে-বিমানটি কায়রোর মরুভূমিতে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তাতে অনেক সাংবাদিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল। বিশিষ্ট সাংবাদিক মোজাম্মেল হকও নিহত হন সেই দুর্ঘটনায়। কিন্তু আমার কাছে মোজাম্মেলের পরিচয় সাংবাদিক হিসেবে নয়। আমার কাছে তাঁর পরিচয় সে-কালের রাজনীতির সাম্প্রদায়িক প্রধান ধারার বাইরের বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী কর্মী হিসেবে। ১৯৪৭-উত্তর পর্যায়ে মোজাম্মেলও গ্রেফতার হয়ে রাজবন্দী হয়েছিল। মোজাম্মেলের নিজ সংগঠন আরএসপির সঙ্গে আমার পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠতা ঘটে নি। তাই মোজাম্মেলের রাজনীতিক জীবনের বিস্তারিত কাহিনী বলতে পারেন সাংবাদিক-সাহিত্যিক এবং বামপন্থী রাজনীতিক নির্মল সেন। আমার স্কুল জীবনের আর এক সহপাঠী, এই দলের আর একজন কর্মী, 'দৈনিক বাংলা'য় কর্মরত সাংবাদিক আবদুল খালেক এবং মোজাম্মেলের অন্য সাথীরা। এবং তাঁর সেই জীবন কাহিনীও পূর্ব বাংলার বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান কাহিনী। সেটিও ইতিহাসরকারদের দ্বারা সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

---

* অধুনালুপ্ত 'দৈনিক বাংলা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪০-এ স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাস করে কলকাতা যাই নি কলেজে পড়তে। এসেছি ঢাকাতে। তারও কারণ নিশ্চয়ই আর্থিক। দূর কলকাতার চাইতে ঢাকায় অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হবে খরচ সঙ্কুলানের।

১৯৪০ থেকে ১৯৪২ ঢাকা কলেজে পাঠ। এই পর্যায়ে কলেজে এবং হোস্টেলের কিছু স্মৃতিচারণ করি। কলেজের হোস্টেলে নিবিড়ভাবে যে-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক চেষ্টা করেছিলাম সমমনা মুসলমান সহপাঠীদের নিয়ে, তার বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীয়তা এবং উদারতাবাদী। এই হোস্টেলে থাকাকালেই প্রো-ফজলুল হক, এ্যান্টি-ফজলুল হক ঘটনা ঘটেছে ১৯৪২-এ। প্রো-ফজলুল হক মানে তখনকার কলেজ এবং হোস্টেলের বিশেষ পরিবেশে এ্যান্টি-মুসলিম লীগ। লীগ-বিরোধী। এবং সে-কারণেই মুসলমান ছাত্রদের প্রধান ধারা দ্বারা প্রো-ফজলুল হক, এ্যান্টি-মুসলিম লীগ বলে আখ্যায়িত হয়েছি। তাদের বিরূপ আচরণের কবলে পড়েছি।

সেদিনকার ঢাকার ছাত্রদের এই এ্যান্টি-হক, প্রো-হক আন্দোলনটিকেও তাৎপর্যহীন বলা চলে না। এ্যান্টি-হকেরই জোর ছিল বেশি। এটা ঠিক ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। আসলে রাজনীতির কোনো খবর আমি এবং আমার সঙ্গীরা রাখতাম না। কলকাতাতে মুসলিম লীগের সঙ্গে হক সাহেবের কী নিয়ে বিরোধ বেধেছে, মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়ার ব্যাপার, আমরা বুঝতাম না। ঢাকা কলেজের হোস্টেলে নিরীহ গোবেচারি আমার 'উপদলটি'র যা একটু ক্রিয়াকলাপ, তা সাহিত্য-সংস্কৃতি আর বই পড়াকে কেন্দ্র করে। এবং এই বৈশিষ্ট্যটিকেই প্রধান সাম্প্রদায়িক ধারাটি অপছন্দ করতো। হক সাহেব যখন হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে এবং ঢাকার নওয়াব হাবীবুল্লাকে নিয়ে মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, তখন মুসলিম লীগপন্থীরা ক্ষিপ্ত হয়েছিল। এমন সময়ে হক সাহেব যখন ঢাকায় আসার কর্মসূচি ঘোষণা করলেন, তখন ঢাকার মুসলিম লীগপন্থী ছাত্রদের কেন্দ্র সলিমুল্লাহ আর ফজলুল হক হল এবং ঢাকা কলেজের হোস্টেলের ছাত্ররা তাঁর বিরূপ সংবর্ধনার চেষ্টা করলো। ঢাকা কলেজের হোস্টেলের এই ধারার ছাত্ররা এসে আমাদের হুমকি দিল : তোমাদেরও হক-বিরোধী মিছিলে যোগ দিতে যেতে হবে ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে। আমরা বললাম, তেমন মিছিলে যাব কি যাবো না, তা আমাদের স্বাধীন মতামতের ব্যাপার। এমন জবাবে তারা আমাদের ওপর আরো বেশি ক্ষিপ্ত হলো। কিন্তু ফুলবাড়িয়া স্টেশনে ঢাকার নবাবের প্রভাবাধীন স্থানীয় অধিবাসীরাই সংখ্যা আর লাঠিতে ভারি ছিল। এ্যান্টি-হকরাই সেখানে পরাজিত হলো। কিন্তু তারা প্রতিশোধ তুললো তারা আমাদের ওপর সলিমুল্লাহ আর ফজলুল হক হলে এবং ঢাকা কলেজের হোস্টেলে। ফজলুল হক হলে তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল এ কে নাজমুল করিম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। তাঁরও সেখানে বেশ কিছুটা স্বাধীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথা উদারতাবাদী চিন্তার বৈশিষ্ট্য ছিল। আমি ঢাকা কলেজে থাকতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ঘটে। তাঁর ছোট ভাই লুৎফুল করিম। ঢাকা কলেজে আমার সহপাঠী। বড় সোজামুখের ছেলে। মোহাম্মদ আবুল কাশেম। সে তার চাইতেও বেশি। সাম্প্রদায়িক চিন্তার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ আর পরিহাসে খড়্গ-কণ্ঠ। আমাদের সঙ্গী ছিল মুজাহার উদ্দিনও। মোটকথা, প্রধান ধারা লীগপন্থীরা হলেও মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা যেমন এই চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে বেশ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি তার মধ্যে প্রধান স্রোতের বিরুদ্ধবাদী স্বাধীন এবং অসাম্প্রদায়িক ধারার তরুণদের সংখ্যাও যে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তারই পরিচয় পাওয়া যায় আজ থেকে ৪৩ বছর পূর্বেকার এই ঘটনাটিতে। ঢাকা কলেজের হোস্টেলে আমরা হলাম আক্রমণের লক্ষ্য। ফজলুল হক হলে নাজমুল করিমের আসবাবপত্র নষ্ট করা হলো। ঢাকা কলেজের হোস্টেলে, এখন ফজলুল হক হলের যেটি মূল ভবন, সেই ভবনের খাবার ঘরে আমাদের আহার গ্রহণ হলো নিষিদ্ধ। এমন প্রতিকূল পরিবেশে, নিজের ফাইনাল পরীক্ষা যখন সামনে, তখন হোস্টেল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম বড় ভাইয়ের চাকরিস্থলে। বড় ভাইয়ের মনে তখন মুসলমানত্ববোধ তীব্র হয়েছে। আমার এসব কীর্তি-কাহিনী শ্রবণ করে তিনি শুধু বললেন : তোমরা হচ্ছ মুসলমান কওমের দুশমন।

এসব ১৯৪২-এর গোড়ার ঘটনা। কিন্তু ১৯৪২-এ আমাদের ছাত্রজীবনে কেবল স্থানীয় এসব ঘটনারই আঘাত লাগে নি। আঘাত লেগেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও ১৯৪২-৪৩-৪৪ : এই সময়টাই ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তীব্রতার সময়। তার স্মৃতিচারণেরও একটা প্রাসঙ্গিকতা আছে। যুদ্ধের গোড়াতে আমরা ছিলাম হিটলারের বিক্রমে মুগ্ধ। তখন তাকে যত না বর্বর মনে করেছি, তার অধিক বীর ভেবেছি। কিন্তু এই সময়েই একদিকে যেমন কমিউনিস্ট কর্মীরা তাদের আন্তরিকতা দিয়ে মুসলমান এইসব ছাত্রকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যুদ্ধের সত্যকার চরিত্রকে, তেমনি সোভিয়েতের অসীম আত্মদানকারী প্রতিরোধের কাহিনী আমাদের মনকে জয় করে নিয়েছে। সোভিয়েতের সঙ্গে সেই এবং সে-ভাবেই আমাদের পরিচয়ের শুরু। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাবের আর একটি দিকও উল্লেখ করার যোগ্য।

ঢাকায় সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন, হাইকোর্ট তথা ঢাকা কলেজের বিল্ডিং এবং সলিমুল্লাহ হল : এ-সবই যুদ্ধের সৈনিকদের হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। কুর্মিটোলায় মার্কিন আর ব্রিটিশ বাহিনীর ছাউনি পড়েছে।

মুহূর্তে সেদিন ঢাকা শহর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেল। কতো দেশের কতো বর্ণের সৈন্যরা এলো। তাদের স্বাধীন, নগ্ন, বিচিত্র ব্যবহার। ঢাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো শহর, অলিগলির সামনে 'আউট অব বাউন্ডস',—'নিষিদ্ধ এলাকা' বলে নোটিশ লটকে দিয়েছে সামরিক বাহিনীর কমান্ড। কিন্তু তাতে ঢাকার কোনো এলাকাই সৈন্যদের আদিম আক্রমণের বাইরে অক্ষত থাকে নি।

এই যুদ্ধের পথ ধরেই এসেছে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ। তবু এমন প্রতিকূল জীবনের আর একটি উজ্জ্বল দিকও আজ স্মৃতিতে ভাসে। ব্রিটিশ এবং মার্কিন উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের বাধ্যতামূলক দায়িত্বের আওতায় এই ঢাকা শহরেই এসেছিলেন আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের অনেক মহৎ চরিত্র, যাঁরা ছিলেন পরাধীন ভারতের নির্যাতিত মানুষের আন্তরিক শুভার্থী। চোখে প্রায় দেখতে পান না এসেছিলেন সেই মার্কিন অধ্যাপক র‍্যাপাপোর্ট, মার্কিন কমিউনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত স্প্রিঙ্গার এবং তাঁর বন্ধুরা। ব্রিটিশ বাহিনীরও অনেক মহৎ সৈনিক ছিলেন। সেই বাহিনীরই এক ক্যাপ্টেন, ক্লাইভ ব্রানসন কবি ছিলেন। বামপন্থী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তিনি ঢাকায় আসেন নি। তিনি বর্মা ফ্রন্টেই নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের মানুষের যে মর্মান্তিক অবস্থা তিনি দেখেছেন, সে সম্পর্কে তিনি রোজনামচা লিখেছেন, কবিতা রচনা করেছেন, দেশে পত্নী, প্রিয়ার কাছে চিঠি লিখেছেন। তাঁর সে সব কাহিনী কলকাতা, ঢাকার বামপন্থী পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়ে আমাদের মনকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ঢাকায় সৈন্যদের ছাউনিতে আমাদের একটা কৌতুকজনক চেষ্টা ছিল : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর মার্কিন-ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে বিতর্ক বা সেমিনার সংগঠিত করা। মার্কিন বামপন্থী সেনারাই এসব চেষ্টার প্রধান নেপথ্য উদ্যোক্তা ছিলেন। এসব মিলে সেই যুদ্ধের সময়ে আমাদের মনে একটা প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক মৈত্রীর অনুভূতির সঞ্চার ঘটেছে। তাই আমার বলতে হয়, একটি ধারা বা চরিত্র গঠনে কতো যে উপাদানের যোগ ঘটে, তাকে নিরূপণ করা কিংবা বর্ণনা করা কারুর একার পক্ষে সহজ বা সম্ভব নয়।

১৯৪২-এ বিপ্লবী সাহিত্যিক সোমেন চন্দের নিহত হওয়ার ঘটনা দ্বারাও আলোড়িত হয়েছি।

১৯৪২-এর মার্চ মাসে সোমেন চন্দ নিহত হন।

কে এই সোমেন চন্দ? ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের এক অধ্যাপক ও সাহিত্য-প্রধান অবজ্ঞাভরে প্রশ্ন করেছিলেন : কে এই সোমেন চন্দ। আমি বলেছিলাম : এক অসীম সম্ভাবনাময়, অকালে নিহত ঢাকার সাহিত্যিক, ১৯৪২ সালের। মুসলমান সাহিত্য-প্রধান প্রায় তির্যক স্বরে বলেছিলেন : আমরা শুনি নি।

সোমেনের নাম তাঁর না শোনাটাই স্বাভাবিক। এবং সোমেনের নাম সেদিনের মুসলমান ছাত্র সম্প্রদায়ের আমি এবং কতিপয় আমরা শুনেছিলাম এবং সে ঘটনা দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলাম, এটি আমাদের সৌভাগ্য।

সোমেন চন্দকে আজকে সদিচ্ছাপূর্ণ তরুণ সাহিত্রিকদেরও অনেকে হয়তো জানেন না। এর কারণ ইতিহাসের অনুদঘাটন। ইতিহাসকে বিস্মৃত হওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেনের সহজ পরিচয় : সোমেন বাংলা কথা সাহিত্যের 'ইঁদুর' গল্পের বিশ কি, একুশ বছর বয়সের লেখক। ঢাকা রেল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কর্মী। পড়ছিল মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে। গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের একটি তরুণ। কমিউনিস্ট কর্মী। নিহত হলো সে মর্মান্তিকভাবে ঢাকারই আর একটি বামপন্থী দলের হাতে : রাজনৈতিক মতান্তরের পটভূমিতে। কিন্তু আমি এবং আমরা তখন অপরিণত। তবু আজ ভাগ্য মানি যে সোমেনের আত্মদানের ঢেউ আমাদেরকেও স্পর্শ করেছিল, আলোড়িত করেছিল।

১৩৫০ তথা ১৯৪৩-এর 'প্রতিরোধ' পত্রিকার সোমেন স্মৃতিসংখ্যায় সোমেনের ওপর যে-সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার কিছুর পুনর্মুদ্রণ ঘটেছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুই খণ্ডের সঙ্কলন 'সোমেন ও তার রচনা সংগ্রহ'তে। নিজের নামগত সঙ্কোচ অতিক্রম করে বলছি, আমার নিজের স্মৃতিতে ছিল না সোমেনের ওপর রচিত 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' নামক যে রচনাটি, সরদার ফজলুল করিমের সেই রচনাটিও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই সংকলনটিতে। রচনাটি যে খুব শক্তিশালী, তেমন নয়। তবু সেদিনকার মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি তরুণের লেখা হিসেবে রচনাটির একটি তাৎপর্যকে স্বীকার করতে হয়। সেই কারণটির উল্লেখ করেই সঙ্কলক লিখেছেন; "প্রবন্ধটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, এতে একজন সম-সাময়িক মুসলিম লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। অসাম্প্রদায়িক, মানবপ্রেমিক কমিউনিস্ট সোমেনকে তাঁরাও চিনতে পেরেছিলেন, ভালোবেসেছিলেন তাঁকে।" প্রবন্ধটির উদ্ধৃতির কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রবন্ধের সূচনাতে যেখানে বলা হয়েছে : "১৯৪২ সালের মার্চ মাসে সোমেন চন্দ যখন নিহত হয়, আমাদের মোসলমান ছাত্র সমাজের বৃহত্তর অংশ তখন নিজেদের নেতৃবৃন্দের মান-অপমানের পরিমাণ নির্ধারণ লইয়া ব্যস্ত। কোনো বিশিষ্ট নেতাকে পুষ্পমাল্য প্রদান বা অপর কাহাকেও কালো পতাকা প্রদর্শন, ইহাই ছিল আমাদের তখনকার বৈশিষ্ট্য।"—সেখানকার বক্তব্যটি যথার্থ। এই প্রবন্ধটিতে সেদিনকার তরুণ ছাত্র হিসেবে একটি প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলা হয়েছিল : "সোমেন গতানুগতিক নয়। সোমেন নতুন পথের যাত্রী।" আজ এই প্রৌঢ় বয়সেও সেই প্রত্যয়টির পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি : সোমেনের কাছে আমাদের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। সোমেন তাঁর নতুন পথের যাত্রায় আমাদের শরিক করেছিলেন। জীবন ও সমাজ-চেতনায় নতুন একটি পর্যায়ের উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন।

১৩৫০-এর মন্বন্তরের আঘাতের কথা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। কেবল আমাদের অতিক্রান্ত পথের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলতে পারি, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ত্রাণকার্যে ঢাকার ফ্যাসি-বিরোধী এবং কমিউনিস্ট সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সুহৃদদের নামের মধ্যে স্মরণীয় হচ্ছেন রবি গুহ, মদন বসাক, দেব প্রসাদ মুখার্জি, অনিল বসাক, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সরলানন্দ সেন, জ্ঞান চক্রবর্তী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৫-৪৬-এ দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলন হয়েছে। ঢাকায় রশিদ আলী দিবসের ঢেউ এসেছে। কলকাতায় ট্রাম শকিকদের আন্দোলন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছি। নৌ-বিদ্রোহের খবর এসেছে।

ট্রাম শ্রমিকদের কাহিনী এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। আমার মনে হচ্ছে যেন '৪৫ সালে তখন আমি কলকাতাতেই ছিলাম, সেদিন, যেদিন ৮০ দিনের একটানা ধর্মঘটের পরে ইংরেজ কোম্পানির ওপর বিজয়ী শ্রমিকদের নেতা মোহাম্মদ ইসমাইলের গলায় মালা পরিয়ে ট্রাম শ্রমিকরা প্রথম তাদের লাল ঝাণ্ডায় সজ্জিত পাইলট ট্রামগাড়ি সারা কলকাতায় ৮০ দিনের মর্চেধরা লাইনের ওপর দিয়ে বিজয়ের গর্বে চালিয়ে নিয়েছিল আর লাইনের দুপাশের সারা ভারতের মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক নেতা, কেরানি, কর্মচারী, ছাত্র, ধনী, অ-ধনী সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকে দুচোখ ভরে দেখছিল। অভাবিতপূর্ব এক নতুন শক্তির যেন তারা সুসজ্জিত মহড়া দেখছিল : শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির মহড়া। এই ঘটনাতে যথার্থই সমগ্র বঙ্গ এবং ভারত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।

ঢাকায় কমিউনিস্ট শিক্ষাবিদ ড. কে এম আশরাফ এসেছেন। উদারপন্থী, কিছুটা জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেনের বন্ধু কে এম আশরাফ।

১৯৪৫-এ নেত্রকোণায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলন হয়েছে। তাতে সাগ্রহে যোগদান করেছি। কৃষক সমিতির সাংগঠনিক শক্তি এবং শৃঙ্খলায় অনুপ্রাণিত হয়েছি। সারা ভারত বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রী নেতাদের ভাষণ শুনেছি।

নেত্রকোণার কৃষক সম্মেলনের কথাটি যদি অধিকতর বিস্তারিতভাবে বলতে পারতাম, তাহলেই মাত্র এর তাৎপর্যের কিছু প্রকাশ করা যেতো। কিন্তু এমন আনুষ্ঠানিক আলোচনায় প্রবন্ধের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নেত্রকোণার একটি বিরাট মাঠকে কৃষকেরা যেন তালপাতা আর বাঁশের একটি নগরীতে রূপান্তরিত করে ফেলেছিল। লক্ষাধিক কৃষকের সমাবেশ ঘটেছিল। তারা এসেছিল বিরাট বিরাট মোর্চা তৈরি করে প্রায়ই পায়ে হেঁটে সারা বঙ্গ, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ থেকে। কৃষক নগরের মুখে তারা নিজেরা তৈরি করেছিল এক বিদ্রোহী কৃষকের ভাস্কর মূর্তি, যে-কৃষক তার হাতে-পায়ের নিষ্পেষণের শেকল ভেঙে ফেলেছে।

এদিকে মুসলিম লীগের আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিনত হয়েছে। বঙ্গদেশের মুসলিম লীগে জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য থেকে আগত বাগ্মী আবুল হাশিমের ধর্মীয় ব্যাখ্যাসহ সমাজতন্ত্রী ভাবধারার সমর্থনসূচক গ্রুপটির সঙ্গে সহেযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম কমিউনিস্টপন্থীদের। সে অভিজ্ঞতারও গুরুত্ব আছে।

ঢাকেশ্বরী বস্ত্রকলের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছে। গুলিবর্ষণ হয়েছে। সে ঘটনার আকর্ষণে শ্রমিকদের মধ্যে যাতায়াত ঘটেছে। অভিজ্ঞতা নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

১৯৪৬-৪৭ সালে কমিউনিস্ট কর্মীদের ওপর মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপের আক্রমণ ঘটেছে। মুনীর চৌধুরীর ঘর লুণ্ঠিত হয়েছে সলিমুল্লাহ হলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম ছাত্রদের প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ফ্যাসিস্ট কাউন্সিল গঠন করেছে। প্রগতিপন্থীদের নাজেহাল করেছে। রথখোলার মোড়ে কমরেড মুজাফফর আহমদের উদ্বোধন করা ন্যাশনাল বুক এজেন্সির প্রগতিশীল বইয়ের দোকান আক্রান্ত এবং লুণ্ঠিত হয়েছে। করোনেশন পার্কে দেশের পরিস্থিতির ওপর কমিউনিস্ট পার্টির আহূত সভা শাহ্ আজিজের গ্রুপ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আমার হয়তো সভাটিতে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল এবং মুনীর চৌধুরীর বক্তৃতাদানেরও কর্মসূচি ছিল। মিটিং ভেঙে দেয়ার পরে আক্রমণকারীরা কোর্ট হাউজ স্ট্রিটে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস আক্রমণ করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেছে। প্রতিক্রিয়ার তখন একটা আক্রমণাত্মক অবস্থান। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট সমর্থক এবং কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কর্মী।

১৯৪৭-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছি। পুলিশের তৎপরতা এবং অনুসন্ধান বৃদ্ধি পেয়েচে। ১৯৪৮-এ স্বেচ্ছামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে আত্মগুপ্তভাবে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে জীবনযাপন ঘটেছে। অভিজ্ঞতার সেও একটি দিক। নিজের পিতা-মাতার স্নেহ-প্রীতির কাছে ফিরে যেতে পারার এক বিরল সৌভাগ্য যেন। কিন্তু ১৯৪৮-এর ইস্তফাদানটি যথার্থই প্রিয় ছাত্রছাত্রী, শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকবৃন্দ এবং রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ আত্মীয়জনদের কাছে অবোধ্য এবং পাগলামির নামান্তর বলে বোধ হয়েছিল। (একটু অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন সরকার অভিভাবকবৃন্দ। তাদের অনুসন্ধানী চোখের ভ্রূ আরো খানিকটা কুঞ্চিত হয়েছিল।) বর্তমানের দূরদৃষ্টি থাকলে অতীতকালে এমন কাজটি সম্ভব হতো না। কিন্তু কেবলই কি লোকসান? অবর্ণনীয় যে-লাভ হয়েছে, তার প্রাপ্তি কেমন করে ঘটতো? জীবনের সব সময় এক সময় নয়। পাগলামির সময়ে খানকটা পাগলামি করা জীবনের ধর্ম। এ-কথা প্রৌঢ় পিতা এবং শিক্ষকের পক্ষে তার সন্তান এবং সুকুমার ছাত্রবৃন্দের কাছে বলা উচিত কাজ নয়। কিন্তু নিজের কাছে বলারও তো একটা ব্যাপার থাকে।

১৯৪৯-এর ডিসেম্বরের গোপন অবস্থায় অপরাপর কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছি।

১৯৪৯-৫০-এ কারাগারের অভ্যন্তরে দীর্ঘ অনশনে অংশগ্রহণ করেছি। বন্দী নিবাসকে কমিউনিস্ট কর্মীদের তরফ থেকে আত্মশিক্ষার স্থানে পরিণত করার চেষ্টা এবং রাজবন্দীদের আশাবাদী রাজনৈতিক মনোবল রক্ষা করার অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যবস্থাপনাকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে।

১৯৪৯, '৫০ ও '৫১ : এই সময়ে পূর্ববঙ্গের কারাগারের মধ্যে রাজবন্দীরা যে-মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন, সে-কাহিনী পূর্ববঙ্গে এখনো সাধারণভাবে অজানিত। অথচ এই সংগ্রামের তাৎক্ষণিক ভুলভ্রান্তি ও মতামতের তফাত যাই থাক না কেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনের বিকাশে এই সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কারাগারে রাজবন্দীদের এই সংগ্রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহিনী সেদিনকার মুসলিম লীগ সরকার সর্বপ্রকারে গোপন করে রাখবার চেষ্টা করলেও সেই নিষিদ্ধ কাহিনী কারাগারের দেয়ালের বাইরের পৃথিবীতে রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'—এই শ্লোগানকে একটি সর্বজনীন এবং আপোসহীন শ্লোগানে পরিণত করেছিল। কারাগারে একাধিকবার অনশন ধর্মঘট করেছেন রাজবন্দীরা। ১৯৪৯-৫০ এ সংঘটিত হয় ৫৮ দিনের দীর্ঘ অনশন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। এই অনশনকালেই কুষ্টিয়ার শ্রমিক নেতা শিবেন রায় নিহত হন। দীর্ঘ অনশনের প্রতিক্রিয়ায় মারা যান বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ফণী গুহ। অনেক রাজনৈতিক কর্মী অনশনের ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সে এক মর্মান্তিক কাহিনী। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঘটেছিল ত্রিশদিনের অধিক অনশনের। এ-কোনো কৌতুকজনক হালকা অভিজ্ঞতা নয়। মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। প্রথম ছয় কিংবা সাতদিন একেবারে কোনো প্রকার খাদ্যহীন উপবাস। কর্তৃপক্ষ চোখের সামনে ভাতের থালা এনে রাখছে। সেই থালার দিকে চোখ রেখে দিনের পর দিন রাজবন্দী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আত্মহত্যাকে ঠেকানোর জন্য হয়তো কেবল জলপান করেছে। সে এক অসম লড়াই। কর্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের সঙ্গে মানবেতর ব্যবহার করছে। মানুষের মতো বেঁচে থাকার নিম্নতম সুবিধা থেকেও তাদের বঞ্চিত রাখছে। অথচ ইংরেজ আমলেও এমন সুবিধা স্বীকৃত ছিল। রাজবন্দীরা এই অবস্থার প্রতিবাদ করার জন্য সর্বশেষ পথ হিসেবে অনশনে নেমেছেন। কিন্তু নির্দয় মুসলিম লীগ সরকার হুমকি দিচ্ছে, জেলের মধ্যে অনশন অপরাধ, এ-জন্য রাজবন্দীদের অধিকতর দণ্ড হবে। তবু রাজবন্দীদের মানুষের মতো ব্যবহার পাওয়ার কোনো দাবিকে স্বীকার করা হবে না। প্রত্যেক বন্দীকে সঙ্গীহীন করে বিচ্ছিন্নভাবে এক একটা খুপরি তথা 'সলিটারি সেল' বা ডিগ্রিতে দিনরাত ২৪ ঘণটা তালাবদ্ধকরে রাখা হচ্ছে। এমন সঙ্গীহীন অবস্থাতেই শিবেন রায়ের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ ঘটে। তাঁকে জোর করে নাকের মধ্য দিয়ে দুধ খাওয়াতে গিয়ে রবারের নল জেলের কয়েদিরা কর্তৃপক্ষের রবারের নল দিয়ে দুধ ঢুকিয়ে অনশনকারীর মৃত্যুকে বিলম্বিত করার এই ছিল কর্তৃপক্ষের কৌশল। দীর্ঘ ৫৮ দিনের অনশনের পরে রাজবন্দীরা সামান্য হলেও কিছু অধিকার অর্জন করেছিল। কিন্তু তার ক্ষয়ক্ষতি কম হয় নি। এইভাবে সেদিন বাংলাদেশের কারাগার থেকে কারাগারে বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট কর্মীরা ভারতীয় উপমহাদেশের অতীতের সব মহৎসংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন।

১৯৫০-এর এপ্রিল মাসে রাজশাহী জেলে কর্তৃপক্ষের গুলিবর্ষণ ঘটেছিল বন্ধ ঘরের অসহায় বন্দীদের ওপর। আর নিহত হয়েছিলেন সাতজন নেতৃস্থানীয় রাজবন্দী : কম্পরাম সিংহ, বিজন সেন, দেলোয়ার হোসেন, হানিফ, আনোয়ার, সুখেন ভট্টাচার্য আর সুধীন ধর। জীবনের জন্য পঙ্গু হয়েছিলেন আরো অনেকে। এসব কাহিনী আজো বিস্তারিতভাবে অলিখিত। এসবের উল্লেখ এই স্মৃতিচারণে কেবল এ-কথা বলার জন্য যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট ৪০-৫০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশকের বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী চিন্তা ও আন্দোলনের ধারাটি তখন আর দুর্বল বা তাৎপর্যবিহীন নয়। সে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল নানা ঘটনা, দুর্ঘটনা এবং অভিজ্ঞতায়।

পরবর্তী বিকাশের কথা এবং তার বৈশিষ্ট্য আমার আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন কারাগারের মধ্যে রাজবন্দীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ১৯৫২-এর বিস্ফোরণ পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে বামপন্থী এবং সমাজবাদী চিন্তার নতুন এবং অধিকতর শক্তিশালী এবং ব্যাপক পর্যায়ের সূচনা ঘটিয়েছে।

২১. জীবনকে যদি একটি রিলে রেস হিসেবে দেখা যায়, তবে বলতে হয়, প্রগতিশীল বামপন্থী-সমাজতন্ত্রী চিন্তার এককালের পতাকাবাহীরা তাঁদের সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের আদর্শ এবং স্বপ্নের পতাকাকে বহন করে অগ্রসর হয়ে ১৯৫-তে এসে উত্তর-পথিকদের হাতে সেই পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। উত্তর-পথিকরা পূর্ব-পথিকদের হাত থেকে সেই পতাকা গ্রহণ করেছেন। এখানেই পূর্বের সঙ্গে পরের যোগসূত্র। পরবর্তী যাঁরা, তারা পরবর্তীকালে সংখ্যায় অধিক হয়েছে। তাদের এখন অনেক শাখা-প্রশাখা : অনেক স্রোত-উপস্রোতের ধারা তৈরি হয়েছে। সবটাই এককালের ক্ষীণ-স্রোতা অন্তরঙ্গ নদীটির কূল উপচে বন্যার বিস্তারে পরিণত হওয়ার ব্যাপার। তবে বন্যার পানির বিপুল বিস্তারের যেমন একটি মনোহারী রূপ আছে, বিস্তার-বাচক শক্তির একটি ভাব আছে, তেমনি তার একটি অগভীরতা এবং অস্থিরতারও দিক আছে।

জীবন অবশ্যই দ্বান্দ্বিক। তার কোনো প্রকাশই অর্থহীন বা পরস্পর সম্পর্কশূন্য নয়। আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন আজ অধিকতর জটিল এবং সমৃদ্ধ। আজকের বাংলাদেশ আজকের পৃথিবীর সামগ্রিক জীবনের স্রোতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত। তার আশা-নিরাশা, শক্তি-দুর্বলতা পৃথিবী এবং পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। আজকের মুহূর্তটি অতিক্রান্ত সকল মুহূর্ত এবং কালের 'কিউমুলেটিভ' বা সম্মিলিত ফসল। বন্যার ব্যাপ্তিকে সমুদ্রের গভীরতা দিয়ে তার ঐতিহাসিক বিজয়ের অনিবার্যতাকে বাস্তব সত্য করে তুলতে হবে এবং এমন গুরুতর এবং সৎচিন্তা ও প্রয়াসে একটি দ্বান্দ্বিক ইতিহাসবোধের কোনো বিকল্প নেই। এবং সেই বোধের অন্যতম উপাদান হচ্ছে পূর্ব থেকে পরের বিকাশের যোগসূত্রটিকে আবিষ্কার এবং উপলব্ধি করে তার অনিবার প্রবহমানতার প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠা।*

পুনশ্চ : ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ : দশ বছর। ১৯৯৫ সালের ২৮ জুন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত একটি সেমিনারে লেখক উপরোক্ত বক্তব্যটি পুনরায় আগত অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দের নিকট আলোচনার জন্য পেশ করেন।
(৩০.০৬.৯৫)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনশ্চর পুনশ্চ : ১৯৮৫ থেকে দশ বছরের অধিক, প্রায় পনের বছর এই ১৯৯৯-তে অতিক্রান্ত। কাল থেমে থাকে না। এই আলোচনার উত্থাপক তথা লেখকের প্রয়াণের পরেও কাল প্রবাহিত হতে থাকবে। উল্লিখিত আলোচনাকারীর দৈহিক বয়স ১৯৯০-তে ৭৪ বছর তো বটেই। তার ক্ষুদ্র দেহ তথা আকারে, এত দীর্ঘকাল মানায় না। কালের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, হয়তো-বা পরিচয়ের বাইরে বিকৃত এবং বিলুপ্তপ্রায়। তবু যেহেতু প্রকৃতির রেশ এখনো কিছু অবশিষ্ট, তাই আগ্রহ জাগে উল্লিখিত আলোচকের বিবৃতকালের পরবর্তী সময়ে এই দেশ এবং সমাজের, তার অন্তর্গত শ্রেণীসমূহের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের একটি সমন্বিত আলেখ্য যদি কেউ উপস্থিত করতেন তাহলে তার মাধ্যমে নিজের স্বপ্নের বিকাশ ও বিস্তারের তাৎপর্যটি আরো অন্তরঙ্গভাবে অনুধাবনে আমি সক্ষম হতাম। (৬-৬-৯৯)।

পুনশ্চর পুনশ্চ এবং তৎপর : আলোচ্য এই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমান ২০০০ সাল থেকে প্রায় বিশ বছর আগে। সেই ১৯৮৫-তে যে-স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী এবং সুহৃদজনের কাছে মূল আলোচনাটি পেশ করা হয়েছিল তাদের বয়স ১৯৮৫-তে যদি বিশের কিছু কম কিংবা বেশিতে থেকে থাকে, তবে তাদের দৈহিক বয়স এখন ২০+১৫ = ৩৫ তো বটেই।

এঁদের প্রায় সবাই এবং প্রত্যেকে রাস্তাঘাটে, সড়কে, চায়ের দোকানে, কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গণে প্রীতি ও শ্রদ্ধায় আমাকে স্যার, সরদার ভাই এবং অপর সব মমতাভরা সম্বোধনে আপ্লুত করে জড়িয়ে ধরেন, আলিঙ্গন করেন। তখন তাঁদের এমন অন্তরঙ্গ প্রীতির জবাবে কোনো কথা বলা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। চোখের পাতা ভিজে ওঠে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। নিজের চোখ মুছে নিজের মনেই বলি : কী আনন্দের এই জীবন, পরিবেশ এবং পৃথিবী। সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, আশাহত অবস্থা, আঘাত, দৈবদুর্বিপাক সত্ত্বেও জীবন এবং পৃথিবী বিস্ময়ের এবং আনন্দের।

ওঁরা জিজ্ঞেস করেন : কেমন আছেন?

আমি ঠাট্টাচ্ছলে বলি : 'কেমন' শব্দটির মধ্যখানের 'ম'টি কেটে দিয়ে আবার বলুন।

ওঁরা একটু থমকে যান। তবু বলেন : 'কেন' আছেন।

আমি বলি এটিই যথার্থ প্রশ্ন : কেন আছেন, কেন আছি?

এর কোনো ভারি এবং দার্শনিক জবাবে 'রুমীর আম্মা'র পুর্নপ্রকাশের সময়টিতে নিজেকে জড়িত করতে চাইনে।

আমার একটি সহাস্য জবাব : বেঁচে আছি, কারণ বেঁচে না থাকলে 'রুমীর আম্মা'র পুর্নপ্রকাশের ঘটনাটি দেখতে পেতাম না। সে কারণে এ ঘটনাটি আমাকে যথার্থই উদ্দীপিত করে তুলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু একটি কথা আলোচনার দাবি রাখে। প্রীতিভাজন ও স্নেহভাজনরা জিজ্ঞেসও করেন : আপনার সাম্যবাদী স্বপ্নের কি অবস্থা!

আমি বলি : মহৎ স্বপ্নের কি কোনো মৃত্যু থাকে, কিংবা আছে?

: আপনার সেই স্বপ্নকে মহৎ কেন বলছেন?

আমি বলি : সে তো অবশ্যই আলোচনার ব্যাপার। কিন্তু আমার স্বল্প বুদ্ধিতে আমি বুঝতে পারিনে, মানুষ নামক প্রাণীর-সমাজে নানা কার্যকারণে উদ্ভূত অমানুষিক বৈষম্য একদিন থাকবে না, এমন স্বপ্নের চাইতে মহৎ স্বপ্ন আর কী হতে পারে?

আমার এমন জবাবের আলোচনা ক্রমাধিক পরিমাণে যে রহস্যময় এবং আবেগমূলক হয়ে ওঠে, তা আমি বুঝতে পারি।

তাঁরা বলেন নব্বইয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের বিপর্যয়ের পরেও আপনি আশাবাদী?

: হ্যাঁ, অবশ্যই আশাবাদী। আশা বাদে মানুষ বাঁচে কেমন করে? আশার দীপকে তোমাদের হাতে তুলে না দিয়ে আমিই-বা মরি কেমন করে? তাই আমি আশাবাদী। এখনও আশাবাদী।

ওঁরা বলেন : আপনি সংশোধনের ঊর্ধ্বে : ইনকরিজিবল।

আমি বলি : এটাকে আমি প্রশংসা হিসেবে নিলাম এবং আমার নিভন্তপ্রায় আলোর শিখাটি আবার জ্বলে উঠুক।

প্রীতিভাজনেরা এরপরে তাদের জীবনের আলো দিয়ে যথার্থই আলিঙ্গন করে আমাকে আলোর শলাকাতে পরিণত করেন। আমি তাঁদের এমন প্রকাশে কৃতজ্ঞতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি।

'রুমীর আম্মা' যে এখনো বেঁচে আছেন, সে ঘটনার অধিক, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার, অপর আর কী প্রমাণের আবশ্যক থাকে?

৪.১০.২০০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনশনে আত্মদান

১৯৪৭-এর পরবর্তী ৪৮-৪৯ এবং ৫০ সালের কথা। দেশে তখনো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আমেজ বর্তমান। কিন্তু তা উপরতলাতে। শাসকদল এবং শাসক শ্রেণীগুলির মধ্যে। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের উপর স্বাধীনতার বছর না ঘুরতেই আর্থিক এবং রাজনৈতিক আঘাত নেমে আসতে লাগল। শ্রমিকের মজুরীর ক্ষেত্রে, কৃষকের জমি আর জীবনধারণের সামগ্রীর ক্ষেত্রে, মধ্যবিত্তের ভাষা ও সংস্কৃতিবোধের ক্ষেত্রে। এই শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সচেতন যে কোনো শ্রমিক-কৃষক-আন্দোলনের কর্মী কথা বলার চেষ্টা করেছে, মিটিং বা প্রতিবাদ-ধর্মঘটের প্রয়াস নিয়েছে তাকেই মুসলিম লীগের শাসন আইন, বে-আইনের পরোয়া না করে গ্রেফতার করে কারাগারে ভরে দিয়েছে। শত শত কর্মীদের সেদিন পূর্ববাংলার কারাগারগুলি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই কর্মীদের অধিকাংশ ছিলেন শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মী। সকলেই ছিলেন সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ঐতিহাসিক কারণে সেদিন এই কর্মীদের অধিকাংশ ছিলেন সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। যদিও এরা সকলেই সচেতনভাবে ছিলেন সম্প্রদায়গত পার্থক্যবোধের বাইরে। তবু লীগ শাসকগোষ্ঠীর একটা ভরসা ছিল এদের অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মুসলিম সমাজের মধ্যে এদের উপর অত্যাচার কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। সে ভরসার যে একটা বাস্তব অবস্থা ছিল না, তা নয়। গোড়ার দিকে তেমন অবস্থা ছিল বৈকি। কিন্তু সে অবস্থা স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ভেদের বালুর বাঁধকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের এমন বিকাশে সেদিনকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত, জনগণ থেকে দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন, শত শত রাজবন্দীর মরণপণ অনশনের দামও যে কম ছিল না, এ সত্যটি আজো ব্যাপকভাবে জ্ঞাত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দীদের সে অনশন-লড়াই কোনো শখের ব্যাপার ছিল না। বন্দীদের এ লড়াই করা ছাড়া উপায়ন্তরও ছিল না। ইংরেজ শাসন আমলে যারা রাজনৈতিক সভা, শোভাযাত্রা ও আন্দোলনের কারণে বন্দী হতেন ইংরেজ সরকার তাদের সাধারণ বন্দী বলে গণ্য করত না। কারাগারের মধ্যে তাদের থাকা, খাওয়া এবং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। সেকালে তাই রাজবন্দী বা 'ডেটিনিউ' কথাটা মর্যাদাসূচক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পূর্ব-বাংলাতে সমাজতন্ত্রী মনোভাবের রাজনৈতিক কর্মীরা যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল তখন লীগ সরকার চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব থেকে, এই রাজবন্দীরা ইংরেজ আমলে যে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করত তার সবগুলোকে নাকচ করে দিয়ে রাজবন্দীদের কারাগারের সাধারণ অপরাধীদের পর্যায়ভুক্ত করে নির্যাতনের চরমে নিয়ে গেল। এই অবস্থার বিরুদ্ধে পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন কারাগারের রাজবন্দীরা '৪৮, '৪৯ এবং '৫০ সালে বিভিন্ন মেয়াদের অনশন ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়।

এই অনশনের প্রধান ধর্মঘট হয়েছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। '৪৯ সালের মধ্যভাগে ঢাকা জেলে রাজবন্দীরা বোধহয় ৪০ দিনব্যাপী যে অনশন ধর্মঘট করে, তখনো আমি কারাগারের বাইরে। তখনো আমি গ্রেফতার হইনি। বাইরের সংগঠন কারাগারের রাজবন্দীদের অবস্থার খবর খুব কমই পেত। তাদের অনশনের খবর আমরা বাইরে যা পেয়েছিলাম তার ভিত্তিতে দেওয়াল পোস্টার দেওয়ার চেষ্টা করে সেদিনকার সেই প্রতিকূল অবস্থায় জনসাধারণে মধ্যে কিছু সহানুভূতি তৈরির চেষ্টা আমরা করেছিলাম। সেদিন সেই দেওয়াল পোস্টার লাগানো কতো না বিপজ্জনক ছিল। তরুণ কর্মীরা রাতের আঁধারে সেই দেওয়াল পোস্টার লাগাবার চেষ্টা করত। এবং অনেক ছাত্র ও তরুণ কর্মী কারাগারের অনশন ধর্মঘটের উপর এমনি দেওয়াল পোস্টার লাগাতে গিয়েই গ্রেফতার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী ড. আবদুল্লাহ-আল মুতী তখনো হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেননি। আমার স্নেহাস্পদ ও অনুরাগী। আমাদের পারস্পরিক স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক। স্মিত মুখে আন্দোলন, সংগঠনের কোনো ডাক গ্রহণে সঙ্কোচহীন হয়ত সেদিন তাঁরও উপর দায়িত্ব পড়েছিল রাতের অন্ধকারে কারাগারে অনশনরত রাজবন্দীদের অনশনের কথা দেওয়ালে পোস্টার লাগিয়ে জনসাধারণকে জানাবার চেষ্টা করার। সে দায়িত্ব পালনের মধ্যেই হয়ত আল মুতীও গ্রেফতার হয়ে '৪৯-এর শেষের দিকে গিয়েছিলেন কারাগারে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। এবং আমার আগে থেকেই আল মুতী যোগ দিয়েছিলেন এই অনশন সংগ্রামে। নিজে মুখ ফুটে কখনো বলেননি এ কাহিনী। কিন্তু তাঁর কথা মনে পড়তে আমার চোখে ভেসে ওঠে '৪৯-৫০ সালে ঢাকা জেলে অনশনরত অবস্থায় আল মুতীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। জনাব আলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকসাদও তখন কিশোর। আলী আকসাদও গ্রেফতার হয়েছিলেন এই সময়েই অনশন বন্দীদের কথা দেওয়ালের লিখনে প্রচার করার অবস্থায়।

'৪৯-এর গোড়া কিংবা মধ্যভাগের ৪০ দিনের অনশনে রাজবন্দীরা কোনো দাবি আদায় করতে পারেনি। জেল কর্তৃপক্ষ এবং মুসলিম লীগের কোনো কোনো নেতার প্রতিশ্রুতিতে সে অনশন তারা প্রত্যাহার করেছিল। কিন্তু তাদের উপর নির্যাতনের আদৌ কোনো উপশম না ঘটাতে '৪৯ সালেরই শেষ দিকে, হয়ত ডিসেম্বরের শুরুতে, ঢাকা জেলের রাজবন্দীরা আবার অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করে।

১৯৪৯-এর ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমি যখন আরো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে জেলে যাই তখনো সেই অনশন চলছে।

জেলের বাইরে থাকতে জীবনে কোনোদিন অনশন করেছি, এমন স্মরণ করতে পারিনে। রোজার মাসে কখনো কখনো যে রোজা রাখিনি, তা নয় কিন্তু রোজা রাখা আর অনশন করা এক কথা নয়। অনশনের কৌতুক একবার বোধ করেছিলাম ঢাকা কলেজের হস্টেলে থাকা কালে, সেই '৪২-'৪২ সালে। তখন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন দার্শনিক ড. মমতাজউদ্দীন আহমদ। আর আমাদের হস্টেলের সুপারিনটেন্ডেট ছিলেন জনাব ওয়ালীউল্লাহ। ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে ছাত্রদের অভিযোগ ছিল। খাবার-দাবার ভালো হচ্ছে না বলে বোধহয়। এবং তার প্রতিবাদে আমরা ছাত্ররা অনশনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। কিন্তু সে অনশন একদিনও টেকেনি। সন্ধ্যা না হতেই প্রিন্সিপ্যাল এসে 'সোনামণি' বলে ছাত্রদের ঘোষিত অনশনকে ভেঙে দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার আগে দুপুরে আমরা গোপনে গোপনে কেক বিস্কুট খেয়ে যে অনশন চালাচ্ছিলাম না, এমনও নয়।

কিন্তু সে তো ছেলেমানুষি কৌতুক। ১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে যখন জেলে গেলাম তখন রাজবন্দীদের অনশনের বোধহয় বিশদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। এবং সে অনশন, অনশনের কোনো কৌতুক ছিল না।

জেলের ভেতরে ঢুকে সাথীদের সঙ্গে আমিও অনশনে যোগ দিলাম। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তেমন কোনো চিন্তা করতে হয়নি আমাদের। চিন্তা করার উপায়ও ছিল না। সাথীরা ইতোমধ্যেই বিশদিন যাবৎ অনশন করে আছে। রাজবন্দী হিসাবে মর্যাদা আদায়ের দাবিতে। কাজেই আমার পক্ষে সেই অনশনে যোগ না দেওয়ার তো কোনো চিন্তা আসতে পারে না।

কিন্তু অনশনটা কী? এটা এতদিন জানতাম না। অনশনের কথা শুনেছি। কিন্তু অনশন কী, তা এবারই মাত্র জীবনে প্রথমে জানতে শুরু করলাম।

আর এ জানা হঠাৎ জানা নয়। এ জানা একদিনে ঘটে না। একদিনে ঘটতে পারে না।

'৪৯-৫০ এর অনশনে শুধু যে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের পুরুষ রাজবন্দীরাই যোগ দিয়েছিলেন, তা নয়। যে কজন মহিলা রাজবন্দী ছিলেন তখন ঢাকা জেলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরাও দীর্ঘ এই অনশনে যোগদান করেছিলেন। আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম ঢাকা তাঁতীবাজার এলাকা থেকে। বর্তমানের কবি এবং সাংবাদিক সন্তোষগুপ্তের বাসা থেকে। বন্ধুবর সন্তোষগুপ্তের আশ্রয়েতেই বসেছিল আমাদের রাজনৈতিক সাংগঠনিক গোপন আলোচনা। এবং তার উপরে পুলিশের আকস্মিক হামলাতে গ্রেফতার হয়েছিলাম আমি, সন্তোষগুপ্ত, জ্ঞান চক্রবর্তী, মনুমিয়া, সন্তোষের বৃদ্ধা মা এবং রানু চ্যাটার্জী। রানু চ্যাটার্জী ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা অজিত চ্যাটার্জীর স্ত্রী। সন্তোষ বাবুর মা ছিলেন বিধবা। জেলে এসে সন্তোষ বাবুর বৃদ্ধা মা এবং রানু চ্যাটার্জী এ দুজন মহিলা বন্দিও অনশনে যোগ দিয়েছিলেন।

আমাদের ধরে নিয়ে, একরাত কোতোয়ালী থানায় রেখে, ঢাকা জেলের ভেতরে যেখানে ঢোকানো হলো তার নাম 'আট ডিগ্রি। এর ভয়ঙ্কর পরিচিতি 'কনডেমনড সেল' বা 'ফাঁসির ডিগ্রি' বলে। পাশেই ফাঁসির মঞ্চ। যাদের ফাঁসির হুকুম হয়, তাদের এই ডিগ্রিতে এনে রাখা হয়। 'আট ডিগ্রি' মানে জেলের বৃহৎ বেষ্টনী-দেয়ালের মধ্যে আবার দেয়াল ঘেরা পরপর খাড়া করা আটটা খুপরি। এক মুখওয়ালা খুপরি। সামনের দিকটাতে লোহার গরাদ। বাকি তিনদিক একেবারে নিচ্ছিদ্রভাবে আটকা। ডিসেম্বরের শীত। আমাদের অর্থাৎ যতদূর স্মরণে পড়ে আমাকে, জ্ঞান চক্রবর্তী, সন্তোষগুপ্ত এবং ভূমিহীন কৃষক নেতা মনুমিয়াকে ঢোকানো হলো এই আট ডিগ্রিতে। পাকা ঠাণ্ডা মেঝেতে কয়েকটা শক্ত আলওয়ালা কম্বলের উপর বসা শোয়ার ব্যবস্থা।

বোধহয় রাতের বেলা ঢুকিয়েছিল। সকালে দেওয়া হলো নাস্তা হিসাবে 'লফসি'। জেলের আদিকাল থেকে পরিচিত ডাল-চালের খিচুড়ি। প্রায় 'আলুনী' নামে আনুনী। প্রায় অসিদ্ধ। আমরা বললাম, 'আমরা খাবার খাব না।' জেল কর্তৃত্বের প্রতিনিধি, জমাদার-সিপাহীরা তম্বি করল : 'তাহলে আপনারাও হাংগার স্ট্রাইক করলেন?' আমরা বললাম : হ্যাঁ আমরাও হাংগার স্ট্রাইক করলাম।

এরপরে আর কোনো বাক্য বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল না। সিপাহী-জমাদারদের চক্ষু আরো রক্তবর্ণ হলো। জেলখানাতে এসে জেলের খাদ্য গ্রহণ অস্বীকার করা যে একবারে সশ্রম কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ, তা বুঝিয়ে দিতে তারা কসুর করল না। 'ডিগ্রির' পাহারা আরো কড়া হলো। সাধারণ কোনো কয়েদীর সঙ্গেও যেন আমরা কোনো কথা না বলতে পারি তারও কড়া হুকুম জারী করা হলো।

আমরা জেলের খাওয়া খেলাম না। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ জেলের নিয়ম মতো সকালে লফসী এবং দুপুরে ও রাতে ভাত, ডাল ও ঘ্যাট থালায় করে আমাদের সামনে রেখে যেতে লাগল।

খাদ্য চোখের সামনে রেখে দেওয়ার মনোবৈজ্ঞানিক কারণটা তখন বুঝিনি। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখেছি, এ নিয়ম সাংঘাতিক নিয়ম। তুমি বন্দী, সেলে বন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দী। তুমি আকাশের মুখ দেখবে না। তুমি কোনো মানুষের মুখ দেখবে না। তোমার কোনো কাজ নাই। কেবল শুয়ে থাকা। কেবল অতীত নিয়ে নিজের মনে চিন্তা করা। এমন অবস্থায় তোমার বিদ্রোহ, তুমি খাবে না? কতদিন তুমি খাদ্য না খেয়ে থাকতে পারবে? রোজ তোমার সামনে খাবার দেওয়া হবে। আর ঐ খাবার সামনে রেখেই তোমার মনে প্রতিজ্ঞাকে তোমার বজায় রাখতে হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষার এর চাইতে আর কোনো বড় পরীক্ষা হতে পারে না। অনশন বন্দী হিসাবে আমাদের জীবনধারণের যে একটু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল সে হচ্ছে এই যে, খাবার মধ্যে আমরা কেবল পানি খাব। আমরা যে কজন একসঙ্গে প্রথম কয়েকদিন ছিলাম, তাদের আলোচিত কথা হলো : এটা আমাদের সংগ্রামের পন্থা, আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নয়। কিন্তু জলটুকু পর্যন্ত পান না করলে জীবন অল্প কদিনের মধ্যেই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই প্রয়োজনমত পানি আমাদের খেতে হবে। কিন্তু শুধু পানি খেয়ে আপনি কদিন থাকতে পারেন?

প্রথমদিন গেল। প্রথম দিনের শেষের ভাগে, অর্থাৎ সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে পেট মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু তখনো দেহের উপর মনের নিয়ন্ত্রণ তো হারাইনি। তবু তখন থেকে টের পেলাম, এখন থেকে আমার দুটো সত্তার ক্রমান্বয়ে জন্ম হচ্ছে : একটা আমার চেতন, রাজনৈতিক সত্তা। সে খাদ্য গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকছে। কিন্তু আর একটা সত্তা দেহের সত্তা, পেটের অস্ত্রের সত্তা।...

বলছিলাম আমার দুই সত্তার কথা। মনের সত্তা আর দেহের সত্তা। মনের সত্তা চাচ্ছে অনশনে অটল থাকতে। দেহের সত্তা চাচ্ছে খাদ্য গ্রহণ করতে। এই দুই সত্তার সংঘাত অনশনের গোড়াতে—ধরুন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিন যাবত যত তীব্র থাকে, তারপরে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসাতে কিছুটা অসাড় হয়ে পড়ে। কিন্তু গোড়াকার এই দিনগুলিই বড় সংকটজনক।

সেই অনশনের প্রথম ছদিনের কথা স্মরণ করলে আজ মনে কৌতুকের সঞ্চার হয়। 'সেলের' মধ্যে দিনরাত মেঝেতে চোখ বুজে শুয়ে থাকি। মাথার কাছে জেলের সিপাহী-জমাদার সকাল বিকাল ভাত-তরকারি থালায় করে রেখে যায়। আমি মাঝে মধ্যে কেবল কিছু লবণ মিশিয়ে পানি খাই। এটা আমার বয়স্ক সাথীদের উপদেশ। এটা নাকি প্রয়োজন, শরীরের ভেতরে যে বিষাক্ত পদার্থ জমছে এই অস্বাভাবিক জীবনে, তার কিছুটা বহিষ্করণের জন্য।

একদিন যায়, দুদিন যায়, তিনদিন যায়। অনশন বন্দীরা যে হঠাৎ মরে না যায় সে জন্য জেলের ভেতরকার ডাক্তার তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে রোজ এসে আমাদের এক নজর দেখে যায়। দরকার মতো নাড়ী টেপে। বুকে স্টেথিসকোপ লাগায়। আমরা নির্বিকারভাবে মেঝেতে কম্বলের শয্যায় পড়ে থাকি।

ক্রমান্বয়ে টের পেলাম শরীরের চাহিদা, বলা চলে লোভ ভাত-ডালের চাইতেও মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যের প্রতি বাড়ছে। এবং মিষ্টি বলতে একেবারে ঢাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিখ্যাত সন্দেশ, রসগোল্লা, চমচম, প্রাণহরার প্রতি। এখন চোখ বুজলে কিংবা খোলা রাখলেও মনের সামনে ভেসে ওঠে এই সমস্ত মিষ্টি দ্রব্যের চেহারা। ক্রমান্বয়ে এর স্বভাবটি আরো একটু অগ্রসর হলো। 'মরণচাঁদের' মরণ নাই। আজো যেমন আছে, সেই ত্রিশ বছর আগে তখনো ছিল। ছিল নওয়াবপুরের রাস্তায়, দক্ষিণ দিকে। যখন মুক্ত ছিলাম তখন ঐ মিষ্টির দোকানে মাঝেমধ্যে গিয়ে রসগোল্লা সন্দেশ কি খাইনি? খেয়েছিলাম নিশ্চয়ই। সে খাওয়াটা এখন বেশ কাজে লাগল। এখন চোখের সামনে প্রায় দিনরাতই 'মরণচাঁদের' ছবি ভাসে এবং আমি নির্বিঘ্নে বিনেপয়সার প্রাণহারা, চমচম, সন্দেশ, পানতোয়া, রসগোল্লা খেয়ে চলি। দেহের আর দোষ দিই কি করে? একটা জীবন্ত দেহের কোষগুলি বাঁচতেই চাইবে। সে বাঁচার জন্য চাই এনার্জি, তেজ। আর সেই তেজের উপাদানই নাকি চিনি, মানে মিষ্টি। কিন্তু এমন মানসিক ভোজে দেহকোষগুলি তেমন সুবিধে করতে পারেনি। তাই ছদিন যখন পার হয়ে গেল, তখন সপ্তম দিনের সকালে দেখলাম জেলের ডাক্তারের হুকুমে জেলের একদল বরকন্দাজ স্ট্রেচার এনে তার উপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে নিয়ে এল জেলের হাসপাতালে।

হাসপাতালে আসাতে মনটা একটু তাজা হয়ে উঠল। কারণ তখন জেলের ভিতরে অনশন বন্দীদের সংখ্যা এত যে তাদের প্রত্যককে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। জেলের ভেতরে বিচ্ছিন্ন রাখার মতো যত খুপরি আছে সেগুলি সবই ভরে গেছে অনশন বন্দীতে। 'ফাঁসী ডিগ্রি', 'পুরোন বিশ', 'নতুন বিশ', 'সাত', 'ছয়' : এই প্রকার হচ্ছে তাদের আখ্যান। এগুলিকে বাইরের দুনিয়ার মানুষ চিনবে না। কিন্তু ঢাকা জেলের অধিবাসীদের নিকট এদের প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ অর্থমণ্ডিত পরিচয় আছে। সে সব 'ডিগ্রিই' ভরে গেছে অনশন বন্দীতে। এবং এদের মধ্যে শরীর যাদের একবারে কাহিল এবং সঙ্কটজনক হয়ে পড়েছে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে জেলের ভেতরের হাসপাতালে। একটা বড় দোতলা দালানে এই হাসপাতাল। উপরে নিচে চারটে হলঘর। তাতে কোনটাতে অসুস্থ সাধারণ কয়েদীও আছে। সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে রাজবন্দীদের রাখতেও কর্তৃপক্ষে অনিচ্ছা। আশঙ্কা, রাজনীতির জীবাণু সাধারণ কয়েদীদের মধ্যেও সংক্রমিত হবে। আবার রাজবন্দীদের একসঙ্গে রাখারও অনিচ্ছা। এক সঙ্গে থাকলে ওরা আলাপ-আলোচনায়, মিটিং-বৈঠকে, নিজেদের চাঙ্গা করে রাখে। কিন্তু উপায়ান্তর নাই। হয় এটা নয়, নয় ওটা। আর দেখলাম, হাসপাতালে ইতোমধ্যে প্রায় জনপঞ্চাশেক অনশন বন্দীকে স্থানান্তর করে আনা হয়েছে। সকল বন্ধুদের নাম এখন মনে নাই। কিন্তু এখানে এসে পাওয়া গেল ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা ফণী গুহকে। এখানে পেয়েছিলাম রেল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা, যিনি একজন নামকরা অংকবিদ ছিলেন, সেই সুকুমার চক্রবর্তীকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া ছিলেন রেল শ্রমিক ইউনিয়নের সংগঠক ধরণী রায়। এছাড়া ছিলেন চট্টগ্রামের কৃষক নেতা আবদুস সাত্তার। ছিলেন চট্টগ্রামের কতুবদিয়ার স্বভাবকবি, যুবক ধীরেন শীল। বিক্রমপুরের ছোট্টখাট্ট মানুষটি, কৃষক সংগঠক সুশীল ঘোষ। হাসপাতালেই পেলাম আল-মুতী-শরফুদ্দিনকে। আমার গ্রেফতারের কয়েকদিন পূর্বেই বোধহয় অনশনের প্রচার-পোস্টার লাগাতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন আবদুল্লাহ-আল-মুতী। গ্রেফতার হয়েছিলেন কিশোর ছাত্র-কর্মী আলী আকসাদ।

প্রথম ছদিনেও যখন আমি স্বেচ্ছায় অনশন ভাঙলাম না এবং আমার শরীর স্বাভাবিকভাবে কাহিল হয়ে পড়ল, তখন হাসপাতালে নিয়ে এসে অপর অনশনবন্দীদের সাথে আমাকেও জবরদস্তি খাওয়াবার বা 'ফোর্সড ফিডিং' ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হলো।

এ ব্যবস্থাটি বেশ ভয়াবহ এবং কৌতুকজনক ছিল। দেখতাম, রোজ সকাল দশটার দিকে তাগড়া-জোয়ান একদল সাজাপ্রাপ্ত এবং বেদরদী কয়েদীসহ জেল হাসপাতালের কম্পাউন্ডার বা ডাক্তার একটা বাহিনী নিয়ে এসে চড়াও হত। তাদের হাতে থাকত বালতির মধ্যে পানির সাথে দুধের পাউডার মেশানো 'দুধ-পানি'। ডাক্তারি বিধানে তার একটা নির্দিষ্ট মান হয়ত থাকতে পারে কিন্তু জেলের যে কয়েদী বাহিনীর হাতে এই দুধের পাউডার পানিতে মেশাবার ভার ছিল, তারা যে হাতে হাতে সেই মিষ্টি পাউডার বিনা পানিতেই আনন্দের সঙ্গে গলার মধ্য দিয়ে নিজের পেটে পুরে রাখত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে ডাক্তারি বিধানকে উপেক্ষা করে 'দুধ-পানির' মান তরল থেকে তরলতর হওয়ারই প্রবণতা দেখাত।

অনশন বন্দীদের সঙ্কট কম নয়। তারা স্বেচ্ছায় খাদ্য বর্জন করে অনশন করছে। তাদের দাবি : রাজবন্দীদের 'রাজনৈতিক বন্দী'র মর্যাদা দিতে হবে। সে দাবি না মানা পর্যন্ত তারা স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ করবে না। জেল কর্তৃপক্ষের চেষ্টা, স্বেচ্ছায় না খেলেও বন্দীদের পেটের মধ্যে কিছু পরিমাণ তরল খাদ্য ঢুকিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এতগুলো বন্দী যদি হঠাৎ মরে যায়, তার ধাক্কাটা বাইরে যাই লাগুক বা না লাগুক, জেল কর্তৃপক্ষের উপর কিছুটা যে আসবে না, এমন কথা বলা যায় কেমন করে। তাই রোজ সকালে এই বাহিনীর আগমন। তাদের কাজের প্রক্রিয়াটি ছিল এরূপ : প্রত্যেক অনশনবন্দীই দীর্ঘ অনশনে এমনিতেই কাহিল হয়ে আসছিল। তারা প্রায় সময়ই শায়িত থাকত বিছানায়। ফোর্সড ফিডিং-এর এই বাহিনী এসে এক একজন বন্দীর কাছে গিয়ে তার হাত-পা চেপে ধরত, পাছে বন্দীরা বাধা দেয়। তাদের হাত-পা চেপে ধরে তাদের নাকের মধ্য দিয়ে একটা রবারের নল পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করত। এবং এই রবারের নলের উপর দিকে রাখা বাটি বা কুপিতে সেই দুধ মেশানো পানি একসের কি আধসের ঢেলে দিত। এভাবেই খাওয়ানো হতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনশনবন্দীদের। কিন্তু কণ্ঠনালীর দুটো নাকি মুখ। এর এক মুখ গেছে খাদ্যনালী হয়ে পাকস্থলীতে। অপর পথ গেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের নালী হয়ে ফুসফুস যন্ত্রে। সব চাইতে আশঙ্কা ও বিপদ ছিল এই রাবারের নল ঠিকমতো না ঢুকাবার চেষ্টা হলে খাদ্যনালীর বদলে ফুসফুসের নালীর মধ্যে চলে যাওয়ার।

এবং গ্রেফতার হয়ে জেলখানার ভেতরে ঢুকে শুনলাম সেই মর্মান্তিক কাহিনী : কুষ্টিয়ার শ্রমিক নেতা, অনশনবন্দী শিবেন রায়ের নির্মম হত্যার কাহিনী। সে ঘটনা বোধহয় ঘটেছিল ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সালে। অন্যতম অনশনবন্দী হিসাবে শিবেন রায় সকল বন্দী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিনরাত আবদ্ধ থাকেন একটা 'ডিগ্রিতে'। এমনি অবস্থাতে একদিন সেই জবরদস্তি খাওয়াবার বাহিনী তার 'সেলে' এসে তাকে চেপে ধরে নাকের মধ্য দিয়ে রবারের নল ঢুকিয়ে দিল্ কিন্তু কণ্ঠনালীতে পৌঁছে সে নল পাকস্থলীতে না গিয়ে ঢুকে গেল ফুসফুসের নালীতে। শুনেছি, এই সময় বন্দীর তরফ এত যে আপত্তি ও বাধাদান করা হয়, তাকে গ্রাহ্য না করে পাষণ্ডদের ঐ বাহিনী জোর করেই নল আরো ঢুকিয়ে তার মধ্য দিয়ে দুধ ঢেলে বন্দী শিবেন রায়কে সেলের মধ্যে ফেলে রেখে তালা দিয়ে চলে আসে। এবং সেই রাতেই শিবেন রায় দমবন্ধ হয়ে একাকী সেলের মধ্যে নিহত হন। এমন নির্মম হত্যার কাহিনীও সেদিনকার রাজনীতিক আবহাওয়ায় জেলের বাইরে তেমন কোনো প্রতিবাদ তুলতে পারেনি সেই ১৯৪৯ সালে। আজকের '৮১ থেকে ত্রিশ বছরের অধিক কাল আগে। তখনকার রাজনীতিক আবহাওয়া ছিল এমনি নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের আবহাওয়া।

শিবেন রায়ের আত্মদানের পরে জেলের ডাক্তারদের তরফ থেকে সতর্কতা হয়ত একটু বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফোর্স ফিডিং-এ দুধ মেশানো পানির মান হয়ত একটু উন্নত হয়েছিল। কিন্তু জবরদস্তিতে দেওয়া সে তরল পানি দেহের কোনো চাহিদাই পূরণ করতে পারত না। বরঞ্চ তার ফলে ক্ষিধের যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পেত। যখনকার কথা বলছি তখন হয়ত কুড়ি দিনেরও অধিক অতিক্রান্ত হয়েছে। সে এক সঙ্কটজনক অবস্থা। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তখনো কোনো আপোসের কথা বলা হচ্ছে না। অনশনবন্দীদের মধ্যে কারো কারোর মধ্যে যে কিছু কিছু দুর্বলতার প্রকাশ পেতে লাগল না, এমন নয়।

আমার নিজের কথা ভাবতে গিয়ে আজ কিছুটা বিস্ময় বোধহয়। গোড়া থেকে যারা অনশন করছিলেন তাদের ৫৮ দিন পুরো হওয়ার পরে একটা ফয়সালা হয়েছিল। কাপড়-চোপড় এবং থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে কিছু মর্যাদা এবং উন্নত অবস্থার স্বীকৃতি দেওয়া হলো। আমি যোগ দিয়েছিলাম এই অনশনে কয়েকদিন পরে। অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষের দিকে। কিন্তু আমার অনশনও ত্রিশ দিন পুরো হয়েছিল। কেমন করে যে সেই ত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে আজ আর স্মরণ করতে পারছি নে। তবে নিজের দুর্বলতা কাটাতে নিজের মনের একটা তর্ক এবং যুক্তির কথা আজো মনে ভেসে উঠছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দিদের মনে যখন প্রশ্ন উঠত : আর কতদিন, তখন আমার নিজের সিদ্ধান্ত নিতে কোনো অসুবিধে হত না। সে এ কারণে নয় যে, আমি বিপ্লবী বা সাহসী ছিলাম। আমার সামনে ছিল অপর সাথীদের দৃষ্টান্ত। তাদের মধ্যে সবল-দুর্বল, সকলেই আমার থেকে এগিয়ে ছিলেন বিশ দিনেরও বেশি। আমি ভাবতাম, এদের সকলেরই তো বিশ দিন পূরণ হয়েছে। আমার নিজের সিদ্ধান্তের প্রশ্ন তো এখন নয়। প্রশ্ন আসবে এই বিশ দিন পূরণ করার পরে। আমি নিজে অনশনের বিশ দিন পূরণ করেই না প্রশ্ন করতে পারব নিজেকে : 'আর কত দিন?' কিন্তু আমার যখন বিশ দিন, তখন অপর সাথীদের চল্লিশ দিন হয়ে গেছে। এবং তখনো একই কথা : আমার চল্লিশ দিন হলেই না প্রশ্ন : আর কতদিন?

তবে এই চল্লিশ দিনের দিকেই বোধহয়, দেখলাম হাসপাতালে রাজবন্দীদের নেতৃবৃন্দ বিশেষ চিন্তিত হয়ে আলোচনায় বসেছেন : কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ন্যূনতম দাবি না মানা পর্যন্ত অনশন ভাঙা চলবে না এবং এই কঠিন পণ সামনে রেখেই আত্ম-সমালোচনার আহ্বান জানান হলো। যার যে দুর্বলতা আছে তা তিনি স্বীকার করুন। অন্তত : নিজের কাছে করুন। এবং সে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। এই আলোচনার যিনি নেতা ছিলেন সেই ফণী গুহের তীক্ষ্ণ বাক্যের রেশ যেন এখনো আমার কানে বাজছে। শহীদ সাথী শিবেন রায়ের আদর্শ সামনে রেখে সকল সাথীদের ছোটবড় ত্রুটিকে সমালোচনা করে সেদিন তিনি অপর সকলকে সেই আমরণ অনশনের সংগ্রামে দৃঢ়, মজবুত রাখার চেষ্টা করেছিলেন।...

অবশেষে আটান্ন দিনের পরে অনশন শেষ হলো। জেল কর্তৃপক্ষ সকল রাজবন্দীদের একত্র মিলিত হতে দিলেন। বন্দীদের মধ্যে একটা বিজয়ের আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। বস্তুত সেদিনকার সেই সংগ্রামের ফলেই পাকিস্তানে সেই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের বন্দীরা রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ করেছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ সাংঘাতিক রকমের কিছু মঞ্জুর করান না গেলেও সাধারণ কারাদণ্ডভোগী কয়েদীর চাইতে অবস্থার অনেকটা সুসহ হলো। খবরের কাগজ দুএকটি পড়তে পাবার সুযোগ হলো। এবং জেলের মধ্যে কিছুটা খেলাধুলারও সুযোগ মিলল।

৫৮ দিন যাবত খাদ্য বলতে যা বুঝায় তা না খাওয়াতে শরীরের ভেতরের কলকজা যে অনেকখানি অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল, অনশনে বিজয়ের আনন্দে বন্দীরা সেটা যেন ভুলে গেলেন। ফলে অনশন ভঙ্গের সময়ে স্বাভাবিকভাবে খাবারে যে তীব্র আগ্রহ জন্মেছিল এবং সেই শারীরিক অবস্থায় যে সতর্কতা গ্রহণ করা সবার জন্য অপরিহার্য ছিল, তা গ্রহণ না করায় যে জটিলতা অনশনের মধ্যে দেখা দেয়নি, সে রকম নানা জটিলতা অনশনভঙ্গের পরে দেখা দিতে লাগল।

ফণী গুহকে জেল কর্তৃপক্ষ অনশন সংগ্রামের মূল নেতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং অনশন ভঙ্গের পরপরই তাকে ঢাকা জেলের বন্দীদের কাছ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছিন্ন করে ময়মসিংহ জেলে নিয়ে যাওয়া হলো, সম্ভবত ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারির মধ্য ভাগে। কিছুদিন পরে খবর এল, ফণী গুহ ময়মনসিংহ জেলে মারা গেছেন। এ এক নিদারুণ শোকের সংবাদ ছিল। ফণী গুহের মৃত্যুর প্রকৃত অবস্থা আজ পর্যন্ত উদঘাটিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আমরা যারা ঢাকা জেলে রইলাম, তাদের মধ্যেও নানা জটিলতার প্রকাশ দেখা গেল। চট্টগ্রামের কৃষক নেতা অমর সেন, দেখলাম, সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। এমন যে ভদ্র, সংযত, লজ্জাশীল কৃষক নেতা, তিনি সব সম্বিত হারিয়ে বস্ত্রহীন হয়ে গেছেন। বিক্রমপুরের সুশীল ঘোষেরও অমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল।

কুতুবদিয়ার কৃষক-যুবকর্মী এবং স্বভাবকবি ধীরেন শীল অনশন ভঙ্গের পরেও খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে লাগলেন। যারাই তাঁকে খেতে বলছে, তারাই সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তারা কর্তৃপক্ষেরই এজেন্ট এবং অনশন ধর্মঘট এখনো চলছে। তাঁর জীবনও প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। যাই হোক কোনো প্রকারে ক্রমান্বয়ে এই ধকল বন্দীরা কাটিয়ে উঠছিলেন।

অনশনের পরে হাসপাতাল থেকে আমাদের আবার নানা ডিগ্রি এবং ওয়ার্ডের স্থানান্তরিত করা হলো। আমাকে এবং আরো কিছু সাথীকে নেওয়া হলো 'পুরোন বিশে'। সেখানে আমার 'ডিগ্রি' বাদে বাকি ১৯ 'ডিগ্রিতে' উনিশজন সাথী ও বন্দীর সাহচর্যে আমার একটি সহৃদয় জগৎ তৈরি হচ্ছিল। ঠিক এমন সময়ে, বোধহয় ১৯৫০-এর মার্চে, আমাকে ঢাকা থেকে নিয়ে যাওয়া হলো দেশের পূর্বপ্রান্তে : সিলেট জেলে।

সিলেট জেলে নিয়ে চারদিকে আস্ত বাঁশের ঘের দেওয়া একটা হল ঘরের অপর রাজবন্দীদের সঙ্গে যখন আমাকে রাখা হলো, তখন যে মুখগুলিকে সামনে দেখেছিলাম তাদের কাউকেই আমি পূর্বে পাইনি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এই বন্দীনিবাসে যে পরিচয় ঘটল ক্রমান্বয়ে, এমন হৃদ্যতাময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাইরের জীবনে আমার পক্ষে লাভ করা আদৌ সম্ভব হত না। তাই জেল থেকে জেলান্তরের প্রথম আঘাতে যত বিমর্ষই হয়ে থাকি না কেন, এবার আমি কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করতে লাগলাম। এখানেই দেখা হলো বয়স্ক কৃষক নেতা অজয় ভট্টাচার্য, লালা শরবেন্দু দে, দ্বিজেন সোম, জ্ঞান দাস এবং যুবনেতা হোসেন বখত এবং তরুণ ছাত্রকর্মী প্রিয়ব্রত দাস, তার ছোট ভাই ছাত্রকর্মী সত্যব্রত দাস, বুদ্ধিদীপ্ত কিশোর ছাত্র বিজন পুরকায়স্থ, কিশোর শিল্পী গোপেশ মালাকার—এদের সঙ্গে।

ঢাকার জেলের ঘটনা সেদিনকার নিস্পৃহ জনপ্রবাহে তবু কিছু পৌঁছাত এবং তাতে কোনো না কোনো অংশে ক্ষোভ এবং সহানুভূতির ঢেউ কিছু জাগত। কিন্তু প্রত্যন্ত সিলেটের কথা এবং সেই সিলেটের জেলের অভ্যন্তরে সেদিনকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যাচারী শাসকদের নির্মম অত্যাচারের কথা কে জানত? আমিও তা আগে জানিনি। আর সেই অজ্ঞাত কাহিনী সিলেট জেলের বন্দী বন্ধুদের কাছে শুনে আমরা নিজেরা ঢাকা জেলে যে নির্যাতন সহ্য করেছি তা নিজের কাছেই তুচ্ছ বলে বোধ হতে লাগল।

ঢাকা জেলের অনশন সংগ্রামের কথা কোনো প্রকারে সিলেটের রাজবন্দীরা শুনতে পেরেছিলেন। এবং তার ভিত্তিতে তাঁরাও সিলেট জেলে জানুয়ারি (১৯৫০) মাসেই অনশন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। এর জবাবে সিলেট জেলের জেল কর্তৃপক্ষ বন্দীদের কেবল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, তাদের উপর কী নির্মম দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছিল তার কাহিনী কিশোর বন্দী সত্যব্রতের মুখে শুনতে শুনতে আমি সেদিন শিহরিত হয়ে উঠেছিলাম।

এ কাহিনী বিস্মৃত হবার নয়। অথচ সে কাহিনী আমাদের বর্তমানের সংগ্রামী তরুণদের কজনে জানে? এই না জানা তাদের ইচ্ছাকৃত নয়। আমাদের দেশের শাসককুল এবং বৈরী অবস্থাই সেদিনকার সংগ্রামীদের সেই অসম সাহসী সংগ্রামের কাহিনীকে বিস্মৃতির অন্ধকার গুহার মধ্যে নির্বাসিত করেছে। অথচ সেই না-জানা বর্তমানে সমাজ পরিবর্তনে নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধাদের জন্য কতো লোকসানের বিষয়। এই বোধ থেকে প্রায় দশবছর আগে কয়েকটি কিশোর সঙ্গে গল্প বলার মাধ্যমে যে কথা কয়টি আমি বলেছিলাম তাকে উদ্ধার করেই আবার বলছি :

সিলেট জেলে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার কিশোর বন্দী কাজল (সত্যব্রত), গোপেশ আর বিজনের সাথে। গোপেশ আজ গোপেশ মালাকার। আমাদের তরুণ শিল্পীদের অন্যতম। সিলেট জেলের ডিগ্রি কুঠুরীর দেয়ালে সেদিনও দেখেছি অঙ্গারে আঁকা গোপেশের হাতের ছবি। বদ্ধ কুঠুরীতে দিন কাটাবার এবং বেঁচে থাকবার স্বাক্ষর।

অনশন করেছে, এই অপরাধে কাজল, বিজন আর গোপেশকে ভিন্ন ভিন্ন কুঠুরীতে তালাবদ্ধ করে জেলের কর্মচারী, তার সিপাহী, জমাদার আর ষণ্ডা কয়েদীরা একদিকে কিশোর বন্দীদের সামনে ভাতের থালা রেখেছে আর বিরামহীনভাবে প্রহার করে বলেছে : 'খা, ভাত খা। ওরা যতই বলেছে, আমরা রাজবন্দী। তোমরা বিনা দোষে, বিনা বিচারে আমাদের আটকে রেখেছ। আমাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে হবে, ততই ওদের প্রহার গেছে বেড়ে। এত নির্যাতনেও যখন কিশোর বন্দীরা অনশন ভাঙেনি, তখন ওদের কুঠুরী থেকে পানির ভাণ্ডটুকুও জেল কর্তৃপক্ষ সরিয়ে নিয়েছে।

কাজলের কথা যেন আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি : 'এখন ওরা আর আমাদের পানিটুকুও খেতে দিচ্ছে না। কিন্তু পানির পিপাসা যে বেড়ে যাচ্ছে। ভাত না খেয়ে থাকতে পারি। কিন্তু পানির পিপাসায় শরীর যে জ্বলতে শুরু করেছে। তাই বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দীশালার সিপাহী-সান্ত্রীর কাছে মাথা নোয়াতে আমরা চাইনি। একদিন যায়। দুদিন যায়। তবু ওরা একটু পানি দিল না। মুখের ভেতরে যে লালা ছিল, তাও শুকিয়ে গেছে। এখন জিব চুষলে রক্ত বেরোয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারির কনকনে শীত। ঠাণ্ডা মেঝে। একটু বিছানা নাই সাথে। তবু পিপাসায় শরীর গরম হয়ে উঠছে। একটু যদি ঠাণ্ডা করতে পারি, এই চেষ্টায় গায়ের কাপড় ছেড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম।'

'৪৭-এর পরে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববাংলার সকল জেলের অভ্যন্তরে রাজনীতিক বন্দীরা যে অসহনীয় অত্যাচার ভোগের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং প্রাণান্তকর যে প্রয়াস দ্বারা নিজেদের রাজনৈতিক চেতনা এবং মনোবলকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, সে কাহিনী পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসের এক মহৎ অনুপ্রেরণার কাহিনী। ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন প্রাক্তন রাজবন্দীর ডায়রী

কয়েকদিন যাবতই খাতাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। বুঝতে পারছিনে খাতাটি নিয়ে কী করব। এর শেষের পৃষ্ঠাগুলো প্রায় ছিঁড়ে গেছে। প্রথম পৃষ্ঠাতে কয়েকটি সিলমোহর আছে। একটি সিলমোহর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিন্টেডেন্টের। আর একটি সিলেট জেলের। এবং তৃতীয়টি কুমিল্লা জেলের। সিলমোহরের প্রথম তারিখটি হচ্ছে ২৮-৫-৫০। তার মানে আজকের এই ১৯৮১ সাল থেকে ত্রিশ বছরেরও আগের তারিখ। খাতাটি সেদিনকার একটি তরুণ রাজবন্দীর নামে জেল কর্তৃপক্ষ পাশ করেছিলেন। জেলের অভ্যন্তরে কর্তৃপক্ষের নিয়ম-কানুন মেনে রাজবন্দী যদি কিছু টুকিটাকি লিখতে চায় তার জন্য রাজবন্দীর নিজের পকেট খরচে লেখার কিছু সাজসরঞ্জাম কেনার অনুমতির চিহ্ন এটি। রাজবন্দীটির নাম ছিল সরদার ফজলুল করিম।

আমার বিস্ময় আমার বর্তমান নামের সঙ্গে এই নামটির মিলের কারণে যেমন তেমনি খাতাটির এত বছর বয়ে হওয়া এত বছর পর্যন্ত রক্ষিত হওয়া এবং পরিশেষে আমার হাতে এসে এর পৌঁছার কারণেও বটে।

নামের মিলে কী এসে যায়। আমি তো মনে করি বর্তমানের ব্যক্তিই মাত্র ব্যক্তি। একটি ব্যক্তি তার বর্তমান মুহূর্তটিতেই মাত্র আমি বা সেই মুহূর্তটিকেই মাত্র আমার বলে দাবি করতে পারে। অর্থাৎ বর্তমানের আমিই আমি। অতীতের আমি তো সে। বর্তমানের আমি এ কাজ না করে সে কাজ করতে পারি। আজ অফিসে না যেয়ে ঘরে বসে থাকতে পারি। মন্ত্রী পুত্র কন্যাদের কোনো কাজ করা, না করাকে নিবৃত্ত করতে পারি। এমনকি সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে ডানের কিংবা বামের উপাদান হিসাবে যুক্ত হতে পারি। মোটকথা বর্তমানেই আমি কিছুটা ব্যক্তিত্বময়, আপেক্ষিকভাবে কিছুটা স্বাধীন। কিন্তু গতকালের আমির উপর তো আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। গতকালের আমি যদি কাপুরুষ হয়ে থাকি তাহলে বর্তমানের বীরপুরুষ আমি গতকালের আমিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তিত করে দিতে পারিনে। আর গতকালের আমি যদি বীরপুরুষ হয়ে থাকি তবে বর্তমানের কাপুরুষও তাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে না। তেমন দাবিতে কোনো লাভ নেই। কিন্তু ত্রিশ বছর আগের এই খাতাটির উপর যার নাম লেখা আছে তার সঙ্গে বর্তমানের আমার নামের যে মিল তার কাপুরুষতা, বীরপুরুষতা নিয়ে আমি কথা তুলছিনে। আমার কথা হলো, অতীত বর্তমানের আওতার বাইরে। কিন্তু এমন করে কথা বললে একটা চরম সিদ্ধান্ত এসে যায় যে, তাহলে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমান যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারে। অতীত যাই হোক না কেন, বর্তমান স্বাধীনভাবে ডাইনে কিংবা বাঁয়ে ঘুরতে পারে। কিন্তু জীবন প্রবাহের দ্বান্দ্বিকতা এমনটি হতে দেয় না। বর্তমানও একেবারে স্বাধীন নয়। অতীত বর্তমানের আওতার বাইরে বটে, কিন্তু বর্তমান অতীতের আওতার বাইরে নয়। অতীতের মধ্য দিয়েই বর্তমানের আগমন। সে দিক থেকে বর্তমানের সঙ্গে তার বাঁধন বন্ধন। সে কারণেই ত্রিশ বছর আগের এই খাতাকে বর্তমানের জন্য, এবং সে কেবল বর্তমানের একই নামধারী আমার জন্য নয়, সকলকে নিয়ে যে বর্তমান তার জন্যও তাৎপর্যপূর্ণহীন নয়। এবং এ কারণেই খাতাটি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় বলেই, তাকে একেবারে বাতিল করে দিতে আমি পারিনে।

কিন্তু এর রক্ষিত হওয়ার কথাই আগে বলে নিই। রক্ষিত হওয়ার ব্যাপারটিও আমাকে চমৎকৃত করেছে। এ খাতা আমার স্মৃতির মধ্যে আদৌ ছিল না। প্রথম দফায় প্রায় ছবছর বন্দী থাকার পরে কখন আমি মুক্তি পেয়েছিলাম এবং তখন আমার সঙ্গে বন্দীনিবাসের লিখিত খাতাপত্র কী ছিল তা প্রায় ত্রিশ বছর পরে আমার কিছুই স্মরণে নেই। কিন্তু চমকে উঠলাম হঠাৎ কয়েকদিন আগে যখন স্নেহভাজন ভাগ্নে আলমগীর বলল, 'মামা, আপনার জেলখানার একটি খাতা আছে আমার কাছে।' কথাটি শুনে দুর্বোধ্যতার জিজ্ঞাসা নিয়ে তার দিকে তাকাতে ভাগ্নেটি বলল, 'আব্বা মারা যাবার কিছুদিন আগে আমাকে দিয়েছিলেন আপনার কথা বলে যে, এ খাতাটি আপনাকে যেন পৌঁছে দিই।' কথা কয়টি শুনে আমার চোখের পলক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পলকহীন দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠেছিল আমার ভগ্নিপতি জবাব ওফাজ উদ্দিন সাহেবের ছবিটি। রাশভারী মানুষ। আমার তো মুরুব্বি বটেই। সারাজীবন একাগ্রভাবে শিক্ষকতা করেছেন। বরিশালের এ. কে স্কুলের শিক্ষক। কোনো অহংকার করেননি তা নিয়ে। কোনো আফসোসও করেনি। তার আফসোস ছিল আমাকে নিয়ে।

ত্রিশ বছর আগের কথা। মুরুব্বীজনরা দৈনন্দিন জীবনযাপন করেন। নিয়মের জীবন। রাষ্ট্রানুগত্যের জীবন। তাঁদের স্নেহভাজন আমার সম্পর্কে তাঁদের আর কিছু বেশি আশার না থাকলেও এ আশা ছিল যে, দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের টাকাপয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখে স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন আমি যাপন করব। আজকের কথা বলে লাভ নেই। কিন্তু সেদিন সেই আশাটি মুরুব্বীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূরণ হয়নি। তাতেই তাঁদের আফসোস। তাঁদের দুঃখ, তাঁদের সংসারেরই একজন বেলাইনে চলে গেল। জীবনটা নষ্ট করে দিল পুলিশের হুলিয়ার নিচে আর জেলের বন্দিত্বে। কিন্তু বেলাইনে চলার জন্য আফসোসের পেছনেও এমন মুরুব্বিদের যে স্নেহও ছিল, বেলাইনের কেবল বিরোধিতা নয় কিছুটা গৌরববোধও যে ছিল, 'যাক না বেলাইন। ডাকাত তো নয়। দেশের জন্য, দশের জন্যই তো বেলাইন' সে বোধের প্রকাশ বেলাইনের সেদিনকার যাত্রী আমার জেলখানার এই খাতাটির এমন সযত্ন রক্ষণের মধ্যে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমন তাঁদের জীবনযাপনের কোনো আচার আচরণে প্রকাশ পায়নি।

অল্প বয়স্ক তরুণ ইঞ্জিনিয়ার ভাগ্নের সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান অনেক। যেমন বয়সের ব্যবধান ছিল তার পিতার সঙ্গে আমার। বয়সের ব্যবধান মানে যুগের ব্যবধান। আর এই ব্যবধানকে অতিক্রম করে যুগ যুগের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। একটা অপরিচয়ের সঙ্কোচ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তরুণ ভাগ্নেকেও নিজের মনের ভাবটি সেদিন প্রকাশ করে বুঝাতে পারিনি। তার কাছ থেকে খাতাটি নিয়ে আসার পর থেকে কেবল তাকে নাড়াচাড়া করছি আর ভাবছি, একে নিয়ে কী করি?

করার সত্যি কিছু নেই। ত্রিশ বছর এটিকে রক্ষা করা হয়েছে। যিনি রক্ষা করেছিলেন তাঁর আর কিছু না থাক তাঁর বয়সের অপর তীরবাসী এই রাজবন্দীর জন্য স্নেহ-সহানুভূতি ছিল। কিন্তু একালের বর্তমানের সেকালের বন্দীর জন্য অনুরূপ কোনো মমতা বা সম্পর্কবোধ আছে কিনা তা নিশ্চয় করে আজ বলা যায় না। আর তাই পুরোন দিনের এমন ছেঁড়া খাতা শুধু আমার জন্য নয়, দ্রুত বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বর্তমানের জীবন থেকে।

এ খাতা বিনষ্ট হয়ে যাক তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নেই। কিন্তু খাতাটি নাড়তে নাড়তে ত্রিশ বছর আগেকার এই খাতাটির মধ্যে আভাসিত জীবনের জন্য আমার আবার কৌতূহল জেগে উঠছে, একটা মমতাবোধ হচ্ছে, এমন কি একটা ইচ্ছা, আহা যদি ফিরে যেতে পারতাম সে দিনগুলোতে।

দিনগুলো খুব আরামের ছিল না। কিন্তু স্বপ্নের ছিল। রোমান্টিক স্বপ্নের। বলা চলে অবাস্তব স্বপ্নের। কিন্তু এটা তো সত্য নয়, অবাস্তব স্বপ্ন বাদে নিরেট বাস্তব পরিবর্তিত হতে পারে না।

এত ক্ষুদ্র আণবিক অক্ষরে কাগজের পৃষ্ঠায় কেউ লিখতে পারে? বিস্ময়ের ব্যাপার। রুলটানা খাতা। কিন্তু একটি লাইনের মধ্যে অন্তত তিন লাইনের লেখা। কাজেই এক খাতায় তিন খাতার বিষয়বস্তু। কেবল তিন খাতা নয় কোথাও প্রথমে পেনসিলের লেখা। তারপরে পেনসিলের ওপর আবার কালির লেখা। বুঝা যায় আতঙ্ক আছে মনে, পাছে আর একটি খাতাও কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে না দেয় জেলের ভেতরে। তাই সম্ভব মত সব রকম চেষ্টা যেন এক খাতাতেই তিন খাতার প্রয়োজন মেটানো যায়। যা কিছু লেখা তার বেশির ভাগই সেই সময়কার জাতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তর্জাতিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। বন্দীশালার কর্তৃপক্ষ চাচ্ছে যেন রাজবন্দী বন্দীশালার বাইরের জীবনের গতিটা উপলব্ধি করতে না পারে। যেন তার জীবনটা একেবারে গতিহীন হয়ে যায়। কিন্তু গতিহীন জীবনই তো ভবিষ্যৎহীন। কিন্তু রাজবন্দী তো দেশের এবং দেশের মহত্তর ভবিষ্যতের জন্যই বন্দিত্বের এই জীবনকে বরণ করেছে। আর তাই তার প্রাণান্তকর চেষ্টা, দেয়ালবদ্ধ গতিহীন বন্দিজীবনে বসেও বাইরের অনিরুদ্ধ গতির জীবনকে আঁচ করার। তারই স্মারক হিসাবে জাতীয় আন্তর্জাতিক ঘটনার, সংক্ষিপ্তাকারে হলেও, লিপিবদ্ধ বিবরণী। একটি ছত্রে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে : 'রিভিউ অব দি ইন্টারন্যাশনাল সিচুয়েশন অব এ ফোরর্টনাইট আপটু টুয়েনটিসিকথ্ ফেব্রুয়ারি, নাইনটিন্থ ফিফটি; ১৯৫০-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব পক্ষের আন্তর্জাতিক অবস্থার পর্যালোচনা।

এ কেবল ব্যক্তিক ইচ্ছার ব্যাপার নয়। সেদিন মানে ত্রিশ বছর আগে পূর্ব বাংলার জেলে সরকারের হাতে গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিল বামপন্থী বা কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক কর্মীরাই। তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। সমগ্র পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলে কয়েক সহস্র। পূর্ব বাংলার এমন কোনো জেল ছিল না যে জেলে রাজবন্দী ছিল না। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার ১৯৪৭-এর পরবর্তীকালেই বুঝতে পেরেছিল, সামাজিক পরিবর্তনের কথা সেদিন বলার নেতৃত্ব দেবে কারা। এবং আইন-বেআইনের পরোয়া না করে করে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা, কৃষকের ক্ষেত সবখান থেকে সেই প্রগতিশীল কর্মীদেরই তারা গ্রেফতার করতে শুরু করেছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের জোয়ারের পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীরা গ্রেফতার হয়ে পূর্ববঙ্গের জেলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং সেদিন তারা জেলের অভ্যন্তরে অনন্যোপায় হয়ে রাজবন্দীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মরণপণ যে সব সংগ্রাম করেছিল তার বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আজ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি। বর্তমানের উপলব্ধির অভাবে হয়তো তা কোনো দিন লিপিবদ্ধ হবে না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিকাশ, অগ্রগতি এবং রূপান্তরের ক্ষেত্রে সে পর্যায় যে একটি তাৎপর্যময় এবং বর্তমানের জন্য মহৎ ঐতিহ্যময় পর্যায়, এটি অনস্বীকার্য।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বর্ণনায় বন্দির রোজনামচায় দেখা যায় পয়েন্টের ভিত্তিতে লেখা আছে এমন কয়েকটি ছত্র : The Sovier camp of peace has gone on the offensive, on direct action against the imperialist camp, the camp of war mongers লেখা আছে The entire Bourgeois world is in the mire of crisis. The imperialist policy in China and South East Asia has failded abysmally. এছাড়া সমগ্র খাতাটিতে সেদিনকার সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাজনৈতিক পরিবেশে অন্ধকারতম বন্দীশালায় রাজবন্দীরা কেমন করে একে অপরের মনোবলকে উদ্দীপ্ত করে রাখার চেষ্টা করত আভাস আছে তার। তারই জন্য শত বাধা নিষেধের মধ্যেও জেলের ছোট সেল বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুপরিতে কিংবা ওয়ার্ড বা ঘরে নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের চেষ্টা কারুর দায়িত্ব অধিকতর দুর্বল বন্ধুদের পরিচর্যার, কারুর দায়িত্ব দৈনন্দিন সামান্য খাবারটুকুর সুষ্ঠু বিলি বন্টনের, কারুর দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের পাশ করা কাটাছেঁড়া খবরের কাগজের টুকরা থেকে খবর সংগ্রহ করে সাজিয়ে গুছিয়ে সহবন্দীদের বুঝাবার চেষ্টা করা : 'হতাশার কোনো কারণ নেই। আমাদের স্বপ্ন মৃত্যু মানে না। জীবনকে মৃত্যু কখনো পরাজিত করতে পারে না।' আর তারই জন্য বন্দীশালার মধ্যেও সোমেন আর সুকান্তের জন্মদিবস পালনের সীমাবদ্ধ হলেও ঐকান্তিক প্রয়াস। হয়ত তিন কি চারজন সহবন্দীর গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে বসে গুরুতরভাবে সোমেন সেই বাণীকে আবৃত্তি করা যেখানে সোমেনের গল্পের নায়ক উচ্চারণ করেছিল : 'ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলাম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে। তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম।' লিখে রাখা খাতার পাতায় ভাগ্যক্রমে পেয়ে যাওয়া সুকান্তের 'প্রস্তুত' কবিতার একটি টুকরা যেখানে কবি আত্মচরিতের ভাষায় বলছে :

'কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায়
নানা দিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়
ভীতমন খোঁজে সহজ পন্থা, নিষ্ঠুর চোখ,
তাই বিষাক্ত আস্বাদময় এ মর্ত্যলোক
কেবলই এখানে মনের দহন আগুন ছড়ায়
অবশেষে ভুল ভেঙেছে, জোয়ার মনের কোনে
তীব্র ভ্রূকুটি হেনেছে কুটিল ফুলের বনে
অভিশাপময় যে সব আত্মার আজো অধীর
তাদের সকাশে রেখেছি প্রাণের দৃঢ় শিবির
নিজেকে মুক্ত করেছি আত্মসমর্পণে।

খাতার কয়েকটি পৃষ্ঠায় রয়েছে তারিখসহ বন্দীর রোজনামচার টুকরো। আর তাতে ফুটে বেরিয়েছে পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়সের একজন বন্দীর সেদিনকার জীবনবোধ। ত্রিশ বছর দূর থেকে তার দিকে তাকাতে গিয়ে আজ তার জন্য কেমন যেন একটা মমতাবোধে মন ভরে ওঠে। এ রাজনামচার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে উপস্থিত করা মুশকিল। সেদিনকার এই বন্দীটির সঙ্গে আজকের আমির কিছুটা পরিচয় ছিল বলেই হয়ত ব্যাখ্যাহীনভাবেও আমি তার সঙ্গে সহমর্মিতা বোধ করি। আর সেই বোধ থেকেই আজো ইচ্ছা হয় সেই বন্দীটির রোজনামচার কথা কটি হুবহু ধরে রাখার চেষ্টা করি। এ একটা নিছক ব্যক্তিগত আবেগের ব্যাপার। হয়ত বিগতের জন্য মায়াবোধ, যাকে বলে 'নস্টালজিয়া'।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল : ১৪ মার্চ ১৯৫০ ॥ অল্প কয়েকজন কমরেড নিয়ে ছোট একটি সাহিত্য আসর। (আমরা সকলে পরস্পরকে 'কমরেড' অর্থাৎ সাথী বলে সম্বোধন করতাম।) কিন্তু কোথায়? কতগুলো দেয়ালের মধ্যখানে? আর কত উঁচু সে দেয়ালগুলি—অনেক তার উচ্চতা। শক্ত শিক দিয়ে তৈরি ছোট ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুপরিগুলোর সামনের গরাদ। কটা শিক? এক কমরেড একদিন কৌতুকভরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বলতো কটা শিক, কটা সিঁড়ি, কটা কড়িকাঠ, কটা ছাদের কাছের ঘুলঘুলির কাঠি? এক মিনিটে বলতে হবে। আমরা কেউ সঠিক করে বলতে পারিনি। কমরেড বলেছিলেন, 'নটা শিক, নটা সিঁড়ি, নটা কড়িকাঠ আর নটা কাঠি! আরে জেলের নিয়মই এই নয়ের নিয়ম।' আসলে জেলের নিয়ম কিনা জানিনে। কিন্তু ৫৮ দিনের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটে ১৯৪৯-৫০ সনে ঢাকা জেলের রাজবন্দীরা রাজবন্দীদের জন্য রাজবন্দীসুলভ মর্যাদার দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। ৫৮ দিন অনশন ধর্মঘটের পরে কর্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের বেশ কিছু দাবি স্বীকার করে এবং অনশন ধর্মঘটের অবসান হয়। কারাগারে অনশন ধর্মঘটের ইতিহাসে এ অনশন দীর্ঘ অনশনের মধ্যে অন্যতম ছিল। এই ধর্মঘটে কুষ্টিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শিবেন রায় নিহত হন। দিনের পর দিন কমরেডরা চব্বিশ ঘন্টা এ শিকে আটকা ৪ হাত পাশে আর ৮ হাত লম্বা খুপরিতে বসে শুনেছিল আর হিসাব করেছিল, কটা শিক, খড়খড়ি আর কটা কড়িকাঠ। অনমনীয় লড়াই। আর এই সরকারের দেওয়া যন্ত্রণাও বিংশ শতাব্দীর বর্বরতম।

AMARBOI.COM

এমনি একটা খুপরিতে বসেছিলাম আমরা কয়েকজন গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে। আলোচনার বিষয়বস্তু করেছিলাম সাহিত্য আর সংগ্রাম এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্ককে। ৯টা শিক এ চেষ্টাকে পরিহাস করত পারত, পরিহাস করতে পারত, আমাদের এই সাহসকে। ওরা আমাদের মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল—অযুত জনতা যেন শুনতে না পায় আমাদের মুখ দিয়ে তাদের সত্যকার জীবন কাহিনী। চারদিকের দাবানল থেকে আমাদের মতো স্ফুলিঙ্গকে ছুটিয়ে এনে আবদ্ধ করে সে দাবানল থেকে ওরা রক্ষা পেতে চেয়েছে। কিন্তু আগুনের ফুলকি আগুনই জ্বালে। ওরা তাই এখানেও আমাদের ভয় করে। ভয় করে ওদের ন'টা শিক। আর তাই প্রতি দুপুরে নটা শিককেই বাড়ি দিয়ে দিয়েদেখে সেগুলো শক্ত আছে কিনা।

কমরেড এম. ডি. বলতে শুরু করলেন। (যত দূর স্মরণ হয় সাংকেতিক এম.ডি মানে খুলনার যুবক, সাহিত্যিক রাজবন্দী মানিক দাস।) কিন্তু অকৃত্রিম সঙ্কোচে ভেঙে পড়লেন। জীবনে হয়ত এই প্রথম তিনি নিজের ভাবকে আর একজন কমরেডের সামনে গুছিয়ে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন। কিছু পরে সামলে নিয়ে আবার তিনি বলতে শুরু করলেন। উৎসাহের ঐকান্তিকতার ছাপ মুখের উপরে এসে পড়ল। কথার অকৃত্রিমতায় বেরিয়ে এল : আমার সঙ্কোচকে আমি কাটাব। আমি আরো উৎসাহ নিয়ে আমাদের এমনি আত্মশিক্ষামূলক আলোচনাতে যোগ দেব এবং একে সংগঠিত করে তুলব। এম.ডি কথা বলছিল আর আমি ভাবছিলাম, আরেকটা ফ্যাসিস্ট জেলে ১৯৪৩ সালে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কমরেড ফুচিকের (চেকোস্লাভাকিয়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং কমিউনিস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতা, জুলিয়াস ফুচিক। নাজি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে বন্দী শিবিরে নিহত হন) কথা। ফ্যাসিস্টরা ভেবেছিল, কমিউনিস্ট পার্টিকে শেষ করে দিবে। কিন্তু ওরা তো জানে না, দুজন কমিউনিস্ট একত্র হলে কমিউনিস্ট পার্টি আবার তৈরি হয়ে যায়। সুন্দর এই কমরেড। সরল তার মন। মনের কথাকে হয়ত ভাষা দিতে পারে না সবখানে। হয়ত সে ভরসাও পায় না। তবু কত শক্ত। কত দৃঢ়। ফুচিকের মতোই ওর দৃঢ়তা। তেমনি বিশ্বাস। সেদিন যখন বলছিল তার কাহিনী আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম ওর দৃঢ়তার কথা ভেবে। এত অসহ্য অত্যাচার এবং নির্যাতনও সয়েছে। আমরা আর কজন এমন সয়েছি? তবু ভাঙেনি, তবু নড়েনি। সেদিন ওর সে কাহিনী সহজ ভাষায় ফুটে বেরিয়েছিল অপরূপ হয়ে। ভেসে উঠেছিল একটি ছবি। কিন্তু ছবি নয়, সত্য। বাগেরহাট থানার টিনের ঘরের হাজতে সে কি নিদারুণ অত্যাচার। বন্দুকের কুদোর আঘাতে লম্বা বারান্দার এদিক হতে ওদিকে নির্দয় তাড়না। চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টান। জামাটা পর্যন্ত খুলে নিয়ে লোহার শিক দিয়ে শরীরের প্রত্যেকটি গিড়োতে কায়দা করে বাড়ি। প্রথমে আস্তে, তারপরে আর একটু জোরে। তারপরে আরো জোরে। আরো জোরে, আরো। আর সাথে সাথে দুনিয়াব্যাপী ফ্যাসিস্টদের সেই এক প্রশ্ন, এক জিজ্ঞাসা : টেল টেল টেল। বল, বল! কিন্তু বলাতে কি ওরা পেরেছে? পারেনি। কিছু বলাতে পারেনি। বরঞ্চ আরো তিক্ত করেছে ওর অভিজ্ঞতাকে। তীব্র করেছে ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতি ওর ঘৃণাকে আর শক্ত করেছে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের প্রতি ওর বিশ্বাসকে। সত্যি বড় ভালো এই কমরেডটি। আমরা বড় বড় কথার ফাঁকে আমাদের দুর্বলতাকে আড়াল করি। ফাঁকি দিই নিজেকে, ফাঁকি দিই আমাদের আদর্শকে। আর ও ওর সরল মনের অকৃত্রিম সঙ্কোচে আপনার শক্তিকে রেখেছে যেন আবৃত করে। সত্যিকার কমরেডের সহৃদয়তায় সে আবরণের উন্মোচনে সুন্দর মনে কি অপূর্ব দৃঢ়তার সাক্ষাৎই না পেলাম।...

মাথাটা বড্ড ব্যথা করছে। সন্ধ্যা না হতে বদ্ধ খাঁচায় ঢুকে কেবল ভাবছিলাম, কিছু লিখব। লিখব আমার মনের কথা। নিজের মনের কথা লিখে গিয়ে কিন্তু নিজেই যেন ভয় পাচ্ছিলাম। লিখতে পারলাম না কিছু। শুধু একটা কথাই থেকে থেকে মনে হচ্ছিল, আমি কী? আমি কী? দুর্বলতার অসংখ্য প্রকাশে আমি অপদার্থ। চিন্তায় অগভীর। ব্যবহারে চঞ্চল, অস্থির, মর্যাদাহীন। সংগ্রামে ভঙ্গুর। কিন্তু এ আত্মসমালোচনাতেই বা কী লাভ, যদি না হয় কোনো উন্নতি? আর কত ভালো এই কমরেড এ.বি আর কমরেড এম.ডি। (এ.বি সংকেতের রাজবন্দী নিশ্চয়ই আবদুল বারি। একজন রেলওয়ে শ্রমিক, কর্মী ও নেতা। বোধহয় ঢাকার নিকটবর্তী কোনো এলাকায় তাঁর বাড়ি ছিল। আদর্শের প্রতি বিশ্বাসে অনড় ছিলেন। এখন তিনি কোথায়, বেঁচে আছেন কিনা, আমি জানিনে।) আমি আরো অনেক কমরেড। তবু সত্য যা সে এই যে, আমি দাঁড়াতে চাই। শ্রমিকশ্রেণীর মহান আদর্শকে আরো গভীর করে বুঝতে চাই। তার জন্য সংগ্রামে আমি দৃঢ়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে চাই। কিন্তু চিরদিনকার ধিক্কারময় জীবনের ইতিহাসটাই যে সামনে এসে ভড়কে দেয়। হতাশ করে দেয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খোলসে সে পরিণত হয়ে যায়। জেলে এসে অবধি নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নজর পড়ছে। পড়ছে সহযাত্রীদের সমালোচনা ও ব্যঙ্গ উভয়ের ফলে। বাইরে যেটা আত্মীয় বান্ধব আর পাতি বুর্জোয়া পরিবেশের প্রশ্রয়ে উৎরে গিয়েছে গুণ বলে, যা নিয়ে লজ্জা পাইনি, উল্টো গুণ মনে করে তাকে অর্জন করেছি, আজ দেখছি সেটা জঘন্য অসংযম এবং দুর্বলতায় পরিণত হয়ে গেছে। ...

এসব কথা ভাবতে গেলে বড় দমে যাই। কিন্তু সত্যি যা সে হচ্ছে কমরেড এ-বির কথা, যে কথা অন্য কথাচ্ছলে তিনি বললেন এইমাত্র আমার পাশের সেলের (একমুখো খুপরি) মধ্য থেকে। শ্রমিকসুলভ স্পষ্টতা নিয়ে তিনি বললেন : "অন্য সব কিছুর চেয়ে বড় হলো নিজের মনের সাথে সংগ্রাম। আর দুর্বলতাকে জয় করা। এ কাজ না করতে পারলে অনেক শক্ত মানুষও হঠাৎ ভেঙে পড়ে। লোকচক্ষুর অন্তরালে যার ভিতর যায় ক্ষয়ে সে শক্ত জিনিস কিন্তু আসলে শক্ত নয়। আর দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবেই একদিন। আর সে যাবে হঠাৎ। আর তারই জন্য সে হয় সব চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক, ক্ষতিজনক।" এর চেয়ে সত্যকথা আর কী হতে পারে? আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ কমরেড এ.বি-র কাছে। শুধু আজই নয়। অতীতের অনেক দুর্বল মুহূর্তে সত্যই তিনি আমায় বল দিয়েছেন। আর তাঁর নিজের জীবনটাই আগাগোড়া কি অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসে ভরা। দুপুরে যখন তাঁর সহজ জীবনের কাহিনী বলছিলেন, তখন আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনলাম সে কাহিনী। বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা। আর সেই সব অভিজ্ঞতা মহত্তম পরিণতি পেল তাঁর কমিউনিস্ট চরিত্রে। সংগ্রামময় সে জীবন। একটার পর একটা সংগ্রাম। পরাজয় মানেননি কোনোদিন। আত্মবিশ্বাসে ঢিলে পড়েনি একদিনও। আর আজো ফ্যাসিস্ট কারাগারের মধ্যে আমাদের সবার চেয়ে ভবিষ্যতের বিশ্বাসে ও আনন্দে উৎসাহিত। বিকেল বেলা হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলুম, আমাদের উপন্যাসের নায়ক ও। নায়কই সত্যি। এ ওর দাবিও। বিনয় নয়। তাই দুপুরে বলছিলেন, "আমি জোর করে বলছি আপনাদের কাছে, পার্টির কাছে, আমার জীবনের কাহিনী আপনারা, সাহিত্যিকরা জানান শ্রমিকশ্রেণীকে। জানান প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীকে। এ আমার ব্যক্তিগত জীবন নয়। কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টি। আর তাই সে আমাদের আদর্শেরই জয় ঘোষণা।" এত বড় অকৃত্রিম দাবি এবং শক্তিশালী দাবি আমি আর কখনো পাইনি। সূক্ষ্ম তাঁর দৃষ্টি। মমতাময় মন। সাহিত্যিক তার চিন্তা। আমি একদিন আদর করে বলেছিলাম, "আমাদের লেনিন।" কিন্তু মিথ্যে নয় কথাটা। দায়িত্ববোধ করি এমনিতর জীবনের ছবি আঁকাবার। অনেক সময় আত্মধিক্কার দিয়ে ভাবি, ফ্যাসিস্টরা যেন আমাদের স্মৃতিকে বিকৃত করে দিতে অনেকখানি সফলকাম হচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে ঘিরে এ আমাদের অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিতে চায়। লেখনিকে পঙ্গু করে দিতে চায় আর স্মৃতিকে চায় গুলিয়ে দিতে। না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে, এরই মধ্যে কী করে আমি ভুলে গেলাম আমার জীবনের সেই সমস্ত লক্ষ অনুপ্রেরণার কাহিনীকে, বাইরের জগতের প্রতিটি গ্রামের, স্কুলে, কারখানায় আমার স্বপ্নের বাস্তব অঙ্গীকারের জ্বলন্ত সব চিহ্নকে? সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী রূপায়নের নির্ভুল সংকেতকে, মনুকে, মোক্তারকে, সেই বুড়ো ক্ষেতমজুর কমরেডকে, কিংবা যুবক টুকুকে, সামসুরকে, হরনাথকে? আর শুধুই কি তাদেরকে? সেই জীবন্ত চিত্রকে যেখানে গ্রামের পর গ্রামের উপর দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের নতুন বন্যা বয়ে চলেছে আর বদলে দিচ্ছে তার প্রত্যেকটি মানুষের জীবনকে, ঘরের কোনের বউটি হতে, মসজিদের ইমাম সাহেবের জীবন পর্যন্ত। তার স্মৃতিকে গুলিয়ে দেওয়া কিংবা শ্রেণী সংগ্রামের সেই স্রোতকে রোধ করার ষড়যন্ত্রের চেয়ে হীন ষড়যন্ত্র আর কী হতে পারে? আর তাতেই যদি স্মৃতি আমার আসে আঁধার হয়ে কিংবা সে যদি পারে শ্রেণী সংগ্রামের পরিণতির প্রতি আমার বিশ্বাসকে টলাতে তাহলে তার চেয়ে অধঃপতনই বা আর কি হতে পারে?

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল : ২২ মার্চ ১৯৫০ ॥ এই আমার জেল পৃথিবী। চার দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু তবু এখানে কি অভিজ্ঞতার কমতি আছে, আবিষ্কার আর নতুন নতুন রহস্য উদঘাটনের শেষ আছে? ওদের দেওয়া সীমার মধ্যে যদি আমি আমার অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে, জ্ঞান এবং শিক্ষায় আমার আদর্শে পৌঁছার ক্রমগতিকে লক্ষ্য করতে না পারি তাহলে তো ওদের দেওয়া আষ্টেপৃষ্ঠের বাঁধনই আমার কণ্ঠরোধ করে ফেলবে, আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে। অথচ কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই না হলো আমার, এই জেলে এসে এবং হচ্ছে প্রতিদিন।

AMARBOI.COM

একজন শ্রমিক কমরেড এ, আর। (কী দুঃখ। আজ ত্রিশ বছর পরে কিছুতেই আর এই সংকেতকে ভেঙে বার কারতে পারছিনে কে ছিলেন সেদিন এ, আর? সেদিন যদি এই রাজবন্দী এমন সংকেত ব্যবহার না করতেন তাহলে এমনভাবে হয়ত 'এ, আর' হারিয়ে যেত না আমার স্মৃতি থেকে। কিন্তু রাজবন্দীদের নিরাপত্তার জন্য কোনোকিছু লেখার ক্ষেত্রে, কেননা পরিচয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংকেত ব্যবহার ছিল সেই বন্দীশালায় অপরিহার্য।) যতই চোখকে ঠেরে বলিনে কেন, শ্রমিক কমরেডকে আমি সম্মান করি, তার শক্তি ও সম্ভাবনায় আমি বিশ্বাস করি তবু পাতি বুর্জোয়ার অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা আমাকে নিশ্চয়ই আচ্ছন্ন করেছিল। ...

এ. আর অতি সঙ্কোচে আমার ঘরের সামনে এসে বললেন, কাজ আছে কমরেড? বললুম, না তো। দুপুর বেলার ঘুম-কাতর চোখে মন চাচ্ছিল শুয়ে পড়তে। কিন্তু এ. আর-এর চাহনি আর ডাকের নম্রতা আমায় বুঝিয়ে দিল, ও আমায় ডেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে ওর সেলে, ওর নিজস্ব কোনো একটা লেখা পড়ে শোনাবার জন্য। আমি এলুম ওর সঙ্গে। কিন্তু আমার মনের অবস্থা কি ওর সহজ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল। ওর সেলে এসে বললুম, পড়ুন না, কী লিখেছেন। কিন্তু কিছুতেই যেন পড়ার সাহস আসছিল না। আর তারপর সঙ্কোচে নুয়ে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেনসিল দিয়ে লেখা একটি খাতার রচনা পড়ে শোনালেন। নিজের জীবনের কাহিনী গল্পের আকারে বলতে গিয়ে বলেছেন; 'রাস্তার পাশে ছোটখাট একটা গ্যারেজে সোলেমান কাজ করত। ... এখনো এগোয়নি বেশি দূর। কয়েকটি লাইনে শুধু সেই গ্যারেজের বর্ণনা। কল্পনার রং লাগাতে হয়নি। তার নিজের জীবনেরই অভিজ্ঞতা। একজন অত্যন্ত গরীব মুসলিম যুবকের জীবনের কাহিনী। অনাড়ম্বর ভাষা। ছোট্ট ছোট্ট বাক্যের একটি বর্ণনা। অনবদ্য লাগল আমার কাছে। বিস্মিত হয়ে বললুম, 'চমৎকার'। কমরেড এ. আর যেন আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। পরে সাহিত্য আসরেও অন্যান্য কমরেডরা লেখার লাইন কটিকে দেখে আশ্চর্য হলো। এ. বি ঠিকই বললেন তাঁর সহজ সুন্দর উদাহরণ দিয়ে 'এ যেন গ্রামের বউ ভালো ধানের বীজ রেখেছে ভাঙা কলসীটারই মাঝে।' আর বলছেন, 'পার্টি' এই প্রতিভাকে আবিষ্কার করেনি আর কদরও করেনি।' এ অভিযোগও সত্য ...।

কয়েকদিন ধরে ৪র্থ সংগ্রামের পর্যালোচনা হচ্ছে। (খুব সম্ভব ১৯৪৯-৫০ সালের ৫৮ দিনের অনশন ধর্মঘটকে এখানে ৪র্থ সংগ্রাম বলা হচ্ছে। ১৯৪৯ সালের পূর্বে আরো তিনটি ছোটবড় অনশন ধর্মঘট রাজবন্দীরা ঢাকা জেলে করেছিলেন।) আত্মসমালোচনার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেয়। এ কথা তো কতবার বলেছি, এ নিয়ে তো কত প্রবন্ধ লিখেছি। কিন্তু আজ কি আমার আত্মসমালোচনাই আমি করতে পেরেছি? আমি বললাম : "গত সংগ্রামে নানান দিকে আমার দুর্বলতা ফুটে বেরিয়েছিল" কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? জীবনে এমন স্বীকৃতির কথা উঠলেই আমার মনে হয় যেন এটাকে আমি একটা আর্টে পরিণত করে ফেলেছি। যে আত্মসমালোচনা দিয়ে আমার দুর্বলতার শেষ করতে না পারলাম সে আত্মসমালোচনা নিজেকে এবং অপরকে ফাঁকি দেওয়ার কৌশল ছাড়া আর কি? অথচ আমার মূল দুর্বলতা তো থেকেই যাচ্ছে। আমার সেই পরনির্ভরশীলতা, পার্টির মধ্যেও শ্রেণীসংগ্রামের বদলে একটা স্থায়ী শান্ত অবস্থার প্রতি মোহ, রাজনৈতিক দৃষ্টির একান্ত অভাব, সেই চিরকেলে অল্প বয়সী ছেলেমানুষী, হ্যাংলাপনা চরিত্র আর ভলান্টিয়ারী করেই তৃপ্ত থাকার চেষ্টা ফলে একটু আঘাতে কিংবা নতুন কোনো অবস্থাতেই আমি হাস্যসম্পদ ভাবেই মুষড়ে পড়ি। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম তো এত সহজ নয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্র, সমাজ, তার জেল, আইন, ফাঁসির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির লড়াই তো আমার পাতি বুর্জোয়ার মনের দ্রুত উত্থান ও পতনের উচ্ছ্বাস নয়। আর এমন এবং চিন্তা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাব যে পতনের ঢাল পথ, পিচ্ছিল পথ, এ কথা যদি আমি আজো বুঝতে না পারি তো আমার সম্বন্ধে সেই কমরেডের কথা রূঢ় হলেও সত্য হবে, 'অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ'।

ভাবতে যেয়ে অনেক সময়ে খেই হারিয়ে ফেলি। লিখতে ইচ্ছা করে মনের কথা। কিন্তু কী এ মন! বাইরে যদিবা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও টানাপড়েনে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধ্য হয়ে এগুতে পারতাম, আজ ভিতরে বসে যদি নিজের দুর্বলতাকে কাটাতে না পারি তবে মিথ্যাই আমার এতদিনকার এত স্বীকৃতি ও এত ঘোষণা। ...

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল : ৩০.০৩.৫০ ॥ আবার বসেছিল সেই ছোট্ট সাহিত্য আসরটি। প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতায় যেন সবার মন সঙ্কুচিত হয়েছিল। আলোচনা এগচ্ছিল না। কেবল ঠেকছিল। কিন্তু অপরাপর দিনের মতো আজো এ.বি সব সীমাকে কাটিয়ে দিলেন। অনবদ্য দৃষ্টান্তে অদ্ভুতভাবে জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর প্রতিটি কথা। চিন্তার তীক্ষ্ণতা ও ভাবের গভীরতা আসরের সবাইকে উৎসাহিত করে তুলল। প্রশ্ন উঠেছিল কয়েকটি বিষয় নিয়ে : সাহিত্য কী? গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সাহিত্যিকের কর্তব্য কী হবে আর ফ্যাসিস্ট কারাগারেই বা তার বিশেষ দায়িত্ব কী? উত্তরগুলো যে খুব শক্ত, তা নয়। মুখস্থ আমাদের কারুরই যে খুব কম আছে, তাও নয়। কিন্তু এ.বি. যখন সে কথাই বললেন, বললেন নিজের জীবনের ভিত্তিতে তখনি যেন অবাক বিস্ময়ে বুঝতে পারলাম, কথা ও জীবনে ঐক্য কাকে বলে এবং সে ঐক্য কি শক্তি তৈরি করতে পারে।

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে এ কথাই ভাবছিলাম। সাথে এসে যোগ দিল এম.ডি। আমার মনের কথার সুর দিয়েই ও বলল : 'আমি দেখছি আর কেবল আশ্চর্য হচ্ছি এবং আমার অতীতের সব কুয়াশা কেটে গিয়ে অদ্ভুত আলোর রেখা এসে মনের উপর পড়ছে। শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি সবচেয়ে বিপ্লবী। তার আদর্শ মহত্তর। তার দৃষ্টি সবচেয়ে মুক্ত। তার সৃজন ক্ষমতা সীমাহীন। এ সমস্ত সত্যের বাস্তব প্রকাশই যেন দেখতে পেলাম কমরেড এ বীর চরিত্রে।

আমার বড় ভাই এসেছিলেন সেদিন দেখা করতে। আমার মনের উপর অদ্ভুত একটা ছাপ রেখে তিনি চলে গেলেন। সমস্ত সাক্ষাতটাই একটা রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিয়ে অসমাপ্তভাবে শেষ হলো। বড় ভাই আমাকে রাজনীতির পথ থেকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন। আর পাকিস্তানের আদর্শের ব্যাখ্যা করে বললেন : "স্নেহের ভাইটি আমার, তুই ফিরে আয়।" বড় অকৃত্রিম আর করুণ লাগল। আমার বড় ভাইয়ের সেই আবেদনকে আরো করুণ লাগল তখন যখন জবাবে আমার নিঃশব্দ নীরবতায় রেগে গিয়ে তিনি বললেন, "তোমার নীরব অবজ্ঞাই আমার জীবনের চরম শাস্তি।" আমি একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। শরীরটা কয়েক বছর আগে যা দেখেছি তার চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। চশমা জোড়া হাতে ধরে কথা বলছিলেন। দেখলাম সেই পুরোন নিকেল ফ্রেমের চশমা জোড়া আজো আছে। তার একটা ডানা আবার ভেঙে গেছে। ভাঙা টুকরো সুতো দিয়ে জড়ানো। কিন্তু কালো আচকান গায়ে। মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ। আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বলছিলেন : "তোমার আদর্শ আমার আদর্শের বিরোধী। ভুলে যেও না তুমি আমাকে। ফিরে এস তুমি! আর ভেবো না তোমার বিচারই একমাত্র সঠিক বিচার।" কথা বলতে বলতে গরম হয়ে উঠলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাদের পাকিস্তানকে তোমরা কিছুই করতে পারবে না, তোমরা কমিউনিস্টরা। পাকিস্তান আমাদের থাকবেই।' রাষ্ট্রশক্তির ধুরন্ধর গুপ্তচর সাক্ষাতকারকে কড়াভাবে পাহারা দিচ্ছিল যে অফিসারটি তার দিকে চেয়ে তিনি বললেন : 'দেখবেন জনাব, পাকিস্তান হ্যাজ কাম টু স্টে।' ... আরো করুণ লাগল আমার বড় ভাইকে এই মুহূর্তটিতে। আমার ভাইয়ের বিদ্যা এবং বুদ্ধি এই লোকটার চেয়ে কত বেশি। অথচ আজ তারই সামনে আমার ভাই, যিনি আমার আদর্শ ছিলেন, তাঁকে কাঙালপনা দেখাতে হচ্ছে। আমার দুপাশে দুজন আইবি পুলিশ। চারদিকে জাল আর গেট আর তালা দিয়ে নির্বিঘ্নভাবে ঘেরা ঢাকা সেন্ট্রাল জেল। আমি তার মধ্যে। আমার সামনে আমার বড় ভাই, যাঁর মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় টুপি কিন্তু চোখে ভাঙা চশমা। আমরা সেই পরিবারের লোক জেলখানা যাদের কাছে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। আমার মনে হচ্ছিল, জেলাবদ্ধ বাইরের পৃথিবীটা ঘুরছে। সে ঘূর্ণাবর্তের বেগ এত যে সেই পরিবারের আমি পর্যন্ত জেলে, সেই আমি যে ...। আর আমার সেই ভাই আমার সামনে, আমার সঙ্গে জেলের ভেতরে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। রাজনৈতিক বক্তৃতায় গরম হয়ে উঠছেন। আবার সংসারের দুঃখ কষ্টের কথায় ভেঙে পড়ছেন এবং কমিউনিজমের পথ হতে আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ায় আবেদনে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছে চোখে জল আসছে। ...

আমার ভয়ানক ভালো লাগল সমস্ত অবস্থাটা ভাবতে। আমি কেবল ভাবছিলাম, সত্যি জগৎটা বদলাচ্ছে। ভাই কথা বলছিলেন আর আমি নিজেই যেন নিজেকে বলছিলাম : তাহলে আমাদের গ্রামটাও ঘুরছে। ঘুরছে আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সব। ঘুরছে আর এগুচ্ছে বিপ্লবের দুর্দমনীয় আকর্ষণে, যে আকর্ষণ পশ্চিম হতে পূর্বে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘোরাচ্ছে। সেদিন সেই মুহূর্তটিতে এ কথা ভাবতে বড় ভালো লাগল যে আমি এ গতিকে যেন বুঝতে পেরেছি, শুধু বুঝেছি নয়। আমিও এই পৃথিবীটাকে ঘোরাচ্ছি, বদলাচ্ছি, বদলে দিচ্ছি। ... ভাইয়ের অন্য সব কথা আর আমার কানে যায়নি। কিন্তু কানে গেল তাঁর সেই একটি কাহিনী। রাগ করে তিনি বলেছিলেন : 'তোরই মতো আমাদের দেশের আর একটা ভালো ছেলে এমনি করে নষ্ট হয়ে গেল। তার ভাই তাকে কষ্ট করে লেখাল, পড়াল আর শেষে কিনা সে জেলে গেল 'কমিউনিজম' করে। আর শুধু কি তাই? ভাই যদিবা হাজার টাকা জামিন দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনলো তো পরের দিনই সে আবার নিরুদ্দেশ হলো কথা বলে : এ রাষ্ট্রের শোষণে লক্ষ পরিবারের মৃত্যুর কাছে আমার একটা পরিবারের মৃত্যু কিছু নয়।

মুহূর্তে আমার ভাইয়ের উপর আমার সমস্ত রাগ যেন ধুয়ে মুছে গেল। এতক্ষণে মনে হলো, এ সাক্ষাত আমার সার্থক হলো। ইতিহাসের গতিপথকে যে চিনেছে আর গ্রহণ করেছে তার খবর পৌঁছে দিয়ে গেলেন আমার ভাই এই জেলের গরাদের মধ্যে, দিয়ে গেলেন রাগের মাথায় আর জানলেন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিউনিজমের পথ হতে তিনি তাঁর ভাইকে সরিয়ে নিয়ে যাবার বদলে সেই পথকেই করে দিয়ে গেলেন আরো শক্ত, আমার বিশ্বাসকে করে দিয়ে গেলেন আরো দৃঢ়। ...

আমি খুশী মনেই আমার ভাইয়ের পায়ে হাত রেখে সালাম করলাম এবং ফিরে এলাম আমার চার হাত-আট হাতের ছোট্ট সেলটিতে। ...

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল : ১০ এপ্রিল ১৯৫০ ॥ ১২ নম্বর সেলের কমরেডটি। আমার সেলের নম্বর সতের। সতের নম্বরের আগে ষোল নম্বর। তার আগে পনের, চৌদ্দ তের। তারও আগে বার নম্বর সেল আর তার কমরেডটি। আদর করে বলতে গেলে কমরেড নয়, ছেলেটি। স্কুল ছেড়ে মাত্র কলেজে পা দিয়েছিল। কিন্তু ফ্যাসিস্ট সরকার আরো হাজার ছেলের মতো ওর কলেজ পদার্পণও সহ্য করতে পারেনি। বন্য কুকুর ওরা। ওরা ওকে দিনের আলো থেকে রাতের আঁধারে ঠেলে দিয়েছিল। আর তারপরে ওদের হিংস্র জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকেও ছোবল মেরে ওকে ওদের শাসনের একমাত্র সত্য পরিচয় কারাগারের মধ্যে আটকে রেখেছে। ওর অপরাধ? এর উত্তর নিস্প্রয়োজন। এবং এ প্রশ্নও আজ বাহুল্য। কানে বলব মেরে দাও, কারো যেন কোনো দীর্ঘশ্বাস শুনতে না পায়। চোখ অন্ধ করে দাও, চোখ যেন কোনো অত্যাচারকে দেখতে না পায়। হাত পঙ্গু করে দাও, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে হাত যেন উত্তোলিত না হয়। ... ও নাকি পৃথিবীর বাতাসে কান দিয়ে মর্মন্তুদ অত্যাচারের দিকে তীব্র চাহনি চেয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে হাত তুলে চলেছিল আর বলেছিল সহপাঠীদের চোখ চেয়ে চলতে। এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে? ...

কিন্তু আমার কাছে বিস্ময়।

জেলের হাসপাতালের কথা মনে পড়ছে। দীর্ঘ আটান্ন দিন অনশনের পর অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলো। আমাদের মনে বিজয়োল্লাস। দুর্বল ক্লান্ত শরীর। কিন্তু ৫৮ দিন রাতে ঘুম এল না একটুও। ৩ নম্বর আর ৪ নম্বর ওয়ার্ড। (বড় হলঘর) মিলিয়ে আমরা ঐদিনই ছিলাম ২২/২৩ জন। সারা জেলে ছড়িয়ে আছে অনশনকারী আরো ১০০ জন। রাত তিনটা পর্যন্ত মিটিং করলাম হাসপাতালের ঘরে। আগামীকাল থেকে আবার খাবার গ্রহণ করা হবে। বিজয়ী লড়াইয়ের পরে উৎসবের অনুষ্ঠান হবে। আমরা কমিটির পর কমিটি তৈরি করলাম। সেন্ট্রাল কিচেন, হসপিটাল, হাউজ কমিটি, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ডেলিগেশন, মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট নিউজ ব্যুরো। ...

তখনো আমি ওকে ভালো করে চিনিনি। নির্বাক একটি ছেলে। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে দৃঢ় কমরেড। তবু নির্বাক। হসপিটাল হাউজের চার্জ কাকে দেওয়া যায়? প্রশ্ন উঠল। নাম এল ওর। 'এ, ডি-র'। (সিলেট জেলার তৎকালীন তরুণ ছাত্রকর্মী পরেশ ধর।) আমি ভাবলাম, সবাইকেই তো কিছু না কিছু কাজ দেওয়া প্রয়োজন। তাই কিন্তু নির্বাক ছেলেটি ঠাণ্ডা মাথায় অদ্ভুত কাজ করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসম্ভবভাবে খাটল। আমরা অনেকের কিম্বা বলা চলে সকলের উৎসবের সে বাড়তি বন্যায় মাথা ঘোরালাম। চটে উঠলাম। বকাবকি করলাম। নিজের হাতে মগ নিয়ে সারা হাসপাতালে চিৎকার তুললাম, আমার মগ কে নিয়েছে বলতে হবে। একটু মাত্র সমালোচনায় ক্ষিপ্ত হলাম। সামান্যমাত্র কথা দিয়ে ঘণ্টাখানেক তর্কের তুফান তুললাম। মোটকথা বড় চরিত্রে ছোট দুর্বলতার দাগ ছিটিয়ে আমরা আত্মমর্যাদার হানি করলাম। নিজেদের কাছেই যেন কেমন অস্বাভাবিক বোধ হতে লাগলাম। কিন্তু ১২ নম্বরের ১৮ বছরের ছেলেটি তিন নম্বর ওয়ার্ডের সেই অস্বাভাবিক অবস্থা ও চরিত্রের মধ্যে আপন দায়িত্ব পালনে ধৈর্য এবং হাসিমুখ ব্যবহারে মর্যাদাবান হয়ে উঠল। এ জিনিসটা সেদিনও তত বুঝিনি যতটা বুঝছি আজ এবং প্রতিদিন। ...

দুপুরে খাবার এলে ডাক পড়ে ওর। আমরা লাইন করে থালা নিয়ে বসি। ও ভাত ভাগ করে দিয়ে যায়। বিকালেও তাই। দুপুরে কিংবা বিকালে তাসের আড্ডা বসে। ব্রে কিংবা ফিস। ও আর কমরেডদের সঙ্গে তাস খেলে। দুষ্টামিভরা কৌতুকে ও ঘাড় কাত করে অপর কমরেডদের তাস দেখে আর হাসে। কিন্তু কথা বলে না।

কথা বলে না, কিন্তু চাপা উৎসাহে পূর্ণ। আমরা সাহিত্য আসরে বসি। দুপুরের ঘুম ফেলে ও এসে বসে। বলতে বললে বলতে চায় না। আমার ইচ্ছা হলো, ওকে দিয়ে বলাতে হবে। কেননা ওর সংগ্রামী জীবনকে ও শক্তিকে কথা বলার সে ক্ষমতা পূর্ণতা এনে দেবে, আমাদেরকে আরো সাহায্য করবে। দ্বিতীয় দিনের সাহিত্য আসরে বললাম, বলতে হবে। সঙ্কোচ বোধ করল প্রথম। কিন্তু নিজের দায়িত্বকে গ্রহণ করতে কসুর করল না। আমাদের মতো বাক্য সর্বস্ব ভনিতা দিয়ে আবহাওয়াকে কৃত্রিম করল না। ওর প্রকাশের অক্ষমতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও বাধো বাধো প্রকাশ ঐকান্তিক হয়ে বেরুল। সাপ্তাহিক সংবাদ পর্যালোচনায় একদিন অংশ নিল। ছেলেমানুষসুলভ শব্দের পুনরুক্তি আমাদের ঠোঁটে হাসি আনল, কিন্তু ওর ঐকান্তিকতাকে স্পর্শ করতে পারল না। তৃতীয় দিনে দেখলাম বিষয়বস্তুর শৃঙ্খলায় এবং প্রকাশের ক্ষমতায় ও অনেক উন্নতিও করে ফেলেছে।

পুরনো বিশ ডিগ্রি। এক নাগারে লাইন বাঁধা বিশটি খুপরির বন্দীশালা। জেলের ভেতরে জেল। ডিগ্রি বা সেল। জেলের অধিবাসীদের ভাষায় এর সুপরিচিত সংজ্ঞা : জেলের ভেতরে জেল তার নাম সেল। সামনে হাত চারেক প্রশস্ত একটু ইটের চত্বর। তার সাথে আর একটা দেয়াল। চত্বর থেকে ছয় সাতটা সিঁড়ি উপরে সেলগুলি। বারটায় ভাত আসে। আকাশের মাঝখানটাতে চৈত্রের সূর্য আগুন ছোঁড়ে। সেলের দেয়ালগুলো, সিঁড়ি আর চত্বর সে আগুনে তেতে ওঠে। ঝড়ো হাওয়া বয়। মন অস্বিস্তিতে ভরে ওঠে। একটু আড্ডা দেওয়া যায় কোন ঘরে? কোন সেলে? এগার নম্বরে খাবার পরে আড্ডা বসে। কিন্তু শব্দের পরে শব্দের গাঁথুনি কতক্ষণ আর চালানো যায়? এক সময়ে যেন অস্বাভাবিকভাবে সবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা ফুরিয়ে যায়। এ ওর মুখের পানে চাই। তারপর আর কোনো কথা না পেয়ে যে যার সেলের দিকে পা বাড়াই। আমি ভাবি, আমার ১৭ নম্বর সেলে গিয়ে কী হবে? কী করব এই আতপ্ত দুপুরের সেলের মধ্যে একা বসে? যে কথাটা কয়েকদিন ধরে মনে উঠেছিল সে কথাটা আবার উঠল। ১২ নম্বরের সহাস্য নির্বাক কমরেডটির কাছে এসে ইচ্ছা করে বসলুম। কথা তুললুম আমিই : 'সকালে কার চিঠি এল তোমার?' ও বলল 'বাবা লিখেছেন, ছোট ভাই নেপাল লিখেছে আর লিখেছে এক দিদি।' বলে চিঠিগুলো আমার হাতে দিয়ে দিল। বাবা চিঠির সম্বোধনে বলেছেন, 'রাখাল'। ওর নতুন আর এক নাম পাওয়া গেল 'রাখাল'। জিজ্ঞেস করলুম কবে গ্রেফতার হলে? প্রশ্নটা তুললুম ইচ্ছা করেই। ওর নির্বাক জীবনের সংগ্রামী ইতিহাসকে জানবার ইচ্ছা করে। 'পুরোন বিশের (ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে বন্দীদের বিভিন্ন স্থানে আবদ্ধ করে রাখার মধ্যে একটি স্থান) সামাজিক বাসরে আর পাঁচজন কমরেডের উপস্থিতিতে যে সঙ্কোচ এসে ওকে আড়ষ্ট করে তা আর এল না। নিঃসঙ্কোচে টুকরা টুকরা চিত্রে ও বলল ওর জীবনের কাহিনী : লাউতা বাহাদুপুর ও দাসের বাজারের অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কাহিনী। নানকার দাসপ্রথার (সিলেটে প্রচলিত সামন্তবাদী ভূমিদাস প্রথার অনুরূপ প্রথা।) বিরুদ্ধে গরিব ও নানকার কৃষকদের অভূতপূর্ব বিদ্রোহের কাহিনী। দাসের বাজার ৪৯ সালের ১৪ আগস্ট গোলামীর বিরুদ্ধে কৃষকদের সেই অজেয় নতুন স্বাধীনতা ঘোষণার কাহিনী। কমরেড অপর্ণা পাল ও আরো অনেক মহিলা কমরেড ও কৃষক যেখানে নতুন বিপ্লবী পথের দ্বারোদঘাটন করেছেন, সেই কাহিনী। কমরেড অপর্ণা পাল ওর দিদি। ... ওর নির্বাক জীবন সবাক হতে লাগল। অপর্ণা পালের ভাই ও। কমরেড ও। 'দাসের বাজারে থানার নিচে ১৪ আগস্ট দশ হাজারের পর কৃষক মিটিং করে জামায়েত হলো। লাল নিশান উড়াল আর অস্ত্র হাতে নরখাদক ফ্যাসিস্টদের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিরোধ করল। থানার পুলিশ প্রথম দিনের জমায়েতের ব্যাপকতায় ভীত হয়ে ফিরে গেল। দ্বিতীয় দিনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নোমানী আরো বাড়তি সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দাসের বাজার এলাকার গ্রামগুলোর নরনারী, শিশু বৃদ্ধার উপরে। দিদি এবং আরো কয়েকজন মহিলা কমরেড সামনে এগিয়ে এল। পুলিশের প্রথম কাতারে ছিল বাঙালি। দিদি বক্তৃতা দিল পুলিশকে উদ্দেশ্য করে। বাঙালি পুলিশ অস্ত্র নামাল। ওরা পাঠান ফৌজ মোতায়েন করল আর ৫০ গজ মাত্র দূর থেকে গুলি চালাল। সামনের কাতারে যারা ছিল তারা শুয়ে পড়ল। তবু ওখানেই চারজন মেয়ে কমরেড শহীদ হলো। আহত হলো অসংখ্য। হাসপাতালে মারা গেল আরো চারজন। পুলিশ দিদিকেসহ গ্রেফতার করল আরো কয়েকজন মেয়ে কমরেড এবং অনেক পুরুষ কমরেডকে। আমি তখন সিলেট জেলে। দিদির অবস্থা শুনেছিলাম আশঙ্কাজনক। দরখাস্ত করেছিলুম দেখবার জন্য। কিন্তু এতেও ওরা ভয় পেল। আর তাই বদলি করে নিয়ে এল আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এক টুকরা ওর আপন জীবনের কাহিনী। "আমি তখন ক্লাশ ফাইভে পড়ি। অনেক ছোট। কিন্তু হাইলাকান্দি স্কুলে আমি ধর্মঘট করালুম। সে হচ্ছে '৪২ সালের কথা। বুঝতাম না তেমন কিছু। কেউ বুঝাতও না।" তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি দিল্লী ছাত্র কনফারেন্সে গিয়েছিলেন? (১৯৪৬ কিংবা ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত তখনকার অন্যতম ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্র ফেডারেশনের নিখিল ভারত সম্মেলন) আমি বললুম 'হ্যাঁ গিয়েছিলুম'।

আমি গিয়েছিলুম। সে আরেক কাহিনী। সেবার আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। বাবা যেতে দিতে চায় না। বাড়ির কেউ চায় না। হেডমাস্টার চান না, এমন কি পার্টি পর্যন্ত চায় না। হেডমাস্টারকে বললুম, আমি দিল্লী যাবোই আর স্কুলের পরীক্ষাতে আমাকে পাশ করিয়ে দিতে হবে। পাছে কোনো স্ট্রাইক হয় সে ভয়ে হেডমাস্টার রাজি হলেন। একথা বলে সহাস্যে যোগ করল : "পড়াশুনো তেমন করতে না পারলেও একেবারে খারাপ ছেলে তো ছিলুম না।" বড় ভালো লাগল ওর ঐ কথাটি। "বাবা বাড়ি থেকে কোথায় বেরিয়ে ছিলেন। ঐ ফাঁকে বাড়ির সবাইকে দস্তুরমত সন্ত্রস্ত করে অনুমতি আদায় করলুম। আর পার্টির পারমিশন? আমার আঠার বৎসর বয়স হয়েছিল না বলে পার্টি আমাকে পুরো মেম্বার করতে চায়নি। আমি এতে ফাইট করেছিলুম। কেন আমি পুরো মেম্বার হব না?" তারপর পার্টি ওকে পুরো মেম্বারশীপ দিয়েছিল আর দিল্লী কনফারেন্সেও যেতে দিয়েছিল।

বাড়ির কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছিলুম। পাঁচ ভাই, বোন। ও আবার পরিবারের মধ্যে বয়সে তেমন বড় নয়। কিন্তু আজ আর বয়স বড় কথা নয়। নতুন সমাজ সৃষ্টিতে ওর লড়াই পরিবারের মধ্যে মর্যাদায় ওর বয়স বাড়িয়ে দিয়েছিল। যেদিন থেকে বাড়ির সবাই বুঝল এ পথ থেকে ফিরিয়ে নেয়া আর সম্ভব নয়। সব আশা যেদিন বাবা, ওরা ছেড়ে দিল, সেদিন থেকেই ওরা যেন বয়সের বেশি আমাকে সমীহ করে চলতে লাগল। আমার বয়সের গুরুত্ব দিতে লাগল। আমার ব্যাখ্যার তাৎপর্য মেনে নিতে শুরু করল। এ পরিবর্তনটা আমি সচেতনভাবেই টের পেলুম।" নির্বাক ছেলেটি সচেতনভাবেই জানে তার শক্তি কোথায়। নতুন সমাজের আদর্শ নতুন জীবন সৃষ্টি করল। ...

"তিনমাস ইউ.জি ('আন্ডার গ্রাউন্ড' অর্থাৎ আত্মগোপনের অবস্থা) ছিলাম। হোটেলে কোনোদিন খেয়ে, কোনোদিন না খেয়ে, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের শ্বাপদ চক্ষুর সামনে দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলুম। দেশভাগের পর অনেকেই এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। বাবা আমায় আলটিমেটাম দিয়েছিলেন, হয় তুই পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসবি, না হয় তোকে পড়াশুনার খরচ আমি কিছুই দেব না। আমিও আমার মন স্থির করে ফেলেছিলাম। আমার কাজের জায়গাতে আমি থাকবোই। তোমার টাকার প্রশ্ন আমার সে সিদ্ধান্ত থেকে আমায় নাড়াতে পারবে না।"

পারেওনি। তারপর চলল এই জীবনের অসংখ্য ছোটবড় অভিজ্ঞতার কথা। ওর গ্রেফতার হওয়ার কাহিনী গতবার মে মাসে (মে ১৯৪৯) ও গ্রেফতার হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার মে মাস আবার ফিরে আসছে। দুপুরে রাগের মাথায় ও ওর বড়লোক মেজদির কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছে তা ছিঁড়ে ফেলেছে। চিঠিখানি জোড়া দিয়ে পড়ার চেষ্টা করলুম। বড়লোক বোন মেজদি লিখেছে, এতদিনেও তোমার মনের পরিবর্তন হইল না দেখিয়া আমরা দুঃখিত।

"আমিও লিখে দেব এরকম দালালি চিঠি লিখলে তোমার কাছ থেকে আমার কোনো চিঠি পাওয়ার প্রয়োজন নাই।"

মনের পরিবর্তন ওর হয়েছে বৈকি। এক বছরে ফ্রসিস্ট জেলের মধ্যে বসেও সংগ্রামে সংগ্রামে মত ওর আরো পরিষ্কার হয়েছে। বিশ্বাস হয়েছে আরো দৃঢ়। আমি ওর সাথে আলাপ করে ভাবছিলুম ১১ নম্বর ডিগ্রির নির্বাক ছেলেটির জীবন কত সবাক কাহিনীতেই না পূর্ণ।

সেই রাজবন্দীটির এই কয়েকটি তারিখে রোজনামচার কয়েকটি টুকরা। আর নেই। থাকলে গভীর মনোনিবেশ সহকারে আমি তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতাম। এখানে একটা কথা আবার স্পষ্ট করে বলা ভালো। এই রোজনামচার লেখকের নামের সঙ্গে আমার নামের মিল থাকলেও এই রোজনামচার সবলতা দুর্বলতা, এর আবেগ কোনো কিছুর উপরই আমার কোনো এখতিয়ার নেই।

এমনকি একে অস্বীকার করারও আমার কোনো উপায় নেই। রোজনামচার লেখক, আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বকার পঁচিশ বছরের তরুণ এই রাজবন্দীটিকে আমি কিছুটা চিনি বলেই এই রোজনামচার বিশ্বস্ততার সাক্ষী হিসাবেই মাত্র আমি থাকতে পারি। আর কিছু নয়। সেটি একটি দায়িত্ব পালনও বটে। সেই দায়িত্ব পালন হিসাবেই রোজনামচার এই পাতা কয়টি পাঠকদের সামনে উদ্ধার করে দিলাম। রাজবন্দীর রোজনামচায় যে বড় ভাইয়ের কথা লেখা হয়েছে তিনি আজ বৃদ্ধ। তরুণ রাজবন্দীর যে বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী বদলাচ্ছে, সে কথা যথার্থ। পাকিস্তান টিকে থাকেনি এবং এই বড় ভাইয়েরই একটি সুঠাম, কর্মঠ যুবক পুত্র ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার পরে আজো ঘরে ফিরে আসেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আমার চারপাশে সবাই কমিউনিস্ট

২০ নভেম্বর ২০০২

আজকের আলাপের একটা বৈশিষ্ট্য হলো স্যার প্রায় সারাদিনই আমাদের সাথে ছিলেন। এবং দীর্ঘ একটা সময়ের উপর আলো ফেলেছেন। গত দিনের আলাপের সূত্র ধরেই আমরা এগুনোর মনস্থ করি। অর্থাৎ শৈশব-কৈশোরের কিছু স্মৃতিচারণ সে সাথে স্যারের বরিশাল জীবন জেনেছি যে তিনি ১৯৪০ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশান সমাপ্ত করেছন এবং প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে রাজনীতির সাথে তার যোগাযোগের কিছু আভাসও দিয়েছেন। স্বভাবতই এর পরে স্যারের ঢাকা আগমন এবং এতদ্‌প্রসঙ্গে কিছু শুনতে চাওয়াটা আমরা যৌক্তিক মনে করলাম। কেননা ঢাকা আগমনের পূর্বের জীবনের অবদান স্বীকার করে নিলেও বলা যায় বরিশালের সরদার ফজলুল করিম আসলে আজকের সরদার ফজলুল করিম হয়ে উঠতে শুরু করেন ঢাকা আগমনের পর থেকে আমরা স্যারের কাছে বরিশালের পাট চুকিয়ে ঢাকা আগমন এবং সম্পর্কিত বিষয়াদি জানতে চাইলাম।

—এখন তুমি যে বললা ১৯৪১ এ কোথায় ছিলেন? এই কথাটাই আমি মনে ভেবেছিলাম। তুমি বললা, আপনি '৪০ এ মেট্রিক পাশ করলেন। আপনি '৪১ সালে কোথায় ছিলেন? এখন ধরো '৪১ সালে আমি কোথাও ডুব দিয়েছিলাম তা না। আসলে তোমাকে বুঝতে হবে '৪০ সাল '৪১ সাল সবই হচ্ছে কানেকটেড। '৪১-এর আগস্ট সেপ্টেম্বরে আমার রেজাল্ট বেরুলো। তখন একটা প্রসেস চললো। আমার বড় ভাই, তিনি আমার পিতার মতো, আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দিলেন। ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য। এই যে প্রসেসটা—আমি কারু সঙ্গে ঢাকা আসলাম। যার সঙ্গে আসলাম, বড় ভাই তাকে অনুরোধ করলেন, তিনি আমাকে ঢাকার একটা রেপুটেড কোনো গভর্মেন্ট কলেজে ভর্তি করে দিতে পারেন কি না। তো ধরো এই একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। সব মিলিয়ে দাঁড়ালো আর '৪০-এ মেট্রিক পাশ করলাম। '৪১-এ ঢাকা গর্ভমেন্ট ইন্টারমেডিয়েট কলেজে ভর্তি হলাম এবং ১৯৪২ এ ফাইনাল পরীক্ষা হলো। তা রেজাল্ট বেরুতে তো সময় লাগে। আজকের দিনের মতোই সময় লাগে। আমি অবশ্য রেজাল্টের জন্য ঢাকায় অপেক্ষা করিনি।

এবার আমাদের একটু সুবিধা হলো। আমরা তাঁর ইন্টারমেডিয়েট স্টুডেন্ট লাইফ সম্পর্কে কিছু জেনে নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। রাজনীতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বড় শহরে আসবার অনুভূতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহ হচ্ছিল। দেখা গেলো, স্যার এ বিষয়ে বলতে আগ্রহী। তিনি শুরু করলেন :

—অফ কোর্স। অফ কোর্স। এগুলো আসবে। অটোমেটিক্যালি আসবে। ধরো আমার যে বুজুম ফ্রেন্ড মোজাম্মেল হকের কথা আগের দিন তোমাদের বলেছি সে কিন্তু ঢাকাতে পড়তে এলো না। এ বরিশালে কী পড়ছে না পড়ছে আমি ভালো জানতাম না। তবে সে রাজনৈতিক ছিল। ঐ '৪১-'৪২ ব্যাপারটা, আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। তোমাদের তো কোনো স্মৃতি নাই। আমার আছে আমি বলছি। তখন ঢাকা গভর্মেন্ট ইন্টারমেডিয়েট কলেজ বাই ইটসেলফ, বিল্ডিং ওয়াইজও যদি ধরো একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাপার ছিল। It continued to be the same building which was made for Curzon. The same building. এখনো আছে, ঐ যে ডিপিআই অফিস তার পাশে দেখবা একটা অদ্ভুত ধরনের গেইট আছে। এই গেইটটা ভাঙে নাই। কিন্তু এইটা কেউ দেখেও না। আর এইটা সম্পর্কে কিছু মনেও রাখে না। এই গেইট দিয়া ভেতরে ঢুকলে বড় ডোমওয়ালা একটা বিল্ডিং এখনো পাবা। এইটা ছিলো বলা চলে একটা সেকেন্ড কপি অফ কোলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। এই বিল্ডিংটা এখন বোধহয় ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ব্যবহার করে। কাউকে ঢুকতে দেয় না। এটা জাদুঘরের কোনো মাল না এবং এটাতে তোমরাও যাও না। আমিও যেতে পারব না। ঢুকতে এলাউ করা হবে না। ঐ বিল্ডিংয়ের স্টেয়ার কেইসটা একটা রাজসিক ব্যাপার ছিল। দোতলাতে একটা ড্যান্সিং হল ছিলো কাঠের। এগুলো আমার স্মৃতিতে আছে। আমাদের ক্লাশরুমগুলোও ছিলো বড় বড়। ঐ বিল্ডিংয়ের দুটো উইং ছিলো এবং দুটো উইংয়ের মধ্যে যাতায়াতের জন্য একটা ব্রীজ ছিল। ঢাকা কলেজ তখন ছিলো মূলত আর্টস পড়াশোনার জায়গায়। কমার্সও বোধহয় ছিল। আমি যখন ভর্তি হই তখন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ড. মমতাজ উদ্দীন আহমেদ। তিনি ফিলসফির লোক ছিলেন। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি হন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর বড় অবদান আছে। হি ওয়াজ অলমোস্ট ফাউন্ডার। তোমরা জানো এসব?

আমরা আর দশটা প্রশ্নের মতো এ প্রশ্নের উত্তরও জানা নেই বলে স্যারকে জানাই। স্যার তখন জানালেন যে মমতাজ উদ্দীন সাহেবের বিষয়ে এতসব তিনিও জানতেন না। কেননা মমতাজ সাহেব সরকারি চাকুরে ছিলেন বিধায় ঢাকা কলেজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে পরে কোথায় গেছেন সেসব খবর রাখা হয়নি। কিন্তু স্যার পরে খবর বের করেছেন। জেনেছেন। সেকথাই তিনি আমাদের জানালেন। আমরা খানিকটা বুঝে নিলাম, স্যার যে বারবার আনআর্থ করার কথা বলেন এই আনআর্থ করা জিনিসটা কী। সেটা একজন মমতাজ সাহেব হোন বা অন্য কেউ হোন। আমাদের যে বা যা কিছু মহান সেগুলোকে খুঁজে খুঁজে, খুঁড়ে খুঁড়ে বের করে আনা। স্মৃতির অতলে যেতে না দেয়া। সরদার ফজলুল করিম এ সবের জন্যই রোদন করেন। স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রক্রিয়ায় বলে যেতে থাকলেন :

—এই মমতাজ উদ্দীন সাহেব ইংরেজি, হিস্ট্রি এসবই পড়াতেন। আমার সাবজেক্ট কম্বিনেশন ছিলো লজিক, সিভিকস এবং হিস্ট্রি। ঐ সময় আমাদের একজন ইংরেজি প্রফেসর ছিলেন। তিনি হলেন জালাল উদ্দীন সাহেব। ঢাকা কলেজ যখন নিউমার্কেটের ঐ দিকে যায় তখন তিনি প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন।

ঢাকা কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় স্যার কোথায় থাকতেন, কীভাবে থাকতেন এগুলোও আমরা জানতে চাই। পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে স্যার যেন পুরোনো দিনেই বিচরণ করছিলেন :

—তুমি নোট রাখো যে আমি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হলাম। ফজলুল হক হল এবং ঢাকা হল, এখন যেটা শহীদুল্লাহ হল, এই হল দুটোর মাঝখানে একটা পুকুর ছিল, এখনো আছে। দুপারে দুটো ঘাট ছিল। আমি থাকতাম পুব সাইডে। তখন নাম ছিলো ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট হোস্টেল। এই হোস্টেলের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে এখানে রিলিজিয়াস কোনো ব্যাপার ছিল না। ইট ওয়াজ কসমোপলিট্যান। ভাগ ছিল এটুকুই যে এক সাইডে হিন্দু ছেলেরা অন্য সাইডে মুসলিম ছেলেরা থাকতো। তাদের রান্নাবান্না আলাদা হতো। এই পর্যন্তই। সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন দুজন। একজন হিন্দু আরেকজন মুসলিম। সব মিলিয়ে হলটা আমাদের খুব ভালো লাগত। আমরা লেখাপড়া করতাম, গল্প করতাম, ঘাটে বসতাম।

আমাদের আগ্রহ ছিলো স্যারের পলিটিক্যাল ইনভলমেন্ট বিষয়ে জানার। আরেকটা দিক, অর্থাৎ তখন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল, সে যুদ্ধটাকে স্যার কীভাবে দেখেছিলেন। আমাদের উভয় আগ্রহের জায়গাকে একসাথে বেঁধে নিয়ে স্যার বলতে শুরু করলেন :

—আমি '৪১ সালে ঢাকা আসছি। তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের ইমপ্যাক্টটা গ্র্যাজুয়েলি ঢাকার উপরে সেভাবে পড়েনি। যুদ্ধের প্যান্টটা ছিল ইস্টে। বার্মা, সিঙ্গাপুর এসব দিকে। জাপান সাংঘাতিক আক্রমণ করছে। তারা এমনকি আমেরিকার পার্ল হারবারেও আক্রমণ চালাচ্ছে। এই যে ভয়ানক যুদ্ধটা চলছে, এর যা আনুষঙ্গিক—অর্থাৎ আহত হয়, নিহত হয়, হাসপাতালে নিতে হয় এসব ব্যাপারতো রয়েছেই। এসবের প্রভাব ঢাকার উপরে পড়েছিলো। তখন সলিমুল্লাহ হলকে মিলিটারী হসপিটালে পরিণত করা হয়। এটা '৪২ সালের দিকের ঘটনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এছাড়াও এখন যেটা ঢাকা মেডিক্যাল তার একটা অংশও মিলিটারী হসপিটাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তখন অবশ্য এটা মেডিক্যাল কলেজ হয়নি। ঐ পুরো এলাকায় একমাত্র সলিমুল্লাহ হল ছাড়া বাকী সবগুলো স্থাপনাই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরবর্তীতে নতুন রাজধানীর প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর কালক্রমে এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দেয়া হয়। সলিমুল্লাহ হল আলাদা করে তৈরি হয়েছিলো। সেসব যাই হোক। তোমরা যা জানতে চাইছো সেদিকে আসি। আমি কলেজে ভর্তি হলাম। ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ হোস্টেলে থাকছি। পড়ালেখা করছি। '৪২ এর মাঝামাঝি সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। ততদিনে আমার বেশ কিছু বন্ধু-বন্ধব হয়েছে। খুবই ইন্টিমেস্ট বন্ধু-বান্ধব। ধরো, নাসিরউদ্দীন। নাসির উদ্দীন আমার বুজুম ফ্রেন্ড হয়। ও বোধহয় হিস্ট্রিতেই ছিল। তার কোনো রাজনীতি ছিল না। কিন্তু তার একটা এফেকশান ছিল। আমি তখন ছুটিছাটায় বাড়ি না যেয়ে বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতাম। নাসিরউদ্দীনের বাবা আব্দুল গফুর সাহেব ছিলেন চাঁদপুরের এসডিও। আমি সেখানেও গেছি। নাসির উদ্দীনের ছোট ভাই বাচ্চু অর্থাৎ '৭১-এ শহীদ ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গিয়াস উদ্দীন তখন মাত্র ক্লাস এইটের ছাত্র। তার সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সে আমাকে খুবই পছন্দ করতো। চিঠি লিখতো। তার পরে ধরো আবদুল মতিন। 'জেনেভায় বঙ্গবন্ধু' বইয়ের লেখক। আমরা চেনানোর জন্য বলি জেনেভায় বঙ্গবন্ধুর মতিন, সেও আমার ভীষণ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। মতিনের বাবার নাম ছিলো আবদুছ সোবহান। দারুণ অমায়িক মানুষ। আমি মতিনের সাথে নোয়াখালীতে তার বাবার কর্মস্থলে গেছি। তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে কাজ করতেন। তাদের গ্রামের বাড়িও গেছি। মতিন 'পাঁচ অধ্যায়' নামের আত্মজীবনীতে এগুলো লিখেছেও। পলিটিশিয়ান রাজিয়া খান মতিন যিনি একসময় এমপি হয়েছিলেন, সে হলো আবদুল মতিনের ছোট বোন আর মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মতিন চৌধরী সাহেবের ওয়াইফ। আমার আরো বন্ধু ছিলো। যেমন ধরো নূরুল ইসলাম চৌধুরী। সে পরবর্তী জীবনে এ্যাম্বাসেডার হয়। এখন রিটায়ার্ড। সে তেমন একটা পলিটিক্যাল ছিল না। পাবনার পাকশীতে নূরুল ইসলামের বাড়ি এবং রাজশাহী চারঘাটে তার মামাবাড়ি। দুজায়গাতেই আমি গিয়েছি। ও এখনো আমার সাথে যোগাযোগ রাখে। এবার নাম বলব হিস্ট্রির মাযহার উদ্দীনের। ওর বাবা ছিলো মাদারীপুরের উকিল। এই ছেলেটা ছিল ভীষণ অদ্ভুত। মুসলমান হয়েও অমুসলিম ধার্মিক ছিল। সে ধ্যান করতো, বেদ পড়তো। আর সাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে সে জানতো না। মাযহার উদ্দীন এখন জীবিত নেই। নাসির উদ্দীনও এখন জীবিত নেই। আমার আরেকজন বন্ধু ছিলো আবুল কাসেম। সে এখনো তেঁজগা কলেজে পড়ায়। তার মতো নন-কম্যুনাল লোক খুব কম পাইবা। সে ইংলিশ এবং জিওগ্রাফীতে এম.এ। তার কাছে যেয়ে কথা বলো, অনেক কিছু জানতে পারবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা তো কোথাও যাইবা না। এখন হাতের কাছে পাইছো আমারে—ধরে খালি টানাটানি করো। আমার আরো বন্ধুর নাম শুনতে চাইলে বলতে পারি। যেমন ধরো, রবিউল ইসলাম চৌধুরী, লুৎফুল করিম। লুৎফুল করিম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলো। এখন রিটায়ার্ড। এর বড় একটা পরিচয় হলো সে younger brother of নাজমুল করিম। নাম শুনেছো? নাজমুল করিম হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। এই যে রঙ্গলাল সেন, সাদ উদ্দীন, আফসার উদ্দীন, সৈয়দ আহমদ এরা সবাই নাজমুল করিমকে দেখেছেন, তাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। নাজমুল করিমদের খুবই শিক্ষিত পরিবার। আরো কিছু বন্ধু-বান্ধবের নাম আসবে পরে। সেটা অনার্স ক্লাসে পড়ার সময়। ইন্টারমেডিয়েট পড়ার সময় তেমন কোনো হিন্দু বন্ধুর নাম মনে পড়ছে না। সেটা পাবে পরে—যেমন ধরো রবিগুহ। তার সাথে আমার দারুণ বন্ধুত্ব ছিল এবং এটা রাজনৈতিক বন্ধুত্বও ছিল। যাই হোক, ৪২ সালে যে আমি ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা দিলাম সে পরীক্ষায় আশ্চর্যজনকভাবে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি সেকেন্ড স্ট্যান্ড করলাম।

আমরা আবারো সে সময়টাতে স্যারের রাজনীতি সম্পর্কে জানতে চাইলাম।

—আমার রাজনীতি না। সে সময়ের রাজনীতিটা আগে তোমাকে জানতে হবে। তারপরে আমার কথা জানতে চাও। আমি তো পলিটিকস তৈরি করি নাই। আমি পলিটিকসের সঙ্গে জড়িত হয়েছি। এটা একটু খেয়াল রেখো। And you get the politics-সেই '৪১ সালের দিকে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে পাকিস্তানবাদ develop করতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে শ্যামা-হক মন্ত্রী সভার বিরোধিতার কথা বলতে পারি। আমার কথা বলতে গেলে, ঢাকা কলেজে আমার কিছু লিবারেল ফ্রেন্ডস দাঁড়িয়ে যায়—নট ডেডিকেটেড কম্যুনাল। যাদের নাম আমি একটু আগেই বলেছি। আমরা বই পড়তাম, ম্যাগাজিন বের করতাম, লাইব্রেরি তৈরি করতাম। আবার মুকুল সিনেমা হলে সারা রাত জেগে সিনেমা দেখতাম। আমার একটা লেখার নামই আছে—'সিনেমা বিশারদ'। এক একটা পার্বন উপলক্ষ্যে, ধরো কালী পূজায়, এক টিকেটে সারারাত তিন-চারটা সিনেমা দেখতাম। একবার সারারাত সিনেমা দেখে ভোরবেলা হোস্টেলে ঢোকার সময় সুপারিনটেনডেন্ট অলিউল্যাহ সাহেবের কাছে ধরা পড়লে বন্ধুরা সব দোষ আমার উপরে চাপিয়ে দেয় আর কি! এ নিয়ে আমাকে শাস্তিও পেতে হয়েছিলো। সে যাই হোক, আমাদের একটা লিবারেল গ্রুপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো—যে গ্রুপটা একটু সাহিত্য চর্চা করতো। এই গ্রুপটাই পরে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার সাপোর্ট এবং অপোজের ব্যাপারে ইনভলভ হয়েছিলো। সে সময় মুসলিম লীগের ছাত্ররা হক সাহেবের ঢাকা সফরের সময় তাঁর বিরুদ্ধে ডেমোনেস্ট্রেশনের সিদ্ধান্ত নেয়। আমাদের গ্রুপটাকে এতে যোগ দিতে বলে। তারা জানতো যে আমরা মুসলিম হলেও মুসলিম লীগার না, সাম্প্রদায়িক না। বরং একটু জাতীয়তাবাদী। আমরা যাবো কি যাবো না সেটা আমাদের ব্যাপার বলে আমরা পাশ কাটানোর চেষ্টা করি। পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। মারধর করে। ডাইনং হলে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন আমি কিছুদিনের জন্য ঢাকা ছেড়ে নলছিটিতে বড় ভাইর কাছে চলে যেতে বাধ্য হই এবং সেখানে বসেই ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকি। পরে পরিস্থিতি শান্ত হলে হোস্টেলে এসে পরীক্ষায় বসি। ঢাকা কলেজে আমি যে খুব একটা ভালো ছাত্র ছিলাম তা নয়। আমি এবং আমার বন্ধুরা ছিলাম ব্যাক বেঞ্চার। ফার্স্ট বেঞ্চে থাকতো সৈয়দ আলী আশরাফ, অজিত দে—এরা ছিল একেবারে ফরমালি ভালো ছেলে আর কি। আসলে ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমার কখনো পড়ালেখা করা হয়নি। আমি বরং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গটাই এনজয় করতাম। এখনো মনে আছে, আমি কখনো সামনে বসলে বন্ধু কামাল আমাকে টেনে পেছনে নিয়ে আসতো। বলতো, তোর জায়গা আমাদের সাথে পেছনে। তুই আমাদের পড়াবি। এত স্নেহের সম্পর্ক আমাদের ছিল। আসলে ভালো করার জন্য পড়া হয়নি। এমনকি পরীক্ষার পর বড় ভাইকে বলেছিলাম যে পরীক্ষা হইছে আর কি মোটামুটি। কিন্তু রেজাল্টে দেখা গেলো যে আমি সেকেন্ড প্লেস করেছি। এটাতো বড় একটা ব্যাপার। ফার্স্ট প্লেস করতো বরাবরই জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা যারা মূলত হিন্দু। জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হওয়া গেলেও মুসলিম ছাত্ররা ঢাকা কলেজেই বেশি ভর্তি হতো। যেমন আমি। যাই হোক, রেজাল্টের ফলে বড় ভাইর মনোভাব বদলে গেল। মাঝে তিনি ভেবেছিলেন যে আমি বখে যাচ্ছি।

আমরা আবারো স্যারের রাজনীতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলাম। বরিশালে থাকার সময় আরএসপির সাথে পরোক্ষভাবে যেটুকু সম্পর্ক হয়েছিলো সেটা ঢাকায় এসেও ছিলো কিনা জানতে চাইলাম। তিনি না বোধক উত্তর করেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে সোমেন চন্দের খুন হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তবে বিস্তারিত কিছু বললেন না। এছাড়াও জানান যে ঢাকা কলেজে পড়া অবস্থায়ও সরাসরি রাজনীতির সংস্পর্শে তেমন একটা আসেন নি। সেটা শুরু হয় আরো পরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ফজলুল হক হলে ওঠার পর। এ সময় নাজমুল করিমের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। এছাড়াও রবি গুহ, হেশামউদ্দীনের নাম উল্লেখ করেন। নতুন ছাত্র থাকা অবস্থায়ই একটা অনুষ্ঠানকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনাতে সাম্প্রদায়িকতার খানিক মহড়া হয়। ঘটনাটা শুরু হয়েছিলো ঢাকা হলের বসন্ত উৎসব বা এ জাতীয় কোনো একটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। কার্জন হলের অডিটোরিয়ামে মেয়েরা উৎসব উপলক্ষ্যে নাচ-গান করার সময় উপর তলার ফজলুল হক বা সলিমুল্লাহ হলের কিছু ছাত্র হয়তো খানিকটা বখামী করেছিলো। এবং ঢাকা হলের হিন্দু ছাত্ররা অপমানিত বোধ করে মুসলিম ছাত্রদের মারধোর করে। পরদিন ফজলুল হক হলের মুসলিম ছাত্ররা ক্লাস চলাকালে হিন্দু ছাত্রদের আক্রমণ করে। দুপক্ষের সংঘাতের সময় নাজির আহমেদ নামে একজন ছাত্র ছুরিকাহত হয় পরে মারা যায়। স্যার বলেন, সে সময় কোনো কোনো হিন্দু ছাত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুরি চালানো সম্পর্কে কুখ্যাতি ছিল। এ সংঘর্ষ চলাকালে নাজমুল করিম, রবি গুহ, হেশামউদ্দীনরা হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে সরদার ফজলুল করিম চিকেন পক্সে আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালে থাকলেও তাঁকে শোকজ করা হয়েছিলো। তখনকার দিনেও এখনকার মতো রাজনৈতিক নষ্টামীর খবর শুনে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর অন্য একটা ঘটনায় প্রভাবিত হওয়ার কথা স্যার আমাদের জানালেন। চুয়াল্লিশ সালের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অনেক বিদশি সৈন্য বিশেষত আমেরিকান সৈন্য ঢাকায় আসে। যার ফলে ঢাকা হঠাৎ করেই কিছুদিনের জন্য আন্তর্জাতিক শহরে পরিণত হয়ে যায়। স্যার বলেন, প্রগতিশীল কিছু আমেরিকান সৈন্যের সাথে হৃদ্যতা তৈরি হওয়ায় আমরা খানিকটা লাইম লাইটে চলে আসি। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে ভারতের কমিউনিস্টরা অবস্থা পরিবর্তন করে মিত্রশক্তির পক্ষ নেয়। স্বাধীনতার দাবীও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ইংরেজরা তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা না দিতে চাইলেও আমেরিকানরা এর পক্ষে নেয়। সৈন্যদের মধ্যে এসব নিয়ে বিতর্ক হতো। আমরা সেসব বিতর্ক শুনতে যেতাম। এ সময়টাতে হিন্দু ছাত্রদের সাথে সাথে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যেও রাজনীতি সচেতনতা বাড়তে থাকে এবং তারা যুদ্ধ সম্পর্কে নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট ছাত্ররা এই অবস্থানকে capitalize করতে সচেষ্ট হয়। স্যারের মতে, তখন কমিউনিস্ট ছাত্ররা became anti-facist more than anti-imperialist. এ সময় আরএসপি ফরোয়ার্ড ব্লকের মতো মিলিট্যান্ট গ্রুপসহ কংগ্রেসের অনেক হিন্দুরাও কম্যুনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলতে শুরু করে। এমনকি রনেশ দাশগুপ্তকেও তখন ছুরি মারা হয়েছিলো। তখন ঢাকার কমিউনিস্টরা মুসলমান ছাত্রদের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালায়। '৪৪-এর দিকে মুসলিম প্রগতিশীল ছাত্রদের সাথে কমিউনিস্ট প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে আগে উল্লেখিত বন্ধুরা ছাড়াও সানাউল হক, আবদুল মতিন, সৈয়দ নূরুদ্দীন, মুনীর চৌধুরী এরা ছিলেন। সে সময় প্রগতি লেখক সংঘের মধ্যে ছিলেন রনেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সরলানন্দ সেন, কিরণশংকর সেনগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে সরদার ফজলুল করিমের কমিউনিস্ট রাজনীতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। এ সময়ই অন্য অনেক বন্ধুর মতো প্রো-কমিউনিস্ট না থেকে তিনি এ্যাকটিভ কমিউনিস্ট কর্মীর ন্যায় কাজকর্মে জড়িয়ে যান। এ সময় আবার সৈয়দ আলী আশরাফদের নেতৃত্বে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ দাঁড়িয়ে যায়। সাহিত্য সংসদ যাতে পুরোপুরি মুসলিম লীগের খপ্পরে না চলে যায় সেজন্য কমিউনিস্টরা এর ভেতরে ঢুকে যায়। সরদার ফজলুল করিমসহ আরো অনেকে সাহিত্য সংসদে আসা যাওয়ার মাধ্যমে একে কৌশলে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। যার ফলে পরবর্তীতে হাসান হাফিজুর রহমানদের মতো প্রগতিশীল লোকদের হাতে সাহিত্য সংসদের নেতৃত্ব চলে আসে। এসব প্রসঙ্গে স্যার আমাদেরকে ইতিহাস না জানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযোগে অভিযুক্ত করে বলেন, তোমরা তো জানো না যে কাজী মোতাহার হোসেন, নাসিরুদ্দীন সাহেব, নূরজাহান বেগম বা রোকনুজ্জামানের মতো লোকেরা সাহিত্য সংসদে বিভিন্নভাবে জড়িত থাকলেও এরা মূলত ছিলেন কমিউনিস্টদের লোক।

এসব আলাপ চলার সময় আমরা জানতে চাইলাম, আপনি কি ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছেন?

—আমাকে ওরা খুব ভালোবাসতো। রেগুলার মেম্বার করতে চাইতো। তবে তখন পার্টির মেম্বার হওয়া অনেক শক্ত ছিল। আর আমার একটা সাইকোলজি কাজ করতো যে, আমি দ্বিতীয় বর্ষে পড়া একটা ছাত্র মাত্র তখনো পার্টির মেম্বার হওয়ারই উপযুক্ত হই নাই।

কিন্তু আপনার মনের অবস্থা কী ছিল?

—আমার মন তো ততদিনে কমিউনিস্ট হয়েই গেছে। অন্য আর কোনো ইচ্ছাতো ছিল না। কোনো অলটারনেটিভ ছিল না। বিশেষত যুদ্ধ নিয়ে আমার যে এক্সপেরিয়েন্স আর অ্যাকশন, তারপর তো আমার জন্য প্যারালাল টু কমিউনিস্ট অন্য কিছু ভাবার ব্যাপার ছিল না। Not that I choose to be communist but that I had to be communist. এক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল রেখো, আমাদের যে কমিউনিস্ট গ্রুপটা ছিলো they were the best students of the university.

AMARBOI.COM

উপমহাদেশের রাজনীতিতে তখন যে ভয়ংকর দোলাচল চলছিলো সে ব্যাপারে আপনাদের যুক্ততা বা ভূমিকা কী ছিলো।

—তখনো পর্যন্ত আমি ঢাকা বেইসড রাজনীতি করছি। এমনকি বেঙ্গল বেইসডও নয়। আমাদের কমিউনিস্ট গ্রুপটার লক্ষ্য ছিলো ঢাকার রাজনীতিটাকে যাতে কেউ communalized না করে ফেলতে পারে। সেজন্য আমরা হিন্দু-মুসলিম unity টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। কোথাও একটা Killing হলে তার প্রভাবে এখানে যাতে কিছু শুরু না হয়ে যায় সে চেষ্টা করেছি। ধরো একটা শান্তি মিছিল বের করে শহর ঘুরে আসা এরকম অনেক ব্যাপার। শাহ্ আজিজ, ফরিদ আহমদ যে এক সময় কমিউনিস্টদের সাথে জড়িত থাকলেও পরে নেজাম-ই-ইসলামে যোগ দেয়, এরকম লোকগুলোর পর্যন্ত আমরা শান্তি মিছিলে ঢুকিয়ে শহর ঘুরতে বাধ্য করেছি। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবকেও ব্যবহার করেছি। আসলে সে সময় আমাদের ভূমিকা অনেকটা জাতীয়তাবাদীর একথা বলতে পারি। তবে আমরা কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন করি নাই। নাজমুল করিম যদি কিছু করেও থাকেন অতি সামান্য। হেশামউদ্দীন তো কমিউনিস্ট লীডারই। তবে স্বীকার করছি যে main current ছিলাম না। main current ছিলো মুসলিম current সে সময় তারা আমাদের, অর্থাৎ Communist দের আক্রমণ করছে।

পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে আপনাদের ভাষ্য কী ছিল?

—আমাদের ভাষ্য ছিলো national minority প্রশ্নটা আগে solve করতে হবে। যে কথাটা বললাম, আমাদের কমিউনিস্ট গ্রুপটাতো তেমন বড় গ্রুপ না। তাহলে তো মুসলিম লীগের শেষ করে দিতে পারতাম। তখন মুসলিম লীগই বড় গ্রুপ। It is becoming bigger and bigger. এটা তখন লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের দিকে এগুচ্ছে। আর আমরা তখন ক্রমশই আমাদের অবস্থান হারিয়ে ফেলছি।

আপনাদের আদৌ কি কোনো অবস্থান ছিল? আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্যারকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি তেঁতে উঠে বললেন :

—একেবারে ওভাবে বোলো না। মনে করে দেখো সে সময়ের নৌ বিদ্রোহ, আশি দিনের ট্রাম ধর্মঘট এগুলোর কথা। যা দেখে both Congress and the British, they got frightened because of the evolving strength of a third force. অর্থাৎ কমিউনিস্ট ফোর্স, ওয়াকার্স ফোর্স, পিসেন্ট ফোর্স। তারপরে ভাবো আমাদের তেভাগা আন্দোলনের কথা। জানো তোমরা মুসলিম লীগ কী পরিমাণে oppose করেছিলো? একটা বিষয় তোমাদের বুঝতে হবে যে তখন সর্বভারতীয় হিসাবে ধরলে কমিউনিস্টরা একটা বড় শক্তি ছিল। Communist flag was flown. নৌ বিদ্রোহের সময় জাহাজের মাস্তুলে নাবিকরা তিনটা পতাকা উড়িয়েছিলো—কংগ্রেস, মুসলিম লীগের পতাকার সাথে কমিউনিস্ট পতাকাও সেখানে উড়েছিলো। এগুলো একটা symbolic ব্যাপার আর কি। একটা নতুন force develop করেছিলো। যে ফোর্সটাকে গান্ধীজিও উঠতে দিতে চাচ্ছেন না। তবে গান্ধী প্রসঙ্গে আমি বলবো যে গান্ধীজির দুর্বলতা ছিল। ঐ যে ধর্মের ব্যাপারটা। কিন্তু এখানে এটাও উল্লেখ করবো যে তিনি ধর্মকে বিক্রি করেন নাই। বলতে পারো ধর্মই তার আদর্শ এখন ধর্ম বিক্রি হচ্ছে, ব্যবসা করছে। But Gandhi didn't do that এমন নজীরও আছে যে কোরান পড়তে না দেয়ার প্রতিবাদে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেছিলেন। যা হোক, তোমাদের আগ্রহের জায়গাটার সূত্র ধরে বলি—ঢাকায় আমাদের চেষ্টাটা ছিল, এখানে যেন কোলকাতার মতো communalism-টা develop না করে। এজন্য আমরা জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছি। ঢাকার বাইরেও অনেকে ছিলেন। যেমন বগুড়ায় ডাক্তার কাদের। আবার ওদিকে মনিকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন। বর্তমান কমিউনিস্টদের দুর্বলতা কি জানো? এরা নিজেদের ঐতিহ্যটা সম্পর্কে সচেতন না। এরা যদি কোনো চরিত্রাভিধান তৈরি করে থাকতো তাহলে যে কথা তুমি আমার কাছে জানতে চাইছো, আমি বলতে পারতাম যে কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্রাবিধানটা পড়ো।

কথা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এসে পড়ে। কেমন ছিল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অনেক ভালো ভালো শিক্ষক ছিল। যেমন ধরো, প্রফেসর রাজ্জাক। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রফেসর রাজ্জাক became professor Razzaqe because of Rabi Guha, Sarder Fazlul Karim এর মতো ছাত্রদের জন্য। আমাকে একবার হল ইলেকশানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। সেবারই প্রথম ইলেকট্রিক মাইক্রোফোন ব্যবহার করে আমরা সভা করি। একদিন ক্লাস নেয়া অবস্থায় আমার বক্তৃতা তাঁর কানে ঢুকলে নিজের বক্তৃতা থামিয়ে ছাত্রদের আমার বক্তৃতা শুনতে বলেন। ভাবতে পারো, কি কাণ্ড! যাই হোক কমিউনিস্ট হওয়ার কারণে আমি নির্বাচনে হেরে যাই। তবে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে গাল না দেয়ার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতাম। হেরে যাওয়ার পর আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমাদের প্যান্ডেলে বক্তৃতা দেয়ার জন্য ডেকেছিলাম। আমার সম্পর্কে বিরোধী দল বলতো যে, ওর সঙ্গে কোন argument এ যাওয়া যাবে না। মারবি যখন মারবি। শিক্ষকদের মধ্যে আরো ছিলেন মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। He was pro-communist. তিনি কমিউনিস্ট পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ organ পিপলস ওয়ার, জনযুদ্ধ এসব পত্রিকা পর্যন্ত বিক্রি করতেন। পরে এই পত্রিকার আলোকেই তিনি এবং নৃপেন চক্রবর্তীরা মিলে স্বাধীনতা পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুসলমান শিক্ষকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলো এমন আরেকটা নাম শহীদুল্লাহ সাহেব অর্থাৎ ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

তাহলে আপনি কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন? আগের প্রশ্নটা আবারো আমরা উত্থাপন করি।

—এটা তুমি কী বলতে চাও? আমি তো দেখি যে তখন আমার চারদিকে সবাই কমিউনিস্ট। আমাদের পলিসি ছিলো কাউকে hostile না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো দখল করে নেয়া। যেমন ধরো, মুসলিম লীগের নেতা আবুল হাশিম-বন্ধু, মান্যবর। আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। তাঁকেও আমরা ডিল করেছি কমিউনিস্টের জায়গা থেকে। পার্টি আমাদেরকে হুকুম করছে, তোমরা হাশিম সাহেবের কাছে কাছে থাকবা। যা সাহায্য লাগে করবা। এই রকম হুকুমই করা ছিল। হুকুমের চোটে আবার ধরো দুই একজন নষ্টও হয়ে গেছে। যেমন ধরো শামসুদ্দীন। আবুল হাশিম সাহেবকে সামলানোর জন্য তাকেও পাঠানো হয়েছিলো। সে এমনি সামলায় যে নিজেই পাকিস্তানপন্থী হয়ে যায়। পরে পাকিস্তানেই চলে যায়। সেখানেই মারা যায়। কথা হলো যে সব প্রচেষ্টাই যে সফল হবে এমন কোনো কথা নেই। শামসুদ্দীন নষ্ট হইছে কিন্তু তবুতো আমি আজ পর্যন্ত বেঁচে আছি। তোমরা বাঁচিয়ে রাখছো বলে বেঁচে আছি। আমার নিজের কোনো বাহাদুরী নাই। কিন্তু এই বেঁচে থাকাটা I am enjoing and you also should enjoy. আমার একমাত্র রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে যা আমি জানি না তা তোমাদেরকে জানতে হবে। আমার আফসোস হচ্ছে you do not know your noble heritage. মানুষ হিসাবে যে গৌরবজনক ঐতিহ্য তোমার আছে সেটা না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনে তুমি মানুষ হতে পারবে না। এটাই আজকের দিনের পলিটিকসেরও সমস্যা। শেখ হাসিনা কি এসব জানে? Even her father; তিনিও এসব ব্যাপারে তেমন একটা কেয়ার করেন নাই। Pakistanism কি জিনিস, এটা কি মুজিব যথার্থই বুঝতে পারছিলেন? যেমন পেরেছিলো কমিউনিস্টরা। বুঝতে পারে নাই বলেই মুজিব বাংলাদেশ তৈরি করেছে কিন্তু anti-Pakistanism তৈরি করতে পারে নাই। এটা একটু খেয়াল করতে হবে। এখানেই গৌরব উজ্জ্বল ঐতিহ্য বুঝতে পারার গুরুত্ব। Pakistanism-এর ধারণার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের যে অবস্থান ছিল সেটাই গুরুত্বের সাথে বোঝার ব্যাপার আছে। Anyway আমাদের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থানটাকে এভাবে বলতে পারি যে তখন আমরা কমিউনিস্টরা Nill ছিলাম না আবার Full-ও ছিলাম না। Full control এ থাকতে পারলে তো ইতিহাস অন্যরকম হতো। আমরা দেশভাগও হতে দিতাম না। সেই সময়ে আমাদের ভূমিকা যে একেবারে কম ছিল না এটা তোমাদের আত্যন্তিকভাবে জানতে হবে। এটা বই পড়ে হবে না। Not by reading books but by unearthing যত তুমি unearth করতে পারবা ততই ভালো। সোমেন চন্দকে জানতে চেষ্টা করো। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো বারবার পড়ো। গ্রামশী পড়ো। পিপলকে বোঝার চেষ্টা করো, বেশি বেশি আমেরিকা, বিলাত যাওয়া বন্ধ করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম জেল জীবন

৩১ জানুয়ারি ২০০৩

দু মাসেরও বেশি বিরতির পর আজ আবার আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা স্যারের সামনে বসেছি। শেষ আলাপের সূত্রটুকু মনে করিয়ে দেয়ার পর আমরা নির্দিষ্ট করে দেশভাগের সময়ে স্যারদের অর্থাৎ কমিউনিস্টদের অবস্থা কেমন ছিল জানতে চাইলাম। স্যার কথা বলতে শুরু করেন।

—ঠিক আছে। তোমাকে আমি অনেকদিন মিস্ করেছিলাম। আমার কাছের লোক না থাকলে আমি বড় অসহায় বোধ করি। তোমাদের যেহেতু আগ্রহ আছে সেহেতু আমার স্মৃতি তোমাদেরকে একটু দেয়ার দরকার আছে। আমি পুরো দেশ নিয়ে নয়, এমনকি ঢাকা জেলা নিয়ে নয় বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা শহরে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা বলতে পারি। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব বড় রকমের না হলেও কমিউনিস্ট কর্মীদের একটা ভালো অবস্থান ছিল। তোমাদের সাথে আলাপের একটা সমস্যা হলো যে সে সময়টা তোমাদের পক্ষে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। কারণ হচ্ছে সময়তো একটা স্রোতস্বিনী নদীর মতো। সময়তো প্রবাহিত হয়ে যায়। যে সময় অতীত হয়ে গেছে সে সময় বর্তমানের কাছে তুলে ধরা খুব ডিফিকাল্ট। আরেকটা ব্যাপার হলো সব কিছুতো আমার স্মৃতিতেও এখন আর নেই। কাজেই আমরা নির্দিষ্ট সময়ের উপর কিছু পাঠ করে, কিছু শুনে, ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে একটু জোড়াতালি দিয়ে সময়টা ধরার চেষ্টা করতে পারি মাত্র। তোমাদের প্রশ্নে ফিরে আসি। সে সময়ে আমরা কমিউনিস্টরা অন্য একাধিক প্রবল আদর্শের সাথে একটা দ্বন্দ্বমান আদর্শ হিসাবে কাজ করেছি। সে সময়ে মূল আদর্শ হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ হবে। একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, হিন্দু এবং মুসলমানের ভিত্তিতে যারা ভাগ করছে তারা কিন্তু জাতিগত বিশ্বাসগত বা সাংস্কৃতিক মাইনরটির ব্যাপারটা হিসাবে ধরছে না। একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরেই এই চিন্তাটা ছিল। আবার পাকিস্তান আন্দোলনকে কীভাবে দেখা হবে এ বিষয়ে কমিউনিস্টদের একটা সমস্যা দাঁড়ায়। কেননা তত্ত্বগতভাবে পাকিস্তানবাদ স্বীকার না করলেও এর বাস্তব দিকটা অস্বীকার করা যাচ্ছিলো না। এর মধ্যে একটা element of truth আছে। তা হলো question of national minorities. হ্যাঁ ঠিক আছে, মুসলিম লীগ এটাকে ধর্মের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু এই যে পাকিস্তানিজমের চিন্তাটা, এটা যেহেতু মূল স্রোত একে hostile করে কী হবে? এটা হলো এক ধরনের চিন্তার কাঠামো। এখন এই চিন্তার যে ভ্রান্তি তাকে তো জোর করে কথার মাধ্যমে শেষ করে ফেলা যাবে না। আমাকে তার কাছে যেতে হবে, তাকে ম্যানেজ করে ফেলতে হবে এ প্রসঙ্গে হাশিম সাহেবের প্রসঙ্গ চলে আসে। মনে রাখবে জাতীয়তাবাদী পরিবারগুলো অন্যতম একটি পরিবার থেকে হাশিম সাহেব এসেছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি নিজের আন্দোলনই মনে করেছেন। কিন্তু তাহলে পরেও বুঝতে হবে যে, খাজা নাজিমুদ্দীন বা অন্যান্য সামন্তবাদী নেতা পাকিস্তান আন্দোলনকে যেভাবে দেখাতে চান তিনি সেভাবে দেখাতে চান না। এখানে এইটাই বড় কথা যে, খাজা নাজিমুদ্দীন আর আবুল হাশিম সাহেব এক না। এমনকি সোহারাওয়ার্দীও এক না। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সে সময়ে আমাদের গ্রুপটা বেশ সক্রিয় ছিল এবং এটা পরিচালিত হতো under the guidence of the communist organizations, communist party. আমরা বিভিন্নভাবে কাজ করতাম। যেমন ধরো, প্রগতি লেখক সংঘ ছিল। এছাড়াও জনযুদ্ধ, স্বাধীনতা, পিপলস ওয়ারের মতো প্রো-কমিউনিস্ট পত্রিকাগুলোকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের মধ্যে পুশ সেল করতাম। তুমি এখন শুনলে আশ্চর্য হবে, বুঝবে যে আমাদের দৌড়টা কদ্দূর পর্যন্ত ছিলো। এই যে মরহুম মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী যিনি স্বাধীনতার পর ভিসি হয়েছিলেন, তিনি তখন টিচার নাকি সিনিয়র স্টুডেন্ট ছিলেন এখন মনে নেই, সেই মোজাফফর আহমদ চৌধুরীও আমাদের সাথে পত্রিকা বিক্রির স্কোয়াডে থাকতেন। এসব বলে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে দেশভাগের সময় কমিউনিস্টরা একটা কারেন্ট ছিল। হয়তো প্রধান কারেন্ট না। তবে মুসলিম লীগ এটা কাউন্ট করতো। প্রমাণ হিসাবে বলতে পারি, '৪৭ বা '৪৮ সালের দিকে দেশের পরিস্থিতি আলোচনার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে আমি, মুনীর চৌধুরীসহ কয়েকজন যখন সদরঘাটে লেডিজ পার্কে একটা সভার আয়োজন করি। সে সভা আক্রমণের শিকার হয়। সুলতান যে পরবর্তীতে বিচারপতি হয়, শাহ আজিজ এদের যে গ্রুপটা ছিল তারা আমাদের আক্রমণ করে এবং সভা পণ্ড করে দেয়। এগুলো প্রমাণ করে যে কমিউনিস্ট গ্রুপটাকে মুসলিম জঙ্গীরা পছন্দ করছে না। তারা ওই গ্রুপটাকে কথা বলতে দিতে চায় না। আমাদের পজিশনটা ছিলো আক্রান্ত হওয়ার পজিশন। আক্রান্ত কে হয়? যে আক্রান্ত হওয়ার গুরুত্ব রাখে সে। আক্রান্ত হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস আরো আছে। পার্টিশানের পরপরই কমরেড মোজাফফর আহমদ'র রথখোলার National Book Agency আক্রমণ করে তছনছ করে ফেলা হয়। এগুলো কোনোটাই কিন্তু কমিউনিস্টদের দুর্বলতার পরিচয় নয় বরং সবলতার পরিচয়। ঐ রকম কাছাকাছি সময়েই সলিমুল্লাহ হলে মুনীর চৌধুরীর কক্ষ আক্রমণ করা হয়।

আলাপের এ পর্যায়ে এসে ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯'র মধ্যবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সম্পর্কে জানতে চাই। এরকমভাবে সময় বিভাজনের কারণ হলো ১৯৪৯ সাল থেকে সরদার ফজলুল করিমের জেলজীবন শুরু হয়। এবং স্যারের জেলজীবন সম্পর্কে ব্যাপক কৌতূহলের কারণে বিষয়টা সম্পর্কে আলাদাভাবে আলাপের মনস্থ করি। সেজন্যই এর আগের বিষয়াবলী স্পষ্ট হওয়াটা একটু প্রয়োজনীয় বলে মনে হলো।

—এখন ধরো আমি '৪৬ সালে এমএ পাশ করলাম। তারপর কিছুদিন ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে টিচার হিসাবে জড়িত ছিলাম। আরেকটা বিষয় মনে রাখো যে, এসময় আমার কমিউনিস্ট এসোশিয়েসনটা ক্রমান্বয়ে গভীর হচ্ছিলো। একটা সময়ে এসে under the order of the party আমি টিচারশীপ থেকে রিজাইন করি। সে সময়ে একটা crisis period চলছিলো। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে হিন্দু কমরেডরা চলে যাচ্ছিলেন। তখন আমিসহ আরো কয়েকজন পুলিশ এবং ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কাছে বেশি লক্ষ্যযোগ্য হয়ে পড়ি। এসব আমি বলছি '৪৮ সালের শেষ দিককার কথা। তুমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিং থেকে পুরোনো ফাইল ঘেঁটে বের করতে পারো, অবশ্য যদি এখনো সংরক্ষিত থাকে, তাহলে দেখবা যে আমার নামেও একটা ফাইল আছে। সেখানে দেখবা যে হোকম ডিপার্টমেন্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে এই মর্মে চিঠি দেয়া হয়েছে যে, explain-why Sarder Fazlul Karim has resigned and where is his where abouts? তার আস্তানা কোথায়—এসব আর কি? আমার ব্যাপারটা ছিলো এরকম যে আমার কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলো না, resign দিলে কি হবে এসব ভাবনায় আসে নি। কোনো পারিবারিক দায়িত্বও ছিলো না। ফ্যামিলি যখন খবরটা শুনলো একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো—কী ব্যাপার? এর আগে কমনওয়েলথ বৃত্তির অধীনে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ বাদ দেয়ার ব্যাপারটা ছিল।

আর পার্টি? প্রশ্ন রাখি।

—রিজাইন করার পর পার্টি আমাকে আন্ডার গ্রাউন্ডে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ঢাকায় সে সময় গোপন আশ্রয় লাভের জায়গাগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছিলো। এমন অবস্থায় পার্টি আমাকে ঢাকা জেলার চালার চর বলে একটা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানে আন্দামান ফেরত অন্নদা পাল, প্রাইমারী শিক্ষক ও পার্টি সদস্য আখতারুজ্জামানসহ শরীফপুর, পীরপুর অঞ্চলের কয়েকজন পান চাষী আমাকে আশ্রয় দেন। বেশ কয় মাস পরে একটা গোপন মিটিংয়ে যোগদানের জন্য ঢাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেকে পাঠানো হয়। সন্তোষ গুপ্তের বাড়িতে মিটিং করার সময় আমরা গ্রেপ্তার হই। তারিখটা খুব সম্ভব ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯।

এবারে আমরা সরদার ফজলুল করিমের প্রথম জেল জীবনের কাহিনী শোনার প্রস্তুতি নেই। জেলখানার জীবন, সহযোদ্ধাদের সাথে স্মৃতিগুলো, বিশেষ কোনো ঘটনা, সে সময়ের চিন্তাভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে বলার জন্য আমরা স্যারকে অনুরোধ করি।

—ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কীভাবে বললে অর্থাৎ আপনার জেলজীবন সম্পর্কে কিছু বলেন তাতে করে মনে হয় যে আমি একটা ব্যক্তি, এই ব্যক্তি জেলে গেলাম এবং এই জেলটা আমার এবং এই জেলে ঘটে যাওয়া সব কিছুই আমি কেন্দ্রিক। তা কিন্তু না। তোমরা যারা নতুন প্রজন্ম তাদের উদ্দেশে বলতে চাই যে এই জেলের ব্যাপারটা সামগ্রিকতার মধ্যে ধরে বিচার না করলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতা যাই বলো না কেন, এসব ব্যাপারগুলো স্পষ্ট হবে না। সে সময় আমি, সন্তোষ এরাই যে শুধু এ্যারেস্ট হলাম তা নয়। তখন একজন দুজন নয় hundreds of communists were arrested and put into jail. দেশের সব জেলে। কে কোন জেলে ছিলো তা খুঁজে বের করো। তোমাদেরই তো রাষ্ট্র, জেলখানা। কর্তৃপক্ষের কাছে যাও তাদের পুরোনো ফাইলপত্র দেখাতে বলো। এটা করতে না পারলে একটা পুরো চিত্র তুমি পাবে না। আমার কিছু কথাই শুধু জানতে পারবে। যা হোক, আমাদের যখন ঢাকা জেলে ঢোকানো হয় সেখানে তখন allready একশ কি দুইশ কমিউনিস্ট বন্দী আগে থেকেই আছেন। এবং বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে জেলের ভেতরে হাঙ্গার স্ট্রাইক চলছে। হাঙ্গার স্ট্রাইক ছাড়া তখন আর কোনো উপায় ছিলা না। রাজবন্দীদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশ আমর থেকে চালু ছিলো পাকিস্তানি এ্যাডমিনিস্ট্রেশান সেগুলো সব কেটে দিলো। আর জেলের ভেতরে সাধারণ কয়েদীদের লেলিয়ে দিলো এই বলে যে এই যে সব কমিউনিস্টগুলো—এরা সব পাকিস্তানের শত্রু, এদের যেভাবে পারো শেষ করো। সে যাই হোক, এখন সুযোগ-সুবিধা কেটে দিলো বললে তো সব কিছু বোঝায় না। জেলখানায় না গেলে তো তুমি বুঝবা না কেটে দেয়ার মানেটা কি? আমাদের নতুন প্রজন্মের অসুবিধা হলো, এরা জেল শব্দটাই শুনেছে জেলের ভেতরে তো ঢোকে নাই। আর এখন যারা ঢোকে তারা কিভাবে ঢোকে, কেন ঢোকে সেগুলো আলাদা রিসার্চের ব্যাপার আর কি। যা হোক যা বলছিলাম, ঐ হাঙ্গার স্ট্রাইকটা যতদূর মনে পড়ে আটান্ন দিন চলে। এটা তো খেলার কথা না। আমার মতো দুর্বল মানুষও এতে যোগ দিয়েছিলাম। আমরা শুধু লবণ মেশানো পানি খেতাম। ওরা খাবার দিয়ে যেতো আমরা খেতাম না। ছয়দিনের মাথায় আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কারা কর্তৃপক্ষ এ পর্যায়ে force feeding শুরু করে। অর্থাৎ জোর করে খাওয়ানো। তারা অনশনরত কয়েদীদের জোর করে ধরে শুইয়ে ফেলে নাকের ভেতরে রবারের নল ঢুকিয়ে তরল দুধ খাওয়াতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকম অত্যাচারে কুষ্টিয়ার কটন মিলের একজন নেতা শিবেন রায় শ্বাসনালীতে তরল ঢুকে মারা যায়। আটান্ন দিনের মাথায় সরকারের তরফ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর অঙ্গীকার করা হয়। তখন ঢাকা কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী ফণী গুহের নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা শেষে কমিউনিস্টরা অনশন ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা আর বেশি দিন চললে সেটা হতো আত্মহত্যার শামিল। কিন্তু আমরা আত্মহত্যার জন্য সেখানে যাই নাই। দুঃখের ব্যাপার কি জানো—এখনকার কমিউনস্টরা ফণী গুহের নাম জানেও না বলেও না।

আপনি আমরা বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন? শুধু কমিউনিস্টদের?

—মেজর অংশে তো কমিউনিস্টরাই ছিল। শতাধিক। এর বাইরে ধরো, কংগ্রেসের প্রগতিশীলদের একটা অংশ কমিউনিস্টদের সাথে ছিলো। তারা কে কে ছিলেন কতজন ছিলেন এসব আমি বলতে পারবো না। '৫০-র গোড়ার দিকে কর্তৃপক্ষ করলো কি যারা অনশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে একসাথে রাখা বিপজ্জনক মনে করে বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দিতে শুরু করলো। আমাকে পাঠানো হলো সিলেট জেলে। জেলের ভেতরে থেকেই খাপড়া ওয়ার্ডের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনি। সিলেট জেলেও অনশন হয়েছিলো। সেটা বোধহয় আমি যাবার আগে। সেখানে বন্দীদের উপর নিদারুণ নির্যাতন হয়েছে। সিলেট জেলে অজয় ভট্টাচার্য ছিলেন। 'নানকার বিদ্রোহ' নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। তিনি অবশ্য পরবর্তীতে কোনো কমিউনিস্ট গ্রুপের সাথে থাকেননি। কিন্তু আজীবন কমিউনিস্ট ছিলেন। '৫০ সালের শেষের দিকে আমাকে রাজশাহী জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম। রাজশাহী জেল থেকেই ভাষা আন্দোলনের খবর জানতে পারি। কীভাবে আমাদের জন্য বরাদ্দ সংবাদপত্রের সেন্সারশীপের মাত্রা ক্রমশই বাড়তে থাকার সাথে ভাষা আন্দোলনের সফলতার যোগসূত্র আবিষ্কার করি সে কাহিনী বোধহয় তুমি জানো। এ বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ে লিখেছি।

—'৫৩ সালে আমাকে পাঠানো হয় কুমিল্লা জেলে। কতদিন ছিলাম মনে নেই। '৫৪ সালের বিভিন্ন জেলে যাদের সাথে ছিলেন তাদের নামগুলো শুনতে চাইলাম। কিন্তু স্যার রাজী হন নি। কেননা এসব মহৎ নামগুলো খুঁজে বের করাটা আমাদের দায়িত্ব হিসাবে উল্লেখ করলেন। নাম শোনার আশা বাদ দিয়ে আমরা প্রাদেশিক নির্বাচন সম্পর্কে জানতে চাই। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের সময়ও তিনি কুমিল্লা জেলে। বেশ কয়েক মাস পর, সেপ্টেম্বর মাসের পঁচিশ তারিখে কথায় কথায় কিছু নাম জনে নিই যারা স্যারের সাথে বিভিন্ন জেলে ছিলেন। যাঁদের নাম তিনি মনে করতে পেরেছেন তাঁরা হলেন : সিলেট জেল-শফিউদ্দীন, গোপেশ মালাকার, বিজয় পুরকায়স্থ, সত্যব্রত দাশ, অজয় ভট্টাচার্য, লারা শরদিন্দু দে, বরুণ রায়। রাজশাহী জেল-বগুড়ার নেতা আবু (মাজহারুল ইসলাম), প্রিয়ব্রত দাশ। কুমিল্লা জেল—অজয় ভট্টাচার্য, সত্যেন সেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ নির্বাচনে তো আপনি জয়লাভ করেছিলেন। সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

—কী বলবো? তোমরা শুধু এটুকুই জানো যে ঐ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ হেরেছিল আর যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করেছিলো। কিন্তু ঐ যুক্তফ্রন্ট কাদের প্রচেষ্টার ফসল? সাধারণভাবে মনে হবে আওয়ামী লীগের কিন্তু আওয়ামীলীগের ভেতরে থেকে কারা কাজটা করেছিলো? এ কাজটা করেছিলো আওয়ামীলীগের ভেতরে থাকা কমিউনিস্টরা। তখনকার ইস্ট পাকিস্তান এ্যাসেম্বলিতে ত্রিশ জনেরও বেশি কমিউনিস্ট ছিলেন। এরাই প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের জন্যে যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারটা সংগঠিত করে। নির্বাচনের পরে '৫৫ সালে আমি মুক্তি পাই। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা রাজবন্দীদের মুক্তিদান যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটির শুরুর দিক থেকেই আপনাকে জেলে থাকতে হচ্ছে। এবং পরবর্তী কয়েক বছরে সংগঠিত অনেকগুলো বড় বড় রাজনৈতিক ইভেন্টে আপনি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কিন্তু যেটুকু শুনেছি তা হলো জেলখানার ভেতরেও আপনাদের রাজনীতি চর্চা থেমে থাকেনি। জেলখানার ভেতরে রাজনীতি চর্চা, পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্তৃপক্ষের ব্যবহার এসব নিয়ে কিছু বলুন।

—এক কথায় তো এসব বলা যাবে না। এটুকু বলা যায় যে জেলের ভেতরেও কমিউনিস্টরা একটা organized life lead করা চেষ্টা করছে সবাইকে তো এক জায়গায় রাখা হতো না। ধরো কিছু বন্দীকে রাখা হতো ওয়ার্ডে আবার যাদেরকে বিপজ্জনক মনে করতো তাদেরকে রাখতো সেলে। তথাপি যেখানে যে কয়জন থাকতো তারা অর্গানাইজড থাকার চেষ্টা করতো। জেলের ভেতরেই তারা নানা রকমের কমিটি তৈরি করতো। এমনকি প্রশাসনের সাথে দেন-দরবার করার জন্য কমিটি গঠনেরও নজীর আছে। এই ব্যাপটারটাকে সাধারণত একটা টেকনিক্যাল টার্ম ব্যবহারের মাধ্যমে বোঝানো হতো। টার্মটা হচ্ছে Communist cosolidation. কমিউনিস্ট বন্দীরা এসেছিলো সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে। কেউ কৃষক শ্রেণী থেকে, কে্ তেভাগা আন্দোলনের কর্মী কেউ হাইস্কুলের ছাত্র, শ্রমিক শ্রেণী থেকেও কেউ কে্ এসেছে। অর্থাৎ একটা মিক্সড আপ। সবাই তো আর এ রকম না। জেলের ভেতরে আমাদের লক্ষ্য ছিলো সবার মনোবলটা ঠিক রাখা। এলক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন কিছু করতাম। যেমন কাটা ছেড়া করা সংবাদপত্র যা আমরা পেতাম সেটা থেকে লেখা তৈরির জন্য কোনো একজন কমরেডকে দায়িত্ব দেয়া হতো। এটা আবার নির্দিষ্ট দিনে সবার সামনে উপস্থাপন করা হতো। এছাড়াও সেন্সার হওয়া সংবাদপত্র খুঁজে যেটুকু খবর পেতাম তা থেকেই সবাই বুঝ পাওয়ার চেষ্টা করতাম যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সে আভাষ দেখা যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটছে। এসব আমরা করতাম। তারপর আবার মাঝে মধ্যে সবাই একটু ভালো খাওয়া-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাওয়ার চেষ্টা করেছি। খেলাধুলা করেছি। অর্থাৎ এসবই আমরা করতাম কমুউস্টিদের মনোবল অটুট রাখার জন্য।

স্যার জেলখানার ভেতরেতো আপনারা তথ্য ঘাটতিতে থাকতেন। তাহলে এই যে একটু আগে বললেন মনোবল অটুট রাখার জন্য আপনারা অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে বলে একে অপরকে ধারণা দিতেন, এটা কীসের ভিত্তিতে করতেন?

—দুইভাবে। কাঁটা ছেঁড়া যাই হোক কিছু সংবাদপত্র আমরা পেতাম। আর আমাদের চেষ্টা থাকতো এমন একটা সিমপ্যাথেটিক সেপাই জোগাড় করা যে আমাদের একটা স্লিপ বাইরে নিয়ে যাবে। জায়গামত পৌঁছে দেবে এবং কিছু খবরাখবর নিয়ে আসবে। এই পদ্ধতিতে পার্টি আমাদের কাছে অনেক গোপন তথ্য, ডকুমেন্ট, নির্দেশ পাঠিয়েছে। সেগুলো আবার হাতে নকল করে জেলখানার ভেতরে বিভিন্ন অংশে বন্দীদের দেয়া হতো। এগুলো নিয়ে আলোচনা হতো। যত সহজ মনে করছো অত সহজ বিষয় এগুলো ছিলো না। ভীষণ ডেঞ্জারাস আর কি। নির্যাতনের ভয় ছিল। কোনো সেপাই ধরা পড়লে চাকরি চলে যেত। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করবো। আমরা কিন্তু জেলে সিমপ্যাথেটিক লোক ঠিকই পেয়ে যেতাম। সেপাইরা আমাদের ভালোবাসতো। কমিউনিস্টদের মতো লোকতো সমাজে কম যে কিনা একজন সেপাইকেও কাছে টেনে মমতা ভরে তার বাড়ি ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করতে পারে।

জেলখানায় থাকাকালীন সময়ে আপনার পরিবারের সাথে কি যোগাযোগ ছিল? তারা ব্যাপারটাকে কীভাবে নিয়ে ছিলেন?

—আমার বড় ভাই সরকারি চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে জেলে আমাকে দেখতে এসেছিলেন। সঙ্গতভাবেই তিনি রাগ করছিলেন। খুব রাগ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি এসব কি আরম্ভ করেছ? কার জন্য করছ? এই সব আর কি। কারা কর্তৃপক্ষ ভাইকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আমাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বন্ড দিয়ে বের করে নেয়ার জন্য। যাই হোক সেগুলো হয়নি। আমি আছি। আছি আর কি। বড় ভাই রাগ করে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন আরো একটা ভালো ছেলেও এরকম নষ্ট হয়ে গেছে—সে হলো আবদুস শহীদ। এই শহীদকে তোমরা চেনো না। কেউ হয়তো পরে কখনো তাকে রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বই বেচতে দেখেছে। কিন্তু তার আসল কাহিনী কয়জন জানে? শহীদ একটা রিলিজিয়াস ফ্যামিলির ছেলে। সে হলো শর্ষিণার পীরের পরিবারের লোক। অথচ এই শহীদ কমিউনিস্ট লাইনে আসে। খাপড়া ওয়ার্ডের ঘটনার সময় শহীদ সেখানে ছিল পরে জেল থেকে বেরিয়ে সে আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। আমি জেলে থাকার সময়ে বড় ভাই ছাড়া বাবা-মা কারু সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ হয়নি। তাঁরা গ্রামে থাকতেন। বড় ভাই মাঝে-মধ্যেই রাগ করে চিঠি টিঠি লিখতেন এই বলে যে, তোমার জন্য কি আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে যাবে নাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারে নিজের অনুভূতির কথা কিছু বলুন। কম সময়তো নয়। প্রথমবারেই আপনি প্রায় অর্ধযুগ জেলখানায়।

—কি রকম আর মনে হবে। তোমাদের ভাষা ধার করে বলতে পারি যে আমি তখন একটু ভাবুক টাইপের ছিলাম। এরকম না হলে তো জেলখানায় নিজেকে ম্যানেজ করাটা সমস্যা হতো, বুঝতেই পার।

জেল জীবন সংক্রান্ত আলোচনার রেশ আমরা আরেকটু ধরে রাখতে চাইলাম। এ কারণেই জেলখানায় থাকাকালীন স্যারের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা আবারো জানতে চাইলাম।

—তেমন আর কি বলবো। একটা ব্যাপার ধরো যে, আমি খুব বেশি কান্নাকাটি করি নাই। যদিও কান্নাকাটি করাটাই স্বাভাবিক। একটা লোক জেলে আসছে, তার কারণে একটা পরিবার ডুবতে বসেছে—এসব যে কি মর্মান্তিক ব্যাপার তা তোমরা বুঝতে পারবা না। আমার ব্যাপার হলো এই যে আমি তো পরিবারের কোনো কাজে আসি নি। পরিবারের কথা ভাবি নি। স্বাভাবিক যে পরিবার আমার উপরে প্রীত ছিল না। কিন্তু জেলখানায় আমি এত প্রীতি এত ভালোবাসা পেয়েছি যা বলবার মতো নয়। এগুলো আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ। জেলখানার ভেতরে আমার চমৎকার একটা জগৎ ছিল। জেলের ভেতরে বন্ধুরা ভালোবেসে আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পালনের চেষ্টা করেছি। সাধারণ ঘর থেকে আসা কমিউনিস্ট বন্দীদের মনোবল টিকিয়ে রাখার জন্য জেলখানায় আমরা কী করতাম সে সবের কিছু বর্ণনা আমি গত দিন তোমাকে দিয়েছি। একবার আমার উপর এক হাজার পৃষ্ঠার এক বই কমরেডদের পড়ে শোনানোর দায়িত্ব পড়লো। যদ্দূর মনে পড়ছে বইটার নাম ছিলো Diplomat আর লেখক জেমস অ্যালড্রিজ। কুর্দীদের একটা দল স্ট্যালিনের সাথে দেখা করবে এবং কুর্দীদের সাহায্য করার ব্যাপারে তাকে রাজী করাবে—এই হচ্ছে কাহিনীটা। সে এক অসাধারণ ব্যাপার। প্রতিদিন দুপুরে কমরেডরা আমাকে ডেকে নিতো এই বলে, এই বাহে আপনি ঘুমান ক্যানে? আপনি আমাদের পড়ে শুনাবেন না? তোমাকে এসব কথা বলতেও আমার ভীষণ আবেগ এসে যাচ্ছে। আমি সেই বই খানিকটা ইংরেজিতে পড়ে সে অংশটাই আবার অনুবাদ করে শোনাতাম। এসব কাজ পরবর্তীতে অনেক ফল দিয়েছিলো। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর এই লোকগুলো কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তোলা, যুক্তফ্রন্ট গঠন করা এসব ব্যাপারে দারুণ ভূমিকা রেখেছিলো। এই যে নেজামী ইসলামী, ভাসানী, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী এরা এক সাথে এসেছিলো—এই কৃতিত্ব কার? আমি বলছি। এই কৃতিত্ব কমিউনিস্টদের। তোমরা তো এসব কিছুই জানো না। গতদিনও আমি বোধহয় এ বিষয়ে কিছুটা বলেছি।

জেলখানায় বসে কি আপনার কখনো দোদুল্যমানতা এসেছিলো? কখনো কি মনে হয়েছিলো এ এটা কী করলাম! এত ব্রাইট রেজাল্ট, ক্যারিয়ার এইসব—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

–Repentance for the loss of career বলতে যা বোঝায় এটা আমার কখনো আসে নি। আমার অমুক ছিল তমুক ছিলো অমুক হইতে পারতাম এই রকম ভাবনা আমার আসে নাই। আমার একটা লেখায়ও বলেছি যে আমি হলাম most non-ambitious person. ছোটবেলায় বড় ভাই একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, বড় হয়ে তুই কী হবি? আমি কুলী হতে চেয়েছিলাম। আমার স্মৃতিতে ছিল বরিশাল লঞ্চ ঘাট। সেখানে কুলীরা কি সুন্দর কাজ করছে। অন্যের মাল তুলছে। এসব তখন আমার কাছে সাংঘাতিক আকর্ষণীয় ব্যাপার। পরবর্তীতেও আমার কোনো ambition develop করেনি। চাকরি করা, ফরেন যাওয়া, মাস্টারি করা কোনোটা নিয়েই তেমন কোনো ambition কাজ করেনি। মাস্টারিতো পেয়েছিলাম। তা আবার ছেড়েও দিয়েছিলাম। এভাবে তোমাকে বুঝতে হবে যে, এটা হয়। সব লোকতো এক রকম না। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আবারো বলছি, জেলখানায় বসে কখনো আমার মনে হয়নি যে একটা ভুল করলাম। আমি নিজের সম্পর্কে বলি যে আমার জীবনে ভুল বলে কোনো কথা নাই। আমার জীবনে লোকসান বলে কিছু নাই। যে কাজ করতে আমি বাধ্য ছিলাম তাকে আমি ভুল বলি কেমন করে? অনুশোচনা, আফশোস, লজ্জা এগুলো আমার আসে নি। কেন আসে নি বলতে পারবো না। তবে একটা ব্যাপার, আমার এই সব কর্মকাণ্ডের জন্য আমার পরিবার রাগ করেছে বটে কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ করেনি। আমার উপর থেকে ভালোবাসা withdraw করেনি। এটা একটা পারিবারিক দান। তারা আমাকে ভালোবেসেছে। আমি তাদেরকে তা ফিরিয়ে দিতে পারি নি। কিন্তু তাদের ভালোবাসা দিয়ে আমি অপরের ভালোবাসা জয় করার চেষ্টা করেছি। তো আমি হলাম এই রকম। আমি কী করতে পারি! One cannot be other than what he is.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় জেল জীবন এবং বন্ডদানে মুক্তি

২ এপ্রিল ২০০৩

মাঝখানে কয়েক সপ্তাহ স্যারের কথা শোনার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বসা হয়নি। যদিও অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় কোনো ছেদ পড়েনি। আমরা শুরু থেকে যেভাবে সময় ধরে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, আর এক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার কারণে আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকতায় একটু ছেদ পড়েছিলো স্বাভাবিকভাবেই। আজ আবার পূর্বের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসতে চাইলাম। একারণেই প্রথম এবং দ্বিতীয় জেল জীবনের মাঝখানের সময়টুকু সম্পর্কে জানতে চেয়ে আজকের আলোচনার সূত্রপাত করতে চাইলাম।

—১৯৪৯ সালের শেষে জেলখানায় ঢুকে ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে আমি মুক্তি পেলাম। আমি নয় আমরা মুক্তি পেলাম। অর্থাৎ অন্যদের সাথে আমিও মুক্তি পেলাম। মুক্তির পাওয়ার কারণ হলো ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে বিজয়ীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলো কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্ট মাইন্ডেড। যদিও মুসলমান পরিবার থেকে আসা কমিউনিস্ট নিজেদের কমিউনিস্ট হিসাবে উল্লেখ করতো না। সমস্যা ছিলো কমিউনিস্টদের প্রধান সংযোগ ছিলো আওয়ামীলীগের সাথে। ঐ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের প্রধান ভিত্তি ছিলো কমিউনিস্ট কর্মীরা। কেন যেন ১৯৫৪ পরবর্তী প্রজন্মের যে সব লোক কমিউনিজম করে তারা এ কথাটা বলার উৎসাহ রাখে না যদিও তৎকালে কমিউনিস্টরা আওয়ামী লীগকে জয়ী করার জন্য শ্রম-মেধা ব্যয় করেছে তবুও অন্তত ত্রিশজন গোপন কমিউনিস্টকে তুমি পাবে যারা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন। এরা কমিউনিস্ট পরিচয় গোপন রাখতেন কিন্তু শেখ মুজিব এদরকে জানতেন। তো সে সময় সম্পর্কে কী বলবো? সে সময় অনেকগুলো ঘটনা দ্রুতই ঘটেছিলো। যুক্তফ্রন্টের বিজয়, সরকার গঠন, আবার সরকার ভেঙে দেয়া এবং ১৯৫৮ সালে এসে সামরিক শাসনের সূচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাদেরকে গোপন কমিউনিস্ট বলছেন তাদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

—কেমন করে বলবো, সব নাম তো এখন আর মনে নাই। তুমি যদি ঐ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট থেকে বিজয়ী সদস্যদের একটা তালিকা আমাকে দাও তাহলে আমি নামের পাশে ঠিক দিয়ে বলতে পারবো এইটা একটা কমিউনিস্ট ওইটা একটা কমিউনিস্ট। এ মুহূর্তে দুএক জনের নাম মনে পড়ছে। যেমন চাঁটগা'র চৌধুরী হারুনুর রশীদ, সিলেটের পীর হাবিবুর রহমান, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, পাবনার সেলিনা বেগম ও তাঁর স্বামী। আর আমার নিজের ব্যাপারটা হলো এরকম যে তখনও আমি সব সময়ের মতোই যতটা না অর্গানাইজার তার চেয়ে বেশি অবজারভার ছিলাম। এ কারণেই বোধ হয় আমার উপরে তেমন কোনো গুরুতর দায়িত্ব আসে নি।

এ প্রশ্নটা কি করতে পারি যে দায়িত্ব দেয়া হয়নি নাকি দায়িত্ব নিতে চান নি?

—আমি তো বলছিই যে আমি পর্যবেক্ষণকারী হিসেবেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তবুও কখনো কখনো দায়িত্ব পেয়েছি। যেমন বরিশালের নলিন দাস আমাকে বক্তৃতা করার জন্য নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও মুসলিম কমরেডরা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেত। আসলে I was very much beloved boy of the Communist Party. সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত, জ্ঞান চক্রবর্তী, ফণি গুহ কতজনের ভালোবাসার কথা আমি বলবো। আমার অপার ভাগ্য যে আমি তাদের পেয়েছিলাম। সেজন্যই আমি শাহ আজিজুর রহমান না হয়ে সরদার ফজলুল করিম হয়েছি।

আপনার পজিশন যদি এতই নির্দোষ হয় যেমনটা আপনি বলছেন, অর্থাৎ আপনার ভূমিকা হলো পর্যবেক্ষকের তাহলে পুলিশ ঘুরেফিরে আপনারে ধরে কেন?

—ঘুরে ঘুরে তো শুধু আমাকে ধরছে না। যারা ধরে তাদের তো একটা বড় লিস্ট থাকে। সেই লিস্ট অনুযায়ী, যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়ার পরের কথা বলছি, তারা যখন জাল ফেললো তখন একসাথে সব ধরা পড়ে গেল। এমনকি আশি বছরের বুড়া কবিয়াল রমেশ শীলও ধরা পড়লো। আমারে ধরে ঠিক আছে ধরে। কিন্তু প্রশ্ন করো যে রমেশ শীলকে কেন ধরে? আসলে যারা ধরে বা ধরার ক্ষমতা রাখে তারা কার মধ্যে কতখানি বীজ লুকিয়ে আছে সেটা আগে থেকে আঁচ করে নেয়। এটাকেই বলে সিস্টেম। ঐ সিস্টেম মনে করেছে আমাকে ধরা উচিৎ, তাই ধরেছে। ওরা ভেবেছে, এই ব্যাটারে উনপঞ্চাশ সালেও একবার জেলে ঢুকানো হইছিলো। তার মানে এই লোকের নিশ্চয় কোনো গড়বড় আছে সে সময়ের ব্যাপারে আরো কিছু জানতে চাইলে আমি বলবো যে ১৯৫৪ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠান করাটা মুসলিম লীগের একটা অবদান। তারা এটা নাও করতে পারতো। গুণ্ডা লাগিয়ে দিতে পারতো। তারা তা করে না। নির্বাচন হয়েছে এবং নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যালঘু রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। অন্য কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না বললেও আমি মুসলিম লীগের এই অবদান স্বীকার করতে চাই। কেননা আমি পুরো ব্যাপারটাকে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখতে চাই। কোনো নেগেটিভকেই পুরোপুরি নেগেটিভ মনে করা যায় না। কোনো পজেটিভকেই পুরোপুরি পজেটিভ মনে করা যায় না। নেগেটিভেরও পজেটিভ থাকে আবার পজেটিভেরও নেগেটিভ থাকে। মুসলিম লীগ যে চুয়ান্ন সালেই মার্শাল ল' জারী করানোর মতো অবস্থা তৈরি করলো না—এটা একটা বড় ব্যাপার। মার্শাল ল আসলো আটান্ন সালে। মাঝখানের সময়টাতে অবশ্য মুসলিম লীগ মার্শাল ল'র কথা বলতো। আমি কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলিতে যেয়েও শুনছি। তখন ভাবতাম ব্যাটারা হুমকি দিচ্ছে। ওরা বোঝে নাই যে হুমকিটা যতক্ষণ হুমকি থাকে ততক্ষণই হচ্ছে কাজের। হুমকিটা যখন রিয়ালিটি হয়ে যায় তখন তো তার হাতে আর কিছু অবশেষে রইল না। যেমন ধরো সে সময়ের একটা চলতি হুমকি ছিল—বাঙালিরা যদি ওয়ান ইউনিট না মানে তাহলে মার্শাল ল হয়ে যাবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ও এই অস্ত্রের ভয়ই বাঙালিদের দেখাতেন।

স্যার এখন আপনি আমাদের বলেন সামরিক শাসন আসার পরে কী পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করলেন? তখন তো আপনার দ্বিতীয় জেল জীবনেরও শুরু।

—সামরিক শাসন আসলো এবং আমাদের গ্রেফতার করা হলো। আটান্নর শেষ দিক থেকে বাষট্টির ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত আমি জেলের ভেতরে। সামরিক শাসন সম্পর্ক আমার মন্তব্য শুনে কী হবে? যারা বাইরে ছিল তাদের জিজ্ঞেস কর। আমি নিজের ব্যাপারে বলতে পারি। বাষট্টির ডিসেম্বরে আমি ছাড়া পাই। এ ব্যাপারে আমার পরিবারের ভূমিকা ছিল। আরেকটা ব্যাপার হলো জেলে ঢোকানোর আগে সাতান্ন সালে আমি সংসার পেতেছি। নতুন সংসার জীবনের মাথায় জেলে চল গেলাম। জেলে বসে আমি নিজের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনি। কমিউনিস্ট সংগঠনের কোনো দায়িত্বে না থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

এ পর্যায়ে এসে দ্বিতীয় পর্যায়ের জেলজীবন সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হলো। প্রথম জেলজীবনের স্মৃতিচারণের সময় জেলের ভেতরকার পরিবেশ, দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনাই শুধ নয়, সহবন্দীদের মানসিকভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা, পাঠচক্র, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে বন্দীদের চিন্তাভাবনা ইত্যাদি কিছু মিলিয়ে যে ঋণ পরিবেশনা পেয়েছিলাম তাই আমরা পেতে চাইলাম দ্বিতীয় জেলজীবনের কাহিনীটা শোনার সময়।

—প্রথম বারের জেল-জীবন সম্পর্কে যা বলেছি এখানেও তাই, অর্থাৎ Communist elements wanted to remain political inside the jail also. কমিউনিস্টদের বড় গুণটা ছিল এই যে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ-সভ্যতা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে তার যে বোধ যে বিশ্বাস তা কখনোই মন্ত্রী হওয়া না হওয়ার সাথে মিশিয়ে ফেলেনি। জেলখানার ভেতরে বসেও কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডাররা এই বোধের চর্চা অব্যাহত রাখতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলখানার ভেতরে দীর্ঘ সময় থাকার পরে কমিউনিস্ট ক্যাডারদের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন?

—এখানেই আসলে চর্চার ব্যাপার আর কি। বোধগুলো লালন করার ব্যাপার আর কি। আমি তোমাকে বলতে পারি যে জেলখানার ভেতরে যেহেতু কমিউনিস্টদের মধ্যে কমিউনিস্ট থাকার চেষ্টা অব্যাহত থাকতো সেহেতু গণহারে নন-কমিউনিস্ট বা এ্যান্টিকমিউনিস্ট হয়ে যাওয়ার নজীর পাওয়া যায় না—যেটা পরবর্তীকালে হয়েছে।

সরদার ফজলুল করিমের জীবনের একটা অস্পষ্ট অংশে আলোচনাটা হাজির হয়েছে বলে মনে হলো। বাষট্টির শেষে এসে তিনি যেভাবে জেল থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং রাজনৈতিক সংগঠন থকে নিজেকে বিছিন্ন করলেন তা নিয়ে কথাবার্তা হওয়া প্রয়োজন-আমরা অনুমান করি। এ বিষয়টি নিয়ে কারু কারু মধ্যে ক্ষোভ, হতাশা রয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যারা সরদার ফজলুল করিম বিষয়ে আগ্রহী তাদের মধ্যে রয়েছে প্রশ্ন : কেন তিনি এমন করলেন? আমরা স্যারকে জানালাম যে বিষয়টা নিয়ে তিনি কথা বললে অস্পষ্টতার নিরসন ঘটতে পারে। তিনি রাজী হলেন। উদ্দেশ্য মোতাবেক আমরা এগুতে থাকলাম। শুরুতে দ্বিতীয় জেলজীবনের কাহিনী শুনতে চাইলাম।

—তেমন কোনো কাহিনী নাই। প্রথমবারের মতোই জেলের ভেতরে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করেছি। যতদূর মনে পড়ে ঢাকা, রাজশাহী এবং কুমিল্লা জেলে ছিলাম। এখানে একটা কথা উল্লেখ করবো যে, প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার জেল জীবনে একটু হিউম্যান কন্ডিশনে ছিলাম। জেলখানার ভেতরের পরিবেশ আগের চেয়ে খানিকটা ভালো পেয়েছিলাম। চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হওয়ার এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিলো। যদিও সামরিক শাসনামলে আমরা জেলে ছিলাম। এবং অনেক আগেই যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়া হয়েছে তথাপি সামরিক সরকার যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা মাথায় রাখতে বাধ্য ছিল। উনপঞ্চাশ সালের যে রকম বিপুল হারে কমিউনিস্টদের জেলখানায় ঢোকানো হয়েছিলো এবার ততটা হয়নি। তবে প্রধান টার্গেট কমিউনিস্টরাই ছিল।

আমরা প্রশ্ন রাখলাম, ততদিনে তো আওয়ামী লীগ বড় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাহলে তাদেরকে টার্গেট না করে কমিউনিস্টদের প্রধান টার্গেট করতে যাবে কেন?

—আওয়ামী লীগ বড় রাজনৈতিক দল কিন্তু সরকার না। সরকার আওয়ামী লীগের ভেতরে যারা আসল অর্থাৎ কমিউনিস্ট ইলিমেন্টগুলোকে প্রধান টার্গেট করেছিলো। পার্টিগতভাবে দেখলে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর আগের রমরমাটা কমে যাচ্ছিলো। এটা একান্তই আমার অভিমত।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারে আমরা আসল জায়গাটা ধরতে চাইলাম। অর্থাৎ কেন তিনি সংগঠন থেকে দূরে চলে যেতে থাকলেন? কেন তিনি বন্ড দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসলেন? এগুলোকে যদি কেউ নেতিবাচক মনে করে থাকে তাহলে তাঁর বক্তব্য কি?

—তুমি যা বললে এর মধ্যে কোনো মিথ্যা নাই। ধর আমি হচ্ছি এককালের কমিউনিস্ট। বাষট্টির ডিসেম্বরে আমি পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় জের থেকে বেরিয়ে আসি। গভর্মেন্ট বলছে ওরে বাইর করতে হইলে আন্ডারটেকিং দিতে হবে। তখনকার আমলে আন্ডারটেকিংকে বলতো বন্ড। বন্ড শব্দটা খারাপ শব্দ। যে বন্ড দেয় সে সরকারের দালাল ছাড়া আর কি! জেলের ভেতরে থাকার সময় থেকেই কমিউনিস্ট সহবন্দীরা আমার পরিবর্তনটা টের পাচ্ছিলেন। তারা টের পাচ্ছিলেন যে সরদার যেন একটু গা-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো অত ইন্টিম্যাটলি পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের অনুমানে ভুল ছিলো না। তখন আমি নিজের সম্পর্কে একটা রিয়েলাইজেশান ডেভেলপ করছিলাম। আমি সাতান্ন সালে পরিবার গঠন করি। জেলে আসার সময় ছয় মাস বয়সের একটা বাচ্চা রেখে এসেছি। আমার ওয়াইফ একজন শিক্ষক। তার কান্নাকাটি আমাকে স্পর্শ করে। এমন একটা অবস্থায়, আমার মধ্যে যে বোধটা বেড়ে ওঠে তা হলো আমার পরিবারের পাশে দাঁড়ানো উচিৎ। এই বোধ থেকেই আমি বন্ড দিয়ে বেরিয়ে আসতে রাজি হই। তা না হলে কারু পক্ষে আমাকে বন্ড দিয়ে বেরিয়ে আসায় রাজী করানো সম্ভব ছিল না। বলতে পার, এটা আমার একটা নীতিগত পরিবর্তন যা শুরু হয়েছে জেলের ভেতর থেকেই। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়ালো এরকম যে জেল থেকে বেরিয়ে আমি আর রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত থাকলাম না। আবার একেবারে যে নিষ্ক্রিয় থাকলাম তাও নয়। আমি পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নিলাম। কিন্তু তাই বলে আমাকে যারা ভালোবাসতেন যারা আমার আদর্শ ছিলেন তারা আমার উপর থেকে ভালোবাসা প্রত্যাহার করে নিলেন না। আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলেন না। শত্রু মনে করলেন না। আমি তখন পরিবারটিকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে এমনকি ল' কলেজেও ভর্তি হলাম। পরে তেষট্টির ডিসেম্বর মাসে বাংলা একাডেমিতে যোগদান করলাম।

তখন কিন্তু এ অঞ্চলে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। সামরিক শাসনের প্রাথমিক ভীতি কাটিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার হওয়া শুরু হচ্ছে। দীর্ঘ সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকলেন। জীবনের অনেক প্রলোভন উপেক্ষা করলেন। নির্যাতন ভোগ করলেন। অতপর যখন আপনার মতো একজনকে ভীষণ প্রয়োজন তখন আপনি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন। এই যে পরিবর্তনটা এটা অন্যদের সমালোচনার কথা বাদ থাক আপনার নিজের মধ্যে কি কোনো অনুশোচনা জন্ম দেয় নি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অনুশোচনা বা কন্ট্রাডিকশন কোনটাই জনম নেয় নি। আমি হয়তো মুভমেন্টে যোগ দিচ্ছি না, মুভ করছি না। কিন্তু কমিউনিজম সম্পর্কে আমরা যে ভাবনা, মানুষকে যেভাবে দেখি, সমাজকে যেভাবে দেখি সেগুলোর সাথে তো কন্ট্রাডিক্ট করি নি বা সেগুলো রিফিউজ করার দরকার পড়েনি।

কিন্তু এক সময়ে এই জনপদের আন্দোলন সংগ্রামে শরীক ছিলেন এবং আত্যন্তিকভাবেই ছিলেন—একথা আপনি নিজেই আমাদের বলেছেন। অথচ এখন থাকছেন না এই ব্যাপারটা সহজভাবে বুঝতে পারছি না। আপনাদের প্রজন্মের কেউ কেউ বোধ হয় আপনার এই অবস্থান পরিবর্তনকে এ্যাপ্রিশিয়েট করেন না। বিব্রতকর হলেও স্যারকে এ কথাটা বললাম।

—কথা হচ্ছে, আমার যেটা ক্ষমতা নাই সেটা আমি কেমন করে করবো। এক সময় আমি জেল খেটেছি, আন্ডার গ্রাউন্ডে ছিলাম সবই ঠিক আছে। কিন্তু যখনকার কথা বলছো তখন তো এগুলো আমার পক্ষে আর সম্ভব না। আমার বাচ্চা আছে, পরিবার আছে। যাদের ফেলে আমি যেতে চাই না। এটা হলো সচেতনভাবেই চলমান প্রক্রিয়ার বাইরে থাকা। আমার নীতি, আদর্শ, দর্শন কিছুই কিন্তু আমি বাদ দেই নি। কিন্তু একটা লোক সব কাজ নাও করতে পারে। সে অর্গানাইজার নাও হতে পারে। এবার আসি এ্যাপ্রিশিয়েট করা না করার ব্যাপারটায়। খুবই স্বাভাবিক। তুমি একজনকে যে কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে দেখতে চাও সেখানে যদি না দেখতে পাও তাহলে তো ঐ লোকের প্রতি তোমার ভালোবাসা একটু কমবেই। অনেক আগে যখন আমি গণপরিষদের সদস্য ছিলাম একটা ঘটনা হয়েছিলো। ফরেন পলিসি সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে যখন আমি আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দেই তখন কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি শুভাকাঙ্ক্ষী মারফত খবরটা জেনে বলেছিলাম, পার্টি ঠিক কাজ করেছে। কেননা আমি পার্টির ইচ্ছা-বিরুদ্ধে কাজ করেছিলাম। একইভাবে বাষট্টি সালের পর আমার পরিবর্তিত অবস্থানে যারা খুশী হতে পারেন নি তারা তাদের জায়গায় থেকে ঠিক কাজই করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তেষট্টি সাল থেকে আপনি বাংলা একাডেমির চাকরি করছেন। এবং পারিবারিক জীবন-যাপন করছেন। এবং পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করছেন। আপনার এই পর্যবেক্ষণ কাদের কাজে লেগেছিলো?

—হ্যাঁ। পারিবারিক জীবন-যাপন করছিলাম এবং রাজনীতির পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করছিলাম। কারু কাজে লাগুক না লাগুক আমার কাজে লাগছিলো। আমি দেখছিলাম যে সমাজটা পাল্টাচ্ছে। পাল্টানোর ফলে কোথায় যাবে আমি জানি না। কিন্তু আমি তো দেখছি। ভূমিকা পাল্টানোর ব্যাপারে তোমার প্রশ্ন? মুনির চৌধুরীর কথা ধরো—যে আমার ভীষণ ঘনিষ্ঠ। সে রাজনীতির সংগঠন বাদ দিয়ে শিক্ষকতার ভূমিকা নিলো। আমি বাংলা একাডেমির চাকরির রোল নিলাম—ক্ষতি কি? এখানে মুনীরের কথা একটু বলি। আমি যতখানি গভীরভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতি পর্যবেক্ষক ছিলাম মুনীর ততটা নয়। মুনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতিতে যুক্ত হয়। প্রফেসর আবদুল হাই সাহেবের সাথে যুক্ত হয়। এক সময় দেখতে পেলাম যে আমার ব্যাপারে ওর একটা অপছন্দ ডেভেলপ করে। বলেনি কখনো। কিন্তু—ভাবে-ভঙ্গীতে বোঝা যায়।

এসব আলাপ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, যিনি সরদার স্যারের যে কোনো আলাপে অবধারিতভাবে স্থান পেয়ে থাকেন, তাঁর কথা এসে পড়ে। আপাতভাবে কিছুটা বিষয় বহির্ভূতভাবেই স্যার বলতে থাকলেন :

—আমার ব্যাপারে মুনীরের এক ধরনের জড়তা তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু প্রফেসর রাজ্জাকের মধ্যে তেমনি কিছু হয় নি। সেই যে বিয়াল্লিশ সাল থেকে আমারে ধরছে আর ছাড়ে নি। বাংলা একাডেমিতে কাজ করার সময়ও তিনি কোনো কাজে ওদিকে গেলে আমাকে না দেখে আসেন নি। ছাত্র জীবনের পরবর্তী সময়ে রাজ্জাক সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক কেমন ছিল এ প্রশ্ন তুমি এক সময় করেছো। উত্তরে বলি, যোগাযোগ ছিল। তবে যেমন ধরো, বাংলা একাডেমিতে যোগদানের ব্যাপারে ওনার তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না। আমার বড় একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন। এখানে একটা কথা বলি—মুনীর চৌধুরী আমার পক্ষে কোনো কথা বলেছেন এমন খবর আমি পাই নি। অবশ্য আমার পক্ষ নেয়া অতটা নিরাপদ ছিল না। আমার ব্যাপারে তাঁর আড়ষ্টতার প্রমাণটা আমি পেয়েছি। কারণ একটা এমনও হতে পারে যে আমার স্ত্রীর তুলনায় ওর স্ত্রী অনেক বেশি অ্যান্টি-পলিটিক্যাল ছিলেন। আমার কারণে আমার স্ত্রীকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে কিন্তু কখনো সে অ্যান্টি-পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড নেয় নি।

AMARBOI.COM

আমরা স্যারকে মূল বিষয়ে টেনে আনতে চাইলাম। বললাম, ধরুন আপনার যে কাহিনী সেটা অন্য একজন ব্যক্তির কাহিনী। যে ব্যক্তি সুদীর্ঘ সময় ধরে আত্মত্যাগ করেছে, আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, মানুষের মুক্তির রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। তারপর একটা সময়ে এসে বলেছেন যে আমি আর একেবারেই রাজনীতির সাথে নাই। আমি এখন পর্যবেক্ষক। আপনাকে যদি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলি আপনি কি মন্তব্য করবেন?

—একেবারেই রাজনীতির সাথে নাই এমনভাবে বললে হবে না। বলো যে ততটা থাকছেন না। একেবারে খারিজ করে দিলে তো হবে না। ঠিক আছে, তোমার লাইন ধরেই যাই—একজন বন্ধু যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি এই কারবালাটা কী করলা? সারাজীবন এত কিছু করে শেষে আইসা সব ছাইড়া দিলা! এই তো প্রশ্ন? এর একটা উত্তর হলো : One man does not remain one man throughout his life. আমরা এটা সহজে চিন্তা করতে পারি না। একটা মানুষকে নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তার নানান পরিবর্তন সংগঠিত হয়। তুমি দেখতে চাচ্ছো তার যেন পরিবর্তন না হয়। তুমি চাচ্ছো তাকে দশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর আগে যে রকম কমিউনিস্ট দেখেছো সে রকম কমিউনিস্ট হিসাবে দেখতে। একটু অবজেকটিভলি একটু সায়েন্টিফিক্যালি যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবা যে কেউই অপরিবর্তনীয় থাকে না। এই পরিবর্তনকে ভালো বা খারাপ বা কম ভালো বা কম খারাপ বলতে পারো। কিন্তু পরিবর্তনশীলতাকে তোমার স্বীকার করতেই হবে।

তাহলে আপনার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ঘটেছিলো তাকে আপনি কী বলবেন? আপনার কমিউনিস্ট বন্ধুরা যদি আপনাকে নেতিবাচকভাবে দেখেন তাহলে কি আপনি মাইন্ড করবেন?

—আমি বলবো যে আমি পরিবর্তন করলাম। আমি অর্গানাইজেশানের জন্য খুব একটা হেলপফুল থাকলাম না। আর বন্ধুরা নেতিবাচকভাবে দেখলে আপত্তি করবো কেন? তারা তা সঠিকভাবেই করবেন। তবে কতটা নেগেটিভলি করবেন সেটা হচ্ছে কথা (উচ্চ হাসি হাসলেন, আমরাও যোগ দিলাম)। কিন্তু একটা কথা বলছি যে সবই কিন্তু আমাকে নেতিবাচকভাবে নেয় নি। যেমন ধরো, অনিল মুখার্জী। চেনো তাকে? নাম জানো? তার বই পড়েছো? পড়লে আবার পড়। ভীষণ নীতিবোধ সম্পন্ন লোক। এই লোক আমার নন-ইনভলমেন্ট'র ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমার উপর থেকে তাঁর যে স্নেহ-ভালোবাসা তা প্রত্যাহার করলেন না। এবং তিনি একটা কাজ করেছিলেন সচেতনভাবে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পার্টির কোনো সমস্যা নিয়ে আমার সাথে কথা বলেন নি। আর আমিও তাঁকে এ বিষয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন করিনি। তিনি আমার বাসায় আসতেন। পুরো পরিবারকে ভীষণ আদর করতেন।

বারবার একই প্রশ্ন করে হয়তো আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি। তবু শেষ একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। কত ঘটনাই তো আপনার চোখের সামনে ঘটছিলো। ছয়দফা। গণঅভ্যুত্থান। নির্বাচন। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধ। একজন রাজনৈতিক কর্মী না হোক একজন রাজনীতির পর্যবেক্ষক হিসাবে আপনি তখন কী ভাবছিলেন?

—এখন এসব বিষয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে কথা বলা ছাড়া তো উপায় নাই। পেছনের দিকে তাকিয়ে বললেও বলবো, ভাবছিলাম এই কথাই যে দেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, আমরা যে স্বপ্ন দেখতাম সে স্বপ্নের মধ্যে এ্যান্টি-হিউম্যান অর্থে এ্যান্টি-পাকিস্তানি হওয়ার ব্যাপার ছিল না। Pakistan was also a land of people. আমরা সেজন্য পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করেছি। আমরা পাকিস্তানের গণতন্ত্রায়ণ চেয়েছি। এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রক্রিয়াটার মধ্যে ডেমোক্রেটিক ইলিমেন্টগুলেকে যুক্ত করতে চেয়েছি। এসব নিয়ে অনেক কথা আছে। যেমন ধরো, মুজিব মনি সিংহকে বলছে, দাদা এবার লাগাইয়া দেই? মনি সিংহ বলেছেন, একটু ধৈর্য ধর। অস্থির হয়ো না। আসলে কমিউনিস্টারা লং-টার্মে চিন্তা করে। তারা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার টার্মে চিন্তা করে। তারা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার টার্মে চিন্তা করেনি। সেসব যাই হোক-আমি একটা সময়ে এসে এটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবছিলাম যে যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। পিপল মুভ করছে। দেশ গণঅভ্যুত্থানের পর্যায়ে যাচ্ছে। আসাদকে হত্যার ঘটনা যেদিন ঘটে সেদিন আমি সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম।

এবারে আপনার কাছে একটু তাত্ত্বিক জবাব আশা করি। জাতীয়তাবাদের রাজনীতির কাছে কমিউনিস্ট রাজনীতি কেন পিছিয়ে পড়েছিলো? আপনি হয়তো বলবেন যে আওয়ামী লীগের ভেতরে কমিউনিস্টরা ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো রাজনৈতিক দল হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি কেন আওয়ামী লীগের তুলনায় পিছিয়ে থাকল? কিংবা ব্যক্তি হিসাবে ধরলে শেখ মুজিবের তুলনায় পিছিয়ে থাকল? কিংবা ব্যক্তি হিসাবে ধরলে শেখ মুজিবের তুলনায় মাওলানা ভাসানী কেন ঝাপসা হয়ে গেলেন?

—কীভাবে এক কথায় উত্তর দেই! এটা একটা দ্বান্দ্বিক ব্যাপার, হেগেলিয়ান ব্যাপার। হয়তো বলতে পারি যে যা হওয়ার তাই হয়েছে। তবে আসল কথা হচ্ছে যে ব্যাপারটা এত সোজা না। কমিউনিস্ট নামটা অত সহজে সামনে আসতে পারে না। এর জন্য ইতিহাসের পর্ব অতিক্রম করে আসতে হয়। তোমার প্রশ্নের উত্তরে, বলতে পারি যে এটাকে আমি কমিউনিস্টদের ব্যর্থতা মনে করি না। কমিউনিস্টদের অত শক্তি কোথায় যে ব্যর্থতার প্রশ্ন আসে! একটা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টকে ডেমোক্রেটিক রাখার চেষ্টা করেছে এটাইতো বড় কথা। আরেকটা ব্যাপার হলো কমিউনিস্টরা হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। হঠকারিতার ফল ভালো হয় না। খাপড়া ওয়ার্ডের ঘটনাটার কথা বলি। অনেকে হয়তো একমত হবে না কিন্তু আমার দৃষ্টিতে খাপড়া ওয়ার্ডের ঘটনায় আবদুল হকদের হঠকারিতা ছিল। ফল কী হলো? কতগুলো অমূল্য জীবন ঝরে পড়লো আর কমিউনিস্টদের সাফল্য-ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বলি, কমিউনিস্টরা কীভাবে মানুষকে মুক্তি দেবে? যার মুক্তি তাকেই অর্জন করতে হয়। এটা সক্রেটিসের কথা। কমিউনিস্টরা যা পারে তা হচ্ছে মুক্তির অর্জনের ব্যাপারে সাহায্য করা। আরেকটা ব্যাপার হলো, কমিউনিস্টরা একটা সমন্বিত সমাজ, মানুষের সমাজ তৈরি করতে চেয়েছে। কিন্তু বিপক্ষ শক্তি যারা তারা তো বোকা নয়, দুর্বল নয়। তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে এবং করবে। পাকিস্তান আমলেও কমিউনিস্টদের এসব বাধা-বিঘ্নের ভেতরেই কাজ করতে হয়েছে। সুতরাং কমিউনিস্টরা ব্যর্থ হয়েছে এটা আমি মনে করি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ : দস্তখত দিলাম তবু গ্রেফতার হলাম

৮ এপ্রিল ২০০৩

আজকের বিষয়বস্তু ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। শুধু মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস নয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গোড়া থেকেই শুরু হওয়া রাজনৈতিক ঘটনাবলি, মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময়টা—এসবই আজকের আলোচনার উপজীব্য। একজন পর্যবেক্ষক অর্থাৎ সরদার ফজলুল করিম ঘটনাগুলোকে কীভাবে দেখছিলেন? এছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থা, ভাবনা-চিন্তা সর্বোপরি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কি ধরনের চিন্তা তৈরি হচ্ছিলো সেগুলো জানার আগ্রহও আমাদের থাকলো।

—এসব কথা বলার আগে আমি অনুরোধ করবো তোমরা ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এসব বিষয়গুলো মাথায় রাখো। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এটা প্রয়োজন। অনেক ঘটনাই মনে পড়ছে। যেমন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টে হত্যার ঘটনা। তারপর শেখ মুজিব যেদিন ছাড়া পেলেন সেদিনের ঘটনা। মুজিব ছাড়া পেয়েছেন এটা আমার কাছে অনেক বড় ঘটনা ছিল। হাজার হাজার মানুষের মতো আমিও তাঁর ধানমন্ডির বাড়ির দিকে দৌঁড়ে গেলাম। কিন্তু জনতার এত ভিড় ছিল যে আমি খুব বেশি অগ্রসর হতে পারি নি। বাড়ি ফিরে আমি ডায়েরীতে লিখলাম যে শেখ মুজিব মানে হচ্ছে জনতা সুতরাং আমি জনতাকে দেখে আসলাম। এসব কথা বলছি ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য। কালের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য।

'৭১-র কথা যদি জানতে চাও আমি শুরু করবো ৭ মার্চ থেকে। আমি ৭ মার্চ দেখেছি। আমি দেখেছি যে জনগণের মধ্যে পাকিস্তান সম্পর্কে একটা বড় রকমের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন চলে এসেছে। তখন আবার পশ্চিম পাকিস্তানিরা আলোচনা বা আলোচনার ধাপ্পাবাজী শুরু করেছে। আসলে ইয়াহিয়া খান যেদিন পার্লামেন্ট

AMARBOI.COM

অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেন অর্থাৎ মার্চের ১ তারিখে সেদিন থেকে পুরো দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। অধিবেশন বসার কথা ছিলো ৩ তারিখে। ১ তারিখে শেখ মুজিব বাংলা একাডেমিতে একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার মাঝখানেই ইয়াহিয়ার ঘোষণা জানাজানি হয়ে গেল। মুজিব তাড়াতাড়ি বাংলা একাডেমি ত্যাগ করে চলে গেলেন। তখন থেকেই টেনশান ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলো। আমাদের বাংলা একাডেমির পরিবেশটাও বেশ পাল্টে গেল। সেখানে দুএকজন ছিলো যারা চলমান ঘটনাবলি পছন্দ করছিলেন না। এদেরকে এজেন্ট বলা যেতে পারে। পরবর্তীতে এদের মাধ্যমেই রেডিও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি তৈরি করে দস্তখত কালেকশান করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিলো। তখন কবির চৌধুরী সাহেবও বাংলা একাডেমিতে ছিলেন। তিনি দস্তখত দেন নি। আমি দিয়েছিলাম।

এটা কী ধরনের বিবৃতি ছিলো যে কবির চৌধুরী সাহেব দস্তখত দেননি এবং আপনি দিয়েছিলেন? আমরা জানতে চাইলাম।

Situation at Dhaka is normal এ বক্তব্যটা গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলো। রেডিও পাকিস্তানের হেমায়েত নামের এক লোকের মাধ্যমে এ বক্তব্যের সপক্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে দস্তখত সংগ্রহ করা হয়। ঐ সময়ের হলিডে পত্রিকা দেখলে তুমি এগুলো ভালোভাবে জানতে পারবে। মার্চের শেষ দিকে এবং এপ্রিলের প্রথম দিকে সরকার এ উদ্যোগটা নিয়েছিলো। কারণ তখন গণহত্যা, ধ্বংসলীলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভীষণ আলোড়ন চলছিলো। সুতরাং ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক আছে এ রকম একটা ব্যাপার প্রতিষ্ঠা করা সরকারের পক্ষে ভীষণ জরুরী হয়ে পড়েছিলো।

কিন্তু ঢাকার পরিস্থিতি তখন স্বাভাবিক ছিল না। এটা সবাই জানে। কিন্তু আপনি সরকারের পক্ষে দস্তখত ছিলেন। কেন এই মিথ্যাচারের পক্ষে আপনি দস্তখত দিলেন?

—আমার ব্যক্তিগত রূপান্তরের কথা তোমাকে আগের আলোচনায় বলেছি। দস্তখত প্রসঙ্গে বলি, হেমায়েত আমাকে বললো যে স্যার, দস্তখত না দিলে কী হবে এটা আপনি তো বোঝেন। কাজেই ডিশিসানটা আপনাকে নিতে হবে। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে আমি যদি কথামত কাজ না করি তাহলে তারা রিপোর্ট করবে যে Sardar Fazlul Karim has refused to sign the statement. ফল হবে এই যে আমার বাসা আক্রমণ হবে, আমাকে হয়তো আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে। আর ঢাকায় থাকতে হলে আমাকে দস্তখতটা করতে হবে।

এই ভীতিটাতো কবির চৌধুরী সাহেবের জন্যও প্রযোজ্য ছিল? আমাদের প্রশ্ন।

—না, কবির চৌধুরী সাহেব এবং সরদার ফজলুল করিম এক না। এটা তোমাকে বুঝতে হবে। তোমরা ইয়াংম্যানরা বুঝতে চাও না। কবীর চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের অনেক যোগাযোগ ছিল। আর্মিতে তাদের কাছের লোকজন অফিসার পদেও ছিলেন। কাজেই তিনি যা করতে পারেন আমি সরদার ফজলুল করিম সে কাজ করতে পারি না। এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব কৈফিয়ৎ। দস্তখত না দেওয়াটা সরদার ফজলুল করিমের সাহসে কুলায় নাই।

আপনি পারিবারিক কারণ দেখাচ্ছেন, কানেকশান না থাকার কথা বলছেন। অথচ সে সময়ই অসংখ্য মানুষ জান বাজি রেখে লড়াই করছে। এখন আপনি নিজেই নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করুন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেই এটা জরুরী বলে মনে হচ্ছে।

—আমার নিজের সম্পর্কে মন্তব্য হচ্ছে I have to remain by the side of my family. এই বিবেচনা থেকেই আমি সব কিছু করেছি। আরো জেনে রাখো যে ২৭ মার্চ থেকে শুরু করে ৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ গ্রেফতার হওয়ার দিন পর্যন্ত নিয়মিত অফিস করেছি এবং অফিস থেকে বাসার দিকে গেছি।

জাতি কি আপনার কাছে এরকম প্রত্যাশা করেছিলো? আপনি একটা সিম্বল। আন্দোলন, সংগ্রাম, গ্রেফতারবরণের মধ্যে দিয়ে একটা সময়ে আপনার যে অবস্থান তার সাথে কি এসব ব্যাপার মেলানো যায়?

—সিম্বল মানে কি? একটু দ্বান্দ্বিক ভাবো। যদি তুমি বুঝতে না চাও তাহলে তো অসুবিধা। আমি তো আগেও বলেছি যে আমার এক সময়কার যে রাজনৈতিক যুক্ততা পরবর্তীকালে ঠিক সে রকমভাবে আমি আর থাকি নি। একটা ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা ব্যক্তি না। আর জাতির প্রত্যাশা বলতে কী বোঝাচ্ছ এটা বুঝতে পারছি না। পুরো জাতি বলে যে শব্দটা ব্যবহার হয় সেটা একটু বাড়াবাড়ি। পুরো জাতি বলে কোনো ব্যাপার কারু সামনে থাকে না। তার সামনে থাকে তার জীবনটা।

তাহলে কিছু লোক যে বলে, আমার জীবন বাঁচানোর তাগিদে রাজাকার বা শান্তি বাহিনীর মেম্বার হইছি তাদেরকেই বা কী বলার আছে?

—তাদের সাথে কীভাবে তর্ক করবা সেটা তোমার ব্যাপার। আমি শুধু বলতে পারি যে একটা ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক না। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয় বা নিতে বাধ্য হয়। আমিও নিয়েছি। তুমি বা অন্য একজন যে কোন উপসংহারে আসতে পারে। আমাকে সংশোধনবাদী, কাওয়ার্ড বলতে পারে আবার নাও বলতে পারে। জাতি, জাতির প্রতীক এগুলো বিমূর্ত ব্যাপার। কংক্রীট ব্যাপার হলো এই যে সরদার ফজলুল করিম মনোযোগ দিয়ে বাংলা একাডেমিতে চাকুরি করে এবং সরকারের কথামতো দস্তখত দিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। সেপ্টেম্বরে সে গ্রেফতার হলো। যারা আমার দস্তখত দেয়া, চাকরি করা ব্যাপারগুলো পছন্দ করেনি তারা আমাকে কোলাবোরেটর বলেছে। তাদের যা মনে হয়েছে তা বলেছে। আমি কী করতে পারি! তারা অতি সহজে বলতে পেরেছে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরদারের দস্তখত না দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু না দেয়ার যে ফল তা থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য কেউ ছিল না। সত্যি যে আমার সীমাবদ্ধতা ছিল। আমি পিছু হঠেছি। সিগনেচার দিয়েছি। কিন্তু তবুও আমাকে গ্রেফতার করা হলো। এটা কেন হলো? আমার সীমাবদ্ধতা নিয়ে তুমি কথা বলছো কিন্তু কেন গ্রেফতার করা হলো সে ব্যাপারে কেন কিছু বলছো না! আমার অনুরোধ একজন ব্যক্তিকে দেখবে তার পজিটিভে-নেগেটিভে, তার সাহসে-অসাহসে। সব জায়গাগুলো ধরার চেষ্টা করতে হবে। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো সাহসী হতে পারি নি। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। কুমিল্লা থেকে আগরতলা যাওয়া কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তিনি যান নি। তিনি যা পেরেছেন আমি তা পারিনি। সাধারণ মানুষের মতোই আমার মধ্যে সাহস এবং ভীরুতা উভয়ই আছে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গীতার বাণী উদ্ধৃত করেছিলেন। বলেছিলেন, নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য যে ব্যক্তি নিজের জীবন দান করে সেটা দান নয় গ্রহণ। সেখানেই তার সম্পূর্ণতা। এই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের খবর তোমরা রাখো না। তিনি জানতেন যে ঘাতকরা আসবে। তিনি স্বজনদের আহাজারি করতে বারণ করেছিলেন। ঘাতকরা ঠিকই এসেছিলো। এবং তাঁকে হত্যা করেছিলো। এই একটা লোক যিনি নিজেকে দেখেছেন মানুষের সমাজের সাথে নিজেকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে। এই লোকটা একটা সম্মিলিত সমাজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এমন সমাজ যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে। মানুষ মানুষের সাথে থাকবে। শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার নমস্য। আবার ধরো অগ্নিযুগের বিপ্লবী চট্টগ্রামের পূর্ণেন্দু দস্তিদার। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় স্থান ত্যাগ করেছেন। জীবন বাঁচাতে চেয়েছেন। পারেন নি। পথে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু জীবন বাঁচাতে চাওয়াটা কোনো পাপের ব্যাপার না। একটা আঘাতের সামনে জীবন রক্ষা করা একজন ব্যক্তির জন্য কোনো পাপের ব্যাপার নয়। সে জীবনটা কীভাবে ব্যবহার করলো সেখানে হচ্ছে বিচারের প্রশ্ন।

তাহলে সাহসিকতা, আদর্শ, আদর্শের জন্য জীবন বিসর্জন দেয়া এসব কি শুধুই কথার কথা?

—কথার কথা কেন হবে? শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখো। কথার কথা হচ্ছে, যারা কথার কথা বল অথচ কাজ করে না। একটা লোক সিগনেচার দেয় আবার জেলেও যায়—এভাবে সম্পূর্ণভাবে একটা ব্যক্তিকে তোমার বুঝতে হবে। সে শুধুই সিগনেচার দেয় না জেলেও যায়। লোকটাকে যদি মূল্যায়ন করতে চাও তাহলে তার দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করাই বড় কথা না। তাকে ভালোবাসা যায় এমন পয়েন্টগুলোও খুঁজে বের করতে হবে। তার মধ্যে যদি অনুপ্রেরণাদায়ী কিছু থাকে সেগুলো খুঁজে বের করাই বড় কথা।

বেশ কিছু সময় সরদার ফজলুল করিমকে কাঁটা-ছেড়া করার চেষ্টার পর আমরা পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আলাপ যখন পদ্ধতিগতভাবে ক্যাসেট বন্দী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিলো তখন নিবিড়ভাবে স্যারের কথাগুলোর তাৎপর্য বোঝা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে যখন ক্যাসেট থেকে তাঁর কথাগুলো তুলে এনে সাদা পৃষ্ঠায় লিখতে বসেছি তখন মনে হচ্ছিলো, আমরা যে পদ্ধতিতে তাঁকে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিলাম, অর্থাৎ আপনি কেন এরকম করলেন অথচ ওরকম করলেন না। অথবা আপনার কাছে প্রত্যাশা ছিলো এরকম অথচ আপনি ওরকম করলেন—এটা একজন ব্যক্তিকে মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং মানুষ বলেই মানুষের মধ্যে যে সব সীমাবদ্ধতা থাকে সেগুলোকে সক্রিয় বিবেচনায় রেখেই মূল্যায়নের চেষ্টা করা উচিত। আজকের আলোচনার এক পর্যায়ে এসে স্যার পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে একটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায়, আমরা যারা পাকিস্তান ভাঙছি তাঁরা পাকিস্তানত্ব বাদ দেই নাই। পাকিস্তান ভেঙে ফেললেও একটা সম্মিলিত সমাজের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে নাই। কামরুদ্দীন আহমেদ, তাজউদ্দীন আহমেদের মতো লোকেরা যারা পাকিস্তান আমলে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের বেস ছিলেন তাদের লক্ষ্য পূরণ হয় নাই। অতপর আমরা আবারো প্রথম প্রশ্নটি উত্থাপন করলাম। প্রশ্নটি ছিলা এরকমের : একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে আপনি আমাদের বলুন, যুদ্ধের দিনগুলোতে আপনার কী মনে হচ্ছিলো? দেশ স্বাধীন হওয়ার দিকে এগচ্ছিলো এমনটা কি মনে হচ্ছিলো, না কি আপনার মনে হচ্ছিলো যে যুদ্ধ প্রলম্বিত হবে? অথবা এমনটা কি কখনো মনে হয়েছে যে স্বাধীনতা আদৌ সম্ভব নয়?

—তোমরা পোলাপান মানুষ তোমাদের কী করে বোঝাই! তোমাদের সাথে আসলে আলেচনা করা উচিত না। কারণ তোমরা সময়টাকে সেভাবে ধরতে পারবা না। আরে আমরা অফিস করেছি। তা অফিসের মধ্যে আমরা কী করেছি সেটা তুমি কেমন করে জানবা! আমরা অফিসের মধ্যে প্ল্যানচেট করেছি। প্ল্যানচেট করে জিন্নাহ, এ. কে ফজলুল হক সাহেবের কাছ থেকে স্বাধীনতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। এগলোর হয়তো কোনো মানে নেই। এগুলো করেছি মনের আকুতি থেকে। স্বাধীন বাংলা বেতার কানের কাছে ধরে রেখেছি, রাতে শহরে কোথাও বোমা ফাটার শব্দে ভীত নয় সুখী হয়েছি। আবার বাড়ির সামনে দিয়ে মিলিটারির গাড়ি আসলে ভয়ে কম্পিত হয়েছি। ভয় এবং সাহস উভয়ই একজন ব্যক্তির মধ্যে যুগপৎ অবস্থান করে। পর্যবেক্ষণ কী ছিলো এ প্রশ্নের উত্তরে আমার আর কী বলার থাকতে পারে! আমি তোমাদের মতো অত পয়েন্ট ধরে ধরে কথা বলতে পারবো না। যা বোঝার তোমাকেই বুঝে নিতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে এই উপমহাদেশে একটা বিশাল ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। শহীদ মিনার ভেঙে ফেলা হয়েছে। রমনার কালী মন্দির গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলা একাডেমিতে গোলা ফেলা হয়েছে আমার বড় ভাইয়ের ছেলে যুদ্ধে গেলো আর এলো না, বোনের ছেলে লঞ্চে বাড়ি থেকে আসার পথে বিমান আক্রমণের শিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো এবং মারা গেল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দিচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী আমাদের পক্ষে সারা বিশ্বে কূটনীতি চালাচ্ছেন। এসব দেখার পর আমার ভাবনাটা কী দাঁড়াতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

আজকের অর্থাৎ ৮ এপ্রিল ২০০৩ তারিখের আলোচনার ইতি ঘটলো স্যারের নিম্নোক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে :

—একাত্তর সালের বড় ঘটনাই হেচ্ছে একাত্তর সাল। কথাটা এজন্যই আসে যখন কেউ প্রশ্ন করে যে মুক্তিযুদ্ধ করে কী লাভ হয়েছে? আমি বলি যে মুক্তিযুদ্ধটাইতো লাভ করলাম। এই যে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, এটাইতো লাভ। যেমন ধরো, খন্দকার মুশতাকের অন্তবর্তীকালীন সরকারে অন্তর্ভুক্তি, তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা—এইসবইতো অভিজ্ঞতা। মুক্তিযুদ্ধের পরে যা ঘটেছে এখনো যা ঘটছে সবই তো মুক্তিযুদ্ধের ফল। শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এদের সবারই নিহত হওয়ার কারণও মুক্তিযুদ্ধ। ইলেকশানে কারো জেতা না জেতা, কারসাজী, বুশের দালালী বা আমেরিকানিজম সব কিছুর মূলে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ। এই ব্যাপারগুলো অনেক সময় বোধের অগম্য মনে হলেও মিথ্যা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশের সংকলন '৮০ : স্মৃতিচারণ

২১শের সাথে যাঁরা জড়িত ছিলেন—যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন তাঁদের কাছ থেকে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ২১ সম্পর্কে তথ্যাদি উপস্থিত করা এবং তাকে ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখা প্রয়োজন। আমার নিজেরও ব্যক্তিগত ইচ্ছা, যদি সম্ভব হতো তা হলে যাঁরা আজও বেঁচে আছে—বয়োবৃদ্ধ হয়েছেন, ২১শের স্মৃতি যাঁদের আজো আছে, তাঁদের কথা আমি ধরে রাখতাম। বাংলা একাডেমির এ-প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবীদার।

'২১শের স্মৃতিচারণ—' এ শিরোনামটি ভালো। কারণ একুশ বলতেই আমরা বুঝি 'ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ'। আবার ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ শুধুমাত্র বাহান্ন সালের স্মৃতিচারণে সীমাবদ্ধ রাখলে ভাষা আন্দোলনের যে সামগ্রিকতা বুঝতে হলে আমাদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ, বিশেষ করে তার সচেতন যে অংশ—বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ, শিক্ষক, কেরানী, কর্মচারী তাঁদের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি বা রাজনৈতিকভাবে বলা চলে, পাকিস্তান থেকে মোহমুক্তি—এটা আমাদের স্মরণ করতে হয়। কেননা যেখানেই ভাষা আন্দোলনের সূচনা সেখানেই এই মোহমুক্তির সূত্রপাত।

একুশের স্মৃতিচারণ করা আমার পক্ষে কষ্টকর। কারণ পূর্বেই বলেছি, সীমাবদ্ধ অর্থে একুশ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করা আমার পক্ষে অসুবিধাজনক। বাহান্ন সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে আন্দোলন অর্থাৎ যখন ভাষা আন্দোলনের চরম প্রকাশ তখন কিন্তু আমি মুক্ত মানুষ নই, তখন আমি বন্দী। আমি ১৯৪৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ঢাকাতে গ্রেফতার হই। তখন থেকেই ধারাবাহিকভাবে আমি ১৯৫৫ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে কারাগারে আটক থাকি। ১৯৫৫ সালের মধ্যভাগে আমি পাকিস্তানের গণপরিষদে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হই। কয়েক মাস পরেই আবার আমাকে গ্রেফতার করা হয়। এক বছর পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫৬ সালে আমি পুনরায় মুক্তিলাভ করি এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হিসেবে কিছুকাল কাজ করি। তারপর ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান প্রথম সামরিক আইন জারী করলে উক্ত সালের অক্টোবর মাসে আবার আমাকে গ্রেফতার করা হয়। '৫৮ সাল থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত আমি নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে আবার আটক থাকি। ১৯৬২ সালের শেষের দিকে মুক্তি পাই। এবার আমি আমার সাহিত্য জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করি। তারপর থেকে প্রায় ন বছর একজন কর্মী হিসাবে বাংলা একাডেমিতে আমি কাজ করেছি। আবার ১৯৭১ সালে যখন মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয় তখন সেপ্টেম্বর মাসের দিকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আমাকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনী যেদিন ১৭ই ডিসেম্বর কারাগারের বদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়—সেদিন আমি অন্যান্যদের সাথে বেরিয়ে আসি। তাই আমার জীবনের একটা দীর্ঘকাল কেটেছে কারাগারে। কাজেই সেদিক থেকে বায়ান্ন সালের ২১শের স্মৃতিচারণ করা অর্থাৎ ছাত্ররা সেদিন যে শহীদ হয়েছেন, ঢাকা শহরের অযুত মানুষ যে রাস্তায় নেমে এসেছেন—গুলীবিদ্ধ হয়েছেন, জাতীয় জীবনে যে ঘটনা খুব কমই ঘটে—ওকে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে প্রকাশ করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

কিন্তু ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র বায়ান্ন সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এর পূর্ব আছে এবং পর আছে। এদিক থেকে কিছু কিছু কথা আমার মনে পড়ে—মনকে নাড়া দেয়। ১৯৪৭ সাল থেকেই আমার ব্যক্তি জীবনের যে প্রবাহ বিভিন্ন পথ-ঘাট অতিক্রম করে এসেছে—সেই পটভূমির কিছু স্মৃতিচারণ প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। কেননা এর ফলেই পূর্ব-বাংলা গণ-মানুষের মুক্তি বা মোহ-মুক্তি এবং তার চেতনার বৃদ্ধি। এগুলো আমার তরুণকালের উপর যেমন প্রভাব ফেলেছে—তেমনি সীমাবদ্ধ জীবন থেকে আরো কিছু মুসলিম তরুণও সচেতনভাবে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। আর এসবের ফলশ্রুতিতে বিন্দু বিন্দু করে বিপ্লবের পথ তৈরি সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে আমারও পরবর্তীর সঙ্গে একটা যোগাযোগ রয়েছে—তা অস্বীকার করা যায় না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের মূল হোতা ছিল সমাজগতভাবে মুসলিম সমাজ। এটা অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজে যে রাজনৈতিক ঐতিহ্য, যে সংগ্রামী ঐতিহ্য ছিল যে ঐতিহ্য তখনও মুসলিম সমাজ জীবনে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। একজন যুবক রাজনৈতিক কারণে বন্দী থাকবে এবং সেটা আরও পাঁচজনের কাছে আদর্শ হিসাবে অনুভূত হবে—ঐ ঐতিহ্য তখনও আমাদের মুসলিম সমাজে ছিল না। কথাটা এ কারণেই বলছি যে, পূর্ববঙ্গকে ভাষা ও জাতীয়তার ভিত্তিতে নতুন অস্তিত্ব দিতে হলে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের তরুণকেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মোচন ঘটাতে হবে। সেদিক থেকে আমরা যাঁরা ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে ছাত্র আন্দোলন কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম—তাদের এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামনা ছিল যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুসলিম সমাজ বৃহত্তর রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে পারে। যে সাম্প্রদায়িক একটা পরিমণ্ডল এ ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক কারণে সৃষ্টি হয়েছে, যার বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিকতা আমরা অস্বীকার করতে পারি নে তার সীমাবদ্ধতার কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা একটা সম্প্রদায়কে মুক্তি দিতে পারে না। মুসলিম সমাজ একটা সম্প্রদায়, হিন্দু সমাজ একটা সম্প্রদায়—এসব সম্প্রদায় নিয়েই ভারতবর্ষ। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কোনো সম্প্রদায়কে তার বাস্তবজীবন, অর্থাৎ তার সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জীবনের যে অভাব, অনটন, বন্দীত্ব—তা থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা বাস্তব সত্য। সেজন্য বিভিন্ন কারণে যখন মুসলিম সমাজে সচেতন লেখাপড়া জানা কেরানি, ছাত্র, কর্মচারী ইত্যাদির মধ্যে এই সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে চেতনা জাগতে শুরু করলো, তখন এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটা আনন্দের বিষয় হয়ে উঠলো। আমাদের মনে হলো আমাদের রুদ্ধ দ্বার এবার খুলে যাচ্ছে। মানুষের জীবনে নানা পর্যায় থাকে। একটা ব্যক্তি আসলে এক ব্যক্তি নয় বহু ব্যক্তি নিয়েই একটা ব্যক্তি-জীবন। এক ব্যক্তি বৃদ্ধ অবস্থায় যা আছে তরুণ অবস্থায় তা ছিল না। সেদিক থেকে বলতে হয়, সরদার ফজলুল করিম নামে যে তরুণ ছাত্রটি ১৯৪৭-৪৮ সালে ঢাকার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে কিছুটা সক্রিয় ভূমিকায় ছিল অবস্থার প্রেক্ষিতে তারও একটা তাৎপর্য ছিল। সে তাৎপর্য অন্তত এই যে, যে তরুণ সেদিনকার মুসলিম লীগের প্রধান আন্দোলনের ধারা দ্বারা আচ্ছন্ন হতে চায় নি। সচেতনভাবে সে তৎকালীন বামপন্থী আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত হওয়ার চেষ্টা করে। এটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পরবর্তীকালে যে অগ্রগতি—সে অগ্রগতিকে বুঝার জন্যই এর একটি সম্পর্ক আমাদের স্বীকার করতে হবে। বিষয়টি ব্যক্তিগত হলেও পূর্ব-বাংলার মুসলিম তরুণ সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি তাৎপর্যবহ। এ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আমি জড়িত থেকেও দর্শন শাস্ত্রে ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সকলের প্রশংসা পেয়ে পাশ করেছি।

তার আগের বছর দর্শন শাস্ত্রে অনার্সে আমি কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছি। স্বাভাবিকভাবে তখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষকই বেশি ছিলেন। তাঁদের যত্নে, আদরে, স্নেহে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁরাই আমাকে আমার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ দেখে দর্শন শাস্ত্রের বিভাগে ১৯৪৮ সালে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করতেন তাঁদের সকলেই জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষের মধ্যেও খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। হরিদাস ভট্টাচার্য তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইতিহাস আরও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৫, ৪৬, ৪৭ সালের দিকে হিন্দু শিক্ষকই বেশী ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তারাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একদিকে মুসলিম ছাত্রের আধিক্য, অপরদিকে হিন্দু শিক্ষকের আধিক্য, এই বলে সম্প্রদায়গত কোন মারাত্মক দ্বন্দ্ব তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না। শিক্ষকরা সকলেই ছিলেন সর্বজন পূজিত। হরিদাস ভট্টাচার্য, ডি.এন. ব্যানার্জি, অধ্যাপক এ.বি. রুদ্র, ড. মাহমুদ হোসেন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রফেসর রাজ্জাক প্রমুখ—এঁরা ছিলেন আমাদের গৌরব। তৎকালীন ছাত্র সমাজও তাঁদের লেখাপড়ায় ছিল উন্নত—শিক্ষকমণ্ডলী এ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

আমার শিক্ষকমন্ডলীও আমাকে নিয়ে আশা করেছিলেন যে, আমি শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকব। আমি ক্রমান্বয়ে আরও ব্যুৎপত্তি লাভ করবো, বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে আনবো। কিন্তু তাঁরা আমার একটি দিক তখনও জানতেন না। আমার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া আরও যে একটি দিক আছে সে বিষয়ে তাঁরা অবগত ছিলেন না। ১৯৪২-১৯৪৩ সাল থেকে—মোট কথা দুর্ভিক্ষের সময় থেকে আমি ছাত্র হলেও এ সময়ে অবিভক্ত বাংলাদেশে কী হচ্ছে—এ সম্পর্কে আমি শুধু সচেতনই ছিলাম না—এর সাথে আমি জড়িতও ছিলাম। আমি ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের কথা বলছি। এ দুর্ভিক্ষ আমার মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। আমি তখন একটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির আদর্শ অর্থাৎ সাম্যবাদী আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলাম। সে সময় একজন মুসলিম চাত্রের পক্ষে এমন রাজনীতির সাথে জড়িত হওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগে যখন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও একটি কাঠামোগত পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। এখান থেকে বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু-শিক্ষক কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে তখন চলে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় একজন মুসলিম তরুণ শিক্ষকের অধ্যাপনা ক্ষেত্রে টিকে থাকা দরকার ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগে যে একটা চেতনা আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল সে কথা বলার জন্য বলছি, পূর্ববঙ্গে যে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তার আমি সক্রিয় সদস্য ছিলাম। ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষকাল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আমি জড়িত ছিলাম। কমিউনিস্ট পার্টি শুরু থেকেই জনগণের কাছাকাছি ছিল, দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—তাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিবারণের চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে ভারতীয় উপ-মহাদেশে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করে স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করার চেষ্টাও করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। এসব কারণেই আমি কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে যাই। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও সাম্প্রদায়িকতা থেকে শোষিত মানুষের মুক্তি আসেনি। একটা রাষ্ট্র আছে। কিন্তু রাষ্ট্র থাকাটাই বড় নয়। বড় হচ্ছে শোষণ থেকে মানুষের মুক্তি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, পূর্ব-বাংলার কৃষক শ্রমিক তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত দেখতে পাবে, এ ধরনের একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধ সকলের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান ব্যতীত অন্য কোন চেতনা তখন মানুষের মনে ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে বহু কর্মচারী পশ্চিম-বাংলা, বিহার ইত্যাদি স্থান থেকে ঢাকায় এসেছেন—এখানে ভিন্ন উদ্যমে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ ক্রিয়াকাণ্ড শুরু হবে এ ধরনের একটা আশা তাদের প্রত্যেকের মনে ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালেই ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা আঘাত এল। এতদিন একটা কৈফিয়ৎ ছিল যে পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের দ্বারা শোষিত। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা এখন মুক্ত ও স্বাধীন। স্বাধীন বাংলায় তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা জাগরণ ঘটাবে, তাকে উন্নত করবে, তার চর্চা করবে—কিন্তু এই আশার ক্ষেত্রে পূর্ব-বাংলার মানুষ পেল তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর কাছে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে এক বড় ধরনের আঘাত।

১৯৪৮ সালের কথা বলছি। ছাত্র সমাজ তখন যুবলীগ গঠন করেছে। যুবলীগের ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। বাংলা ভাষাই শিক্ষার বাহন হবে, শিক্ষার মাধ্যম হবে। কিন্তু ভাষাকে কেন্দ্র করেই ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকার বুকে ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, আন্দোলন হয়েছিল। সে শোভাযাত্রায় পুলিশের হামলা হয়। সে সময়ের একটা শোভাযাত্রার কথা আমার চোখের সামনে এখনও ভাসছে। জগন্নাথ হলে তখন প্রাদেশিক সংসদের অধিবেশন বসতো। বোধহয় ১২ মার্চে আমরা মিছিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) থেকে শুরু করে আবদুল গনি রোড ধরে সেক্রেটারিয়েটের দক্ষিণ গেটে উপস্থিত হলাম। একজন ছাত্র মন্ত্রী আবদুল হামিদ সাহেবকে ধরে এনে বক্তৃতা দেওয়ালেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "বাংলা ভাষা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ভাষা। সবচেয়ে ভালো ভাষা।" এভাবে তিনি তার জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। এ মিছিলের প্রধান ভাগ ছাত্রই ছিল।

'কায়েদে আযম' ঢাকায় প্রথম এসেই রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন। সেখানে প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল। আমি কিন্তু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ আমি মনে করেছিলাম দেশের এ পরিস্থিতিতেতে আমার পক্ষে চাকরি করা সঙ্গত হবে না, আমার দায়িত্বের কথা চিন্তা করে ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পদত্যাগ করে চলে যাই। জিন্নাহ সাহবের বক্তৃতা শোনার জন্য ঢাকা শহরের অসংখ্য লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। জিন্নাহ সাহেব উর্দুতে ভাষণ দেন। আমি এর পূর্বে জিন্নাহ সাহেবকে দেখিনি। ক্ষীণ দেহ, বেশ দীর্ঘ, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ বেশ বলিষ্ঠ। তিনি বক্তৃতা করতে করতে এক জায়গায় বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কমিউনিস্ট আছে, তোমাদের মধ্যে গুপ্তচর আছে, তোমাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করছে। আমি বলছি ভাষার ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উঠেছে তাতে উর্দু, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' একথা বলেই তিনি বক্তৃতা শেষ করেন কিংবা তাঁর বক্তৃতায় এটা সবচেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। সে সময় ছাত্ররা বিশেষ করে, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা সংবর্ধনার তোরণ জিন্নাহ সাহেবের নামে তৈরি করেছিল। জিন্নাহ সাহেবের ভাষণ শোনার পর ছাত্ররা এতই মর্মাহত হয়েছিল যে, হলে ফেরার পথে সে তোরণ তারা ভেঙে ফেলে। অনেকে বলেছেন—জিন্নাহ সাহেব রেসকোর্সে ভাষণ দানকালে ভাষার প্রশ্নে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার প্রতিবাদ সেখানেই হয়েছিল। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমি একজন সচেতন কর্মী হিসাবেই সেখানে গিয়েছিলাম এবং জিন্নাহ সাহেব কী বলেন, না বলেন, তার প্রতিক্রিয়া কী হয় এসব জানার জন্য সেখানে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে কোন বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ আমি লক্ষ্য করিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় কার্জন হলে। কার্জন হল মিলনায়তনের এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে যেসব ছেলেমেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় পাস করেছেন তাদের সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। আমি ১৯৪৬ সনে পাস করেছি। কিন্তু ইতোপূর্বে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিনি। চিঠি পেয়েছিলাম উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু আমি ছাত্রদের নির্দিষ্ট জায়গায় না বসে শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসি। হলের মধ্যে পেছনের দিকে একটা অংশে ছাত্রদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সার্টিফিকেট বিতরণ পর্ব শেষে জিন্নাহ সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিতে উঠেন। তিনি ইংরেজিতে ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণের এক জায়গায় এসে আবার স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেন : Urdu and Urdu alone shall be the state language of Pakistan.

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চমকে উঠলাম—আমরা পেছনে তাকাতে বাধ্য হলাম। পেছনে ছাত্রদের যে ব্লক ছিল হয়তো ডিগ্রি গ্রহণকারী ছাত্ররাই সেখানে ছিল। সেখান থেকে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে তিনটি শব্দ উচ্চারিত হলো 'নো, নো, নো'। এ তিনটি শব্দই মাত্র উচ্চারিত হয়েছিল। এ ছাড়া কোন আওয়াজ বা শ্লোগান সেখানে উচ্চারিত হয়নি। এ তিন শব্দই জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতাকে থামিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। তিনি মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়েছিলেন। তারপর স্বভাবসুলভভাবে ভাষার বিষয়ে আর কোন বক্তব্য না রেখে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন। জিন্নাহ সাহেব হল থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত হলের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাউকেই বের হতে দেয়া হয়নি। ভাষা আন্দোলনের এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জিন্নাহ সাহেব আরও কয়েকটি জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। কোনো কোনো জায়গায় বিক্ষোভের কথা শুনেছি। কিন্তু তার কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি এ পর্যন্ত যে স্মৃতিচারণ করলাম এ ছাড়া আর কিছু বলা আমার পক্ষে কঠিন। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ব্যক্তিগত কারণে সাংগঠনিক দায়িত্বের দিক থেকে আমি ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাই। আমি ঢাকা জেলায়ই এক গ্রামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত-মজুরদের সাথে থাকি। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করি। এ ছাড়া তাদের সাথে সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, দেশের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করে তাদের সচেতন করে তোলার চেষ্টা করি। আমি সেখানে তাদের মাঝে ছদ্মনামেই একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করি। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসের দিকে সাংগঠনিক কাজের জন্য আমি ঢাকায় এসে উঠি। একটা বাসায় আমি থাকি। সেখানে আরও কয়েকজন কর্মীবন্ধু জড়ো হয়। সেখানে পুলিশের হামলা হয় এবং আমরা গ্রেফতার হই। এই সংগঠন তখনকার সরকারের নিকট সবচেয়ে ভয়ের বিষয় ছিল। কারণ এ সংগঠন খেতে খামারে কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছিল। এ কারণেই মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশের নজর ছিল এই সংগঠনের উপর। যদিও সরকারিভাবে এটা নিষিদ্ধ সংগঠন নয়। তা সত্ত্বেও এদেরকে কাজ করতে দেয়া যাবে না, এ ছিল সরকারি মনোভাব। ফলে নিরাপত্তা আইনের আওতায় সংগঠনের কর্মীদের গ্রেফতার করতে থাকে। এই আইনের বলে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রয়োজন হয় না, সরকার এই আইনের আওতায় যে কোনো লোককে গ্রেফতার করতেপারে। বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সরকার এ আইনের আওতায় গ্রেফতার করে। সরকারের এ কর্মসূচির আওতায় আমিও অন্যান্য কর্মীবন্ধুদের সাথে ১৯৪৯ সালে ডিসেম্বর মাসে গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় যাই।

তখন জেলখানার ভিতর রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে একটা অস্থিরতা চলছিলো। ১৯৪৯ সালে আমি জেলে গিয়েই তা বুঝতে পারি। জেলখানার মধ্যে সে সময় বন্দীরা নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অনশন সংগ্রাম চালিয়েছিল। এ সংগ্রাম ৫৮ দিন যাবৎ চলেছিল। জেল কর্তৃপক্ষ অনশনরতদের জোর করে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা চালিয়েছিল। আমি যেদিন জেলে যাই সেদিন এ সংগ্রামের ২০ দিন অতিক্রান্ত। জোর-জবরদস্তি করে দুধ খাওয়াতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নিবেদিত কর্মী শিবেন রায় নিহত হন। জোর করে নল দিয়ে দুধ খাওয়াতে গিয়ে শ্বাসনালীর মধ্যে দুধ চলে যায়। ফলে, তার মৃত্যু ঘটে। শুধু একটিমাত্র ঘটনা নয়। ১৯৫০ সালে রাজশাহীতে জেলখানার ভেতরে খাপরা সেলে যেসব রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন পুলিশ তাদের উপর গুলি চালালে সাতজন রাজনৈতিক কর্মী মৃত্যুবরণ করে।

আমি বলছিলাম, তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রগামী অংশ বামপন্থী মহল কী করে জেলে গেছেন, অসহনীয় নির্যাতন সয়েছেন—কিন্তু এসব পরিবেশের মধ্য দিয়েও আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে গেছেন, মনোবল রক্ষার চেষ্টা করেছেন, অনেকে মৃত্যুবরণও করেছেন—এর কথা। '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। পূর্ববঙ্গের যে রাজনৈতিক কাঠামো, যে নেতৃত্ব তা সরকার পরিবর্তনে তখন যথেষ্ট ছিল না। একটা হতাশা আমরা জেলখানার মধ্যে বিশেষভাবে অনুভব করতাম। তথাপি কমিউনিস্ট পার্টি একটি সুসংবদ্ধ পার্টি। জেলখানায় যেসব কর্মী মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আবদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে তাদেরকে সতেজ ও তাদের মনোবল অটুট রাখার চেষ্টা সে করেছে। জেলখানার ভেতরের রাজবন্দীরা বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতেন না। ফলে সব সময় তাদের মনের ভেতরে একটা হতাশা, একটা বেদনা তাদেরকে অনবরত আঘাত করতো। দেশীয় বা আন্তর্জাতিক কোন খবরই যা রাজনৈতিক বন্দীদের মনোবলকে সতেজ করতে পারে তা জেলখানার বন্দীদেরকে কোনক্রমেই সরবরাহ করা হতো না। সরকারি কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে চাইতো না।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় আমি ছিলাম রাজশাহী জেলে। সেখানেও আমাদের কানে দূর থেকে ভেসে আসত 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' 'ছাত্র হত্যার বিচার চাই' ইত্যাদি শ্লোগান। আমাদের বন্দীদের তখনকার মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। এ শ্লোগান শুধু রাজশাহী কারাগারে উঁচু দেয়াল ভেদ করে রাজবন্দীদের কানে ঢোকেনি, ঢাকাসহ সব কারাগারের বন্দীদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বহু ছাত্র কারাগারের বন্দীদের সাথে দেখা করে বলেছিল চিন্তার কোন কারণ নেই—আমাদের আন্দোলন জোরসে চলছে। অনেকে বন্দীদের জড়িয়ে ধরে বলেছে জয় আমাদের সুনিশ্চিত ইত্যাদি। অনেক ছাত্র, দলীয় কর্মী দলে দলে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন জাতীয় জীবনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। এ সম্পর্কে 'গল্প নয়' বলে আমার একটি প্রবন্ধ আছে। তাতে আমি এ মনোভাবই ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি, কীভাবে এ ভাষা আন্দোলন আমাদেরকে এ বন্দীশালার মধ্যে উজ্জীবিত করেছিল।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের ফলে রাজশাহী জেলে এক শতের উপরে নতুন রাজবন্দী এলো। আমরা পরস্পরে মিলতাম শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময়। জুম্মার নামাজই একমাত্র উপযুক্ত সময় ছিল যখন সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো বাধা দেয়ার সুযোগ ছিল না। আমরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা ঐ সময়েই সেরে নিতাম। শুক্রবারের জুম্মার জামাতও আমাদের দাবির মাধ্যমে আদায় করে নিতে হয়েছিল।

আজকের অবস্থা থেকে যদি আমরা পুরোনো দিনের দিকে তাকাই তবে বলা চলে সমগ্র পূর্ব বাংলা একটা বন্দীশালায় রূপান্তরিত ছিল। শ্রমিক, কৃষক তথা বাংলার মেহনতী মানুষ তাদের স্বপ্নভঙ্গ থেকে নানা হতাশার মধ্যে নিপতিত ছিল। যখন তারা আলোর আশা করছিল ঠিক সেই সময়েই ভাষা আন্দোলন নতুন পর্যায় নতুন বিস্ফোরণ এনে সমস্ত পূর্ববঙ্গকেই নতুন জীবন দান করেছিল। সেদিক থেকেই আমরা এখনও ভাষা আন্দোলনের কথা বলি। এত বছর পার হয়ে গেছে, তবুও আমরা বলি এ আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। এ আন্দোলনের খুঁটি-নাটি, ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, এটা যাঁর স্মৃতিতে যে রকম থাক না কেন, সমস্ত কিছু আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সে কাল : কিছুস্মৃতি কিছুকথা

সম্বোধন

আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আরিফা রহমান এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ।

স্নেহভাজন অনুজাপ্রতিম নাজমা জেসমীন চৌধুরীর আজকের এই স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে যোগদানে আমার মানসিক অনুভূতিটি আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশের অতীত।

আমি সাধারণ। আমি দুর্বল, অযোগ্য এবং দরিদ্র।

আমি জানি, মৃত্যুর মধ্যে আমাদের বাস। তবু আমি মৃত্যুকে স্বীকার করিনে। 'শহীদ' কথাটি আমার কাছে পবিত্র। আমার স্বপ্নের মনুষ্য সমাজ তৈরির সংগ্রামে জীবনদানকারী সৈনিককে আমি বলি শহীদ। আমাদের নাজমা সেই সংগ্রামের এক মহৎ সৈনিক। জীবনদানকারী সৈনিক। মহৎ জীবন তৈরির সংগ্রামে জীবনদানকারী নাজমাকে আমি শহীদ বলে গণ্য করি। জীবনসংগ্রামের সব শহীদকে আমি জানিনে। আমার জানা-অজানা সকল শহীদের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত বোধ করি। নাজমা আমার অনুজাপ্রতিম। কিন্তু নাজমা আমার চাইতে অনেক বড়। নাজমাকে আমার জানতে হবে। নাজমা স্মৃতি সংসদের আজকের আহ্বানে আমার সকল অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি তাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যোগ দিতে এসেছি এক দায়িত্ব পালনের বোধ থেকে।

আপনারা নাজমার উপর একটি স্মারকগ্রন্থ তৈরি করেছেন। এমন মহৎ স্মারকগ্রন্থও আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি। এটি পাঠ করতে গিয়ে আমার গলা ধরে এসেছে। চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। আনন্দে, গর্বে ও গৌরবে। তখন আর নিজেকে অশক্ত এবং দরিদ্র বলে মনে হয়নি। মনে হয় না। এ গ্রন্থখানিকে কি আমাদের সকলের জন্য অবশ্যপাঠ্য করা যায় না? এ কথা আমি আজ যেমন বলছি, আগামীতেও তেমনি বলব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রীতিভাজন সিরাজ বলেছেন : আপনি এবার কিছু বলুন। নাজমা বলেছেন : স্যার, আপনি কিছু বলুন। নাজমার এমন সম্বোধন তাঁর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বোধন।

আমার নিজের সঙ্কোচ কাটিয়ে আমি তাকে তুমি বলে সম্বোধন করেছি। বলেছি : আমি কী বলব? আমি তোমাকে কী দেব? তোমার দানেই আমি ধন্য। আমরা ধন্য।

আপনি আপনার জীবনের কথা বলুন। আপনার অনুভূতির কথা।

এ প্রায় তার হুকুম। এমন সুন্দর করে সে হুকুম করতে পারে! এ দৃশ্য ভাবতে আমি আবেগে আপ্লুত হই। যারা জীবন দিয়ে আমাদের জীবিত রাখছে তাদের কাছে আমাদের ঋণের শেষ কোথায়? আমার দরিদ্র জীবনে আজ যেভাবে নাজমাকে পেলাম, এমন প্রাপ্তি আমার কাছে অকল্পনীয় ছিল। এই প্রাপ্তিতে আজ আমি নিজেকে শক্তিমান মনে করছি। সমস্ত রকম হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে, জীবনের অপরাজেয়তার স্বপ্নে এবং বিশ্বাসে আমি উজ্জীবিত বোধ করছি। এই বোধটুকুর জন্য আমি অনুজা নাজমার কাছে ঋণী।

নাজমাকে প্রত্যক্ষ রেখে যে কথা কয়টি আমি বলার চেষ্টা করছি তা এই : এ কোনো আত্মজীবনী নয়। 'আত্মজীবনী' কথার মধ্যে হয়তো কিছু অহংবোধের ব্যাপার থাকে। তাই আত্মজীবনী বলার আমার সাহস নেই। কিন্তু জীবন তো, যে জীবন পাঁচটা মানুষকে দেখেছে, পাঁচটা কালকে দেখেছে, তার কথা বলার দায়িত্ব তো সে অস্বীকার করতে পারে না।

১৯২৫ থেকে আজকের এই ২০০০ পেরিয়ে প্রায় ২০০১ এর সামনে দাঁড়িয়ে। আমার দরিদ্র পিতা-মাতার দান করা জীবন দিয়ে যে নতুন মানুষের স্বপ্ন দেখতে দেখতে এই পথটা আমি হেঁটে এসেছি, সেই নতুন মানুষের কল্পনাতীত এক প্রতীক আমাদের নাজমা। তার যে এমন করে সাক্ষাৎ পেলাম, সেজন্য আমি আমার জনক-জননীর কাছে অসীমভাবে কৃতজ্ঞ : কৃতজ্ঞ আমাকে জীবন দেওয়ার জন্যে। তাদের কাছে তাই আমার ঋণের শেষ নেই। এর কোনো পরিশোধ নেই। কিন্তু একে অস্বীকার করার সাধ্য নেই। পাপ বলে যদি কিছু থাকে তবে সেটাই হবে আমার পাপ। জনক-জননীর দান করা জীবনের ঋণকে অস্বীকার করার পাপ।

তাই এ পথ চলতে চলতে ডাইনে-বাঁয়ে যা আমি দেখেছি, জীবন-পথের অপেক্ষমান সারিতে নাজমাকে সে কথা বলার দায়ে আমি দায়বদ্ধ।

* * *

একদিন জীবনের মিছিলে যোগ দিয়েছি, আওয়াজ তুলেছি, পথের সাথী, পথের সংগ্রামী কমরেডদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আওয়াজ তুলেছি : 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বিপ্লব জিন্দাবাদ'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপ্লব কি আসবে? সব প্রতিকূলতা এবং দানবীয় শক্তিকে পরাজিত করে বিপ্লব কি আসবে?

হ্যাঁ বিপ্লব আসবে। আমার বোধ : বিপ্লব এসেছে। বিপ্লবের মধ্যে আমরা বাস করছি।

প্রতিকূলতায় হতাশ হওয়া নয়। দানবীয় শক্তির প্রকাশে শঙ্কিত হওয়া নয়। দানবীয় শক্তি, তথা মৃত্যুর মুখের ব্যাদান : জীবনের শক্তির বিকাশে আতঙ্কিত প্রতিকূলতার প্রকাশ : এই প্রত্যয়ে আত্মপ্রত্যয়ী আমাদের হতে হবে। এই বোধ তো আমরা আহরণ করেছি যেমন নাজমার কাছ থেকে, তেমনি সংখ্যাহীন আমাদের সংগ্রামী সাথীদের জীবন থেকে। নির্যাতিত মানুষের এমন সংগ্রামী ঐতিহ্যের বোধ হচ্ছে আমাদের শক্তির উৎস।

আদি থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত যুগের সংগ্রামী মানুষের মহৎ ঐতিহ্যের আমরা একমাত্র উত্তরাধিকারী : আজকের পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষ। নির্যাতিত সংগ্রামী মানুষ। যে নির্যাতনকারী, সে কোনো মহৎ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। সকল মহৎ সংগ্রামের মহৎ ঐতিহ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হচ্ছে নির্যাতিত, নিপীড়িত সংগ্রামী মানুষ।

তাই নিকটভাবে আমাদের দেশ ও মাতৃভূমিতে, সংখ্যাহীন ঘটনার মধ্য দিয়ে এই বৈপ্লবিক শক্তির প্রকাশকে যেমন আমরা দেখতে পাই, তেমনি বিশ্বব্যাপী তার প্রকাশও আমাদের কাছে আর অদৃশ্য এবং অ-দৃষ্ট নয়।

ওরা বলে : আমাদের স্বপ্ন, তথা একটা নতুন মনুষ্য সমাজের স্বপ্ন আমাদের মিথ্যা এবং মৃত্যু।

আমার বোধ : তা হলে তোমরা এত আতঙ্কিত কেন? একদিন যদি মার্কস-এঙ্গেলস্ বলেছিলেন : The Spectre of Communism is haunting Europe, তা হলে আমরা আজ প্রত্যক্ষভাবে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি :the Spectre তথা the ghost of dead Communism i haunting the exploiting classes of the entire world.

স্নেহভাজন নাজমা, আমি পারি তোমাকে আমার এই অতিক্রান্ত পথের দুএকটি মজার কাহিনীর কথা বলতে। তোমার অসহনীয় কষ্টের কথা স্মরণ করে আমার চোখের পাতা কেঁপে উঠছে। তোমার কষ্টের উপশমের জন্যে দেখো সহস্র বার কেমন উদ্বেগে অস্থির হচ্ছি। কিন্তু তুমি সত্যি জেনো, আমাদের বহমান জীবন এবং সমগ্র পৃথিবীতে এমন সব সংখ্যাহীন ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, নতুন মানুষের নতুন কাহিনী তৈরি হচ্ছে, তোমার কষ্টকে লাঘব করার জন্য। তুমি আমার বলা এই কাহিনীর কথা শুনে নিজের মনে মজা পাবে, তুমি নিজের কষ্টকে ভুলে যাবে, যেমন তুমি যথার্থই তোমার নিজের কষ্টকে হাসিমুখে বিস্মৃত হয়ে তোমার নিকট-দূরের সব সাথীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছ। তোমার মতো এমন জীবনের সাক্ষাৎ আমি খুব কমই পেয়েছি।

* * *

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তোমাকে কয়েকটা গল্প কিংবা বলতে পারো গল্পের অংশ বলছি। গল্পের আগে পরে ভেবে তো লাভ নেই। গল্প গল্পই। আগেরটাও গল্প। পরেরটাও গল্প। যেমন ধরো আমার এক রাতে 'পথের দাবী' পড়ার গল্প।

'পথের দাবী' : শরৎবাবুর পথের দাবী। নিষিদ্ধ 'পথের দাবী'। শরৎবাবু কখন লিখেছিলেন এ উপন্যাস আমি এ মুহূর্তে বলতে পারব না। কিন্তু আমি যখন পড়ি তখন আমি কিশোর : ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্র। বরিশাল জেলা স্কুলে। সে ১৯৩৮-৩৯ সালের কথা। নাজমা, বিস্ময়ের ব্যাপার। তুমি জীবনে এসেছিলে : ১৯৪০ সালে। ১৯৪০ সালে আমি সেকালের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছিলাম। কিন্তু সে কথা বড় কথা নয়। এখন দেখছি বড় কথা : তুমি ১৯৪০ সালে জন্মেছিলে। আর আজ আমি তোমাকে সম্বোধন করে কথা বলছি। কী বিস্ময়কর আমাদের জীবন! কী বিস্ময়কর মানুষের জীবন!

'পথের দাবী' দিয়েছিল আমাকে আমার সহপাঠী অন্তরঙ্গ কিশোর বন্ধু মোজাম্মেল হক। [পরবর্তীকালে সে নিহত হয়েছে, ১৯৬৪ কি ৬৫ সালে মিশরের মরুভূমিতে পিআইএ বিমানের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়] মোজাম্মেল আমার কাছে স্মরণীয়। কেবল আমার কৈশোরের বন্ধু বলে নয়। সমাজগত পশ্চাৎপদতা-অগ্রগামীতার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের একটি কিশোর ছাত্র বলে, যে সেই ১৯৩৯-৪০ এ ছিল সারা ভারতে বিপ্লবী দল RSPI এর সক্রিয় এক রাজনীতিক কর্মী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শক্তিসমূহের একটির মাঝে নিজেকে একাত্ম করা এক কর্মী হিসেবে সে আমাকে বিপ্লবের লাল-নীল ইস্তেহার দিত। আমাকে ভালো পড়ুয়া ছাত্র বলে ব্যঙ্গ করত। অথচ নিজে বৃত্তিধারী মেধাবী ছাত্র ছিল। আমাকে 'পথের দাবী' দিয়ে এক রাতের মধ্যে গোপনে তা পাঠ করার হুকুম দিয়ে বলেছিল : খবরদার! এই বইয়ের কথা কেউ যেন জানতে না পারে। তা হলেই তোমাকে জেলে যেতে হবে।

সে এক রোমান্টিক আর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বরিশাল শহরের একটি বাসা বাড়ি। এ শহরে ইলেক্ট্রিক লাইট তখনো আসেনি। রাস্তায় রাতে ঝুলানো গ্যাসের বাতি জ্বলে। একটি কিশোর, মুরব্বীর ভয়ে হ্যারিকেনের দুদিকে কাগজের ঢাকনা দিয়ে পড়ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের রোমাঞ্চকর এক কাহিনী। ভারতী, অপূর্ব, সব্যসাচীর কাহিনী। ঘটনাস্থল সুদূর বার্মার রেঙ্গুন শহরের অন্ধকার কাঠের ঘর, গাছপালাঘেরা শহরতলীর নদী। নায়িকা ভারতী বরিশালের মেয়ে। কেমন করে এলো সুদূর রেঙ্গুনে সেটি বড় কথা নয়। একটি গুপ্ত দল। যে দল স্বাধীনতার কথা বলে, ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে, স্বাধীন করতে চায় ভারতকে। ব্রিটিশ সরকারের চর অনুচর সর্বত্র, কলকাতা, রেঙ্গুন, সুমাত্রায়। নিষিদ্ধ এই গুপ্ত সমিতির আসল নায়ক সব্যসাচী। তার পিস্তল চলে দুই হাতে। তার গতায়াত রহস্যজনক। পুলিশ ও তাদের অনুচরেরা শত চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সে কাহিনীর বিস্তারিত থাক। কিন্তু এ কথা তো ঠিক যে এ কাহিনী এই কিশোরের দেহমনকে সে রাত্রিতে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল। তার চোখেও স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়েছিল। 'পথের দাবী'র প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরের কোনা কায়দা করে কাটা। এই কোনাতেই মুদ্রিত ছিল 'পথের দাবী' দুটি শব্দ। ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা, সর্বত্র এই বই নিষিদ্ধ। এই বই কতখানি উপন্যাস হয়েছিল কিংবা হয়েছিল না তা নিয়ে তর্ক ছিল কবিগুরু ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে। কিন্তু আমার মনে শিহরণ বাদে কোনো সন্দেহ ছিল না। কোনো তর্ক ছিল না। সেজন্য আজো সেই কিশোর তার বার্ধক্যে লজ্জা বোধ করে না। কারণ একালেও তার সাথী রয়েছে। বৃদ্ধ জ্যোতিবাবুর পরিচিতি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন অশীতিপর এই বিপ্লবী। ঢাকায় এসে তিনিও তাঁর কৈশোরের স্মৃতিচারণ করে বললেন : আমি স্বদেশী রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলাম 'পথের দাবী' পাঠ করে।

কেবল যে রোমাঞ্চকর নিষিদ্ধ বিপ্লবী বই-এর পাঠ তাই নয়। কিশোরের জীবন-নদী দিয়ে জীবনতরী এগিয়ে চলে। আহা সেকালটি ছিল সোনার কাল। স্বপ্নের কাল। বরিশালের বিশাল কীর্তনখোলায় কত বড় বড় জাহাজ : নাগা, গারো, ফ্লোরিকান, অস্ট্রিচ। ঢাকা-বরিশাল, বরিশাল-খুলনা যাতায়াত করে R.S.N.I.G.N. কোম্পানির স্টিমার : মেইল এ্যান্ড এক্সপ্রেস। স্টিমার নয়, যথার্থই জাহাজ। প্রত্যেকটির দুই পাশে তাদের কী বিরাটাকার চাকা। সেই চাকার পেডালের টানে থর থর করে জাহাজ চলে নদীর বুকে বিরাট আকারের ঢেউ তুলে। সে ঢেউএর আঘাতে ইলিশধরার ডিঙিগুলো উথালপাথাল হাবুডুবু খায়। সেই জাহাজে চড়ে কিশোর আসে অজানা এক শহরে। নাম তার ঢাকা। ...

এ কাহিনী এই কিশোরের যৌবন পেরিয়ে প্রবীণ বয়সেও কলমের কালিতে অবর্ণনীয়।

১৯৪১, '৪২, '৪৩, '৪৪, '৪৫ এর কথা। ২০০০ সাল থেকে ৬০ বছর আগের কথা। গরিবের বাচ্চা হলে কি হবে। বিড়ালের জান বটে। তাই মরেও মরে না। মরল না ৭৫ বছরে এসেও। ঠ্যাং ভাঙলো, তবু মরলো না তো। মরলে পরে এই বাংলাদেশের কিছু আসত যেত না। যা যেত এবং যার যেত সে এই 'বিড়াল' তপস্বীর। সে না পেত এ কালের নাজমার দেখা। না পেত নাজমার অনিরুদ্ধ আহ্বানে হাজির হয়েছে যে দীপবাহকেরা : তাদের সাক্ষাৎ।

আহা! যদি ফিরে যাওয়া যেত সেই জীবনে : জীবনের এই অভিজ্ঞতা এবং ভালোবাসা নিয়ে, তা হলে আবার সে ভর্তি হত বরিশালের সেই জেলা স্কুলে : ক্লাস নাইনে, আবার পরীক্ষা দিত ম্যাট্রিকে : শশধর স্যারকে পেয়ে অঙ্কে ভীত কিশোর সলজ্জভাবে প্রশ্ন করত : স্যার একেবারেই পাস করবো না? স্যার মিষ্টি হেসে পিঠে হাত বুলিয়ে বলতেন : তোর খাতা একবার দেখে দিয়েছি। ৪৯ কি ৫০ তুই পেয়ে যাবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতেই সে খুশি। একেবারে ফেল তো নয়।

আসলে এ এক অদ্ভুত ছেলে। জীবনে এ্যাম্বিশন কাকে বলে তা সে জানল না। সেকালের বরিশাল : নজরুল নাকি বলেছিলেন : বাঙলার ভেনিস। ঘাটে ভেড়া জাহাজ। ছবির মতো সুন্দর টিকেটঘর। দক্ষিণে সাগরদাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে দুই পাশে ঝাউ আর দেবদারুর মাথায় পাতার বহর নিয়ে, সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাসের ঢেউএ আন্দোলিত পাতার শা শা শব্দ তুলে।

না, ফিরে যাওয়া যায় না। কিন্তু তাকানো তো যায়। আর তাকালেই সে দেখতে পায়, অতিক্রান্ত পথের এপাশ ওপাশ থেকে কতো পত্রপুষ্প সে তুলে তুলে তার জীবনের কাঁধের থলেকে ভর্তি করেছে। এর যা কিছু মূল্য সে কেবল তার নিজের কাছে। তাতেই সে সার্থকবোধ করে। এবং সেই সার্থকতার পরিশেষের চিহ্ন আজকে এই মুহূর্তে এই কাহিনী বলতে পারার সৌভাগ্য। এতে কোনো অহংকার নেই, সঙ্কোচ ব্যতীত। কোনো দম্ভ কিংবা আত্মম্ভরিতা নয়।

আদৌ আমি মুখ খুলতে চাইনি। যদি নাজমা এসে ডাক দিয়ে না বলত : স্যার আপনি কিছু বলুন।

: আমি কী বলব?

: আপনার জীবনের কথা বলুন। আপনার অনুভূতির কথা।

সেই হুকুমেই বলার এই ব্যর্থ চেষ্টা। নাজমার হুকুমকে অমান্য করার শক্তি আমার নেই। তেমন করলে আমার জীবনের অপদার্থতা এবং অসার্থকতার আর শেষ থাকবে না।...

তবু এই এখন, পেছনের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছি। স্মৃতির পটে ছবির টুকরা এই ভেসে ওঠে তো, এই ডুবে যায়।

কিন্তু পাকা ডুবুরী বলব প্রীতিভাজন অধ্যাপক মনসুর মুসাকে, তার সহকর্মী এবং আমার স্নেহভাজন শিশির ভট্টাচার্য্যকে, আমার বন্ধু অধ্যাপক আবদুল হাইকে। তারা নাজমার দোহাই দিয়ে আমাকে তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে ডেকে এনেছেন। আমার যথার্থই শূন্য কুম্ভ বাজিয়ে তার ভেতর থেকে শব্দ আহরণ করেছেন : শব্দগ্রাহক যন্ত্রে আমার অর্ধোচ্চারিত শব্দকে ধারণ করেছেন, আবার সেই শব্দ বাজিয়ে আমার সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন। তারা যথার্থই আমাকে আমার চেয়ে অধিক জানেন। তাদের দেওয়া পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যেন নিজেকে আবার একটু একটু করে চিনতে পারছি। এবং এজন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা রোধ করছি। নিভন্ত দীপের সলতে যেন একটু জ্বলে উঠছে। সাথীরা বলছেন : এটুকুই যথেষ্ট। তোমার দীপ থেকে আমাদের হাতের শিখাকে জ্বালিয়ে নিতে দাও।

আহা, এমন মিনতির কি কোনো কিছুর সাথে তুলনা হয়! দীপ বলে : একটু ত্বরা করো। না হলে যে নিভে যাবে। তেমন হলে তো আমার সব জীবনটাই ব্যর্থ বলে বোধ হবে। নিঃশেষিতপ্রায় তেলটুকুতে সলতে যদি জ্বলে আরো একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্ত, তবে তা থেকে জ্বালিয়ে নাও তোমাদের জীবনের আলো এবং সেই আলোর নিশান হাতে এগিয়ে যাও জীবনের পথে, সমুখের পানে : নতুন মনুষ্যসমাজ তৈরির নূতনতর স্বপ্ন নিয়ে। মা ভৈ! চরৈবেতি। এগিয়ে চলো।

নাজমা, তোমার কাছে আমার আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ : নিভে যাবার মুহূর্তটিতে তোমার দেওয়া স্বপ্নের সার্থকতার এই বোধের জন্য ...

* * *

২. মানুষের জন্ম কবে?

আমি বলি, মানুষের মৃত্যুদিন হচ্ছে তার সত্যিকার জন্মদিন। একটু উলটাপালটা কথা বলে মনে হতে পারে। শেখ মুজিবের জন্ম হচ্ছে শেখ মুজিবের মৃত্যুর দিনে। মৃত্যুর দিনে। মৃত্যুর পর কোনো ব্যক্তির পুরো পোর্ট্রেটটা আমার সামনে আসে। যেভাবেই মরুক না কেন একজন ব্যক্তি, অসুখেবিসুখে কিংবা কোনো আন্দোলনে বা কোনো যুদ্ধে। মরার পর জন্ম থেকে শুরু হওয়া সার্কিটটা তখন কমপ্লিট হয়। কাজেই আমরা যে জন্মদিবস পালন করি কেউ পঞ্চাশে, কেউ চল্লিশে বা ষাটে—এটা খুব একটা যথার্থ নয়। তখনো পর্যন্ত পুরো পোর্ট্রেটটা আমার সামনে নেই।

আমার সার্কিটও কমপ্লিট হয়নি এখনো, তবে এখন এই পঁচাত্তর বছর বয়সে আমি পেছন দিকে একবার তাকাতে পারি। লুক ব্যাক। স্মৃতি আমার বেশ ভালোই আছে যদিও ঘটনাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার মনে নেই।

বর্তমান বাংলাদেশে জিজ্ঞাসু যে প্রজন্ম তাকে আমি কী দিতে পারি? আমি বড় পণ্ডিত নই, বড় প্রফেসরও নই, বড় গবেষক নই। তাঁরা বড় বড় সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন জীবনে গতি, জীবনের পরিবর্তন, পরিবর্তনের ধারা, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে। এসব আমি তেমন কিছুই জানি না। এমন আমি, কী দিতে পারি আমার পরবর্তী প্রজন্মকে? আমি দিতে পারি আমার জীবনটাকে। শিশুকাল থেকে যেসব অসাধারণ মানুষ আমি দেখেছি তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি নতুন প্রজন্মকে।

৩. শৈশব ও স্কুলজীবন

আমার জন্ম ১৯২৫ সালে বরিশালের আঁটিপাড়া গ্রামে। ভাইবোনদের মধ্যে আমি চতুর্থ। কৃষক পরিবারের ছেলে আমি। আমাদের পরিবারকে মধ্যবিত্ত পরিবার বলা চলে না। নিম্ন-মধ্যবিত্ত বললে ঠিক হয়। বছরের খোরাক হয় কিংবা কিছু কম পড়ে। বাজারে গিয়ে তরিতরকারি বিক্রি করেছি ছোটবেলায়। বাবা কৃষিকাজ করতেন। মনে আছে বাবা বলছেন, 'তুই লাঙলটা ধর বা মইয়ে একটু ওঠ, আমি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।' আমি যে কৃষিকাজ তেমনভাবে করেছি তা বলবো না। কিন্তু কৃষিকাজে বাবাকে সাহায্য করেছি। বাবা আমাকে সঙ্গী হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিলেন। মেঝ ভাইকে তিনি সঙ্গে পাননি। মেঝ ভাই একটু আউট অব লাইন হয়ে যান স্কুল জীবন থেকেই। কিন্তু আমি ছিলাম অনুগত সঙ্গী, বড় ভাইয়ের যেমন, তেমনি বাবার। খুব বাধ্য ছেলে ছিলাম আমি। ছোটবেলায় খুব নামাজ পড়তাম, আজান দিতাম।*

মা প্রতিদিন রান্নার বরাদ্দ চাল থেকে এক মুঠো চাল একটা ভাণ্ডে উঠিয়ে রাখতেন। এ চালটা থেকে ফকির-মিসকিনদের দান করা হত। দানের জন্যে এই এক মুঠি চাল উঠিয়ে রাখা আমাদের দেশের অনেক পুরোনো রীতি। আমার মা-বাবা নিরক্ষর এবং একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন। তাঁদের মতো লোকের কথা ছিল না আমাকে স্কুলে পাঠানোর। কিন্তু তারা আমাকে স্কুলে পাঠিয়েছেন। সেজন্য আমি এই মাটির মানুষগুলোর কাছে ঋণী এবং এই দেশের মাটির প্রতি আমার মনের মধ্যে একটা ভক্তি জেগে আছে।

আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এলাকারই লোক ছিলেন। তখন আজকালকার মতো এক জায়গার শিক্ষক অন্য জায়গায় ট্রান্সফার হওয়ার ব্যাপারটা ছিল না। শিক্ষকেরা একদিকে যেমন স্কুলে শিক্ষাদান করতেন, তেমনি তারা মাঠে কৃষিকাজেও নিযুক্ত থাকতেন। একটা কথা মনে পড়ে যে শিক্ষকেরা খুব যত্ন করে পড়াতেন আমাদের। পাঠশালায় একজন শিক্ষকের কথা বিস্মৃত হতে পারি না কিছুতেই। তাঁর নাম লেহাজ উদ্দিন আহমেদ। তিনি একজন পঙ্গু মানুষ। তিনি আমাদের দূর-সম্পর্কে আত্মীয়ও ছিলেন। আমার মামা। অনেক দূর থেকে এসে পড়াতেন তিনি আমাদের। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি কলম দিয়ে এই মামা হাতে ধরে আমাদের বর্ণমালা লিখতে শেখাতেন তালপাতায়। কাঠকয়লা গুঁড়ো করে পানিতে মিশিয়ে তৈরি হত কালি। সেই কালিতে কঞ্চির কলম ডুবিয়ে সিদ্ধ করা তালপাতার উপর বড় বড় করে অ, আ, ই ইত্যাদি অক্ষর লিখে দিতেন আর আমাদের সেই সব অক্ষরের উপর লিখে লিখে হাত মকশো করতে হত। এই ছিল তখনকার দিনে লিখতে শেখার সিস্টেম। এখন আর এসব পাওয়া যাবে না।

লেহাজ মামার স্মৃতিটা মনের মধ্যে গেঁথে আছে এই জন্যে যে একজন সাধারণ মানুষ সৎভাবে বাঁচার জন্যে কীভাবে সংগ্রামী হয় অর্থাৎ সৎভাবে জীবনযাপন করা যে একটা সংগ্রাম—এটা আমি শিখি লেহাজ মামাকে দেখে। তাঁকে দেখে আমি প্রথম অনুপ্রাণিত হই। বড় ভাই পরে চাকরিবাকরি পেয়ে এই মামাকে খুব সাহায্য করেছেন।

---

* **টীকা :** আলোচনার এই অংশটির বর্তমান রূপে উপস্থানার প্রধান কৃতিত্ব ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মনসুর মুসা এবং তাঁর সহযোগী শিক্ষক শিশির ভট্টাচার্য্যের। তাঁরা দুজনে আমার অনীহা ও অক্ষমতার মোকাবেলায় একটি শব্দগ্রাহক যন্ত্রে বেশ কয়েকদিন যাবৎ আমার মুখের এলোমেলো, গুরুচণ্ডালী কথাকে একটি গ্রাহ্য কথা ভদ্ররূপ দেবার চেষ্টা করেন। এমন কাজের যেমন অবর্ণনীয় পরিশ্রম, তেমনি এর নানা সীমাবদ্ধতা। কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতার কাছে নতিস্বীকার করা ছাড়া আমার উপায় থাকেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আটিপাড়া গ্রামে একটা 'বোর্ড স্কুল' ছিল। সেই স্কুলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে থাকব হয়তো। যখন আমি পড়তে শিখলাম তখন সবাইকে বই পড়ে শুনাতাম। মনে পড়ে, মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' পড়ে শুনিয়েছি বাড়ির লোকদের। শুনে বাড়ির লোকজন বেশ প্রশংসা করত।

১৯২৯ সালে বড় ভাই বা আমার মিয়া ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ পড়তে আসেন ঢাকায়। বাবা মা তাঁর নাম রেখেছিলেন মউজে আলী। ওটা তিনি বোধহয় পরে একটু সংস্কার করে নিজের নাম রেখেছিলেন মঞ্জে আলী। তিনি বরিশাল বি এম কলেজের ছাত্র ছিলেন। বড় ভাই ধার্মিক ছিলেন, দাড়ি রাখতেন। কিন্তু তাঁর ব্যবহার এত ভালো ছিল, এত সামাজিক ছিলেন তিনি যে হিন্দু সমাজের লোকজনও খুব ভালোবাসত তাঁকে, বিশেষত বরিশালের দত্তপরিবার, অশ্বিনী কুমার দত্তের পরিবার তাঁকে খুবই স্নেহ করত। মুসলমানরা তখন চাকরিতে অগ্রাধিকার পেত। সুতরাং বড় ভাই এম.এ প্রথম পর্ব শেষ করেই সাবরেজিস্ট্রারের চাকরি নিলেন। এম.এ'র পড়াটা তিনি কমপ্লিট করেননি। বড় ভাই অনেক সামাজিক কাজ করতেন। যেখানেই যেতেন স্কুল, মসজিদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতেন। খুব জনপ্রিয় ও সৎলোক ছিলেন তিনি।

বড় ভাই বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং পেয়েছেন যেমন, নাজিরপুর, রহমতপুর, নলছিটি। নিজের সংসার তৈরি করার আগে তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর কর্মস্থলে গিয়েছেন। এসব জায়গায় যাওয়ার অনেক স্মৃতি রয়েছে আমার। আমি তখন এত ছোট যে হেঁটে সব জায়গায় যাওয়ার শক্তি আমার ছিল না। তিনি আমাকে কোনো কর্মচারীর কাঁধে তুলে দিয়েছেন আমাকে, হয়তোবা তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। সেসব জায়গায় ভালো নদী ছিল তখন। বড় বড় জাহাজ চলত সেসব নদীতে। নিজের গ্রামের সঙ্গে আমি সম্পর্কহীন নই। গ্রামের সাথে সম্পর্ক ছিল আমার। কিন্তু দূরত্ব সৃষ্টি হয় ১৯৩৪/৩৫ সালে যখন বড় ভাই চাকরি পেলেন। চাকরি পেয়ে তিনি এলেন নাজিরপুরে*। সাথে করে তিনি আমাকেও নিয়ে এলেন। উনি আমাকে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন অবশ্য আমার কান্নাকাটিতেই। মা বাবা অন্যরা খুব একটা রাজি ছিল না আমাকে আসতে দিতে।

এর কিছুদিন পর বড় ভাই গলাচিপায় পোস্টিং পেলেন। সেখানে গলাচিপা স্কুলে আমি সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করি। স্কুলটা বড় ভাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরে স্কুলটাকে তিনি উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত করেন। গলাচিপা থেকে বড় ভাই ট্রান্সফার হন ভোলা মহকুমার দক্ষিণে বোরহানউদ্দিনে। এ সময়ে তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বরিশালে। বরিশাল এ কে স্কুলে আমার বড় ভগ্নিপতি* শিক্ষকতা করতেন। তিনি আমাকে নিজের স্কুলে না নিয়ে ভর্তি করতে চাইলেন

---

* ওফাজ উদ্দীন আহমদ

* মঞ্জে আলী সরদার (১৯১০-১৯৯১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরিশাল জেলা স্কুলে। বরিশালে অনেকগুলো স্কুল ছিল তখন। আমি জেলা স্কুলে ভর্তি-পরীক্ষা দিলাম। প্রশংসাই পেলাম পরীক্ষায়। হেডমাস্টার সাহেব* বললেন: 'না, ইংরেজি বাক্য তো শুদ্ধ করতে লিখতে পারে।' আমি ভাইদের মধ্যে লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম। ব্রিলিয়ান্ট বলা চলে না আমাকে, মোটামুটি ভালো।

বরিশাল জেলা স্কুলে আমি ভর্তি হলাম ক্লাস নাইনে। এখানে আমি বন্ধু হিসেবে পেলাম মোজাম্মেল হককে। পরবর্তীকালে কায়রোতে পাকিস্তান এয়ার লাইন্সের বিমান দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। অনেকে মারা গিয়েছিল এই দুর্ঘটনায়, মোনায়েম খানের ছেলেও নিহতদের মধ্যে ছিল। এই মোজাম্মেল হকই আমাকে 'পলিটিক্যাল' বা রাজনীতি-সচেতন করেছে। মোজাম্মেল ছিল বরিশালের রিভলিউশনারি সোসালিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া বা আর এস পি আই এর সদস্য। বরিশালের রাজনৈতিক জীবন বেশ সমৃদ্ধ ছিল। সেখানে নলিনী দাশের মতো বড় বড় নেতারা ছিলেন। নলিনী দাশ আন্দামান সেলুলার জেলে রাজবন্দী ছিলেন। আমাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। আমাদের বাড়িতেও গেছেন তিনি। এই নলিনী দাশকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় গ্রামের লোকজন জবাই করতে চেয়েছিল। তিনি গ্রামের লোকজনকে বললেন, 'আমাকে জবাই করে তোমাদের কী লাভ? এর চেয়ে আমাকে বরং পুলিশে দিয়ে দাও। তোমরা পুরস্কার পাবে।' গ্রামের লোক ভাবল, 'সত্যি কথাই তো! জবাই করার চাইতে পুলিশে দিয়ে দেওয়া যাক'। এভাবে তাঁর জীবন রক্ষা পায়।

R.S.P.I. নানা ইস্তেহার বের করত। মোজাম্মেল একদিন আমাকে একটি বই দিয়ে বলল, 'এই বইটি তুমি নেবে। এটি এক রাতের মধ্যে পড়ে শেষ করতে হবে। কেউ যেন না দেখে।' সাধারণত বইয়ের নাম উপরে লেখা থাকে। এই বইটি'র উপরে নামের জায়গাটুকু কাটা ছিল। বইটি হচ্ছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবী। সাংঘাতিক বই। কবিগুরু নাকি বলেছিলেন, 'এটা কি একটা উপন্যাস হলো?' শরৎচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন, 'যা হয়েছে তাতো হয়েছে।' কিছু দিন আগে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বাংলাদেশে এসে বলেছিলেন, 'আমি রাজনীতিতে এসেছি পথের দাবী পড়ে।' পথের দাবী পড়ে রাজনীতিতে আমার হাতেখড়ি হয়। যারা পলিটিক্যাল লোক তাদের এখনো বইটি ভালো লাগার কথা। পথের দাবীর যে নায়িকা, ভারতী তার নাম, সে হচ্ছে বরিশালের ভারতী। শরৎ বাবুর রেঙ্গুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল। পথের দাবীর নায়িকা ভারতীকে তিনি রেঙ্গুন নিয়ে গেছেন। সেখানে হাবাগোবা একটি বাঙালি কেরানি ছেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়। রেঙ্গুনে একটি বিপ্লবী সংগঠন আছে। সংগঠনটি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে। আরেকটি চরিত্র আছে সব্যসাচী। সে দুই হাতে পিস্তল ছুঁড়তে পারে। পুলিশ তাকে ধরার জন্যে খুঁজছে। কিন্তু পাচ্ছে না। এক

* সিরাজ উদ্দিন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন পুলিশ খবর পেল যে আজ সব্যসাচী জাহাজে আসবে। পুলিশ ঘিরে ফেলল জাহাজ ঘাট। এমন এক জনকে পাওয়া গেল যার পকেট আছে গাঁজার কলকে। পুলিশ তখন তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি গাঁজা খাও?' সব্যসাচী উত্তর দেয়, 'না আমি খাই না, তবে কলকেটা সাথে রাখি, যদি কেউ খায়!' সংলাপগুলো খুব চমৎকার। এই পথের দাবী পড়ে আমার রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়।

বরিশাল জেলা স্কুল থেকে আমি ১৯৪০ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করি। জেলাভিত্তিক স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। ম্যাট্রিকে পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি উচ্চতর ক্লাসের বন্ধুদের বইটই পড়তাম। আমি ঐ সময়েই সিভিকস ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে এই ১৯৪০ সালেই লাহোর প্রস্তাব পাস হয়। অবশ্য লাহোর প্রস্তাব পাস হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিরাট কোনো আলোড়ন উঠেছিল এমন নয়।

বরিশালে হিন্দু ছাত্ররাই ছিল বেশি সক্রিয়। তারাই মেধাবী। মাঝে মাঝে যে ধর্মঘট হয় তাতে হিন্দু ছাত্ররাই যোগ দেয়, পুলিশের অত্যাচার তাদের উপরই বেশি হয়। মুসলমান ছাত্ররা খুব একটা সক্রিয় ছিল না। তার মধ্যে মোজাম্মের হক ছিল ব্যতিক্রম। আমি আর এসপি'র সদস্য ছিলাম না। তবে আমি মোজাম্মেলের বন্ধু ছিলাম।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর বড় ভাই আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কলকাতায়ও অবশ্য আমি পড়তে যেতে পারতাম। সে সময় অনেক জাহাজ ছিল যেগুলো বরিশাল থেকে কলকাতায় যাতায়াত করত। দুটি ভালো সার্ভিস ছিল জাহাজের। ঐসব জাহাজের দুই-একটি এখনো আছে : অস্ট্রিচ, লেপচা। অনেক জাহাজের নাম মুখস্থ আছে আমার : ফ্লোরিকান, নাগা, গারো ইত্যাদি। এসব জাহাজের দুই পাশে দুটি প্যাডেলের মতো ছিল। মাঝখানে বড় একটা মেশিনঘর। এক পাশে কয়লা রাখা থাকত। ফায়ারম্যান কয়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত মেশিনে। জাহাজের এই ফায়ারম্যান নিয়ে আমি একটি গল্প লিখেছিলাম। 'ফায়ারম্যান' গল্পটি কলকাতার 'মোহাম্মদী'তে ছাপা হয়েছিল।

৪. ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ

ঢাকায় এসে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হলাম আই এতে। তখন ভর্তির ব্যাপারে কোনো কড়াকড়ি ছিল না। থাকলেও আমি তো ছাত্র মোটামুটি ভালো ছিলাম। সুতরাং ভর্তি হতে বেগ পেতে হতো না। মেডিকেল কলেজের মূল বিল্ডিং যেটি এখন, সেটি তখন দোতলা ছিল। তখন এটি ছিল এ্যাডমিনিসট্রেটিভ বিল্ডিং। পরে এটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়। কার্জন হলও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ ছিল। কার্জন হলের বিপরীত দিকের বিল্ডিংটি ছিল তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়ে এটি তৈরি হয়। সেখানে শুধু আই এ, আই এস সি এবং আই কম পড়ানো হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় তখন তিনটি মাত্র কলেজ ছিল : জগন্নাথ কলেজ, গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট কলেজ আর সলিমুল্লাহ কলেজ। জগন্নাথ কলেজ হিন্দু ছেলেদের সংখ্যা ছিল বেশি। ভালো ফল তারাই করত। যেটা এখন ফজলুল হক হল, সেটা ছিল ইন্টারমিডিয়েট কলেজের হোস্টেল। আমি এখানে থাকতাম। এর একদিকে হিন্দু ছেলেরা থাকত, অন্যদিকে মুসলিম ছেলেরা। কখনো মারামারি হয়নি তাদের মধ্যে। দায়িত্বে নিয়োজিত সুপারিন্টেডেন্ট শিক্ষক দুজনেই খুব ভালো ছিলেন।

ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন আমার পেছনে একটি গ্রুপ দাঁড়িয়ে যায়। যাকে বলা যায় 'জাতীয়তাবাদী' অর্থাৎ নন-মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের সাথে আমাদের কোনো প্রকার হৃদ্যতা ছিল না। এ সময়ে আমি পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' উপন্যাসটি পড়ি এক রাতে। এরও একটা অবদান আছে আমার চরিত্র গঠনে। এ সময়ে মোজাম্মেল হকের সাথে আমার যোগাযোগ কমে যায়। সে থাকে বরিশালে, আমি ঢাকায়। তবে তাদের সংগঠন ঢাকায়ও ছিল। মোজাম্মেল ঢাকায় এলে আমার সাথে দেখা করত।

আমি কোনো ছাত্র আন্দোলন করিনি, তথাপি আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম এর সাথে। কমিউনিস্টরা চেষ্টা করত মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে ঢোকার। ঢাকায় আসার পরপরই ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট যে গ্রুপটা, তারা আমাকে পিক আপ করল। আমি একা নই, সৈয়দ নুরুদ্দীন, সানাউল হক এরাও ছিলেন আমার সঙ্গে। ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে আরো ছিলেন নাজমুল করিমের ছোটভাই লুৎফুল করিম, মো. আবুল কাসেম। যিনি ভূগোল আর ইংরেজি উভয় বিষয়ে এম.এ। এখন তেজগাঁ কলেজের অধ্যাপক। এবং হিসামুদ্দিন—তিনি অবশ্য একটু সিনিয়র আমাদের চেয়ে। সম্প্রতি প্রয়াত।

ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় আমি যতটা না কমিউনিস্ট, তার চেয়ে বেশি জাতীয়তাবাদী ছিলাম। আমি আর আমার গ্রুপের বন্ধুরা মিলে তখন হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছি। আমি হলে কিংবা হোস্টেলে গিয়ে নিজে ব্যক্তিগত লাইব্রেরি দাঁড় করিয়েছি। আমি ভেবেছি আমার বন্ধুরা কেমন করে তাদের অবসর সময় কাটাবে। তারা এসে আমার ঘর থেকে নিজেরা বই নিয়ে গেছে। নাম লিখে রেখে গেছে—'আমি বই নিলাম'। আবার সে বই ফেরত দিয়ে গেছে পড়া হয়ে গেলে। সারা রাত জেগে আমরা তখন পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' পড়েছি বা পড়েছি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'।

উভয় বাংলার সব কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে ছিল। কিন্তু ঢাকা শহরের কলেজগুলো ছিল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এন্ড এন্টারমিডিয়েট এ্যাডুকেশনের আন্ডারে। ঢাকা বোর্ড ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিডার অর্থাৎ এখান থেকে ছাত্ররা বের হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। ঢাকা বোর্ডে ইন্টারমিডিয়েটে আমি দ্বিতীয় হয়েছিলাম। কোনো মুসলমান ছাত্র এ রকম রেজাল্ট করেনি এর আগে। সাধারণত জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররাই তখন প্রথম দ্বিতীয় স্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকার করত। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের এসব স্থানে দেখা যেত না। মুসলমান ছাত্রদের তো নয়ই। আমি অবশ্য প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়ার জন্যে লেখাপড়া করতাম না কখনো। ভালো ছাত্রদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। আমার সম্পর্ক ছিল ব্যাকবেঞ্চারদের সাথে। পেছন থেকে এসে তারা আমাকে টেনে নিয়ে যেত তাদের কাছে। বলত, 'তোর জায়গা তো এখানে না। এখানে বসবে সৈয়দ আলী আশরাফ (সৈয়দ আলী আহসানের ভাই)। ওরা তো গুড বয়। তুই তো গুড বয় না। তুই ব্যাড বয়। তুই আমাদের সাথে থাকবি। আর আমাদের পড়াবি তুই'। ক্লাসের এ মাথা থেকে এ মাথা সবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। আমি কোনো ছুটিতে আমার নিজের বাড়িতে যেতাম না। বন্ধুদের বাড়িতে যেতাম। নাসিরুদ্দীনের সাথে চলে যেতাম তার বাবার কাছে চাঁদপুরে। তিনি তখন ওখানকার এস ডি ও। নাসিরুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন আর রশিদুদ্দীন এরা তিন ভাই ছিল। রশিদুদ্দীন এখন ঢাকার একজন বড় সার্জন। জহুরা মার্কেটে বসেন। তাদের ছোট বোন ফরিদা বানু বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। কিংবা যেতাম নূরুল ইসলাম চৌধুরীর বাড়ি রাজশাহীতে। বাড়ির ওপর কোনো টান ছিল না আমার। বাড়ির লোকরা অবশ্য খবর পেত যে তাদের 'করিম' খুব পরিচিত, তাকে সবাই খুব ভালবাসে।

ইন্টারমিডিয়েটে দ্বিতীয় হওয়ার পর আমার ইংরেজির অধ্যাপক আমাকে সাথে করে ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। সবাইকে বলেছিলেন, 'দেখো, একে কিন্তু আমি আবিষ্কার করেছি'। আমার এক শিক্ষক ছিলেন পি সি চক্রবর্তী। তিনি দাঙ্গায় মারা গিয়েছিলেন। তাঁকে স্মরণে পড়ে। কী সুন্দর লোক! গলাবন্ধ কোট পরতেন, ময়মনসিংহের টানা-টানা ভাষায় কথা বলতেন। আমি একদিন গিয়ে রসিকতা করে বললাম, 'স্যার আমি এত কম নম্বর পাইছি কেন? অজিত (অজিত দে, এইচ এল দের ছেলে) এত বেশি নম্বর পাইল কেন?' উনি তখন আমাকে বললেন, 'তুমি কি মুখস্থ কর?' আমি বললাম, 'না স্যার আমি মুখস্থ করতে পারি না।' উনি উত্তর দিলেন, 'মুখস্থ কর। মুখস্থ না করিলে ভালো নম্বর পাইবা না।' ভালো ভালো বই মুখস্থ করলে ঐ সব বাক্য লেখার সময় মাথায় আসে—এটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি ইন্টারমিডিয়েটে আমাদের ইতিহাস পড়াতেন। ৪২ এর দিকে দাঙ্গায় তিনি নিহত হন। দাঙ্গা মানে ছুরি মারামারি আরকি। প্রায়ই হত এ রকম ঢাকা শহরে। লোকজন দলে দলে লাঠিসোটা নিয়ে বের হয়ে দাঙ্গা শুরু করত, তা কিন্তু নয়।

৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

যুদ্ধের খবর আমরা নিয়মিতই পেতাম। তখনো রেডিও তেমনভাবে চালু হয়নি, মাত্র চালু হয়েছে। ছাত্ররা দাবি করছে হোস্টেলে একটি করে রেডিও পাবার জন্যে। পত্রিকাগুলো যেমন, আনন্দবাজার, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, এ্যাডভান্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ইত্তেহাদ বোধহয় আর একটু পরে হয়েছে) ইত্যাদি কলকাতা থেকে সকাল বেলায় রওয়ানা হত। কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত ট্রেন সার্ভিস। গোয়ালন্দ থেকে কানেকটিং স্টিমার সার্ভিস ছিল নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিকেল চারটা-পাঁচটার মধ্যে পত্রিকা নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে যেত। তারপর নারায়ণগঞ্জ থেকে আবার ট্রেনে করে ঢাকায় আসত। সুতরাং যুদ্ধের প্রায় তাজা খবরই আমরা পেতাম।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ঢাকা আন্তর্জাতিক নগরীতে পরিণত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। এই ব্যাপারটা আমার মনে করতে ভালো লাগে। ঢাকায় যখন আমি তরুণদের সঙ্গে কথা বলি তখন আমি এ সময়টার কথা বলি তাদের। বলি এ জন্যে যে, মুসলমান সমাজের মধ্যে এসব কথা বলার মধ্যে পুরোনো লোক আর নেই। হিন্দু যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই নিহত হয়েছেন বা ওপারে চলে গিয়েছেন। সেজন্যে বর্তমান প্রজন্মকে আমি এটা জানানোর চেষ্টা করি যে আমাদের একটা সুন্দর সময় ছিল। আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো মনে করে যে আমাদের সময়ে শুধু দাঙ্গাই হয়েছে। না, আমাদের সময়ে শুধু দাঙ্গাই হয়নি। দাঙ্গা অবশ্যই এখানে হয়েছে, কিন্তু এর বাইরে অন্য অনেক কিছুই করেছি আমরা।

AMARBOI.COM

ঢাকা ছিল যুদ্ধের সময়ে একটি পশ্চাৎ ঘাঁটি। এখন যেখানে ক্যান্টনমেন্ট সেখানে পুরো জায়গাটায় সৈন্যরা ছড়িয়ে ছিল। ধরা যাক, কোনো সৈন্য ফ্রন্টে গেল। সেখানে যুদ্ধে আহত হওয়ার পর এসব সৈন্যকে চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হত ঢাকায়। এখন যেটা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল তখন সে বিল্ডিংটা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সে বিল্ডিঙের পুরোটা এবং সলিমুল্লাহ হল মিলিটারিরা দখল করে নেয়। শুধু ফজলুল হক হলটা তারা দখল করেনি।

এই সব সৈন্যদের মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ক্যাডাররা ছিলেন। অনেকের নাম এখনো মনে করতে পারি। এক মিলিটারি অফিসারের নাম ছিল রাপাপোর্ট। আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। নামকরা অধ্যাপক। কিন্তু তখন যুদ্ধে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক বলে তাঁকেও যুদ্ধ করতে আসতে হয়েছে এশিয়ায়। স্প্রিঙ্গার নামে একজন যুব কমিউনিস্ট ক্যাডার ছিলেন। আরেক জন ব্রিটিশ কমিউনিস্টের নাম এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। হয়তো বা ক্লাইভ ব্র্যানসন। বার্মা ফ্রন্টে তিনি মারা গেছেন। তিনি কবি ছিলেন। তাঁর লেখা কবিতা আছে, কবিতা অনুবাদও করা হয়েছে।

সাধারণ সৈন্যরা ঢাকায় এসেই নিষিদ্ধ পল্লীর খোঁজ করত। ইসলামপুর বা আশপাশের এলাকায় মিলিটারি এ্যাডমিনিসট্রেশন 'আউট অব বাউন্ড' লেখা বোর্ড টাঙিয়ে দিত। আউট অব বাউন্ড ফর দি আর্মি। আর্মি পারসনেরা এখানে যেতে পারত না। তবুও যেত অবশ্য অনেকেই। যেত এবং ধরাও পড়ত। কিন্তু স্প্রিঙ্গার, রাপাপোর্টের মতো সৈন্যরা, মানে কমিউনিস্টরা খুঁজত, ভালো মানুষ কোথায় আছে। ভালো মানুষ পাবার একটি জায়গা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন হল বা হোস্টেল থেকে তাঁরা লোকজন খুঁজে খুঁজে বের করত। কমিউনিস্টদের একটি সিম্বল তো ছিলই : মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত। এটা একটা আন্তর্জাতিক সিম্বল ছিল তখন। এর মানে আমিও একজন। আমি 'তোমাদেরই লোক'।

এ সময়টার খুব সুন্দর সুন্দর স্মৃতি আছে আমার। ফজলুল হক হল আর ঢাকা হলের মাঝখানে যে পুকুরটা এবং তার যে বাঁধানো সিঁড়ি, ওখানে আমরা আড্ডা মারতাম সৈন্যদের সাথে। আড্ডাটা আমাদের অজান্তেই 'ইন্টারন্যাশনাল' হয়ে যেত। চীনে তখন যুদ্ধ চলছে কুওমিনটাং এর সঙ্গে কমিউনিস্টদের। চুং কিং ছিল তখন চীন সরকারের হেড কোয়ার্টার। একজন বিমান-সেনা হয়তো সকালে বিমানে করে উড়ে গিয়ে যুদ্ধ করে এসেছে চীনে। সেই সৈন্যই হয়তো বিকাল বেলা চা খেতে খেতে আমাদের সঙ্গে গল্প করছে সেই পুকুরঘাটে : 'ডু ইউ নো আই ফ্লিউ টুডে টু চুং কিং?' সে চুং কিং এয়ারপোর্টে নেমেছে, সেখানেও কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক করার চেষ্টা করেছে। মাও সে তুং বা অন্যদের নাম উচ্চারণ করেছে। ওখানকার কমিউনিস্টরা হয়তো তখন তাকে বলেছে, 'ডোন্ট টক, ডেঞ্জারাস!' এভাবেই আমাদের কিছুটা আন্তর্জাতিকীকরণ হয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধ চলছে তখন। ১৯৪২ সালের কথা। আমরা তখন ফজলুল হক হলে থাকি। ফজলুল হক হলের করিডোরের সিঁড়িঘরে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল আলোচনা হত। সানাউল হক, সৈয়দ নুরুদ্দীন এঁরা সে আলোচনায় আমার সঙ্গী ছিলেন। পক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন আলোচনা করতাম আমরা। এখন যেটা গুলিস্তান সিনেমা হল তকন সেটার নাম ছিল গুলিস্তান বিল্ডিং। এই গুলিস্তান বিল্ডিঙে ডি এন ফা বলে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। ডি এন ফার বিপরীতে একটি সিনেমা হল ছিল। হলটির নাম ছিল ব্রিটানিকা। সে যুগে ঢাকার একমাত্র ইংলিশ সিনেমা হল। সৈন্যরা আমাদের নিয়ে যেত সেই রেস্টুরেন্টে। শত শত সৈন্য নয়, কিছু কিছু আরকি! বেশি বেশি খাবারের অর্ডার দিত। অত খাবার খাওয়া যেত না। বাকি খাবার সৈন্যরা আমাদের পকেটে ঢুকিয়ে দিত। আমরা রাজি হতাম না। কিন্তু তারা বলত, 'ইউ নিড ইট, ইউ নিড ইট'।

এই সখ্য থেকে একবার একটা ঘটনা ঘটল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সামনে এখন যে ওভারব্রিজটা আছে তার পাশে জি ঘোষের লেন বলে একটা লেন আছে। সেখানে একটি বাসায় থাকত কয়েকজন কমিউনিস্ট। বাসাটির নাম দিয়েছিল তারা 'কমিউন'। কমিউন হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে সবাই এক সাথে থাকে, এক সাথে খায়। আলাদা কোনো ব্যাপার নেই। আমেরিকান সৈন্যরা এক বার দেখতে চাইল, আমরা কীভাবে পাঁচ আঙুল ব্যবহার করে খাই। সৈন্যরা বলল তারাও চামচ ব্যবহার না করে হাত দিয়ে খাবে। কমিউনে দাওয়াত করা হলো সেই সব সৈন্যদের। খাওয়া দাওয়ার আয়োজন চলছে যখন, তখন হঠাৎ কোথা থেকে মিলিটারি পুলিশ এসে ঐ সৈন্যদের ধরে নিয়ে গেল। তাদের শাস্তি কিছু একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয় হয়েছিল। মিলিটারি কর্তৃপক্ষ পছন্দ করত না সৈন্যরা সাধারণ লোকজনের সাথে, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সাথে মিশুক। তবুও সখ্যটা তো ছিলই। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে পরিচয় দেওয়া, বিদায় নেওয়া, স্যালুট দেওয়া, একে অপরকে কমরেড বলা, এসব এখন আর দেখা যায় না, কিন্তু তখন বেশি ছিল।

একবার অধ্যাপক রাপাপোর্ট এসে আমাদের বললেন, 'হোয়েয়ার ইজ ইয়োর বোস?' বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের নাম তিনি শুনেছেন। কতখানি শুনেছেন আমি জানি না। কিন্তু তিনি এসে অধ্যাপক বোসের খোঁজ করলেন এবং জানালেন যে বোসের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। আমরা তাঁকে নিয়ে গেলাম অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে। তিনি তখন বসতেন কার্জন হলের পশ্চিম সাইডের একটা ঘরে। ঘরটা এখন আছে। সত্যেন বোস একটা রোমান্টিক ক্যারেক্টার। চেহারাটাই রোমান্টিক ছিল তাঁর। দিন দুনিয়া বোঝেন না তিনি। সাম্প্রদায়িক কোনো ভাব তাঁর মনে ছিল না। মুসলমান ছেলেদের কাছে আসতে তিনি কোনো দ্বিধা করতেন না। ছেলেরা বলত, অন্য কেউ কম্যুনাল হতে পারে, সত্যেন বোস কিছুতেই কম্যুনাল হতে পারেন না। কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন, তাঁর লেখা পড়ে সত্যেন বোস সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, 'দেখো দেখো, আমার ছেলে এ রকম বাংলা লিখেছে। তোমরা কেউ কি এ রকম বাংলা লিখতে পারো?' তখন তিনি কলকাতায় খয়রা প্রফেসর।

সত্যেন বোস সব সময় কাজে ডুবে থাকতেন। কেউ গিয়ে না ডাকলে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরি থেকে বাসায় খেতে আসতেন না। খাওয়ার কথা মনেই থাকত না তাঁর। অনেক গল্প আছে তাঁর সম্পর্কে। সত্যেন বোস একবার মেয়েকে নিয়ে মুকুল সিনেমায় গেছেন ছবি দেখতে। টিকেট কিনতে গিয়ে দেখলেন যে মানিব্যাগটা তাঁর পকেটে নেই। মানিব্যাগ ফেলে গিয়েছেন তিনি বাড়িতে। তিনি মেয়েকে বললেন, 'মা তুই এখানে বোস। আমি বাড়ি থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে আসি।' এখন যেখানে খন্দকার মোকাররম হোসেন লাইব্রেরিটা, সেখানে একটা চাইনিজ প্যাটার্নের বাড়িতে তিনি থাকতেন। তখন যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছিল ঘোড়ার গাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে করে বাড়ি ফিরে এসে টেবিলের উপর থেকে নিজের মানিব্যাগটা নিতে যাবেন, এমন সময় টেবিলের উপরে পড়ে থাকা একটি আনসলভড প্রব্লেমের দিকে নজর গেল তাঁর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল সেটা সমাধান করতে। মেয়েকে যে সিনেমা হলে বসিয়ে রেখে এসেছেন তা তিনি ভুলেই গিয়েছেন। অনেকক্ষণ পর গাড়োয়ান সাহস করে বলল, 'হুজুর, আপনি যাবেন না?' আপনার মেয়েকে আপনি সিনেমা হলে বসিয়ে রেখে এসেছেন।' সিনেমা হলের কর্মচারীরা অবশ্য তাঁর মেয়েকে আগেই সিটে বসিয়ে দিয়েছিল। সত্যেন বোস যাবার পর তারা বলল, 'সিনেমা তো এখনি শেষ হয়ে যাবে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।' এ রকম মনভোলা লোক ছিলেন সত্যেন বোস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. কমিউনিস্ট পার্টির নীতি পরিবর্তন

১৯৪১ সালের আগে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ-ভারতে বেআইনি ছিল। ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আক্রান্ত হলো তখন কমিউনিস্ট পার্টি আইনসঙ্গত হলো। আগে কমিউনিস্টদের নীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। কিন্তু হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করল তখন তারা নীতি পাল্টাতে বাধ্য হলো। কমিউনিস্টরা দেখল, যুদ্ধের চরিত্র বদলে গেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিই পালটে গেছে তখন। ফ্রান্স ততদিনে দখল হয়ে গেছে। যে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড সোভিয়েত রাশিয়াকে তার জন্মকালে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে, এক সময় দখল করারও চেষ্টা করেছে, তারা এখন রাশিয়ার মিত্র শক্তি। সুতরাং আগে যেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখন সেটা হয়ে গেছে পিপলস্ ওয়ার। কমিউনিস্টরা ভাবল, পিপলের যেটা আসল দুর্গ সেই সোভিয়েত ইউনিয়নই যদি হিটলারের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে আমরাও ধ্বংস হয়ে যাব। সুতরাং তারা তখনকার মতো ব্রিটিশদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত রইল, কারণ আমেরিকান আর ব্রিটিশরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগী শক্তি বা এ্যালাইড ফোর্স। আন্তর্জাতিকভাবেই কমিউনিস্টেরা ঘোষণা করল যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা আপাতত স্থগিত থাকবে। তাদের বর্তমান রাজনীতি হবে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী। ভারতবর্ষে জেলখানাতেই কমিউনিস্টরা তাদের নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল।

এ অবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী অংশ মনে করল, কমিউনিস্টরা হচ্ছে ব্রিটিশের দালাল। তারা ভাবছে, ব্রিটিশদের এখনি তাড়াতে হবে। যারা তা করবে না তারা সবাই ব্রিটিশদের দালাল। পি সি যোশী সে সময়ের একজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা। পি সি যোশীর মতো বড় বড় কমিউনিস্ট নেতারা শুধু যে সংগ্রামের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন সে সময় তা নয়, তাঁরা মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান আন্দোলন'কে একেবারে খারিজ করে দিলেন না।

সোমেন চন্দ*

কমিউনিস্টদের সঙ্গে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড, R.S.P.I ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী দলগুলোর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। এই সংঘাতের পরিণতিতে ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ সোমেন চন্দ খুন হয়। সোমেন চন্দ একটা সম্ভাবনাময় তরুণ সাহিত্যিক। তখন তার বয়স মাত্র ২০ বছর। সে মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের ছাত্র ছিল আবার সাথে সাথে ফুলবাড়িয়া স্টেশনের ওয়ার্কশপের শ্রমিক কর্মীও ছিল। কর্মী শুধু নয়, সবার অত্যন্ত প্রিয় কর্মী ছিল সে।

* সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ভারতের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেনের স্মৃতিকথা : পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে একটি এ্যান্টিফ্যাসিস্ট কনফারেন্স হচ্ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। এই কনফারেন্সে বঙ্কিম মুখার্জী ও অন্যান্য সমস্ত নেতা কলকাতা থেকে এসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সোমেন তার সঙ্গী বন্ধুদের নিয়ে মিছিল করে যাচ্ছিল সেই কনফারেন্সের দিকে। এর আগে নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল হয়েছে ঐ কনফারেন্সের মঞ্চে; বিরুদ্ধপক্ষ মঞ্চ দখল করার চেষ্টা করে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তারা ফিরে গিয়ে সোমেনের মিছিলকে আক্রমণ করল। মিছিলের অন্য সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সোমেনকে তুলে একটা গলির ভিতর নিয়ে যায় তারা এবং সেখানে ছুরি মেরে ওর চোখ-টোখ উপড়ে ফেলে। কে সোমেনকে খুন করেছে তা জানা যায়নি। আর এস পি স্বীকার করতে চায়নি। কিন্তু অন্যেরা মানে কমিউনিস্টরা বলে, তাকে ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি এই সমস্ত অর্থাৎ কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের কর্মীরা সোমেন চন্দ্রকে খুন করেছিল। ফরোয়ার্ড ব্লক তখন কংগ্রেসের অন্তর্গত অন্য সব পার্টির মতোই ছিল।

এটা খুব সাংঘাতিক একটা ঘটনা সে সময়ের। গোপাল হালদার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এরা সবাই অর্থাৎ এমন কেউ ছিল না যে এ ঘটনায় মর্মাহত না হয়েছিল। আমার তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা চলছে। এই ঘটনাটি আমি সরাসরি দেখিনি, তবে পরে যখন শুনেছি সোমেনের এই আত্মাহুতির কথা তখন খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করেছি। পরবর্তীকালে যখন প্রগতি লেখক সঙ্ঘে যাতায়াত করেছি, যখন সোমেন চন্দ দিবস পালন করেছি, তখন এ সমস্ত কাহিনী এসেছে। প্রগতি লেখক সঙ্ঘ সোমেন চন্দের একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেছিল। অশোক মিত্র আই সি এস সোমেন চন্দের একটি গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এর মধ্যে একটি গল্পের নাম 'ইঁদুর' (mice)। এই 'ইঁদুর' গল্পে এক মধ্যবিত্ত যুবক তার পারিবারিক কাহিনী বলছে। এই কাহিনীর মধ্যেও এসে যাচ্ছে জীবনের বিভিন্ন দিক এবং দাঙ্গা। সোমেন কিংবা তার গল্পের নায়ক রাস্তা পার হতে গিয়ে দেখছে রাস্তার উপর রক্তের স্তূপ জমে আছে। কোনো নিরীহ ব্যক্তিকে কে বা কারা মেরে ফেলেছে। ছেলেটি ভাবছে, এই রক্ত কবে নিঃশেষ হবে!

৭. মুসলিম ছাত্রদের মেরুকরণ

গঙ্গাধর অধিকারী (জি অধিকারী) এ সময়ে একটি পুস্তিকা লেখেন : 'পাকিস্তান এন্ড দি কোশ্চেন অব সেল্‌ফ ডিটারমিনিশেন অব দি মাইনরিটিস'। অর্থাৎ মুসলমানেরাই একমাত্র মাইনরিটি নয়, আরো মাইনরিটি আছে ভারতে। ভারতবর্ষে একটা পাকিস্তান নয়, দশটা পাকিস্তান দরকার। পাকিস্তানপন্থীরা তখন আবুল কালাম আজাদ, হুমায়ুন কবির প্রমুখ জাতীয়তাবাদীদের গালাগালি করছে মুসলিম কমিউনিটির বিদ্রোহী হিসেবে। হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় ছিল না। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সটারনাল পরীক্ষক হিসেবে আসতেন, দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্যের বাসায় থাকতেন। সেখান থেকে তিনি পরীক্ষা নিতেন।

মুসলিম লীগের আবুল হাশেম সাহেব এসেছিলেন একটি জাতীয়তাবাদী পরিবার থেকে। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের একটা বিশেষ ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। তাঁর ব্যাখ্যাটা কিছু পরিমাণে সোসালিস্ট। সুতরাং মুসলিম লীগের মধ্যে দুটি উপবিভাগ দাঁড়িয়ে গেল। একটি দল ডানপন্থী আর একটি দল প্রগতিবাদী। মুসলিমদের মধ্যে যারা প্রগতিবাদী, কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের পক্ষ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। পার্টি থেকে সদস্যদের কাছে গোপন নির্দেশ আসত, 'অমুক প্রগতিবাদী, তুমি ওর কাছাকাছি থেকো। যদি কোনো ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে তাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসো।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কিছু যোগাযোগ হয়। হিসাম উদ্দীন আহমদ যিনি পরবর্তীকালে বগুড়া কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন, এখন তো তার আমার চেয়ে বেশি বয়স হয়ে গেছে, ওঁরও এ ধরনের স্মৃতি থাকবে। রবি গুহেরও আছে এসব স্মৃতি। রবি গুহ তাঁর লেখায় নাজমুল করিমের খুব প্রশংসা করেছেন। রবি গুহের স্বপ্রশংস সব চিঠি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এ সব সূত্র একটির সাথে অন্যটি জোড়া দিলে আপনারা একটি ডেভেলপমেন্ট পাবেন তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির। তখন আপনারা দেখবেন, মুসলিম লীগ পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র মুসলিম দল হিসেবে ডেভেলপ করেনি। আবুল হাশেমও খাঁটি মুসলিম লীগার ছিলেন না। ছাত্র ফেডারেশন ছিল কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন।

ঢাকা কলেজ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থানগত দূরত্ব বেশি ছিল না। তেমন আলাদাও ছিল না এ দুটি প্রতিষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে আমাদের পরিচয় ছিল। যাতায়াতটাও ছিল। একই রাস্তা তো। আমার বন্ধুবান্ধব, যেমন নাজমুল করিমের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। নাজমুল করিমের এক বন্ধু রবি গুহ। রবি গুহ, নাজমুল করিম আর আমি খবুই মার্কড ছিলাম। মুসলিম লীগ যখন থেকে সংগঠিত হতে শুরু করল তখন থেকেই আমরা তিনজন হয়ে দাঁড়ালাম তাদের অর্থাৎ পাকিস্তানি পক্ষের আক্রমণের লক্ষ্য। মুসলিম লীগের মধ্যে খুব গোঁড়া যাঁরা যেমন, শাহ আজিজুর রহমান কিংবা সালেক বলে একজন ছিল, 'দে মেইড আস দেয়ার টার্গেট অব এ্যাটাক।' আমাদের তারা বলত 'হকপন্থী' অর্থাৎ আমরা শেরেবাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের সমর্থক।

এ সময়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল। যে সময়ের কথা বলছি তখন ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিত হয়ে একটা সরকার গঠন করেছেন। এই সরকারের পেছনে ঢাকার নবাব বাড়ির সমর্থন ছিল। নবাব সলিমুল্লাহ এবং ডাকার সরদাররা ছিল শ্যামা-হক সরকারের সমর্থক। ফজলুল হক সাহেব একবার ঠিক করলেন যে তিনি ঢাকায় আসবেন। এটা শুনে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট হোস্টেল, ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল : ইত্যাদিতে যেসব মুসলিম লীগের ছেলেরা থাকত তারা ঠিক করল হক সাহেবকে তারা বিরূপ সংবর্ধনা দেবে। ফুলবাড়িয়া স্টেশনে ওরা ঐভাবে অরগানাইজড হলো। আর এদিকে নবাব হাবিবুল্লাহ এবং তাঁর অনুগামীরাও অর্থাৎ ঢাকা সিটির যত সরদার, যত স্থানীয় লোক ছিল সবাই একজোট হলো। আমরা যারা নিরীহ, মানে আমি সরদার ফজলুল করিম, মোহাম্মদ কাসেম যে এখন তেজগাঁও কলেজের অধ্যাপক, নাজমুল করিমের ছোটভাই লুৎফুল করিম অর্থাৎ আমরা প্রগতিবাদীরা এই দ্বিতীয় গ্রুপটির সঙ্গে থাকব বলে স্থির করলাম।

আমি আমার গ্রুপের মুখপাত্রের মতো ছিলাম, একটু লিডারগিরি করতাম। লিডারশিপ অবশ্য শুরু হয় আরো অনেক আগে থেকে। একবার আমার গ্রুপের সব ছেলে মিলে সারা রাত মুকুল সিনেমায় গিয়ে সিনেমা দেখেছি, ভালো ভালো সব সিনেমা—মুক্তি, দেশের মাটি ইত্যাদি। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট এর জন্যে আমাদের শাস্তি দিয়েছেন। ছেলেদের যখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমাদের বলেছে যে তোমাদের পারমিশন আছে সিনেমা দেখার?' ছেলেরা তখন উত্তর দিয়েছে, 'সরদার বলেছে'। আমাকেই সরদার বানিয়েছে তারা। এই সরদারিটা আমি ভালোই এনজয় করেছি। সাময়িক পত্রিকা, হাতে লেখা ম্যাগাজিন এসব বের করেছি। আমাদের গ্রুপটা ছিল জাতীয়তাবাদী এবং হকপন্থী। একবার আমাদের গ্রুপের কিছু ছেলেকে সুপারিটেনডেন্ট হল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। তখন হক সাহেবের মন্ত্রীসভা ক্ষমতায়। আমরা হক সাহেবের কাছে পিটিশান পাঠিয়ে দিলাম এই মর্মে, যে আমরা হকপন্থী বলে অর্থাৎ আমরা আপনাকে সাপোর্ট করি বলে আমাদের এমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ রকম সব ব্যাপারস্যাপার ছিল তখন।

একদিন আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট কলেজের হোস্টেলে বসে কথা বলছি তখন মুসলিম লীগের গ্রুপটা এসে আমাদের বলল, 'অমুক তারিখে আমরা ফুলবাড়িয়া স্টেশনে ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে ডেমনেস্ট্রেশন দিতে যাব। তোমরা সেদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে।' আমি আমাদের গ্রুপের মুখপাত্র হিসেবে তাদের বললাম, 'আমরা যাব কি যাব না, তার সিদ্ধান্ত আমরা নেব। তোমাদের মতামত আমরা শুনলাম, ঠিক আছে।' এটা শুনে ওরা খুব ক্ষেপে গেল আমাদের উপর।

হক সাহেব আসেননি সেবার, নবাব হাবিবুল্লাহ এসেছিলেন কলকাতা থেকে। একটা মারামারি হয়েছিল সেদিন দুই পক্ষের মধ্যে ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুমের সামনে, যেখানে এসে রেলগাড়ির কম্পার্টমেন্টগুলো দাঁড়াত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে। ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট হোস্টেলের মুসলিম লীগপন্থী ছেলেরা সবাই ফুলবাড়িয়া স্টেশনে লুকিয়ে ছিল এই ভেবে যে হক সাহেব না নবাব হাবিবুল্লা যেই ট্রেনে করে এসে প্ল্যাটফর্মে নামবে অমনি তারা তাদের উপর হামলা করবে। কিন্তু মুসলিম লীগারদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি সেদিন। নবাব বাড়ির পক্ষের লোকেরা অর্থাৎ সব সরদার আর স্থানীয় লোকেরা মিলে বেদম পিটালো মুসলিম লীগপন্থীদের। পিটুনি খেয়ে ওরা নিজ নিজ হলে ফিরে গিয়ে ওরা আবার সেখানে যাদের যাদের হকপন্থী বলে মনে করত তাদের উপর হামলা করল। নাজমুল করিমের বিছানাপত্র সব উপর থেকে নিচে ফেলে দিল, ডাইনিং হলে আমার খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিল। যদি আমি ডাইনিঙে খেতে আসি তবে আমাকে চোখা বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে মারবে টারবে বলে হুমকি দিল। আমার কলেজে যাওয়াও বোধহয় বন্ধ করে দেয় তারা। আমার তখন ফাইনাল পরীক্ষা। আমি হোস্টেল ছেড়ে আমার বড় ভাইয়ের কাছে চলে গেলাম।

আমার বড় ভাই মঞ্জে আলী তখন ঝালকাঠির কাছে নলছিটির সাবরেজিস্ট্রার। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক মনোভাবের ছিলেন। হুমায়ুন কবীরের প্রশংসা তিনি কখনো করেননি। তিনি বরং জিন্না সাহেবের প্রশংসা করতেন। তবুও বড় ভাই যখন ঢাকায় আসতেন তখন তিনি এটা দেখে মোহিত হতেন যে ছেলেপিলেরা তাঁর ভাইয়ের বেশ প্রশংসা করে। ওরা বলত, 'ও! আপনি সরদারের ভাই!' বলে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করত। এটা তাঁর খুব ভালো লাগত। কিন্তু ইতোমধ্যে ঢাকার ঘটনাটা তাঁর কানে গেছে এবং আমার সম্পর্কে তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা শুরু করেছেন। আমাকে দেখে বড় ভাই একটা এ্যগ্রেসিভ টোনে বললেন, 'তুমি দুই কলম ইংরেজি শিইখ্যা খুব মাতব্বর অইয়া গেছো, হুমায়ুন কবিরের দলে যোগ দিছো!' হুমায়ুন কবির তখন বিখ্যাত। বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন তিনি, হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছেন, শ্রমিক আন্দোলনের হুমায়ুন কবিরের বিরোধী পক্ষ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

১৯৪১-৪২ সালে মুসলিম লীগ ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে। পাকিস্তান আন্দোলন দানা বাঁধছে। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মুসলিম লীগ খুব জোরদার হয়ে গেল এমন নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. মজহারুল হক আর ফজলুর রহমান—এই দুজনে 'পাকিস্তান' নামে একটি বাংলা পত্রিকা বের করতেন এ সময়। ফজলুর রহমান সাহেবের সাথে আমি ৫৫/৫৬ সালে পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির সদস্য ছিলাম। সেটা অবশ্য আরো পরের কথা।

যেখানে কংগ্রেসের স্লোগান ছিল 'কুইট ইন্ডিয়া', সেখানে মুসলিম লীগ ধ্বনি তুলল ডিভাইড এ্যন্ড কুইট। ১৯৪২ এ কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন জঙ্গি রূপ নিল। ব্রিটিশ সরকার সবাইকে গ্রেপ্তার করে ফেলল। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইত্যাদি সব বড় বড় কংগ্রেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতাকে হায়দ্রাবাদের একটা প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখল। এদিকে বঙ্গদেশে মেদিনীপুর, তমলুক ইত্যাদি জায়গায় স্বাধীন সরকার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। জনগণ টেলিগ্রাফের খুঁটি ইত্যাদি উপড়ে ফেলছে। মহিলা নেতা মাতঙ্গিনী হাজরার কথা পাবেন আপনারা ইতিহাসে। আন্দোলন সাংঘাতিক জঙ্গি হয়ে উঠেছে। 'উত্তাল চল্লিশ' বলে একটা বইয়ে এসব আন্দোলনের কথা লেখা আছে।

৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪২ সালে ভর্তি হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, কেন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম? প্রধানত আমার মুরুব্বী ছিলেন আমার বড় ভাই। বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে মাস্টার্স পার্ট ওয়ান করেছেন। আগেই বলেছি, কৃষক পরিবারের ছেলে ছিলাম। অভিভাবকেরা ভাবলেন, কলকাতায় খরচ চালানো কঠিন হবে। বড় ভাইয়ের শিক্ষকেরা সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেমন ধরুন, এস এন রায়। বড় ভাই তাঁদের কাছে চিঠি লিখে দিতেন—'স্যার, আমি আমার ছোট ভাইকে পাঠালাম। আপনি একটু দেখবেন।' এই প্যাট্রোনাইজেশনটা তিনি নিজে এখানে যোগাড় করতে পারতেন। সুতরাং আমার ঢাকা আসাই স্থির হলো। কলকাতায় কোন রকম ইনস্টিটিউশনাল পরিচয় আমাদের ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে প্রথমে কিছুদিন ইংরেজি বিভাগে ছিলাম। বক্তৃতা শুনলাম কিছুদিন। দেখলাম, কোন টিচার কী রকম বক্তৃতা দেন। এখন যেটা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল সেখানে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস হত। সব ক্লাসের পাশ দিয়ে ঘুরতাম। করিডোর দিয়ে গেলে এপাশে-ওপাশে বিভিন্ন ক্লাস দেখতে পেতাম। দর্শনের হরিদাস ভট্টাচার্যের বক্তৃতা শুনে খুব ভালো লাগল। সাংঘাতিক বক্তৃতা। সত্য কী, মিথ্যা কী—এসব নিয়ে তিনি সেদিন আলোচনা করছিলেন। হরিদাস বাবুর কাছে গিয়ে বললাম, 'স্যার আমি দর্শনে ভর্তি হবো।' চলে এলাম দর্শনে। এতে অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কমল না, বরং বাড়ল।

কবি জসীম উদ্‌দীন সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। আমি দর্শনের বাইরে অন্য ক্লাসও করতাম। দেখতাম, জসীম উদ্‌দীন স্যারকে ছেলেরা টালাইতেছে। 'টালাইতেছে' মানে ছেলেরা তাঁকে একটু tease করছে বা তার সাথে পরিহাস করছে। জসীম উদ্‌দীন স্যার ভালো ইংরেজি বলতে পারতেন না। মাহমুদ হাসান সাহেব তখন সম্ভবত ভি সি। তিনি একদিন করিডোর দিয়ে যেতে যেতে জসীম উদ্‌দীন স্যারের বক্তৃতা শুনে থমকে দাঁড়ালেন এবং ক্লাসে ঢুকে স্যারকে বললেন, 'মি. জসীম উদ্‌দীন, ইউ বেটার নট গিভ লেকচার ইন ইংলিশ। স্পিক রাদার বেঙ্গলি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনকার কিছু ছেলে একটু ইয়ার্কিবাজ ছিল। পলিটিক্যাল সায়েন্সের এক তরুণ পাস করা শিক্ষক হয়তো ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ক্লাসে ছেলেরা সেই স্যারকে বলছে, 'স্যার আপনি বরং বাংলাতেই বলেন।' সেই স্যার যখন বাংলায় বলা শুরু করলেন তখন একটু পরে তারা আবার আব্দার করা শুরু করল, 'না স্যার ইংরেজিই ভালো।' স্যার এবার ইংরেজিতে বলতে লাগলেন। পরে এক সময় ছাত্ররা আবার বলল, 'স্যার আপনি এবার সংস্কৃতে বলুন।' কোনো কোনো স্যার সোজা মানুষ ছিলেন বলেই ছেলেরা তাঁদের এ রকম টালাইতে পারত। কথাটা বললম এ কারণে যে হরিদাস ভট্টাচার্য্য বা এস. এন. রায়ের মতো অধ্যাপকের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করা সম্ভব ছিল না। এ সব বড় বড় অধ্যাপকদের বাগ্মীতার কাছে ছেলেরা দাঁড়াতেই পারত না।

হাদী সাহেব ছিলেন দর্শনের শিক্ষক। তিনি হাউস টিউটর ছিলেন। তাঁর ইংরেজি বক্তৃতা আমি বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছি রেডিওতে পড়ার জন্যে। তিনি আমাকে তাঁর বক্তৃতার ইংরেজি কপি দিয়ে বলতেন, ফজলুল করিম, আপনি দেখেন তো কিছু করতে পারেন কিনা। স্যার আমার লেখা পড়ে খুব প্রশংসা করলেন। আমাকে বললেন : 'আপনি লিখেছেন তো ভালো। কিন্তু আমি পড়লে কেউ কি বলবে যে ওটা আমার লেখা?

শিক্ষকরা তখন ছাত্রদের খুব দেখাশোনা করতেন। তখন ছাত্র তো খুবই কম। আমাদের দর্শন বিভাগে ছাত্র ছিল পাঁচ কি ছয় জন। তখন অনার্স ছিল তিন বছরের, এম.এ এক বছরের। ১৯৪৫ এ আমি অনার্স শেষ করি। ১৯৪৫ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শেষ হলো। ঐ যে টি এইচ খান এখনো যার নাম পাওয়া যায় বিএনপির লগে সেই টি এইচ খান আমার ক্লাসফ্রেন্ড। মিসেস আখতার ইমামও আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিলেন। উনি আমার কথা খুব মনে করেন। উনি আমাকে বলেন, 'আপনি আমাকে লেখাপড়ার ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছেন।'

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই সে সময়ে, অর্থাৎ ১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দাঙ্গা হয়। সেদিনকার দাঙ্গার কারণটা ছিল এ রকম : কার্জন হলে হিন্দু ছাত্ররা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছিল। সব ছেলেমেয়েই গেছে সেখানে, হিন্দু ছাত্ররা যেমন গেছে, মুসলমান ছাত্ররাও গেছে। বোধহয় মুসলমান ছেলেদের মধ্যে কেউ ইয়ার্কি করার জন্যে কিছু ফুল বা পাতা বা এ রকমের কিছু দোতলার ব্যালকনি থেকে হিন্দু মেয়েদের গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ঐ এরিয়াটা ছিল হিন্দু ছেলেদের। পাশেই ঢাকা হল। হিন্দু ছেলেরা এতে অফেন্স নেয় এবং মুসলমান ছেলেদের মধ্যে কয়েকজনকে মারধর করে। পরদিন যখন ক্লাস শুরু হয়, তখন মুসলমান ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। সেই সময় একটা মারামারি হয়। মারামারির মধ্যে নাজির আহমদ নামে এক ছাত্র ছুরিকাহত হয়। নাজির আহমদের নামে একটি লাইব্রেরি আছে কোথাও। তখন মিডফোর্ড ছিল একমাত্র হাসপাতাল। নাজির আহমদকে মিটফোর্ডে নিয়ে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। রক্তও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাকে আর বাঁচানো যায়নি। এই ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি হয়তো আমার ভাইয়ের কাছে চলে যাই। এটা একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো হয়েছিল। সব মুসলমান ছাত্রই যে এতে অংশ নিয়েছিল তা নয় তবুও মনে পড়ে ঢাকা হলের ছেলেরা ধেয়ে আসছে আর্টস বিল্ডিঙের দিকে, আর্টস বিল্ডিঙের ছেলেরা পিছিয়ে যাচ্ছে। এ রকম ছোটখাটো দাঙ্গা বা ছুরি মারামারি প্রায়ই হত ঢাকা শহরে। তবে লোকজন যে দলে দলে লাঠিসোটা নিয়ে বের হয়ে দাঙ্গা শুরু করত তা কিন্তু নয়।

৯. '৪৩ এর মন্বন্তর

১৯৪৩ সালটি মনে রাখা দরকার। ১৯৪৩ মানেই হচ্ছে বাংলা ১৩৫০। ১৩৫০ সালে হয়েছিল সেই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ যার নাম ৪৩ এর মন্বন্তর। এই দুর্ভিক্ষটা আমাদের প্রভাবিত করে। এতে যত না কংগ্রেস কর্মী, ফরওয়ার্ড ব্লক, R.S.P.I এরা বেরিয়ে আসে, তার চেয়ে বেশি বের হয়ে আসে কমিউনিস্ট কর্মী। যেমন পি সি যোশী, একজন দক্ষ কমিউনিস্ট নেতা। তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপরে বই লিখেছিলেন 'হু লিভস্ ইফ বেঙ্গল ডাইস?'

আমি তখন সক্রেটিস, প্লেটো, হেগেল—এ সমস্ত নিয়ে পড়াশুনো করছি। একদিন আমার কমরেড এসে বলছে, তুমি কী এত লেখপাড়া করো? হেগেল তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? তোমার মা-বোনেরা যেখানে মারা যাচ্ছে সেখানে তুমি হেগেল পড়ে কী করবে? আমি নিজেও নিজেকে প্রশ্ন করেছি, এই পাঠ দিয়ে আমি কোথায় যাব? আমাকে ওরা বলছে, 'তুমি নয়া বাজারে গিয়ে লঙ্গরখানায় ডিউটি দাও। সেখানে গিয়ে দেখ তোমার মা-বোনেরা এসে হাজির হয়েছে। তাদের তুমি খাবার বিতরণ করে দাও। তুমি সেখানে থাকলে অন্যায়-অত্যাচার কম হবে। ঐ দেখ একটা মেয়েকে ধরে পিটাচ্ছে।' সুতরাং আমি আমার হেগেলের কাছে থাকতে পারলাম না। পর দিন আমাকে যেতে হলো নয়া বাজারে সিরাজদৌল্লা পার্কে। ৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময় আমি বন্ধুদের সঙ্গে গ্রামেও গিয়েছি রিলিফের কাজে।

এক ঝাণ্ডায় তিন পতাকা

কমিউনিস্টরা লঙ্গরখানা খোলে এবং আরো বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্যে। দুর্ভিক্ষে ভূমিকা রাখার কারণে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের প্রধান তিনটি পার্টির একটিতে পরিণত হয়। ১৯৪৫-৪৬ এ নৌবাহিনীর সৈন্যরা যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন তাদের জাহাজের মাস্তুলের উপর তারা তিনটি ঝাণ্ডা বা পতাকা টাঙিয়ে দেয়। একটি হচ্ছে কংগ্রেসের পতাকা, একটি মুসলিম লীগের পতাকা, একটি কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা। কলকাতা শহরে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনব্যাপী একটি ট্রাম ধর্মঘট হয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। মোহাম্মদ ইসমাইল এই ট্রামধর্মঘটের একজন নেতা। এই ধর্মঘট ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজের বিরুদ্ধে। পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর কোম্পানি। পুরো ট্রাম ব্যবস্থাকে আশি দিন পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা হয়। অবশেষে ট্রাম কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটীদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েছিল। কিছু দাবি তো অবশ্যই মেনেছিল। ট্রাম আবার চালু করার আগে দুই-তিন দিন ধরে লাইন পরিষ্কার করতে হয়েছিল; মরচে ধরে গিয়েছিল ট্রাম লাইনে। গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়েবই লিখেছেন। তারাশঙ্করও লিখেছেন এ বিষয়ে। এভাবে কমিউনিস্ট পার্টি একটা পিপলস পার্টি হিসেবে গড়ে ওঠে।

ফজলুল হক হল থেকে 'কলাপী' নামে একটি পত্রিকা বের করতাম আমরা। নূরুল ইসলাম চৌধুরী, যিনি পরে রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন এই ম্যাগাজিনের সম্পাদক। ঐ 'কলাপী'তে ১৩৫০ নামে আমার একটা লেখা আছে। লেখাটা অনেকটা মাসিক ডায়েরির মতো। ১৩৫০ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মাসে দুর্ভিক্ষের ডেভেলপমেন্টটা এতে পাওয়া যায়।

AMARBOI.COM

১০. প্রগতিবাদী মুসলিম গ্রুপ

আমাকে দেখতে হবে 'এ্যাজ এ সেপারেট এ্যান্ড আইসালেটেড এলমেন্ট ফ্রম দি মেইন মুসলিম কারেন্ট'। ৪৬ এর নির্বাচনে, এমনকি সিলেটের উপর যখন গণভোট হয় তখন মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন এরা সবাই অংশগ্রহণ করেছে। আমি বা আমার গ্রুপের কেউ কিন্তু তা করেনি। ঢাকাতে আমরা ছিলাম আবুল হাশেম সাহেবের কমিউনিস্ট গ্রুপের অনুগামী বা সমর্থক। এই আবুল হাশেম সাহেব বদরুদ্দীন উমরের বাবা। শামসুদ্দীন ছিল কমিউনিস্ট, একেবারে কমিউনিস্ট পার্টির লোক। তখন মুনীর চৌধুরীও আমাদের পাশে এসে গেছে।

মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী আলিগড়ের ছাত্র ছিলেন*, ১৯৪৬ এ ঢাকায় এসে ইংরেজি বিভাগে ঢুকলেন। তাঁর বাবাও ছিলেন ইংরেজির লোক। আলিগড় যাওয়ার কারণে একাডেমিক্যালি সে হয়তো একটু জুনিয়র হয়ে গেছে আমার তুলনায়। আমি যখন এম.এ দিচ্ছি সে হয়তো তখন অনার্স দিচ্ছে। মুনীর চৌধুরী সাহিত্যিক ছিলেন। ঢাকায় কারা কারা সাহিত্যিক তা খুঁজে বের করাই ছিল আমেরিকান সৈন্যদের একটা কাজ। মুনীরকে তারা খুব পছন্দ করত। রণেশ দাশগুপ্ত বা সত্যেন সেন কীভাবে সাহিত্যিক হয়ে উঠল তা বলা মুস্কিল। তবে তাঁরা সাহিত্যিক হয়ে গেলেন

* প্রফেসর আনিসুজ্জামান বলেছেন : মুনীর আসলে ১৯৪৩ সালেই ঢাকায় এসে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা হচ্ছে আসল কথা। মুনীর পরবর্তীকালে জেলেও গিয়েছিল। রণেশ দাশগুপ্ত তাকে 'কবর' নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সেটা অবশ্য ভাষা আন্দোলনের পরের ঘটনা।

মুনীরের একটা পরিষ্কার পোর্ট্রেট আমাদের সামনে থাকা দরকার। মুনীর ছিল একটা সাংঘাতিক হিউমারিস্ট। আমাদের সঙ্গে যেমন, তেমনি নিজের পরিবারের মধ্যেও। খুব রসিক লোক ছিল সে। আমাদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলত বাপ-মা'র সাথেও ঠিক সেভাবে মজা করে কথা বলত। মুনীর ছিল মাস্টার স্পিকার, মাস্টার ডিবেটার। ফজলুল হক, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল এবং সলিমুল্লাহ হল—এই চারটা হলের বার্ষিক অনুষ্ঠানের মুনীর জড়িত থাকত। যে কোনো সাহিত্যিক ডিবেটের মুনীর একেবারে মাস্টার। ওর একটা সাইকেল ছিল। যদি একই দিনে তিনটা হলে ডিবেট থাকত তবে একটা হলে ডিবেট উইন করে আর একটা হলে যেত। আমরা সচেতনভাবে ভালোবাসতাম তাকে। মুনীরের একটা বাক্য আছে তার আত্মজীবনীতে 'আমি যদি সরদারদের না চিনতাম তা হলে আমার জীবন কী হত আমি জানি না।'

আমি ব্যক্তিগতভাবে মুনীরের নাম দিয়েছিলাম king of words অর্থাৎ 'শব্দের রাজা'। গোঁড়া মুসলিম ছাত্ররা ওকে কমিউনিস্ট বলে মনে করত। কিন্তু মুনীর ওদের সঙ্গে খুব মজা করত। যদি কখনো কোনো জঙ্গিবাদী মুসলিম ছাত্র ওকে একটা কথা বলত, মুনীর অমনি ঠাট্টা করে তাকে উত্তর দিত, 'আপনারা যা কইছেন তার উপরে আর কথা হয়?' তখন ছেলেরা তার কথা বুঝতে না পেরে একে অপরকে জিজ্ঞেস করত, 'মুনীর কি আমাদের পক্ষে কইল, না বিপক্ষে কইল?' হি ওয়াজ সো কিউট। কাউকে সে ভয় পেত না।

মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে মোজাম্মেলের মতো ছেলেরা ব্যতিক্রম। মোজাম্মেল হক, আবদুল খালেক, নাজমুল করিম, সরদার ফজলুল করিম এর সবাই ব্যতিক্রম। আবুল হাশেম সাহেব পরবর্তীকালে এভাবে স্মৃতিচারণ করেছেন : কমরেড সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী এরা সবাই আমাদের মোগলটুলীর মুসলিম লীগ অফিসে এসে আমাকে একেবারে আক্রমণই করে বসলেন এই বলে, যে আপনাকে এই কথাটার ব্যাখ্যা দিতে হবে। আমি যখন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলাম তখন সরদার ফজলুল করিম বললেন : আপনি উপমা দিবেন না। অর্থাৎ আমি যে মেসেল দিয়ে কথা বলতাম এটা তারা পছন্দ করতেন না। আমার সামনে তারা দাঁড়াতে পারতেন না।' এসব কথা তাজউদ্দীনের ডায়েরির মধ্যেই পাওয়া যাবে।

যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি, আর্মি তখনো ছিল। আর্মিতে অনেক ভালো এলিমেন্ট ছিল। ওরা প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টদেরকে বাছাই করে ব্রিটিশ যে খারাপ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যে যুক্তিযুক্ত—এ কথা নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ডিবেট করত। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ওরা আমাদের নিয়ে যেত। ডিবেট হত সেখানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো মারামারির কোনো ব্যাপার নয়, একদল থাকত ব্রিটিশের পক্ষে, আর এক দল ইন্ডিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে। ডিবেট হত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিটন হলেও। লিটন হলে ছোট্ট একটি অডিটোরিয়াম ছিল। এসবের বেশ সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো স্মৃতি আমার আছে।

১১. প্রগতি লেখক সংঘ

ঢাকা শহরে প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। এর সাথে আমার সম্পর্ক বাড়তে থাকে। প্রগতি লেখক সংঘের একজন অরগানাইজারও ছিলাম আমি। লেখক তেমনভাবে ছিলাম না অবশ্য, কিন্তু আমি এর ভলান্টিয়ার, অনুগত ছিলাম। প্রগতি লেখক সংঘের 'ক্রান্তি' নামে একটি পত্রিকা ছিল। সোমেন চন্দের ওপর একটি সংখ্যা বের করে 'ক্রান্তি' পত্রিকা। এতে আমার একটি লেখা ছিল ১৯৪৫ এর তারিখ দেওয়া। কলকাতার 'সোমেন চন্দ রচনাসমগ্র' সঙ্কলনের সম্পাদক একটি নোট দেন আমার লেখাটির নিচে : এই লেখা থেকে প্রমাণ হয় সোমেন চন্দ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অপরিচিত ছিলেন না, বিচ্ছিন্ন ছিলেন না তাদের কাছ থেকে।

এ ছাড়া যুদ্ধের সময় সোভিয়েত সাহিত্য যা আসত তার অনুবাদ করা আমার একটা হবি হয়ে দাঁড়ায়। সুন্দর সুন্দর সব গল্প। আমি নিকোলাই তিখনভের একটি গল্প অনুবাদ করেছিলাম। গল্পটির নাম 'একটি শিশুর জন্ম'। যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে গল্প। যুদ্ধ চলছে, বোমা এসে পড়ছে। এমনি সময়ে একজন মা মারা যেতে যেতে সন্তান প্রসব করছে রাস্তায়। জীবন ও মৃত্যু যে একসঙ্গে চলে এবং সোভিয়েতরা যে জীবন দিয়ে লড়াই করছে—এটা সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় এই গল্পটিতে।

আমার পার্সোনাল দৃষ্টিটা অন্য কোনো কিছুর দ্বারা রুদ্ধ হতে পারিনি। জওহরলাল নেহেরুর 'গ্লিম্পসেস অব দি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' বইটা আমি বহুবার পড়েছি। আমি ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করি এখনো, 'আচ্ছা নেহেরু যদি প্রধানমন্ত্রী না হতেন, তা হলেও কি তার নাম থাকতো?' মুসলমান ছেলেরা তো নেহেরুকে চিনেই না। যারা চিনে তারা বলে, 'হ্যাঁ থাকতো, তার 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' ইত্যাদি বই তাঁকে একইভাবে বিখ্যাত করে রাখতো।' আমি বলি, আর একটি বই আছে নেহেরুর : 'কন্যার কাছে পিতার পত্র'। জেল থেকে কন্যা ইন্দিরাকে যেসব পত্র লিখেছেন নেহেরু সেগুলো সঙ্কলিত হয়েছে এই বইয়ে। পত্রের মাধ্যমে ইন্দিরাকে রাজনীতিবিদ করে তুলেছেন নেহেরু। বইটি যে আমি কতবার কিনেছি আর কতবার হারিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, অমৃত দত্ত, সরলানন্দ সেন (মাও সে তুঙের জীবনী-লেখক) ও অন্যান্যেরা নিয়মত একটা পাক্ষিক সভায় মিলিত হতেন ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোর্টের কাছে একটি বিল্ডিঙে। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল আবার অচ্যুত গোস্বামীর বাসাও ছিল। সেখানে আমরা মাঝে মাঝে যেতাম। আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে সৈয়দ নুরুদ্দীন, মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক, আবদুল মতিন এদের মিটিঙে নিয়ে যাওয়া। সবাই আমার খুব প্রশংসা করত এই বলে যে আমি খুব বাধ্য ইত্যাদি।

১৯৪৪-৪৫ সালে ক্রমান্বয়ে আমি প্রগতি লেখক সঙ্ঘের একজন স্বেচ্ছাসেবকে পরিণত হলাম। প্রগতি লেখক সংঘ থেকেই অজিত গুহের সাথে আমার আলাপ। ওয়ারীতে তিনি থাকতেন হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির উল্টোদিকের একটা বাড়িতে। বাড়িটার নাম ছিল টয়। নীল রঙের সিরামিক দিয়ে লেখা ছিল বাড়ির নামটা। কিছু দিন আগে ভেঙে ফেলা হয়েছে। অজিত গুহ জগন্নাথ কলেজের প্রফেসর ছিলেন। কামরুল ভাই অজিত গুহের বাড়িতে পড়ে থাকতেন। আমাদের খুব খাওয়াতেন তিনি। এই যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, আমি তো মনে করি নূরুল হুদা ইজ এ ক্রিয়েশান অব অজিত গুহ। তিনি কতখানি অজিত দার কথা স্মৃতিতে রেখেছেন জানি না। এই যে আলতাফ মাহমুদ, আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী সারা মাহমুদ বা তার শালা, ওর নামটা ভুলে গেছি—এদের সবাইকে অজিত গুহ পালন করতেন নিজের সন্তানের মতো।

১৯৪৫ সালের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি তখন ফজলুল হক হলের ছাত্র। ছাত্ররা ঠিক করল তারা নির্বাচন করবে। হলের স্টুডেন্ট ইলেকশান। প্রত্যেক হলে হয়। আমি ছিলাম একটু গুডি গুডি টাইপের। কর্মচারীদের মধ্যে আমি আর রবি গুহের খুব জনপ্রিয়তা ছিল। তাদের ছেলেমেয়েদের সন্ধ্যায় পড়াতাম আমরা। কর্মচারীরা আমাদের খুবই ভক্তি করত, সালাম দিত। শিক্ষকরা ঠাট্টা করে বলতেন, 'কর্মচারীরা দেখি আমাদের চেয়ে তোমাদেরই সালাম বেশি দেয়, কী ব্যাপার!' পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেয়ারার্স ইউনিয়ন হয়েছিল। পরবর্তী কালে শেখ মুজিবর রহমানও এর সাথে জড়িত হয়েছিলেন।

১৯৪৫ বা ৪৬ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল বের হয়েছিল বাংলায়। আগে পত্রিকাটি ছিল বাই-লিঙ্গুয়াল, আমরাই প্রথম বাংলা চালু করি। বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় আমার। প্রবন্ধটার নাম ছিল : সাহিত্যের সমস্যাটা কি? প্রবন্ধটির কথা অনেকে বলেন, বিশেষ করে মুস্তাফা নূরুল ইসলাম এই প্রবন্ধটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মুনীরও বলত। প্রবন্ধের বিষয় ছিল : সাহিত্যের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক থাকবে কি থাকবে না। সেখানে এই আইডিয়াটি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে রাজনীতি যদি মানুষের জন্যে হয়, তবে রাজনীতিকে অবশ্যই সাহিত্যের জন্যে হতে হবে। লেখাটি কলকাতায় আহসান হাবীব সাহেবের চোখে পড়ে। তিনি তখন 'সওগাত' পত্রিকায় কাজ করেন। আহসান হাবীব সাহেব তখন আমাকে চেনেনও না। তিনি সওগাতে রিপ্রিন্ট করেন লেখাটি। আমার 'নানা কথা' বইয়ে প্রবন্ধটি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে কিছু প্রগতিবাদী উপাদান দানা বেঁধে উঠছিল। পুরোপুরি তারা কমিউনিস্ট-এ কথা বলা যাবে না। তারা প্রো-কমিউনিস্ট। যেমন, এ কে এম আহসান একজন প্রো-কমিউনিস্ট। এমনকি কবীর চৌধুরীকেও পুরোপুরি কমিউনিস্ট বলা যাবে না। তিনি লিখেছেন, একবার জ্যোতি বসু এসেছেন বক্তৃতা দিতে। ইচ্ছে হচ্ছে, জ্যোতি বসুর বক্তৃতা শুনতে যেতে। কিন্তু তখন তিনি সরকারি চাকরি করেন, সম্ভবত ফুড ডিপার্টমেন্টে। সুতরাং কেমন করে যাবেন? অবশেষে মাথায় ঘোমটা দিয়ে, মানে মাথা ঢেকে বক্তৃতা শুনে এলেন।

১২. এ্যামবিশন কাকে বলে?

১৯৪৫ বা ৪৬ এ একটি অফার আসে আমার কাছে বিলাত যাবার জন্যে। একটা স্কলারশিপ ছিল 'রিজার্ভড ফর মুসলিমস'। আমাকে বলা হলো কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ এসে তুমি ইন্টারভিউতে এ্যাটেন্ড কর।

ইন্টারভিউ কার্ড নিয়ে আমি কলকাতায় যাই। কলকাতায় গিয়ে আমি রাইটার্স বিল্ডিঙে না গিয়ে প্রথমে গেলাম কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে। ৮নং ডেকার্স লেনে, এটাই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির হেড কোয়ার্টার। সেখানে মুজাফফর আহমেদ (যাকে আমরা কাকাবাবু বলতাম), নৃপেন চক্রবর্তী (যিনি পরে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, আমার খুব প্রিয় লোক আর কি!)। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আমি তো বিলেত যাচ্ছি'। আমি ফিলসফিতে এম.এ ও অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়েছি, আমি মুসলিম। স্কলারশিপটা ফিলসফির জন্যে রিজার্ভড এবং মুসলমানদের জন্যে রিজার্ভড। সুতরাং স্কলারশিপটা আমারই ছিল।

আমার আশ্চর্য লাগে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকটা আমার মধ্যে একেবারে খালি রয়ে গেছে। বিলেত যাব, পাস করে আসব—এসব নিয়ে ভাবতাম না। আমি যেই বললাম, 'আমি বিলেত যাবো', ওঁরা শুনে হাসতে হাসতে ঠাট্টার ছলে বললেন, 'আপনি বিলেত যাবেন আর আমরা এখানে বসে ভেরেণ্ডা ভাজবো?' আমি বললাম, 'আমাকে কী করতে হবে?' ওঁরা বরলেন, কাঁথা-কম্বল নিয়ে পার্টি অফিসে চলে আসেন। কী করতে হবে বুঝেন না?' তো কাঁথা-কম্বল নিয়ে পরদিন আমি পার্টি অফিসে যাইনি কিন্তু ইন্টারভিউ কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।

ইতিহাসের অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেন সাহেব (সম্ভবত তখন ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট) ছিলেন ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্যতম সদস্য। তিনি আমার অনুপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন। কলকাতা থেকে ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সরদার কেন আপনি গেলেন না? হোয়াই ডিড ইউ নট গো?' আমি বললাম, 'না স্যার আমি দেশ ছেড়ে যেতে আগ্রহী নই।' এটা একটা ঘটনা। মাহমুদ হোসেন সাহেব আশ্চর্য হয়েছিলেন। নিশ্চিত স্কলারশিপ পেয়েও বিলাত যেতে চায় না—এ কেমন ছেলে! বলে রাখা ভালো যে এই ড. মাহমুদ হোসেন ভারতের এক সময়ের রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের ছোট ভাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের কোর্স ছিল তিন বৎসরের আর এম.এ কোর্সে ছিল এক বৎসরের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু এ দুটি কোর্স দুই বৎসরের ছিল। সিলেবাস থেকে শুরু করে সব দিকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বতন্ত্র ছিল। অনেকটা প্রাচীনকালের তপোবনের আদলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে স্বর্ণযুগের কথা এখনকার শিক্ষকেরা জানেন না বা জানলেও স্মরণ করতে চান না। আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' সঙ্কলনে আপনারা সেসব গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কিছুটা আভাস পাবেন।

১৯৪৬-এ আমি এম.এ পাস করি। আমি অনার্স ও এম.এ তে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলাম। হরিদাস ভট্টাচার্য্য তখন অবসর নিয়েছেন। তারপর এস এন রায়ের ভাই বিনয় রায় বিভাগীয় প্রধান। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কাল থেকে ক্লাস নেবে।' আমি পরদিন থেকে ক্লাস নিতে শুরু করলাম দর্শন বিভাগে। প্রথম দিনের ক্লাসের কথা তেমন মনে নেই তবে তখনো আই ওয়াজ মোর এ স্টুডেন্ট দ্যান এ টিচার। ছাত্ররা সেভাবেই আমাকে গ্রহণ করেছিল।

দর্শন বিভাগের প্রথম দিকের ছাত্রদের কথা আমার মনে নেই তবে ছাত্রীদের একজনের নাম মনে আছে। তাঁর নাম ছিল উষা পৈত। পরবর্তী কালে আমাকে সংসারী করলেন আমাদের শফিকের (সাপ্তাহিক যায়যায়দিন পত্রিকার সম্পাদক শফিক রেহমান) বাবা প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান সাহেব। জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি। সাইদুর রহমান সাহেব সোজা আমাকে ইন্টারভিউতে নিয়ে গেলেন আমার ভাবী শ্বশুর পরিবারে। তিনি যখন হবু কনেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মেয়ে, একে চিন?' তখন কনে জবাব দিল, 'ইনি তো আমাদের স্যার ছিলেন।' দ্যাট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং!

১৪. মুসলিম লীগের জঙ্গি গ্রুপ

এদিকে মুসলিম লীগ ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে শাহ আজিজুর রহমান, এস এম সুলতানের নেতৃত্বে মুসলিম ডানপন্থীরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে। ছাত্রদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ডানপন্থীরা তখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে, ছাত্রদের মধ্যে বাম মনোভাবাপন্ন কারা আছে। মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, নাজমুল করিম, তার ভাই লুৎফুল করিম, আবুল কাসেম, আবদুল মতিন (যিনি পরবর্তীতে 'জেনেভায় বঙ্গবন্ধু' লিখেছেন)কে তারা প্রথমত পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করে। মুসলিম লীগের মধ্যে যারা একটু জঙ্গি মনোভাবপন্ন তারা একটা কাউন্সিল দাঁড় করিয়েছিল। এই কাউন্সিলটা পরিচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল ফ্যাসিস্ট কাউন্সিল হিসেবে। ১৯৪৫-৪৬ সালে এরা আমাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করে। তখন আমি ফজলুল হক হলে থাকি টিচার হিসেবে।

১৯৪৫-৪৬ সালে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে স্পষ্টত দুটি গ্রুপ দাঁড়িয়ে গেল। একটা গ্রুপকে কমিউনিস্ট বলা হচ্ছে। তারা কিন্তু নিজেদের বলছে, 'জাতীয়তাবাদী বা হকপন্থী। হকপন্থী হিসেবে আমি আক্রান্ত হয়েছি। আমি একাই যে আক্রান্ত হয়েছি তা নয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের বড় ছেলে সফিয়্যুল্লাহ তখন কমিউনিস্ট। শহীদুল্লাহ সাহেব একজন ডেমোক্র্যাট। পরিবারের ভিতরেও তিনি ডেমোক্র্যাট। সফিয়্যুল্লাহ তখন আন্ডার গ্রাউন্ডে কাজ করছে। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সরকার, মানে তখনকার সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ—এরা সবাই শহীদুল্লাহ সাহেবকে গিয়ে বলেছে, 'কনট্রোল ইয়োর সান'। শুনে শহীদুল্লাহ সাহেব তার স্বভাব-সুলভ নাকী সুরে উত্তর দিয়েছেন, 'অ্যা' হাউ কেন আই ডু ইট? সে এখন বড় হয়েছে, তার ডিসিশন সে নেবে।' শহীদুল্লাহ সাহেব ছেলেকে ভর্ৎসনা করেননি। যখন পুলিশ কিংবা ব্রিটিশ সরকার তাঁর ছেলেকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছে তখন তিনি এই ভাবটাই দেখিয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব থাকতেন এখনকার সাইন্স এ্যানেক্সের পাশে চাইনিজ ধরনের একটি বাড়িতে। এটা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটি হলের প্রভোস্টের কোয়ার্টার। সফিয়্যুল্লাহ কমিউনিস্ট পার্টি করত বলে মুসলিম লীগাররা শহীদুল্লাহ সাহেবের কোয়ার্টারে গিয়ে তাকেও অপমান করেছিল।

AMARBOI.COM

সেই সুন্দর মুখ : মতি

ফ্যাসিস্ট গ্রুপটা একবার জঙ্গিভাবে আক্রমণ করল মুনীরকে। তাকে তার রুম থেকে বার করে দিল। মুনীর চৌধুরীর বিছানাপত্র তারা পুড়িয়ে দিল, বইপত্র তছনছ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুনীরের এক খালাতো ভাই ছিল রফিকুর ইসলাম। তার ডাক নাম মতি। সে জগন্নাথ কলেজে বিজ্ঞান পড়ত। এখন আর নাই সে, কিছুদিন আগে সে মারা গেছে। এই রফিকুল ইসলাম আমাদের পরিচিত অর্থনীতির টিচার এম এম আকাশের বাবা। মুনীরের ঘরটায় যেদিন ভাংচুর করা হয় তার পরদিন দেখা গেল উলটা পালটা সব বিছানাপত্র আর বইয়ের স্তূপের মধ্যে বসে মতি একটা বই পড়ছে। বিরোধী পক্ষ তো ঘরটার উপর নজর রাখছিল, কারা সে ঘরে আসে তারা দেখবে। তারা যখন দেখল মুনীরের ঘর খোলা এবং মতি বইয়ের স্তূপের উপর বসে মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছে তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি করছেন এখানে?'

মতি ছেলেটা খুব হাসি খুশি আর বুদ্ধিমান ছিল। সে উত্তর দিল 'আমি একটা বই পড়ছিলাম'। 'কী বই'—প্রশ্ন করাতে মতি জানাল, 'রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভলগা থেকে গঙ্গা।' জঙ্গি গ্রুপের ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'এই বই আপনি আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েন নাই?' মতি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ আগেও পড়েছি'। 'তবে আজ আবার কি পড়ছেন?' 'আজ বর্বর যুগটা একটু ভালোভাবে পড়ে দেখছিলাম।' এত সুন্দরভাবে স্মার্টলি উত্তরটা দিল মতি।

এতে বোঝা যায়, ছাত্রদের মধ্যে ফ্যাসিস্ট গ্রুপটা বা ডানপন্থীরাই একমাত্র গ্রুপ ছিল না। এর কালচারাল রিফলেকশানটা আপনারা ঐ সময়কার বিভিন্ন ম্যাগাজিনে পাবেন। টিচারদের কাছে আমি, মুনীর এরাই ছিলাম সাংঘাতিকভাবে ফেভারিট। তখন ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন এ. জি. স্টক। আগে ছিলেন ইহুদি একজন, এ্যন্ডারসন না কি যেন নাম ছিল তাঁর। এরা সবাই পছন্দ করতেন আমাদের।

নাজমুল করিম আর রবি গুহ পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র। তারা আবদুর রাজ্জাক সাহেবকে পিক আপ করেন জ্ঞানী লোক হিসেবে। রাজ্জাক সাহেব ক্লাসের মধ্যে যা আলোচনা করেন, তার অধিক আলোচনা করেন ক্লাসের বাইরে। বাড়িতে গেলে তিনি ছাত্রদের খাওয়ান। আমাদের তিন জনেরই প্রধান আকর্ষণ ছিল ছুটির দিনে রাজ্জাক স্যারের বাসায় যাওয়া, নানান কথা বলা, নানান বই নিয়ে আলোচনা করা। সেই হিসেবে ১৯৪৪-৪৫ সালেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়।

১৫. কমিউনিস্ট পার্টি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভারতবিভাগ

কমিউনিস্ট পার্টিকে আমি একটি পরিবারের মতো দেখতাম। মেম্বাররা ছিল ভাইয়ে মতো। যেমন, রবি গুহ কিছুই আমাকে ছাড়া খেতো না; পূজার প্রসাদও আমাকে দিয়ে, তারপর খেতো। কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার কেউ হতে চাইত না। ভাবতো, আমি মেম্বার হওয়ার উপযুক্ত নই। পার্টি মেম্বার করতে চায় কিন্তু কর্মীরা মেম্বার হতে চায় না—এ রকম ছিল অবস্থা। উচ্চ ধারণা ছিল সবার কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে। সমাজ বদলাতে চাই আমরা, সে জন্য কষ্ট করতে হবে, যদি না পারি তা করতে, তবে মেম্বার হবো কী করে? আমি নিজেকে পার্টির মেম্বার হিসেবে কোনোদিন দেখিনি। আমি মেম্বারশিপ ফি দিলাম, তারা আমার কাছ থেকে ফি নিল—এটা কখনো হয়নি। আমি ছিলাম ঘরের ছেলে। আমার সম্পর্কে তেমন কোনো প্রশ্নও কখনো উঠেনি।

এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি। একবার শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে একজন কমরেডকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কারের পর কমরেডের এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করে, এখন কী করবি? বহিষ্কৃত কমরেড উত্তর দেয়, 'কি আর করবো, বাইরে থেকেই কাজ করবো।' অর্থাৎ এরা এ্যান্টি কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কিছু করার কথা চিন্তাও করতে পারত না। আদর্শ, অঙ্গীকার, স্বপ্ন এসব কিছু মিলিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনটা একটা ফ্যামিলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় ব্যাপার ছিল। কীভাবে, কোথা থেকে ফান্ড আসত তা আমরা জানতাম না। কিন্তু পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা' আমরা বিক্রি করতাম। আমি বিক্রি করেছি, মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী বিক্রি করেছেন। চার পয়সা দাম ছিল এর চার পৃষ্ঠার পত্রিকা। হিন্দু, মুসলিমসহ সবার মধ্যে একটি ইউনিট গড়ার স্বপ্ন দেখত কমিউনিস্ট পার্টি। তারা ভাবত, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ছাড়া তো আমরা কিছুই করতে পারব না। কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশী, শ্রী রাজা গোপালচারী, গান্ধীজি আর জিন্নার মধ্যে দেখা করার ব্যবস্থা করেন। এভাবে কমিউনিস্ট পার্টি পিপলস্ পার্টি হিসেবে পরিচিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি এমন একটি পার্টি যেটি জনগণের কাছাকাছি থাকে।

৪৭ সাল এগিয়ে আসছে। ৪৫-৪৬ এ ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে কথা হচ্ছে। জিন্না সাহেব আর গান্ধীজির মধ্যে টানাপড়েন চলছে। আবুল হাশেম সাহেবের গ্রুপ আর সুভাষ বোসের ভাই শরৎ বসু মিলে একটু চেষ্টাও করছে যেন ডিভিশনটা বন্ধ করা যায়, কেননা হাশেম সাহেব হচ্ছেন বর্তমানের বিখ্যাত একটি জাতীয়তাবাদী পরিবারের লোক।

ঢাকার কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, ঢাকা তো বরাবরই তৎকালীন ইতিহাসে দাঙ্গার শহর হিসেবে অপখ্যাত ছিল। দাঙ্গার আবহাওয়া শুরু হয়ে গেছে তখন। সব সময় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আতঙ্কে আমরা আতঙ্কিত থাকতাম। দাঙ্গার সময় কমিউনিস্ট এলিমেন্টদের কাজ ছিল শান্তির দিকে খেয়াল রাখা, শান্তিমিছিল বের করা। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে যারা প্রগতিশীল ছিল তারা এতে যোগ দিত। ফরিদ আহমেদ, শাহ আজিজুর রহমানও শান্তিমিছিলে যেত বলে মনে পড়ছে।

AMARBOI.COM

তখন জঙ্গি গ্রুপটা নানা এ্যাকশানে যাচ্ছিল। রায় সাহেবের বাজার আর নবাবপুর এর মাঝখানে ছিল একটা খাল। সেই খালের উপর ছিল নবাবপুর ব্রিজ। নবাবপুর ব্রিজের কাছে নবাবপুর মসজিদটা এখনো আছে কিন্তু নবাবপুর ব্রিজটা এখন আর নেই। এই ব্রিজের দুই পাশে ছিল হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের মতো ব্যাপার। নবাবপুর সাইডটা হচ্ছে হিন্দুস্তান আর রায় সাহেবের বাজারটা হচ্ছে পাকিস্তান। ওটা একটা সাংঘাতিক পয়েন্ট ছিল। আর্মড ফোর্স যখন আসত তখন একটা সাইড দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়াত আর একটা সাইড উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াত।

১৯৪৭ এ ব্রিটিশরা চলে গেল। ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়ে গেল। ঠিক হলো, পাকিস্তান আর ইন্ডিয়া কমনওয়েলথের মধ্যে থাকবে। রানী কমনওয়েলথের প্রধান। এ ছাড়া রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন। ১৪ই আগস্টে মিছিল একটা নিশ্চয়ই বের হয়েছিল। তাতে কংগ্রেসও জয়েন করেছিল। কিন্তু তাদের তেমন উৎসাহ ছিল বলে মনে হয় না। আমরাও যে খুব উৎসাহের সঙ্গে এতে যোগ দিয়েছি তা নয়। তবে আমরা সব সময় লক্ষ রেখেছি সাম্প্রদায়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঙ্গা যাতে না শুরু হয়। নবাব বাড়িতে মিটিং হয়েছে। নবাব বাড়ি যেহেতু প্রো-হক ছিল সেহেতু ওরা আমাদের সাহায্য করেছে।

পাকিস্তান হবার পর বেশিরভাগ হিন্দু টিচার ক্রমান্বয়ে চলে যাচ্ছেন ঢাকা থেকে। আবহাওয়াটা খারাপ হয়ে উঠছে। অপশন দেওয়া হচ্ছে। কোথায় থাকবেন? এখানে না ওখানে? ওখানকার মুসলমান কর্মচারীদেরও অপশন দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশটা সাংঘাতিকভাবে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অনেক হিন্দু টিচার চলে গেলেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশিরভাগ বিখ্যাত হিন্দু শিক্ষক যেমন ডি এন ব্যানার্জী, অমিয় চক্রবর্তী, এঁরা প্রায় সবাই কমিউনিস্ট-মনোভাবপন্ন ছিলেন। দেশভাগ হওয়ার পর এঁরা খুব ফ্রাইটেন্ড হলেন। একটা অপশান দেওয়ার ব্যাপার দাঁড়াল : আপনারা এখানে থাকবেন, নাকি ওখানে? অনেকে চলে গেলেন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের একটা সঙ্কট দেখা দেয়। রাজ্জাক সাহেবের স্মৃতিকথার মধ্যে এ ব্যাপারটি আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব যখন শিক্ষক সংগ্রহের জন্যে বিলাত যান তখন রাজ্জাক সাহেব বিলাতে। রাজ্জাক সাহেব তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে টিচার দিচ্ছি'। রাজ্জাক সাহেব তখন লাস্কির সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। লাস্কির তিনি ছাত্র এবং সহকর্মী ছিলেন। লাস্কি* তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন।

AMARBOI.COM

১৬. আমাদের সভা আক্রান্ত হলো

৪৭ এর শেষে বা ৪৮ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। তখন পাকিস্তান হয়ে গেছে। সদরঘাটের বাঁধটা যেখানে, তার পুর্বদিকে একটা পার্ক ছিল। পার্কটার নাম ছিল লেডিজ পার্ক। ঐ লেডিজ পার্ক ছিল একটা মিটিং প্লেস। মাঝে মাঝে সভা হত ওখানে। ওখানে ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় অবস্থার উপরে আলোচনা করার জন্যে একদিন একটি মিটিং আহ্বান করে। ঐ সভায় সরদার ফজলুল করিম ওয়াজ টু প্রিসাইড ওভার দি মিটিং এ্যান্ড মুনীর চৌধুরী ওয়াজ টু স্পিক। অন্য কমিউনিস্ট নেতা যারাই থাকুন না কেন—এই দুই জনই ছিল প্রধান।

আমরা মিটিং শুরু করতে যাব, তখন দি মিটিং ওয়াও এ্যাটারক বাই শাহ আজিজুর রহমান গ্রুপ। সুলতান হোসেন খানও আক্রমণকারী গ্রুপে ছিলেন। এই জঙ্গি গ্রুপটা আমাদের মিটিং ভেঙে দিল। লাঠিপেটা করল আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমাদের দৌড়ে পালিয়ে আসতে হলো। পালিয়ে আমরা আশ্রয় নিলাম এখন যেটা বার লাইব্রেরি তার উত্তর দিকে একটা দোতলা বিল্ডিঙে। এটা ছিল ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অফিস। আমি আর মুনীর ওখানে আশ্রয়

* হ্যারও লাস্কি : দ্রষ্টব্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা : ২য় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০২; পৃ. ৮৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিলাম। শাহ আজিজেরা ওখানে গিয়েও কিছু ইট-পাটকেল ছুঁড়ল আমাদের দিকে। তার পর তারা চলে গেল।

আর একটা ঘটনা ঘটেছিল এ সময় রথখোলায়। নবাবপুরের মাঝামাঝি জায়গায় রথখোলা নামে একটা জায়গা ছিল। এখন ট্রাফিক পুলিশ যেখানে দাঁড়ায় সে জায়গাটা। সেখানে কলকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্সির একটা শাখা খোলা হয়েছিল। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি কমিউনিস্ট প্রকাশনা বিক্রি করত। কাকাবাবু মানে মুজাফফর আহমেদ এই ঢাকা শাখাটির উদ্বোধন করেন। এই সময়ে এই শাখাটার উপরেও হামলা হয়। বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় রাস্তায়। এটাও একটা ঘটনা।

১৭. অধ্যাপনায় ইস্তফা

১৯৪৭ পর্যন্ত কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন অন্যরা। বড় বড় নেতারা ছিলেন অনেকে যাদের নাম আপনাদের কাছে বলে লাভ নেই কিছু। আপনারা চিনবেন না, মনেও রাখতে পারবেন না। পুলিশের চোখ ছিল তাদের দিকে। আমি তো কেউই ছিলাম না। আমি খাইদাই, সংস্কৃতি করে বেড়াই, মিছিলে প্রসেশানে যাই। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল এটা জানা যে, মুসলমানদের মধ্যে কারা কারা কমিউনিস্ট। কারণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন তো সাধারণ মুসলমানেরা করবে না। সুতরাং খুঁজে বের করতে হবে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী কারা। বেশিরভাগ হিন্দু কর্মী ভারতে চলে গেছে, অনেকেই চলে যাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কারা কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করে বা কারা কারা কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচিত তা জানতে হবে! মুসলমান অফিসারেরা তো চেনে না মুসলমানদের মধ্যে কারা কারা কমিউনিস্ট। তাই গভর্নমেন্টে হিন্দু অফিসারদের অনুরোধ করে বলল, 'তোমরা আরো কটা দিন থেকে যাও পাকিস্তানে। তোমরা ভারতে যাবার আগে আমাদের চিনিয়ে দিয়ে যাও, মুসলমানদের মধ্যে কারা কারা কমিউনিস্ট।' এভাবেই আমাদের নাম প্রথম পুলিশের খাতায় আসে।

তখন পার্টি একদিন আমাকে বলে, 'তুমি তো চাকরি করে কাজ করতে পারবে না। পুলিশ তোমাকে খোঁজ করছে। চাকরি ছেড়ে দাও।' আমি তো বাধ্য কর্মী। একদিন বিভাগীয় প্রধানের কাছে একটি দরখাস্ত দিলাম। দরখাস্ত খুলে তিনি অবাক হলেন। ওটা ছিল আমার পদত্যাগ পত্র। উনি বললেন, 'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইট?' আমি বললাম, 'স্যার একটা ডিসিশন হয়ে গেছে। এটা আর বদলানো যাবে না।' আমি যেমন সহজে শিক্ষক হয়েছিলাম তেমনি সহজে শিক্ষকতার কাজ ছেড়েও দিয়েছিলাম। অন্যান্য শিক্ষকেরা তাতে অবাকই হয়েছিলেন একটু। হরিদাস বাবু বলেছিলেন, 'আই হ্যাভ নেভার সিন এ বয় লাইক হিম'। মানে এ ছেলে একটু অন্য পথে হাঁটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়ে পার্টির কাজে চলে এলাম। আমি একটা গোবেচারি ছেলে, কমিউনিস্ট নেতারা আমার মতন একটা মুসলমান ক্যাডার পেয়েছে এটা তাদের জন্যে আনন্দের ব্যাপার। ইউনিভার্সিটির হিন্দু প্রফেসর যারা তাদের তো একটা পারিবারিক ট্রাডিশন আছে আন্ডার গ্রাউন্ডে যাওয়ার। কিন্তু একটা মুসলমান ছেলে এ রকমভাবে হাতের চাকরি ছেড়ে দিল এটা অমুসলমান টিচারদের যতটা টাচ করেছে মুসলমান টিচারদের ততটা করে নাই। বলা যায় যে, ব্যাপারটা মুসলমান টিচারদের আদৌ টাচ করে নাই, কিন্তু হিন্দু টিচারদের সাংঘাতিকভাবে টাচ করেছে।

আমার রেজিগনেশান দেওয়ার এই খবরটা যে গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছেছিল তার প্রমাণ আছে। আমার যে পার্সোনাল ফাইল তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো আছে। সেখানে আমি দেখেছি যে তৎকালীন গভর্নমেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে এক্সপ্ল্যানেশান চেয়েছে : হোয়াই সরদার ফজলুল করিম হ্যাজ রিজাইনড? তার ঠিকানা এখন কোথায়, তোমরা আমাদের জানাও।

জীবিকার সমস্যা কখনোই ছিল না আমার। ছাত্রাবস্থায় স্কলারশিপ পেতাম। তা দিয়ে চলতাম। মাস্টার যতদিন ছিলাম ততদিন মাইনে পেতাম। বোনের বাড়িতে থাকতাম, খেতাম। যা লাগবে বড় ভাইই দিতেন। পরীক্ষার আগে তিনি আমাকে দোয়া করে যাবার জন্যে ঢাকায় আসতেন। কখনো জিজ্ঞেস করতেন, ‘তোমার কিছু লাগবে না?’ আমি রসিকতা করে জবাব দিতাম, ‘যা লাগবে তা তো তৈরি করছি। পড়াশুনো করছি, আর কী করব?’ জামাকাপড়ের খুব একটা চাহিদা আমার কখনো ছিল না।

চাকরি ছাড়ার খবরটা বড় ভাই পরিবারের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। আমার চাকরি ছেড়ে দেবার খবর শুনে বাবা আর বড় ভাই ঢাকায় এলেন আমাকে খুঁজতে। বাবা তখন বুড়ো হয়েছেন। বড় ভাইয়ের চাকরি আছে, তবুও তিনি এসেছেন। বড় ভাই আমার হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট বিনয় বাবুর কাছে গিয়ে বললেন, ‘দেখেন তো আমার ভাইটা কেমন হয়ে গেল!’ ও কী করছে না করছে, আপনি ওর সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, একটু বলেন ওকে।’ তখন বিনয় বাবু উত্তর দিলেন, ‘দেখেন, ও আমার ছেলের চাইতে বেশি। ওর রেজিগনেশন লেটার, ওটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু আপনারা তো ওকে ফিরাতে পারবেন না।’

বাবা আর বড় ভাই সিদ্ধেশ্বরী এলাকার এক বাসায় পেল আমাকে। যেখানে এখন মৌচাক মার্কেট, সে জায়গাটা তখন জঙ্গলের মতো ছিল। ওখানে আমার এক ছোট ভগ্নিপতি থাকত। ফরেস্ট অফিসে কাজ করত সে। ও আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। বনজঙ্গলের মতো ছিল বলে জায়গাটা সেফ ছিল, ওখান থেকে আমি আমার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতাম। বাবা তখন বৃদ্ধ মানুষ। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘তুই একটা পাগল। তুই এগুলো কী আরম্ভ করেছিস? তোকে আজ আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। বাড়ি যেতে হবে।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ধরা পড়ে গেলাম। বড় ভাই আর বাবার হাতে আমি ধরা পড়ে গেলাম। আমার তখন মনে একটাই প্রশ্ন, 'এই বন্ধন থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পাবো? আমার বাবা আর বড় ভাইয়ে হাত থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পাবো? আমি তখন অপেক্ষা করতে লাগলাম,, কখন মাগরেবের নামাজ শুরু হবে এবং বাবা আর বড় ভাই কখন নামাজ পড়তে যাবেন। আমি ঠিক করলাম, সেই সময়টাতেই আমি পালাব।

আমি জানতাম, তাঁরা যদি আমাকে জোর করে বাদামতলীর ঘাটে স্টিমারে নিয়ে উঠায়ও, তবুও তো ওঁরা আমাকে বরিশালে নিয়ে যেতে পারবেন না। স্টিমারঘাটে ইন্টেলিজেন্স আছে, পুলিশ আছে। তারা আমাকে ফলো করছে। যে মুহূর্তে ওরা আমাকে জাহাজে ওঠাবে সঙ্গে সঙ্গে তো জাহাজ ছেড়ে দেবে না। জাহাজে এজেন্ট আছে, আই বি আছে, ওয়াচার আছে। তারা তো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পয়েন্ট আউট করবে : এই যে, সেই লোক যাচ্ছে। সরদার ফজলুল করিম যাচ্ছে। এখন জাহাজে আছে। ওরা আমাকে ধরে ফেলবে। যে স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে আমার বাবা আর ভাই আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, তাতে বড় রকমের আঘাত আসবে। এটা সম্ভব হবে না। আর পুলিশ এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের পক্ষ থেকে আমাকে ফলো করার এত সব ব্যাপার বাবা আর বড় ভাই চিন্তাও করতে পারতেন না। ওঁরা ভাবছিলেন, ও পাগল হয়ে গেছে, চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। পাগলটাকে আমরা নিয়ে যাই। বাবা সেই প্রথম ঢাকায় এসেছেন। বাবাকে বড়ভাই নিয়ে এসেছেন শুধু আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন বলে। আমি আমার শেল্টার থেকে পালালাম, কোথায় গিয়েছিলাম, আজ এতদিন পরে মনে হচ্ছে, আমি সেদিন ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। যদি আমি সেদিন না পালাতাম তবে নট ইন ১৯৪৯, আই উড হ্যাভ বিন এ্যারেস্টেড অন ১৯৪৮।

আপনাদের কাছে মনে হবে, মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি ছেলে কমিউনিস্ট হয়ে গেল! আমি ব্যাপারটিকে দেখি এভাবে : একটি জীবন নানান উপাদানের সমন্বয়ে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমার গ্রামের পাশেই ছিল হিন্দু পাড়া। হিন্দুপাড়াগুলো যেন কেমন-কেমন ছিল, আলাদা একেবারে। টাউনের মতো মনে হত সেখানে গেলে। সেখানে আমার হিন্দু বন্ধুবান্ধব ছিল। সেখানে আমি বন্ধুদের সাথে এক সাথে খেয়েছি। মা দুই থালায় আমাদের ভাত গিয়েছে। একই জায়গায় একই আসনে।

১৮. হিন্দু মায়ের মুসলমান ছেলে

একটা ঘটনার কথা বলি। আমার বড় ভাই মঞ্জে আলী তখন রহমতপুরে সাবরেজিস্ট্রার। সাবরেজিস্ট্রার একজন বড় অফিসার। তা ছাড়া বড় ভাই খুব সামাজিক লোক ছিলেন। সবার বাড়িতে যেতেন। এক হিন্দু জমিদার ছিলেন রহমতপুরে। সেই জমিদারের প্রাপ্তবয়স্ক বড় ছেলে অকালে মারা গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বড় ভাইয়ের যাতায়াত ছিল সেই বাড়িতে। বড় ভাই একদিন সে বাড়িতে গেলে পরে সেই জমিদারের বৃদ্ধা স্ত্রী কেঁদে ফেলেন। বড় ভাইকে দেখে তাঁর নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে যায়। তখন বড় ভাই তাঁকে প্রবোধ দেন এই বলে, 'আপনি কাঁদেন কেন! আমিই তো আপনার বড় ছেলে।' শুনে ভদ্রমহিলা শোক ভুলে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুইই আমার ছেলে।' এটা একটা ঘটনা। এক জন মুসলমান বলছে এক হিন্দু মহিলাকে : 'মা, আমি আপনার ছেলে।' বড় ভাই তখন দাড়ি রাখেন।

একদিন বড় ভাই আর আমি মগরিবের নামাজের সময় গেছি সে বাড়িতে সময়টা হিন্দুদের সন্ধ্যাহ্নিকেরও সময়। আমার বড় ভাই মহিলাকে বললেন, 'মা, আপনার ধোয়া কাপড়টা দিন তো। কাপড়খানা বিছিয়ে আমি নামাজটা পড়ে নিই।' এক ঘরে সন্ধ্যাহ্নিকের কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে আর তার পাশের ঘরে বড় ভাই নামাজ পড়ছেন! আমি বলতে চাই, এটা বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা উপাদান, এই যে সমন্বয়—বন্ধুত্ব কিংবা আত্মীয়তা। তিনি মুসলমান হয়ে এক হিন্দু মহিলার কাপড়ের উপর নামাজ পড়ছেন, পাশে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে।

এ ঘটনার কথা আমি যখন লিখি ১৯৭২ সালের দিকে তখন লেখাটা বড় ভাইয়ের* নজরে পড়ে। হয়তো কেউ লেখাটার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'করিম তুমি কী সব লেখো, আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো না?'। তিনি না পারেন স্বীকার করতে, না পারেন অস্বীকার করতে। তিনি বিব্রত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তো আর পলিটিশিয়ান না যে ঘটনাটা বেমালুম অস্বীকার করবেন। তাঁর অনেক হিন্দু শিক্ষক ছিলেন, অনেক ভালো হিন্দু শিক্ষক, তাদের তিনি পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেন। আমাকে তিনি গৌরবের সঙ্গে তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আমাকে তিনি ভালবাসতেন এই জন্যে যে ভাইদের মধ্যে অন্তত একটাকে পাওয়া গেছে।

১৯. ভাষা আন্দোলন

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাক্ট অনুসারে ভারত ও পাকিস্তানে একটি করে কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি গঠন করা হয়েছিল। ইন্ডিয়াতে বছর এক-দুইয়ের মধ্যে কনস্টিটিউশান তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু পাকিস্তানে তখনো আলোচনা চলছে। পাকিস্তান তো একটা পাকিস্তান না। লাহোর রিজলিউশানে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল। মূল প্রস্তাবটা ছিল এ রকম : হোয়েয়ার মুসলিমস আর

* বড় ভাই : মঞ্জে আলী সরদার : জীবনকালে উচ্চপদে সরকারি কর্মচারী ছিলেন : জন্ম আনু : ১৯০৬, মৃত্যু : ১৯৯১। এই বড় ভাই এর একটি যুবক সন্তান হুমায়ুন ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করে। কেবল আমার বড় ভাই এর ছেলে নয়। আমার মেজ-বোনের একটি ছেলেও নিহিত হয়েছে ২৫শে মার্চের পরে বোধ হয় এপ্রিল মাসে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পথে লঞ্চে, পাকিস্তান বাহিনীর বিমান আক্রমণে, ওর নাম ছিল জাহাঙ্গীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজরিটি দোজ প্রভিন্সেস উইল বি কনস্টিটিউটেড এ্যাজ অটোনোমাস এ্যান্ড সোভারিন স্টেটস। কিন্তু ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান হওয়ার পর জিন্নাহ সাহেব বললেন, 'লাহোর রিজলিউশানে একটা ভুল আছে। স্টেটস কথাটা টাইপের ভুল, কথাটা আসলে হবে স্টেট। সুতরাং ডিসেম্বর মাসেই এটা অ্যামেন্ড করে ফেলা হয় : 'স্টেটস' এর বদলে 'স্টেট'। হাশেম সাহেব তখন এর বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়।

এ রকম ঘটনা তখন অনেক ঘটছিল। ভাষার ব্যাপারে বারবার উর্দুর উপর জোর দিয়ে বলা হচ্ছিল : উর্দু শ্যাল বি দি লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা অব পাকিস্তান, স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান। করাচীতে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছিল। তখন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে করাচীতে বৈঠক হচ্ছে। মূলনীতি কমিটির বৈঠক হচ্ছে। ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস্ ফর দি কনস্টিটিউশান কী কী হবে সেসব নিয়ে আলোচনা চলছে। এ্যাসেমব্লি সদস্যরা কোন কোন ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারবে তা এ্যাসেমব্লির রুলস এ্যান্ড রেগুলেশনের মধ্যে লেখা থাকে। সেখানে লেখা ছিল, মেম্বারস মে স্পিক ইন উর্দু এ্যান্ড ইন ইংলিশ।

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে তখন নেতৃস্থানীয় ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় এঁরা সব। এ্যাসেমব্লির এক সভায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম বাংলা ভাষার প্রশ্নটি তুলেছিলেন। ধীরেন দত্ত কুমিল্লা কোর্টের এক জন বড় উকিল ছিলেন। তিনি এ্যাসেমব্লির প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'স্যার আই হ্যাভ এন হাম্বল সাবমিশন। পাকিস্তানের মানি অর্ডার ফর্মে যদি শুধু উর্দু আর ইংরেজি ব্যবহার করা হয় তবে ইস্ট বেঙ্গলের কৃষকেরা কীভাবে এই ফর্ম ব্যবহার করবে? ধরা যাক, কৃষকের ছেলে স্কুলে পড়ে। সেই ছেলে বাবার কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছে। বাবা তাকে মানিঅর্ডার করবে। এই কৃষক ফাদার কীভাবে মানিঅর্ডার ফর্মটা ব্যবহার করতে পারবে?' এসব কথা অবশ্য সবই ইংরেজিতেই হচ্ছিল। মানিঅর্ডারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে তিনি বললেন, আই হাম্বলি সাবমিট, ইন দি রিজলিউশান, দি মেম্বারর্স মে স্পিক আইদার উর্দু অর ইংলিশ, টু এ্যাড অ্যানাদার ওয়ার্ড দ্যাট দি মেম্বারর্স মে স্পিক আইদার উর্দু অর ইংলিশ অর বেঙ্গলি।' দ্যাট ওয়াজ দি সাবমিশন অব ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইন ১৯৪৮। কিন্তু তাঁর সেই বিনীত দাবিটাকে দমন করা হলো। লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে* ভয় দেখাল এই বলে যে 'তুমি প্রভিন্সিয়ালিজম প্রিচ করছো, এটা চলবে না'। এসব কথা ইতিহাসে আছে।

---

* ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৭১, ২৫শে মার্চের পরবর্তীতে কুমিল্লার নিজ বাড়ি থেকে পাকিস্তান বাহিনীর দ্বারা গ্রেপ্তার হয়ে সেনানিবাসে নির্মমভাবে নিহত হন। তাই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ : এ কথা ইতিহাসগতভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৮ এর মার্চ মাসেই মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এলেন এবং রেসকোর্সে বক্তৃতা দিলেন। গরমের দিন ছিল তখন। পশ্চিম দিকে যেখানে এখন টিএসসি, সেখানে রেসকোর্সে ঢোকার একটা গেট আছে। ঐখানে মঞ্চ তৈরি করা হয়। পাশেই ছিল কালীমন্দির, রমনা কালীমন্দির যেটা পাকবাহিনী ৭১ সালে ভেঙে ফেলে। পাশে মা আনন্দময়ীর আশ্রমও ছিল। আমরা নিজেরা ভিজিট করেছি সে আশ্রম, বসেছি সেখানে। এ আশ্রমটা অবশ্য আগে থেকেই উঠে গিয়েছিল। হতে পারে মা আনন্দময়ী ঢাকা থেকে চলে গিয়েছেন বলে। কালীমন্দিরটা কিন্তু তখন ছিল।

সে সময় আমি ঢাকাতে দুইটা মিটিং এ্যাটেন্ড করি। এর মধ্যে একটা হচ্ছে রেসকোর্সের সেই মিটিংটা। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে : 'চুপ করো, বৈঠ যাও, খাম্ সে সুনো।' খুব বড় মিটিং ছিল সেটা এবং খুবই অরগানাইজড। তখনকার দিনের মুসলিম পপুলেশন বা ছাত্রদের মধ্যে 'কায়েদে আজম' খুবই পপুলার টার্ম। ইট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট ভিজিট ইন ঢাকা। দেশ তখন মুসলিম লীগের আমেজে আচ্ছন্ন। ছাত্ররা তখন ইনসপায়ারড বাই পার্টিশান এ্যান্ড ইনটেলিজেন্স অব জিন্নাহ। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাথে মোকাবিলা করার কারিশমা ইত্যাদি ব্যাপারের জন্যে জিন্নাহ তাদের কাছে তখনো 'মহান নেতা'। কাজেই পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্তি বা ডিসইল্যুশনমেন্ট, যাকে আমরা বলি, সেটা তখনো শুরু হয়নি। সেদিন সম্ভবত ১৬ই মার্চ, ১৯৪৮। কিন্তু আমার* মনে আছে জিন্নাহ সাহেবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করে ১১ই মার্চে—এটা আমার মনে আছে। তা হলে জিন্নাহ সাহেব সম্ভবত ৮ই মার্চ তারিখে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

জিন্নাহ সাহেবের সব কথা তো আমার মনে নাই। রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : 'উর্দু এ্যান্ড উর্দু এলোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে, একে বাঁচাতে হবে, রিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে এ্যান্ড আই ওয়ার্ন ইউ দ্যাট দেয়ার আর ফিফথ কলামিস্ট এমাংস্ট ইউ। কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না' ইত্যাদি। যে কথাটা এখনো কানে বাজছে সেটা হচ্ছে, এ্যাজ ফার এ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কনসার্নড 'উর্দু এ্যান্ড উর্দু এলোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান।'

কমিউনিস্টদের ব্যাপারটা ওখানে উপস্থিত হাজার হাজার ছাত্রদের যতটা না উত্তেজিত করেছে তার চাইতে দশ গুণ বেশি উত্তেজিত করেছে 'কায়েদে আজম' এর ভাষাসংক্রান্ত ঐ মন্তব্যটা। ছাত্রদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক।

---

* স্মৃতির কথা ঠিক না হতে পারে, অনেক সুহৃদ বলেছেন জিন্নাহ সাহেব এসেছিলেন ১১ই মার্চের পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্নাহ সাহেবকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যে ছাত্ররা ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল ... এ সমস্ত জায়গাতে গেট বানিয়েছিল। কিন্তু রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে সেই সব গেট তারা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে ফেলে।

২০. 'নো, নো, নো'!

এর একদিন পর কার্জন হলে স্পেশাল কনভোকেশনের আয়োজন করা হয়। সেই কনভোকেশনে জিন্নাহ সাহেব নিজ হাতে ডিগ্রির সার্টিফিকেট দেবেন—এমন কথা ছিল। সেই ডিগ্রির সার্টিফিকেট তিনি ডিস্ট্রিবিউট করেন তাঁর বক্তৃতার আগে কিংবা পরে। আমি তখনো পর্যন্ত আমার সার্টিফিকেট নিইনি। কার্জন হলের অনুষ্ঠানে প্রথমে ছিল শিক্ষকদের বসার জায়গা, তার পেছনে ছিল ছাত্ররা। আমি ইচ্ছে করলে শিক্ষকদের সঙ্গে বসতে পারতাম। শিক্ষকেরা তাদের জায়গা থেকেই ডিগ্রি আনতে স্টেজে যাবে। আমি সেখানে বসিনি। তা ছাড়া ডিগ্রি নিতে হলে আগে থেকে রেজিস্ট্রারের সাথে যোগাযোগ করে ফর্ম পূরণ করতে হত। সেসব কিছুই আমি করিনি।

জিন্নাহ সাহেব তাঁর স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে ইংরেজিতে ভাষণ দিলেন। রেসকোর্সেও ইংরেজিতে ভাষণ দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে যখন শব্দ হয়েছে বা গণ্ডগোল হয়েছে, তখন উর্দুতে দুই-একটা কথা বলেছেন। কার্জন হলে তিনি উর্দুতে কিছুই বলেন নি, তার প্রয়োজনও হয়নি। জিন্নাহ সাহেব যখন রাষ্ট্রভাষার কথায় এলেন তখন তিনি রেসকোর্সের কথাটাই রিপিট করলেন : 'আই টেল ইউ, এ্যাজ ফার এ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কনসার্নড 'উর্দু এ্যান্ড উর্দু এলোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান।' এ সময়ে ছাত্ররা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে থেকে তিনটা আওয়াজ বের হয়েছিল 'নো, নো, নো'। জাস্ট তিনটা শব্দ। কোনো গোলমাল, নয়, হৈচৈ নয়। এই তিনটা শব্দই শুধু ছাত্ররা উচ্চারণ করেছিল পিছনের সারি থেকে। এই তিনটা আওয়াজ সে সময়কার রেডিও রেকর্ডিঙে নিশ্চয়ই ছিল। পরে হয়তো মুছে ফেলা হয়েছিল। জিন্নাহ সাহেব হেজিটেটেড ফর এ সেকেন্ড এ্যান্ড স্টপড, বাট দেন হি কনটিনিউড হিজ ওউন স্পিচ এজ হি ওয়ান্টেড টু।

জিন্নাহ সাহেবকে এস্কর্ট করে কার্জন হলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কারা কারা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল, তা এতদিন পরে আর মনে নেই। তবে একটা কথা মনে আছে, জিন্নাহ সাহেবকে যখন এস্কর্ট করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কার্জন হলের পিছন দিকের গেটটা ব্যবহার করা হয়েছিল। সামনের গেট দিয়ে তাঁকে বের করা হয়নি।

জিন্নাহ সাহেব ১১ই মার্চের আগেই চলে গেছেন কিনা আমি জানি না কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ১১ই মার্চ তারিখে যে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল তা ইতিহাসে আছে। আমি নিজেও পিকেটিং এ অংশগ্রহণ করেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা পুলিশ তখনো পর্যন্ত আমার পিছনে লাগে নাই। আমি তখন শিক্ষকতা ছেড়ে এসেছি। বিভিন্ন সভা সমিতিতে যাচ্ছি। নিজেকে ওপেন রেখেছি।

পাকিস্তান হওয়ার পর ইডেন কলেজের বিল্ডিংটা সরকার দখল করেছে। সেটাই তখন সেক্রেটারিয়েট। মিনিস্টাররা সেখানে অফিস করা শুরু করেছিল। ইডেন কলেজটা তখন চলে গেছে ওয়াইজ ঘাটে এখন যেখানে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি সেখানে। মনে পড়ছে, কার্জন হলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা একেবারে সেক্রেটারিয়েটে চলে গেছে, আমরা ছাত্ররা সব মিছিল করে সে রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। তোহাও পিকেটিঙে পার্টিসিপেট করেছিল। ১১ই মার্চের পিকেটিঙের সময় তোহাকে সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে নির্মমভাবে পেটানো হয়েছিল।*

একটা ঘটনা আমার মনে আছে যে, ছাত্ররা সেক্রেটারিয়েট থেকে একজন মিনিস্টারকে বের করে এনেছিল। তিনি এডুকেশন মিনিস্টার বা অন্য কোনো মিনিস্টার হবেন। কোন মিনিস্টার তিনি ছিলেন তা মনে নেই তবে এটা মনে আছে যে তার বাড়ি ছিল পিরোজপুরে। ছাত্ররা তাকে ধরে এনে একটা বাক্সের উপর উঠিয়ে দিয়ে বলেছে, 'আপনি এখন বলেন।' তখন ঐ লোক ভয় পেয়ে বলেছে, 'বাবারা তোমরা শোনো। বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দি বেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি বাংলা ভাষাকে সাপোর্ট করি।' ছেলেরা তখন সেই মিনিস্টারের কাছে দাবি জানিয়েছিল : আপনাদের রিজলিউশন নিতে হবে, বাংলাকে পাকিস্তানের ওয়ান অব দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজেস অব পাকিস্তান ঘোষণা করতে হবে।

AMARBOI.COM

এখনো মনে পড়ছে, পিকেটিং করার সময় আমি তাজউদ্দীন আহমদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি মেইন পোস্ট অফিসের সামনে। মেইন পোস্ট অফিসটা ছিল এখন যেখানে টি এন্ড টি অফিস সেখানে। তখন তো আর এলাকাটা এখনকার মতো ছিল না, আরো ছোট ছিল। পশ্চিম পাশে যে এক্সটেনশন সেটাই ছিল মেইন বিল্ডিং। পাশে একদিকে ছিল খেলার মাঠ। এখন আপনারা আর রিকালেক্ট করতে পারবেন না, অন্তত আমি যেভাবে পারি সেভাবে পারবেন না। এর এক পাশে ছিল ব্রিটানিকা সিনেমা যেখানে ইংরেজি ছবি দেখানো হতো, আর একসাইডে ছিল নবাবদের একটা বড় রেস্টুরেন্ট : ডিয়েনফা।

এ সময় থেকে মুসলমান ছাত্রদের মোহমুক্তি শুরু হলো। সবার অবশ্য হলো না মোহমুক্তি। ছাত্রলীগ গ্রুপিং ছিল : শাহ আজিজ গ্রুপ ছিল, তোয়াহাদের গ্রুপ ছিল। আমি মুসলিম লীগের কেউ ছিলাম না। কিন্তু তোয়াহা ওয়াজ প্রমিনেন্ট মুসলিম লীগ লীডার। তাজউদ্দীন ওয়াজ প্রমিনেন্ট মুসলিম লীগ লীডার অব ইস্ট বেঙ্গল। কামরুদ্দীন আহমদ ছিলেন। তিনি অবশ্য স্টুডেন্ট ছিলেন না। কিন্তু তার স্টুডেন্ট সাপোর্টাররা ছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের

* স্মৃতি বলছে পুরোনো জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং-এ তাজউদ্দীন আহমদের পাশে তোহা এবং আমি : আমরা দুজনেই ছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্চ—এই কয়েক মাসেই পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্তি হয়ে গেল ছাত্রদের। এই মোহমুক্তিটা একটা এ্যাগ্রেসিভ রূপ নিল ১৯৫২ সালে। এটা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ সময় নানান জনে নানান কথা বলছেন। মুসলিম লীগের মিনিস্টার ফজলুর রহমান সাহেব এ্যাডভোকেটেড : বেঙ্গলি শুড বি রিটেন ইন অ্যারাবিক হরফ, ইন এ্যারাবিক লেটার্স। ১৯৪৮ এর মোহমুক্তিটাই ম্যাচিউর করল ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে।

আমরা সাধারণত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করি। তা কিন্তু নয়। ভাষা আন্দোলনের শুরু হয়েছিল আরো আগে, ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের আগে। ভাষা নিয়ে যখন প্রাদেশিক পরিষদে আলাপ আলোচনা শুরু হয় তখন এই মোহমুক্তির ঘটনা কিছুটা ঘটতে শুরু করে। আগেই বলেছি পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লিতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব দিয়েই ভাষা আন্দোলনের শুরু। সে জন্যে আমি মনে করি এবং অনেকেই এটা বলেছেন যে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ বা সৈনিক যদি আমরা কাউকে বলতে চাই তবে বলা উচিত, তিনি হচ্ছেন ধীরেনন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি হচ্ছেন পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের প্রথম উপস্থাপক। ৭১ সালে তিনি যেভাবে নির্মমভাবে নিহত হলেন পাক আর্মির দ্বারা, তাতে তিনি তাঁর জীবনের যে আদর্শ ছিল সে আদর্শের জন্যে সম্পূর্ণ মুল্য দিয়ে গেলেন—এটা বলতে গিয়ে আমি আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি।

AMARBOI.COM

২১. আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন

৪৮ এর মাঝামাঝি থেকেই আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে। আন্ডারগ্রাউন্ডের প্রথম দিকে আমি শহরেই ছিলাম। আন্ডারগ্রাউন্ড মানে কারো সঙ্গে গোপনে কনটাক্ট করা, কোনো কমরেডের সঙ্গে দেখা করা, সন্দেহকারীকে ধোঁকা দেওয়া কিংবা তারা আমার সঙ্গে কনটাক্ট করে বলল : অমুক জায়গায় অমুককে পাওয়া যাবে।

তখনো হলে আমার সিট ছিল টিচার হিসেবে। আমি নিজেকে টিচার বা লিডার বলে মনে করতাম না। আমি এখনো স্টুডেন্ট—এই চিন্তাই আমার মাথায় ছিল। এ সময় ফজলুল হলে আমার একটা সিট ছিল। মুজাফফর আহমদ চৌধুরী সাহেবও তখন ফজলুল হক হলে থাকতেন। ফজলুল হক হলের ইস্ট উইঙের একেবারে সাউদার্ন ব্লকে ছিল তাঁর সিট। সুতরাং হলে আমি একা নই; কিন্তু মুজাফফর আহমদ চৌধুরীকে কেউ এ্যাটাক করছে না। জঙ্গি গ্রুপটা মনে করছে, সরদার ফজলুল করিম কমিউনিজিমের বীজ ছড়াচ্ছে।

মুসলিম লীগের ছেলেরা এসে আমাকে হল থেকে বের করে দিল। তোয়াহা সাহেবের এক চাচা খয়ের ছিল ঐ জঙ্গি গ্রুপের এক জন লিডার। খয়েরের নাম এখনো পাওয়া যেতে পারে ইতিহাস ঘাঁটলে। ওরা ঠিক করল : আমরা সরদারকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের করে দেবো। জঙ্গি ছাত্রদের বলা হয়েছিল, 'তোরা কেউ সরদারের সাথে আর্গুমেন্ট করবি না। কেন থাকতে পারবেন না ইত্যাদি কোনো কথাই বলবি না। ওরে ধরবি আর টাইনা বার করে দিবি। তার সাথে আর্গুমেন্টে গেলে পারবি না।' ওদেরও ধারণা, সরদার ফজলুল করিম কোনো খারাপ লোক না। মারামারির লোক না। এ্যান্টি-হক মুভমেন্টের সময় আমাকে হেক্‌ল করা হয়েছিল। এ্যান্টি-হক মুভমেন্ট হয়েছিল আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়।

ওরা এসে আমাকে বলল, 'আপনি হলে থাকতে পারবেন না।' তখন আমি, ইন মাই ওন ন্যাচারাল ওয়ে, বলেছি, 'না, আমি থাকবো না। হলের একটি ছেলেও যদি অবজেক্ট করে, যদি অবজেকশান দেয় যে আমি হলে থাকতে পারবো না, তবে আমি হলে থাকবো না।' এ উত্তর শুনে তারা খুশি হলো। আমার উপর কোনো হাতটাত না উঠিয়ে 'নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর' শ্লোগান দিয়ে 'চল চল' বলে চলে গেল।

এবার আমাকে পুরোপুরি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হলো। আগে যা-ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে পারতাম, খেতে পারতাম এর ওর বাসায় এখন তাও বন্ধ হল। আমাকে বলা হলো, 'তুমি এভাবে ঘুরতে পারবে না। আজ তুমি গ্রেপ্তার হচ্ছো না বলে যে কালও হবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমি তখন পার্টিকে বললাম, 'আমাকে শেল্টার দাও'। পার্টি তো একটা ছোট অরগানাইজেশন, মিলিট্যান্ট বটে কিন্তু প্রধানত একটা থিওরেটিক্যাল পার্টি। তার একটা থিওরি আছে, একটা প্রগ্রেসিভ আউটলুক আছে। এই প্রগ্রেসিভ আউটলুক দিয়েই তারা বিভিন্ন ছেলেদের যোগাড় করার চেষ্টা করে। তখন ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বা সেক্রেটারিয়েটের সভা ডাকা হল। তাদের তো আরো নানা ইস্যু আছে। সেইসব ইস্যুর মধ্যে এটাও একটা ইস্যু যে সরদার তো রিজাইন দিয়েছে। এখন তাকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তার আত্মীয়ের বাসায় তো সে থাকতে পারে না। কোথায় তাকে রাখা যায়? কমিউনিস্ট পার্টির যে খুব একটা বড় বেইজ ছিল, খুব স্ট্রং, তাতো না। পারিবারিক কারণে অনেক হিন্দু কমরেড তখন ভারতে চলে যাচ্ছেন। পার্টিতে খুব সাংঘাতিক একটা কর্মী ও নেতা-সঙ্কট চলছে।

পার্টি আমাকে রাখতে পারছে না ঢাকায়। কোনো সেফ জায়গা নেই। কোথায় রাখবে? আমাকে তখন বলা হলো, তুমি বরং কলকাতায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে তুমি অমুক ঠিকানায় রিপোর্ট কর। সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। তখনো পাসপোর্ট হয়নি। কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা সতর্কতা ততদিনে ডেভেলপ করেছে যে কোনো ইউজুয়াল পথ আমার ব্যবহার করা চলবে না। তখন কলকাতা যাবার ইউজুয়াল পথটা ছিল এরকম : ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে শিয়ালদা। আমি একটু ডাইভার্স রুট নিলাম। আমি ঢাকা থেকে ট্রেনে গেলাম পাবনা ঈশ্বরদী। ঈশ্বরদী থেকে পার্বতীপুর। এভাবে নর্থ বেঙ্গল হয়ে আমি কলকাতায় রিচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলাম। তাতে করে আমার মেন একটা সেন্স এসেছিল যে আই অ্যাম সেফ, কেন না এত ঘুরেটুরে এসেছি। পথে তো কেউ বাধা দেয়নি, কেউ জিজ্ঞেসও করেনি।

ঢাকা থেকে কলকাতায় গিয়ে যারা রিফিউজি হয়েছিলেন, তারা আমাকে আশ্রয় দিলেন। আমি দেখলাম যে তাদের অবস্থাও বড় খারাপ। তখন হঠাৎ একদিন আহসান হাবীব সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো আমার 'দৈনিক ইত্তেহাদ' অফিসে। কবি আহসান হাবীব। তিনি আমার পারিবারিক ভাই ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেছেন একেবারে কিড অবস্থায়, আমি যখন ক্লাস এইট নাইনে পড়তাম।

দৈনিক আজাদ হয়তো তখন ঢাকায় এসেছে, কিন্তু দৈনিক ইত্তেহাদ আসেনি তখনো। আহসান হাবীব ইত্তেহাদের সাহিত্য সম্পাদক। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন ইত্তেহাদের এডিটর। রোকনুজ্জামান তখনো কলকাতায়। পার্ক সার্কাসে যে বাড়িটাতে আহসান হাবীব সাহেব থাকতেন সেই একই বাড়িতে রোকনুজ্জামানও থাকতেন।

আমি কলকাতায় গিয়ে নিজেকে খুব ফ্রি বোধ করলাম। চৌরঙ্গীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি ট্রাফিক দেখছি, ট্রামে চড়ছি। আমি ভাবছি, এখানে আমাকে কে চেনে? চিনবে কে? হাবীব ভাইকে একদিন বললাম, আমার তো থাকার জায়গার খুব অসুবিধা। রিফিউজিরা খুবই কষ্টেসৃষ্টে আছেন, কেউ চৌকির উপরে, কেউ নিচে—এভাবে থাকছেন। আমি যে এই সমস্ত রাস্তায় গেছি তা হাবীব ভাই খুব একটা জানতেন না। তিনি বললেন, আমি তোমার বড় ভাই। তুমি কলকাতায় এসেছো, তুমি আমার বাসায় থাকো।' এটা বলাতে আমি আমার সামান্য বিছানাপত্র যা ছিল তা নিয়ে পার্ক সার্কাসে আহসান হাবীব সাহেবের বাসায় গিয়ে উঠলাম।

কদিন ওখানে ছিলাম বলতে পারবো না। এক দিন শেষ রাতের দিকে তিনি পত্রিকা অফিস থেকে ফিরেছেন কাজটাজ করে। তখন তিনি বিয়েও বোধহয় করেছেন। আমাকে যে ঘরে তিনি শুতে দিয়েছিলেন তার পাশের ঘরে ছিলেন রোকনুজ্জামান, পরে সে আমাকে বলেছে। সেই ঘরে নকিং হচ্ছে। হাবীব ভাই যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?' তখন উত্তর এল, 'আমরা পুলিশের লোক। দরজা খুলুন।' তখন হাবীব ভাই আর কী করবেন, উনি জীবনে তো পুলিশ দেখেননি। দরজা খুলে দিলেন। তখন কয়েকটা লোক, সাদা কাপড়ে বোধহয়, অর্থাৎ ইউনিফর্মে না, অর্থাৎ আই বি ডিপার্টমেন্টের লোক, তারা হাবীব ভাইকে বলল যে স্যার আমাদের খবর আছে, আপনার এখানে একজন ইস্ট বেঙ্গলের পলিটিক্যাল এ্যাবসকন্ডার আছে। তখন এটা সাংঘাতিক টার্ম : 'পলিটিক্যাল এ্যাবসকন্ডার'। এ ধরনের লোককে যে রাখে তার অবস্থা কিন্তু নিরাপদ না। হাবীব ভাই বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার এখানে পলিকি্যাল এব্যাবসকন্ডার কেন থাকবে?' তখন পুলিশ বলল, 'আপনার এখানে কে কে আছে?' তিনি প্রথমে নিজের ফ্যামিলি মেম্বারদের কথা বললেন। তারপর বললেন যে তাঁর বাড়িতে একজন রিলেটিভ আছেন। পুলিশ এবার বলল, 'কই আপনার সেই রিলেটিভ কোথায়? তাকে ডাকুন। আমরা তাকে একটু দেখবো।'

হাবীব ভাই আমাকে ভিতরের ঘরে ডেকে নিলেন। আমাকে বললেন, 'করিম ('করিম' বলে ডাকতেন তিনি আমাকে) কী করবো? ওরা তোমাকে দেখতে চায়!' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমি যাব।' খুব স্মার্টলি বললাম কথাটা। আমি তো অত চিন্তাভাবনা করে কথা বলতাম না, যখন যা দরকার হয় বলার তা বলতাম। যখন যা দরকার হয় করার তা করতাম। আমি যে মাস্টারি শুরু করেছিলাম, তাও অত চিন্তাভাবনা করে করিনি। টিচার ক্রাইসিস হয়েছিল বলেই মাস্টারি করতে রাজি হয়েছিলাম। স্যার বলেছেন, 'তুই কালকে থেকে ক্লাস নে, আমি নিতে শুরু করলাম।' আমাকে পার্টি বলেছে, 'তুমি এ্যারেস্টেড হয়ে যাবে। তুমি চাকরি করতে পারবে না। তুমি রিজাইন দাও।' আমি রিজাইন দিলাম। পার্টিকে বলেছি, 'আমাকে রাখার ব্যবস্থা করো।' পার্টি বলেছে, 'তোমাকে কোথায় রাখবো?' এর পর তারা আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি চলে গেছি কলকাতায়। তারাই বলেছে, এই পথ দিয়ে যাও, সোজা গোয়ালন্দের পথ দিয়ে যেও না। ন্যাচারালি, নিশ্চয়ই তারা আমাকে এ্যাডভাইস করেছে।

ঢাকাতে আমি কোনো সাংঘাতিক কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল লিডার ছিলাম না। ঢাকায় যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পুরোনো সব আই বি অফিসার তারা ইস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে সাহায্য করেছে বাই গিভিং লিস্ট অব দি মুসলিম স্টুডেন্টস এন্ড আদার্স হু আর কমিউনিস্ট মাইন্ডেড। এই লিস্টিটা তারা দিয়ে গেছে। এই লিস্টি অনুযায়ী তারা সবাইকে ফলো করছে। কারণ এ্যারেস্ট তো এমনি করা যায় না। অ্যাকশনের উপর তো এ্যারেস্ট করবে। বিনা এ্যাকশনে তো এ্যারেস্ট করা যায় না। তখনো তো কমিউনিস্ট পার্টি ইললিগাল না। এক জন যদি কমিউনিস্ট থাকেও তবুও তাকে এ্যারেস্ট করার যে ফর্মালিটি সেটা তো আনা যায় না। ওয়াচ করার ব্যাপারটা আছে। ওয়াচিংটাও কিছুদিন পর্যন্ত এ্যাভয়েড করা গেছে। আমি তো গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতায় যাইনি, আমি গিয়েছি পার্বতীপুর হয়ে। কলকাতায় গিয়ে আমি খুব ফ্রি ফিল করছি। সেই ফ্রিনেসটা ধাক্কা খেলো একদিন শেষ রাতে যে কথা আগেই বলেছি।

ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখলাম, গোটা পাঁচ-ছয় লোক। ওরা আমাকে অবজার্ভ করল, আঘা সে মাথা, মানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এর পর তারা আমাকে প্রশ্ন করল, 'আপনার নাম কি?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমার নাম ফজলুল করিম।' 'সরদার' শব্দটা আমি বাদ দিলাম। তেমন কিছু ভেবে নয়, এমনিই স্পন্টেনাসলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি কি করেন?' আমি বললাম যে আমি কলেজে পড়ি। 'কী পড়েন?' 'কোথায় পড়েন?' আমি বললাম যে আমি চাখার কলেজে পড়ি। কী কী বলেছিলাম, আমার সব মনে আছে। আমি এইভাবেই জবাব দিয়েছিলাম। 'কী পড়েন?' আমি বললাম 'আমি বিএ পরীক্ষা দিয়েছিলাম গত বছর। আমি পাস করতে পারি নাই। এ বছর আবার দেবো।' বাড়ি কোথায়? বলেছি : 'বরিশালে'। 'কেন এসেছেন?' 'আমি এখানে বেড়াতে এসেছি'। পুলিশের লোকজন তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল, 'নো, নো, নট দিজ ওয়ান। সাম বিগ গাই। সাম বিগ সরদার ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল।' এ কথাটাও আমার মনে আছে। ওরা আমাকে পছন্দ করছে না। যখন ইস্ট বেঙ্গল পুলিশ আমাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের কাছে হ্যান্ড ওভার করেছে তখন তারা আমার নাম বলেছে, 'সরদার ফজলুল করিম, কমিউনিস্ট লিডার ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল'।

সন্দেহ হলেই কাউকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গ্রেপ্তার করে না। পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তির পেছনে স্পাই লাগায়। সেই স্পাই কখনো সামনে থাকে না, সব সময় পিছনে থাকে। পিছন থেকে ওয়াচ করে, দেখিয়ে দেয়—ঐ যাচ্ছে। একসাথে যায় না, দশগজ পেছনে থেকে ফলো করে এবং তারপর রিপোর্ট করে। ওদের তো চাকরিই ওটা। আমাকে যে কলকাতাও ফলো করা হচ্ছে এটা আমার মাথার মধ্যে ছিল না। আমি যখন চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকছি, ট্রাম দেখছি, ট্রামে উঠছি কিংবা ইত্তেহাদ অফিসে যাচ্ছি, আহসান হাবীব সাহেবের সাথে কথা বলছি, তখন তো আমার মাথার মধ্যে নাই যে আমার পেছনে একটা শ্যাডো আছে। আমি হাঁটছি, সেও হাঁটছে। আমি থামলে সেও থামছে। আমি যদি এই ব্যাপারটা খেয়াল করতাম তা হলে আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তা আসত যে আই এ্যাম বিয়িং ফলোড। আই শুড বি মোর কশাস। এই কথাটা কিন্তু ঐ রাত্রের হামলার আগ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে আসে নাই। তখন আমার বন্ধু মোহাম্মদ আবুল কাসেম কলকাতায় আছে। অন্যান্য বন্ধুরা আছে, তাদের বাসায় যাচ্ছি।

পরদিনই আমি আহসান হাবীব সাহেবের বাসা ছেড়ে চলে আসি। দ্যাট ওয়াজ এ রোমান্টিক এসকেপ। সেখান থেকে আমি কোথায় গেলাম মনে নেই। কিছু দিন পরে আমি ইস্ট বেঙ্গলে ফিরে এলাম। কতদিন পরে ফিরে এলাম, কোন রুট দিয়ে এলাম তা এত দিন পরে আর খেয়াল নেই। এটা ৪৮ এর শেষ বা ৪৯ এর প্রথম দিকে হবে। ঢাকায় এসে আমি যেখানে রিপোর্ট করা দরকার সেখানে রিপোর্ট করলাম। কিন্তু কলকাতাতেও যে পুলিশি হামলা হয়েছিল সেটা অবশ্য তাদের জানালাম না।

আমি আর কী করবো? পার্টির কথায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে নিয়ে পার্টি করবে কি? আমাকে দিয়ে কি তারা ধান ভানাবে? আন্ডারগ্রাউন্ড থাকাটাই হচ্ছে এখন কাজ। যতদিন পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে জীবন রক্ষা করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্টিকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি এখন কী করবো? পার্টির যারা অরগানাইজার অর্থাৎ সেক্রেটারিয়েটের সদস্য তারা আমাকে ছোট ছোট স্লিপ পাঠাত। এইসব স্লিপে লেখা থাকত আমাকে কী করতে হবে। এসব স্লিপ অবশ্য রোজ তারা পাঠাত না আমাকে। তখন কমিউনিস্ট পার্টির অফিস বলে কিছু নেই। শাহ আজিজেরা আক্রমণ করার আগে একটা অফিস ছিল, সেখানে আলোচনা সভা বসত।

২২. 'আন্ডারগ্রাউন্ড' : মাটির তলে

পার্টি এক দিন একজন কুরিয়ার মারফত স্লিপ পাঠাল আমার কাছে। মেসেঞ্জারকে পার্টির ভাষায় বলা হত 'কুরিয়ার'। স্লিপে বলা হলো, কুরিয়ার যাচ্ছে তোমার কাছে। তুমি এর সাথে চলে যাও। কোথায় যাবো সেটা জানতাম না। গিয়ে দেখলাম জায়গাটা নরসিংদীতে, মনোহরদির চালাকচরে। সুন্দর সাজানো জায়গা। আমার খুব ভালো লাগল।

কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াজ নট এ উইক পার্টি ইন ইস্ট বেঙ্গল। কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াজ এ্যন অরগানাইজড পার্টি। আবুল হাশেম সাহেবের মুসলিম লীগের সঙ্গে তাদের একটা লিয়াজোঁ ছিল আবুল হাশেম সাহেবের যে পার্সোনাল সেক্রেটারি, সে একজন কমিউনিস্ট ছিল। বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির বেইজ ছিল। আমি ঢাকার কথা বলতে পারি। অন্যান্য জায়গার কথা তেমন বলতে পারি না। নলিনী দাশ, মুকুল সেন এঁরা ছিলেন বরিশালের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা।

চালাকচরে কমিউনিস্টদের একটা সিমপ্যাথেটিক বেইজ ছিল প্রধানত প্রাইমারি স্কুল টিচারদের মধ্যে* এবং তার চাইতেও বেশি বারুইদের মধ্যে। বারুই হচ্ছে পানচাষী—অর্থাৎ যারা পানের বরজ করে। চালাকচরের কাছেই শরীফপুর নামে একটা এলাকা ছিল। সেখানেও বারুইদের একটা কমিউনিটি ছিল। এই চালাকচরে আবুল হাশেম সাহেব পাবলিক মিটিং করেছিলেন এবং নবাব বাড়ির গ্রুপ এই মিটিংটা এ্যাটাক করেছিল।

আমার প্রকৃত পরিচয়টা পার্টি চালাকচরের লোকজনকে জানায়নি। পার্টি হয়তো পাঠিয়েছে, 'মজিদ সাহেবকে পাঠালাম।' যখন কোনো হিন্দু বাড়িতে থাকতে হয়েছে, তখন আমি নতুন একটা নাম নিয়েছি, যেমন ধরুন, অশোক। মুসলিম হিসেবে আমাকে তো হিন্দুরা তাদের খাবার ঘরে নিয়ে যাবে না। হিন্দু বাড়িতে খাওয়ার কিছু কাস্টম আছে, যেমন খাবার সময় ডান হাত দিয়ে গ্লাস ধরতে হবে। কাসার থালা বাটিতে খেতে হবে। আমি এসবে বেশ রপ্ত হয়ে

* চালাকচরের প্রাথমিক শিক্ষক আখতারুজ্জামান খুবই গুরুত্বপূর্ণ কমরেড ছিলেন। তিনি আজ নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিলাম। মেয়েরা আমাকে ছোটভাই বলে ডাকত। কেউ হয়তো আমার কমরেডের ওয়াইফ, তাকে বউদি বলে ডাকতাম। কোয়ায়েট হোমলি ওয়েতে ছিলাম।

এই এরিয়ার বড় নেতা যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিল অন্নদা পাল। তিনি একজন বিখ্যাত আন্দামান ফেরত স্বাধীনতা সংগ্রামী। আন্দামান সেলুলার জেলে তিনি দীর্ঘদিন রাজবন্দী ছিলেন। অন্নদা পালকে পরবর্তীকালে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে হয় পারিবারিক কারণে। তিনি মারা গেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গলেই, এখানে না। এই আন্দামান সেলুলার জেল ইন্ডিয়ান সোসালিস্ট মুভমেন্টে বেশ বড় একটা অবদান রেখেছে।

আমার এক বন্ধু অনিল মুখার্জীও আন্দামানে রাজবন্দী ছিলেন। তিনি ছিলেন নারায়গণগঞ্জের শ্রমিক নেতা। অনিল মুখার্জী একজন ভালো লেখক ছিলেন। তিনি একজন এমিয়েবল এবং সান্ড থিওরেটিশিয়ান ছিলেন। তার 'সাম্যবাদের ভূমিকা' এবং 'শ্রমিক আন্দোলনের হাতেখড়ি' নামে দুটি বই আছে। তিনি কাজ করতেন নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের মধ্যে। কমিউনিস্ট পার্টি যখন ভালো ভালো মুসলিম ছাত্রদের সংগ্রহ করছে, তখনই তার সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি সে সময়েই আমাকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে গেছেন, মিটিঙে বক্তৃতা দিইয়েছেন আমাকে দিয়ে।

অনিলদার কাছ থেকে আমি আন্দামানের জেল সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছিলাম। কোনো কয়েদির যদি দশ বছরের বেশি কারাদণ্ড হয়ে যেত কোনো অপরাধে বা কোনো রাজনৈতিক কারণে তবে তাকে কলকাতা থেকে জাহাজে করে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হত। আন্দামানের নাম ছিল কালাপানি। লোকে ভাবত, ওখানে যাকে পাঠানো হয় সে আর ফেরত আসে না, আসতে পারে না। সেলুলার জেলে যে শুধু আন্দোলনের বড় বড় নেতাদেরকেই পাঠানো হয়েছে তা না, সাধারণ কয়েদিদেরও সেখানে পাঠানো হয়েছে। আন্দামান মানুষের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে উঠেছে প্রধানত আন্দামান জেলের কয়েদিদের দ্বারা। ওখানে যাওয়ার পর সাধারণ বন্দীরা বাইরে ঘোরাফেরা করত, কাজকর্ম করত, জেলের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করত, চাষ করত।

আন্দামানে সাধারণ কয়েদিদের কয়েক বছর পর ছেড়ে দেওয়া হত। জেল থেকে বের হয়ে তারা ওখানকার মেয়েদের বিয়ে-সাদি করত। কিন্তু পলিটিক্যাল প্রিজনার যারা তাদের বের হতে দিত না সেলুলার জেল থেকে। অনিলদা বলেছিলেন, আন্দামান সেলুলার জেলে তাঁরা কেমন করে কাজ করেছেন। কেমন করে আন্দামান সেলুলার জেলে অনশন ধর্মঘট করে তারা সেখানকার নিয়মকানুনে পরিবর্তন আনেন এবং কেমন করে আন্দামান সেলুলার জেল ওয়াজ চ্যাইঞ্জড ইন টু এ মার্কসিস্টি ইউনিভার্সিটি।

কংগ্রেস নেতা, কোয়াইট এ নাম্বার, ছিলেন সেলুলার জেলে। কংগ্রেসের মধ্যে যে সেকশানটা কমিউনিস্ট মাইন্ডেড হয়ে যায় এই আন্দামানেই তারা চেঞ্জ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় থ্রু রিডিং কমিউনিস্ট লিটারেচার। এই লিটারেচার তারা নানাভাবে সংগ্রহ করত। আন্দামান সেলুলার জেলের যিনি সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন তিনি ছিলেন একজন আইরিশ। ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তার একটা সফট কর্নার ছিল। যত সব কমিউনিস্ট লিটারেচার তা সে রাজবন্দীদের এনে দিত পড়ার জন্যে। কমিউনিস্টেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে করে এই লিটারেচারগুলো পড়ত। এসব পড়েই অগ্নিযুগের বেশ কিছু বিপ্লবী, সবাই না অবশ্য, বেশ কিছু কমিউনিস্টে পরিণত হয়। তারা তো এক-দুই বছর না, বহু বছর সেখানে কাটিয়েছেন।

আমি যে সরদার ফজলুল করিম তা চালাকচরের সবাই জানত না। মনে করুন, আমাকে একটা মুসলিম বাড়িতে রেখেছে। সেখানে ছাত্র আছে। কোনো ছাত্রের সাথে আমি হয়তো গল্প করছি। পড়াচ্ছি তাকে, কিছু একটা করে দিন কাটানো আরকি। বাড়ির যে মুরুব্বি সে অবশ্য জানে আমি কে এবং আমার সমস্ত তদবীর তদারক তিনিই করছেন। রাত্রে সাধারণত আমি কোনো নোন প্লেসে থাকতাম না। এই যেমন ধরুন, কোনো একটা গরুর ঘর, তার মধ্যে বিছানাপত্র বিছিয়ে আমি থাকতাম। গরিব এলাকা ছিল। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তেমন কোনো চাহিদা ছিল না আমার। হয়তো কোনোদিন একটি পুঁটিমাছ দিয়ে বা কোনোদিন পাটকাঠি দিয়ে শুঁটকি মাছ পুড়িয়ে তা দিয়ে কিছু ভাত খেলাম। সে এলাকায় সাধারণ মানুষ সব সময় ভাত খেতে পেত না। একটা সময়ে তাদের কম খেতে হত। ওটা আবার কাঁঠালের এরিয়া ছিল। কাঁঠালের সিজনে, সকাল বেলা কিছু কাঁঠাল দিত, সেই কাঁঠালের কোষ খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি রোমান্টিক লাইফ ফর মি।

৪৯ এর প্রথম দিক থেকে শুরু হয় আমার এ জীবন। কেমন করে দিন কাটত আমার? এক দিন এক কমরেড হয়তো বলল, 'চলেন মজিদ সাহেব আজ অমুক জায়গায় একটা আলোচনা আছে।' সেখানে গেলাম তার সাথে। সেই আলোচনা সভায় আমার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে এই সমাজ, তার মানুষ এবং তার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে কিছু বললাম। দৈনন্দিন আন্দোলন সম্পর্কে তেমন কিছু অবশ্য বলা হতো না। এর মধ্যে যারা একেবারে কমিউনিস্ট নেতা, তিনি জানেন আমি সরদার ফজলুল করিম। অন্যরা জানে, মজিদ মিয়া হিসেবে কিংবা বারুই কমিউনিটির মধ্যে অশোক হিসেবে।

সে সময়ের দুএকটি গল্প করা যায়। একদিন ক্লাস এইট না নাইনে পড়ে এমন একটি কমিউনিস্ট ক্যাডার ছেলে আমাকে বলছে, 'মজিদ সাহেব, আপনি ঢাকা শহরটহর চেনেন? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কিছু চিনি।' তখন ছেলেটা বলল, 'সেখানে আমাদের একজন বড় নেতা আছে, আপনি জানেন?' আমি বললাম, আমি তো জানি না। তখন ছেলেটি বলল, 'তার নাম হচ্ছে সরদার ফজলুল করিম।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ আমি নাম শুনেছি কিন্তু দেখি নাই।' ছেলেটি তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে, 'আমি তার কাছে যাব, তার সঙ্গে দেখা করবো।' আমি হয়তো তাকে তখন বলেছি, 'যাওয়ার আগে আমার একটা চিঠি নিয়ে যেও।' এখনো ঐ এলাকার লোক আমাকে নিতে চায় ওখানে। কিন্তু আমার তো খুব একটা মুভমেন্ট নাই ইদানীং। তাদের মনে সাংঘাতিক রোমান্টিক সব আইডিয়া ছিল এ্যাবাউট সরদার ফজলুল করিম। তারা এই ভেবে গর্ববোধ করে যে, 'সরদার ফলুল করিম আমাদের এখানে থাকতো।' ছেলেটি বলেছিল যে সরদার ফজলুল করিম ওদের নেতা। মুসলমানদের মধ্যে কোনো কমিউনিস্ট নেতা আছে এটা সে যুগে তাদের জন্যে একটা গর্বের ব্যাপার ছিল।

তখন প্রাইভেট লাইফেও, কৃষকদের মধ্যে, গ্রামে, ঘড়িটা ছিল আনইউজুয়াল। কোনো মানুষ ঘড়ি পরতে পারে এটা তাদের ধারণার বাইরে ছিল। আমার একটা রিস্টওয়াচ তখন ছিল, পুরোনো টাইপের, আমি কেয়ার নিতাম যে রাস্তাঘাটে যখন আমি হাঁটি তখন যেন হাতে ঘড়ি না পরি। গ্রামে আপনি তো একা হাঁটবেন না। আপনার পাশে আরো লোক যাবে। গ্রামের লোক, দে উইল পিক আপ ডায়ালগ উইথ ইউ, 'আরে ভাই আপনি কই যাবেন?' 'আমি অমুক জায়গায় যাব।' 'আপনি কী করেন?' 'আমি মেট্রিক পড়ি, স্কুলে পড়ি।' ডেইলি লাইফটা ছিল ওখানে এ রকম। গোপন লাইফটা ছিল সাধারণত একই জায়গাতে না থাকা। না থাকা মানে আমি যে থাকতাম না তা নয়, ওরাই আমাকে রাখত না। যারা রেখেছে তারা তো বোঝে, বিপদ কতটা! এর আগে অলরেডি কমিউনিস্টদের উপর হামরা আরম্ভ হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গাতে এ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছে তারা। সুতরাং এরা আমাকে বিভিন্ন পিকুইলিয়ার জায়গায় রাখত। পুলিশ যদি রাত্রে হামলা করে, তাদের ঘরের উপর হামলা করলেও গোশালায় তো আর হামলা করবে না! সো গরুর ঘর ইজ সেইফার। আমার তো কোনো অসুবিধা ছিল না।

কয়েক মাস আমি চালাকচরে ছিলাম। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে আমার কাছে একটা গোপন মেসেজ যায়। মেসেজটা হচ্ছে এই যে, ঢাকাতে অত তারিখে তুমি আসো। এখানে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিটির একটা মিটিং হবে। তখন ছিল ডিসেম্বর মাস। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হল। নারায়ণগঞ্জ থেকে রায়পুরা যেতে যে লোহার ব্রিজটা আছে ঘোড়াশালের মনোহরদী এলাকায় সেটা পার হতে হয়েছিল এটা মনে আছে। মনোহরদী, হাতিরদিয়া—এসব জায়গা আমার পরিচিত। এই হাতিরদিয়া কিন্তু আমাদের আসাদের বাড়ি। আমি আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থাতেও ঢাকা থেকে ওখানে যাতায়াত করেছি। এস্কর্ট (মানে বাহক) হয়তো একজন ছিল। কিন্তু আমি মোটামুটি রাস্তাটা চিনে গিয়েছি : টঙ্গী থেকে ট্রেনে করে ঘোড়াশাল গিয়ে ওখানে স্টেশনে নেমে তারপর পায়ে হেঁটে গেছি অনেকবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাম থেকে নিয়ে এসে অর্গানাইজেশন আমাকে একটা বাসায় উঠাল। এই বাসাটা হচ্ছে সন্তোষ গুপ্তের বাসা। সন্তোষ গুপ্ত নিজেও তখন কমিউনিস্ট। ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মিটিং চলছিল সেই বাসাতে। কারণ ইতোমধ্যে অনেক লোক গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। অনেক লিডার গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। এখন ডিস্ট্রিক্ট কমিটির অবস্থাই বড় কাহিল। এখন এমন একজন কাউকে দরকার যে কিছুটা গাইড করতে পারবে। কাকে দেওয়া হবে এই দায়িত্ব এই প্রশ্ন যখন করা হলো তখন সরদার ফজলুল করিমের নাম এল। সরদার ফজলুল করিমকে রাখার ব্যবস্থা করা হোক। হি উইল বি দি সেক্রেটারি অব দি ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি।

১৯৪৯ এর ২৫শে ডিসেম্বর সন্তোষ গুপ্তের বাড়িতে এই সমস্ত আলোচনা করে যখন আমরা দুপুরে খাওয়ার পরে বিশ্রাম নিচ্ছি তখনি দরজায় ঘা পড়ল। আমাদের সংগঠন এই গোপন আশ্রয়কে যতখানি গোপন ভেবেছিল আশ্রয়টা ততখানি গোপন ছিল না। এই বাসার আশপাশেই কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তখন সময়টা ছিল এমন যে যদিও কমিউনিস্ট পার্টিকে ফর্মালি বেআইনি করা হয়নি তবুও এ্যাডমিনিস্ট্রেশান কমিউনিস্টদের টার্গেট করছে। একের পর এক কমিউনিস্ট কর্মীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে। সুকুমার চক্রবর্তী নামে একজন অঙ্কবিদ, মানে খুব ভালো শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণে। ফণি গুহ নামে একজন বড় নেতা ছিলেন আমাদের, তিনিও এ্যারেস্টেড হয়ে গিয়েছিলেন। এ্যারেস্টেড না হয়ে তো উপায় ছিল না।

AMARBOI.COM

সন্তোষের এই বাড়িটা ওয়াজ আন্ডার ওয়াচ। এই কথাটা সন্তোষ গুপ্ত নিজেও জানত না, যদিও সন্তোষ ছিল আই জি অব প্রিজনসের কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক। ওর একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হামলা করা হলো। আমাদের মধ্যে দুজন মহিলা ছিলেন। একজন হচ্ছেন সন্তোষের বিধবা মা। আর একজন হচ্ছেন অজিত চ্যাটার্জী নামে একজন কৃষক নেতার ওয়াইফ। এরা সন্তোষের বাড়িটাকে বাসাবাড়ি বানিয়ে একটা ক্যামুফ্লেজের মতো ব্যবহার করত। আমরা গোপনে রাত্রে আসতাম সে বাসায়। কিন্তু এর মধ্যে অনেক কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিলেন। কোন্ রাস্তায় কোন পুলিশ কীভাবে পাহারা দেয় তা জানা যেত না তো কিছু। এই ক্যামুফ্লেজের ব্যাপারে যে পুলিশ জেনে গেছে তা আমরা জানতাম না।

২৩. গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম

দুপুরের পরে যখন হামলা হলো, দরজা ভাঙল, তখন পুলিশ বলছে, ‘এই বাড়িটা, এই বাড়িটা।’ আমরা তখন এসকেপ করার চেষ্টা করছি, দেয়াল ক্রস করে এখন যেখানে কোতোয়ালী থানা ঐ এলাকায় যাবার চেষ্টা করছি আর আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন পুলিশকে দেখিয়ে দিচ্ছে : ঐ যায়, ঐ যায়, ঐ যায়! কেননা

পাবলিকের ধারণা হচ্ছে আমরা ডাকাতের দল। আমরা দুই একটা বাড়ি ক্রস করেছি, হয়তো বাথরুম বা কোথাও আশ্রয় নিয়েছি, কিন্তু উই ওয়েয়ার কট। আমাকে তখন পুলিশ লাঠি দিয়ে বাড়িটাড়ি মেরেছে, সন্তোষকেও মেরেছে। এলাকার লোকজন আমাদের গায়ে হাত তুলেনি, তুলেছে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এবং পুলিশ। পুরো ব্যাপারটার আসল অরগানাইজার হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এবং পুলিশকে তারা নিয়ে যায়, এভাবেই ব্যাপারটা ঘটে।

সেদিন ঐ বাসায় যেসব কমিউনিস্ট ছিলেন তারা সবাই গ্রেপ্তার হন। মহিলা দুজনও গ্রেপ্তার হলেন। আরো কিছু লোক ছিলেন যাদের নাম বলাটা ঠিক হবে না। জ্ঞান চক্রবর্তী ছিলেন আমাদের সাথে। মনু মিয়া বলে একজন দিনমজুর কমরেডও ছিলেন। ১৯৪৯ সালের দিকে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ছিল এ রকম যে, পিপলের মধ্য থেকে ক্যাডার বার করতে হবে। শ্রমিকদের মধ্য থেকে ক্যাডার বার করতে হবে। দে উইল বি অরগানাইজার্স, নট দি মিডল ক্লাস। মিডল ক্লাসের দুর্বলতা আছে। ওয়ার্কার্স, কৃষক, দিনমজুর এদেরকে ট্রেইনড করতে হবে। এই মনু মিয়া ওয়াজ লাইক দ্যাট। এই রকমই আর এক জন লোক ছিলেন সিরাজুল হক সাহেব। তিনি তাঁর এলাকার বড় নেতা হয়েছিলেন, ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন।

এই হচ্ছে আমার প্রথম এ্যারেস্ট হওয়ার কাহিনী। এ্যারেস্ট করে প্রথমে আমাদের কোতোয়ালী থানায় নিয়ে গেল। থানায় প্রথমে কিছুটা ইন্টারভিউয়ের মতো হলো। পিটানোও কিছু হল। সন্তোষকে পিটাল। আমাকেও থাপ্পড়টাপ্পড় মারল। পরে রাত্রিতে সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিল। মহিলাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো মহিলা ওয়ার্ডে। আসামি জেলে পাঠানোতে সময় লাগে, ওয়ারেন্ট ইত্যাদি তৈরি করতে হয়। আমাদের জেলে পাঠাতে পাঠাতে রাত এগারোটা-বারোটা বেজে গিয়েছিল। সেখানে আগে থেকেই সরদার ফজলুল করিম একটি বড় নাম। যত আই বি শুনল, সরদার ফজলুল করিম ধরা পড়েছে, তারা সবাই দৌড়ে দেখতে এল। এসে তো দেখল ছোটখাটো একটা মানুষ আমি। সেদিন থেকেই শুরু হলো আমার ডিটেনশান জীবন।

জেলে আসামি নেওয়ার পর প্রথমে তাকে সুপারিনটেনডেন্টের কাছে হাজির করা হত। তখন আই জি অব প্রিজনস্ ছিলেন আমির হোসেন। তিনিও ইন্সপেকশনে এসেছেন। এই আই জি অব প্রিজনস্ এর পার্সোনাল কনফিডেন্সিয়েল ক্লার্ক হচ্ছেন সন্তোষ গুপ্ত। সন্তোষকে আমাদের মধ্যে দেখে আমির হোসেন সাহেবের চোখ ছানাবড়া। তিনি খুব অবাক হয়ে বললেন, 'সন্তোষ, তুমিও এর মধ্যে আছ?' এ অনেকটা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার মতো আরকি!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪. জেলজীবন

পাকিস্তান আমলে আমরা যারা বাম রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের গ্রেপ্তার করেছিল। বিভিন্ন জেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনেক বার জেলখানার গেটে আমাদেরকে রিলিজ করার ভান করা হয়েছে, কিন্তু রিলিজ করার পরপরই আবার নিরাপত্তা আইনে জেলে ঢুকানো হয়েছে। এবার দেখানো হচ্ছে যে আমাকে জেলখানা থেকে রিলিজ দেওয়া হয়েছে আবার তারপরই দেখানো হচ্ছে যে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নতুনভাবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে আবার অনির্দিষ্টকালের জন্যে জেলে রাখা যাবে।

আমরা যারা কমিউনিস্ট কর্মী, আমাদের যখন পুলিশ ধরত তখন তারা আমাদের ঠাট্টা করে বলত, 'যান, যান, আপনারা জেলখানায় গিয়ে পার্টি করেন। বাইরে কেন এত কষ্ট করেন?' কিংবা নাজির জমাদার, যাকে আমরা সিকিউরিটি জমাদার বলতাম অর্থাৎ সিকিউরিটি প্রিজনারদের দায়িত্বে যারা থাকত তাদের বিভিন্ন র‍্যাঙ্ক ছিল। জমাদার একটা খুব বড় র‍্যাঙ্ক। আমি জানি না নাজির জমাদার এখনো বেঁচে আছেন কি না। আমাদের যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল এবং যখন আমাদের সিকিউরিটি জেলে ঢুকানো হলো তখন সে তার বিহারিভঙ্গি মেশানো বাংলায় আমাদের বলল, 'যাইয়ে যাইয়ে, অন্দরমে যাইয়ে। এখান থেকে আর বেরুতে হবে না।' কথাটা সত্যি। ১৯৪৮ সাল থেকে সব কমিউনিস্ট কর্মীদের মুসলিম লীগ সরকার গ্রেপ্তার করতে শুরু করেছে। মুসলিম লীগ প্রশাসন জানত এই কমিউনিস্টরাই হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধান শত্রু। কারণ তখন পর্যন্ত পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্তিটা মুসলিম কর্মীদের মধ্যে শুরু হয়নি। সেটা আওয়ামী লীগের কথাই বলি বা মুসলিম লীগের কথাই বলি।

AMARBOI.COM

২৫. কখন গেলেন, কখন এলেন? : এটাই কি সব?

লোকজন আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করে, আপনি কখন জেলে গেলেন? আমি উত্তর দিই আমি প্রথম ১৯৪৯ সালে জেলে গেলাম। এর পর তারা জিজ্ঞেস করে আপনি কবে জেল থেকে বের হলেন? আমি বলি ১৯৫৫ সালে। মাঝখানে আমি আমার জেল জীবনের দীর্ঘ ৬/৭টি বছর কেমন করে কাটালাম—এটা তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে না। বাইরে যারা থাকে তাদের মনে এই প্রশ্নটা আসে না। তারা মনে করে জেল ইজ জেল। সেখানে লোকে যায় আর বেরিয়ে আসে। কিন্তু একটা লোক যদি রাজনৈতিকভাবে জেলে যায় এবং যদি রজনৈতিকভাবেই বের হয়ে আসতে পারে তবে সেটা সোজা কথা নয়। এটা একটা বড় কথা। তুমি কেমন করে তোমার রাজনৈতিক নীতি-আদর্শ বা মরাল রক্ষা করে জেল থেকে জীবন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের হয়ে আসতে পারলে! এই ইতিহাস বাংলাদেশে এখনো অজানা। জেলের ভেতরকার ইতিহাস যারা জানতে চায় তাদের এটা জানা উচিত।

গোয়েন্দা বিভাগ সিদ্ধান্ত নিত কোন্ সিকিউরিটি প্রিজনারকে কোন জেলে রাখা হবে। জেলখানার ভেতরেও ম্যাপ দেখে তারা বলতে পারত কে কোনখানে আছে বা কার কোন্খানে থাকা উচিত, তার সমস্ত চার্ট ওরা করত। তাদের নির্দেশেই জেল প্রশাসন পলিটিক্যাল প্রিজনারদের ডিল করত। ওদের নিয়ম ছিল এক জেলে কোনো প্রিজনারকে এক সঙ্গে বেশি দিন রাখা যাবে না এবং প্রিজনারকে তার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে যত দূরে রাখা যায় তত ভালো। জেলখানার মধ্যেও পলিটিক্যাল প্রিজনারদের সাধারণ কয়েদি থেকে আলাদাভাবে রাখতে হবে।

জেলখানায় কিছু সেল থাকে। সেল হচ্ছে দশ হাত বাই পাঁচ হাতের খুপরির মতো এক একটা ঘর যাতে একটি দরজা থাকে। এই সেলের মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে একজন বন্দীকে সারা দিনরাত তালা দিয়ে রাখতে পারত। দিনের বেলায় যদি কখনো রাজবন্দীকে বার করত তবুও ঐ সেলের সামনে যে উঁচু দেয়াল আছে তার সামনেই তারা কিছুক্ষণ পদচারণা করতে পারত। রাতে সেলের মধ্যে একটা টুকরি রাখা থাকত। সেই টুকরির মধ্যেই রাজবন্দীকে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে হত। সকাল বেলা হয়তো সেল খুলে দিত। বন্দীকে কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়ে আবার সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হত।

AMARBOI.COM

জেলে বইপত্র যা ছিল তা তারা পড়তে পারত। আত্মীয়স্বজনেরা যদি কোনো বইপত্র বন্দীর নামে জমা দিত তবে জেল কর্তৃপক্ষ এইসব বইপত্র আই বি অফিসে পাঠিয়ে দিত। আই বি অফিস এইসব বইপত্র চেক করে যে বইয়ের উপর ওরা 'সেন্সরড এন্ড পাসড' মেরে দিত সে বইগুলো আবার জেলখানায় আসত। তখন প্রিয়জনারেরা সেগুলো পড়তে পারত। জেলে অনেকেই লেখাপড়া বা গবেষণামূলক কাজ করতে পেরেছেন। সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, অনিল মুখার্জী এঁরা সবাই জেলে বসে ভালো কাজ করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত যেসব রাজবন্দী তারা জেলখানায় গিয়ে চিন্তা করতেন, জেলখানার সময়টা তাঁরা কীভাবে ব্যবহার করবেন লেখাপড়ার কাজে। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান রাজবন্দী আমাদের লেখাপড়ার কোনো ট্র্যাডিশন তেমন ছিল না। আমরা মুসলমানেরা জেলখানায় গিয়েই ভেঙে পড়তাম। আমাদের মেধ্যে ভেঙে পড়ার যে প্রবণতা এটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ছিল।

জেলখানায় 'সেল' কথাটির একটি প্রতিশব্দ আছে। প্রতিশব্দটি হচ্ছে 'ডিগ্রি'। 'ইসকো ডিগ্রিমে লে যাও। আট ডিগ্রিমে।'—অফিস থেকে এ রকম অর্ডার হলো। আট ডিগ্রি বা আট নাম্বার সেলটি হচ্ছে ফাঁসির সেল। ফাঁসি দেবার আগে আসামিকে এইসব সেলে রাখা হয়। আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে এমন। যদিও আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমন কোনো নেতা নই। তবুও গোয়েন্দা বিভাগ থেকে হুকুম পাঠিয়েছে—সরদার ফজলুল করিমকে অন্য প্রিজনার থেকে আলাদা করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কতদিন সেলে রাখবে তার ঠিক নেই কিছু। আমাকে ওখানে খাওয়াদাওয়া দেওয়া হত। সেলে কারো সাথে কোনো আলাপ করতে পারি না। বই-পত্র দেওয়া হয় না। হাঁটাচলারও উপায় নেই।

পূর্ব পাকিস্তানের জেলখানায় কৃষক আসছে, শ্রমিক আসছে, ক্ষেতমজুর আসছে, শিক্ষক আসছে, তরুণ ছাত্র আসছে, কত বিচিত্র ধরনের লোকজন! এটা সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। পূর্ববঙ্গে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত জেলখানায় যারা ছিল তাদের উপর বিস্তারিত গবেষণা হওয়া দরকার। জেলখানার ফাইল দেখে তাদের জেল জীবনের ইতিহাস তৈরি করা একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজ। কোনো সিরিয়াস গবেষক সরকারের কাছে আবেদন করে পুরোনো ফাইলপত্র উদ্ধার করে তার মধ্য থেকে সেই সময়ের রাজবন্দীদের একটা পোর্ট্রেট দাঁড় করাতে পারে। কথাটা এ কারণে বলছি যে আমাদের এখানে কিছুই আর থাকছে না। সব মুছে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে আমি মুছে যাব। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের যেসব বন্ধুরা আজ আমাকে দিয়ে কথা বলাচ্ছেন—এটা তাদের একটা আন্তরিক চেষ্টা। ওঁরা বলছেন, 'না, আমরা কিছুটা ধরে রাখার চেষ্টা করবো, সব মুছে যেতে দেবো না।'

AMARBOI.COM

২৬. অনশন ধর্মঘট

আমি যখন ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে ঢাকা জেলে ঢুকলাম তখন আমি জানতে পারলাম যে জেলখানায় একটা অনশন ধর্মঘট চলছে। এই অনশন ধর্মঘটের একটি ইতিহাস আছে। ব্রিটিশ আমলে রাজবন্দীদেরকে সম্মানের সাথে রাখা হত। কখনো কখনো তাদের জেলখানা থেকে বের করে থানা ডিটেনশানে রাখা হত কোনো ওসির দায়িত্বে। তারা ঐ এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারত না। সেখানে তাদের জন্য কিছু খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা হত। তারপর বছর দুই-তিনেক পরে তাদের পুরোপুরি রিলিজ দিয়ে দেওয়া হত। তাদের হাত খরচা ছিল ও পোশাকআশাক ছিল। হাতখরচা কত ছিল তা আমি জানি না। বিভিন্ন গ্রেড ছিল নিশ্চয়ই রাজবন্দীর। হাতখরচার টাকাটা তাদের পরিবার পেতে পারত।

পাকিস্তান হওয়ার পর যখন মুসলিম লীগ সরকার যে আইনের বলে পলিটিক্যাল কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল সেটার নাম দিল তারা 'আন্ডার সিকিউরিটি এ্যাক্ট' বা 'নিরাপত্তা আইন'। এই আইনে বন্দীদের যতদিন খুশি জেলে রাখা যেতে পারে, কোনো বিচার-আচার ছাড়াই। এইসব বন্দীদের কোনো প্রকার ভাতা দেওয়া হত না। ব্রিটিশ আমলে যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত রাজবন্দীদের, সমস্ত সুযোগসুবিধা বাতিল করা হলো। তাদের মোটামুটিভাবে জেলখানার মেঝেতে মানে ফ্লোরে নামিয়ে দেওয়া হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের মানবেতর পরিবেশের প্রতিবাদে সিকিউরিটি প্রিজনাররা অনশন করছেন। অনশন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রথম ছয়দিন কর্তৃপক্ষ অনশনকারীদের সামনে খাবার রাখত, অনশনকারীরা তা স্পর্শ করত না, কর্তৃপক্ষ খাবার তুলে নিত। এই প্রক্রিয়াটা ছয় দিন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ চলতে দিত। ছয় দিনের পর থেকে জেলের ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, তাদের সহকারীরা মানে সাধারণ কয়েদিরা দল বেঁধে এসে অনশনকারী বাধা দিত কিন্তু এমন কিছু স্যুইসাইডার বাধা নয়; কারণ তারা তো জেলে মরতে আসেনি। তারা বেঁচে থাকতে এসেছিল যাতে তাদের আদর্শের বাস্তবায়ন তারা করতে পারে ভবিষ্যতে—এই ছিল তাদের মনের ইচ্ছা ও চেষ্টা।

অনশনের সেদিন ছিল ২০তম দিন। ২০তম দিনে কুষ্টিয়ার এক শ্রমিক নেতা শিবেন রায় মারা যান। সেদিন কর্তৃপক্ষ এক দল জঙ্গি কয়েদি নিয়ে এসেছিল তাকে ফোর্সড্ ফিডিং করাতে। তাদের সাথে ছিল একটা রাবারের নল। এই নলটা নাকের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। নলের এক দিকে ঢোকানো হত পানি মিশ্রিত দুধ। জেলের ডাক্তার-কম্পাউন্ডারেরা মনে কত, এই তরলটা পেটে গেলে প্রিজনার অনশনজনিত কারণ মারা যাবে না। এটা অনেকটা জোর করে অনশন ভঙ্গ করানো। স্বাভাবিক কারণেই প্রিজনাররা এটা করতে দিতে চাইত না।

মানুষের শরীরে শ্বাসনালী আর খাদ্যনালী পাশাপাশি। আমাদের নাক থেকে দুটো পথের একটি খাদ্যনালী হয়ে গেছে পাকস্থলীতে আর অন্যটি শ্বাসনালী হয়ে গেছে ফুসফুসে। কয়েদিরা যখন জোর করে কমরেড শিবেন রায়ের নাক দিয়ে নলটা ঢুকিয়েছে সে নলটা খাদ্যনালীতে না গিয়ে শ্বাসনালীতে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল। শিবেন রায় তার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে চিৎকার করেছে, কিন্তু কয়েদিরা তার কথা শুনেনি। তারা ঐভাবেই দুধ ঢেলে শিবেন রায়কে সেলে তালা মেরে চলে গেছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। রাতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অনশনের ২০তম দিবসে শিবেন রায় মারা যান। এটা খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার। সাধারণত পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে জেলের ভিতরে চিৎকার করত, শ্লোগান দিত : রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, ইত্যাদি। সেদিনও তারা শ্লোগান দিয়েছে। কিন্তু তাতে কারো কিছু এসে যায়নি। জেলখানার চার দেয়াল পার হয়ে বন্দীদের এসব প্রতিবাদ বা চিৎকার কখনোই বাইরে পৌঁছাত না। বাইরের কর্মীরা অবশ্য চেষ্টা করছিল পোস্টার লাগিয়ে জনগণকে এই অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে অবহিত করতে। সুতরাং বাইরের লোকেরা এ সম্পর্কে কিছুটা জানত, তবে সাধারণ মানুষ তেমন একটা জানত না।

শিবেন রায় যেদিন মারা যান সেদিনই রাতে আমাকে ঢাকা জেলে ঢোকানো হয়। জেলে ঢোকার পর আমরা ঠিক করলাম যে আমরাও এই অনশনে যোগ দেব। পরদিন সকালে যখন সিপাহীরা আমাদের সামনে খাবার রেখে গেল, খিচুড়ি বা ভাত, আমরা তাদের খাবারটা রাখতে দিলাম কিন্তু খাবারটা আমরা স্পর্শ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলাম না। দ্বিতীয় দিনও খাবার প্রত্যাখ্যান করলাম। আমার সেলে কলসিভরা পানি থাকত। পাশে থাকত লবণ। গ্লাসে কিংবা বাটিতে লবণ মিশিয়ে জল খেতে লাগলাম। তখন সিপাহী এবং হাবিলদারেরা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট দিল যে নতুন যারা এসেছে তারাও অনশন ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে।

বাই দিস টাইম দি হোল জেল ওয়াজ ফুল অব কমিউনিস্ট। জেল প্রশাসনের নীতি ছিল এ রকম যে, সাধারণ কয়েদিকে পলিটিক্যাল প্রিজনার্সদের সাথে মিশতে দেওয়া যাবে না। মিশতে দিলে তারা সাধারণ কয়েদিদেরকে পলিটিকালাইজ করবে। সাধারণ কয়েদিদের বলা হলো এদের সাথে তোমরা মিশবে না। এরা হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু! সাধারণ কয়েদিরা সবাই পাকিস্তানের বন্ধু হয়ে গেল এবং তাদের দিয়ে মাঝে মাঝেই রাজবন্দীদের পেটানোর ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হলো। পুরোপুরি একটা অমানবিক ব্যাপার।

রাজবন্দীরা তো একে অপরের সঙ্গে মিশতে পারছে না। কিন্তু সিপাহীদের মধ্যে ভালো কিছু লোক ছিল। তাদেরকে দিয়ে এক রাজবন্দী অন্য রাজবন্দীর কাছে খবর পাঠাত বা একটা চিঠি সিপাহীর হাতে দিয়ে হয়তো কেউ বলত, 'এই চিঠিটা আপনি তাঁতীবাজারে অমুক ঠিকানায় একটু পৌঁছে দেবেন।' যোগাযোগের আর একটা উপায় বের করল মুসলমান প্রিজনারেরা। তারা দাবি করল শুক্রবারে তাদের জুম্মার নামাজ পড়তে দিতে হবে। তারা যে বাইরে খুব একটা নামাজ রোজা ইত্যাদি পালন করত তা কিন্তু নয়। যেহেতু ধর্মীয়ভাবে দাবিটা করা হচ্ছে, সেহেতু জেল কর্তৃপক্ষের পক্ষে এ দাবি পুরোপুরি নাকচ করে দেওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং সিপাহীদের তত্ত্বাবধানে তাদের শুক্রবারে একটা জায়গায় নিয়ে হাজির করা হত। রাজবন্দীরা যখন মোনাজাত করত তখন দুই হাত তুলে মোনাজাত করার সময় প্রথম কথাটা তারা জিজ্ঞেস করত, 'তোমরা কেমন আছো? অবস্থা কী? আমাদের তো জেলখানায় বেঁচে থাকতে হবে। জেলখানায় কীইবা আমরা করতে পারি। একমাত্র পথ যে খাবার দিচ্ছে জেলখানায় তা প্রত্যাখ্যান করা।' খাবারও এমন কিছু ভালো ছিল না। যাচ্ছেতাই একেবারে।

জেলখানায় যদি কোনো প্রিজনার খাবার প্রত্যাখ্যান করে তবে তা হয় একটা এ্যাডিশনাল ক্রাইম। জেলখানায় ফাইল করা বলে একটা কথা আছে। সবাইকে লাইন ধরে বসতে হবে এবং আই জি পি অর্থাৎ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস্ যখন সামনে দিয়ে যাবে তাকে হাত তুলে সালাম করতে হবে। এসব ব্যাপারে রাজবন্দীরা বিভিন্ন সময়ে আপত্তি জানিয়েছে। প্রতিটি প্রিজনারের টিকেট ছিল একটা। সেই টিকেটে তার নাম ধাম, টিকানা এবং অপরাধের বিবরণ লেখা থাকত। জেলের ভিতরে একটা জেল কোর্ট বসে। সেই কোর্টে জমাদার বা হাবিলদারেরা তাদের আসামিদের হাজির করত এবং প্রিজনারেরা জেলের অভ্যন্তরে তার অপরাধের জন্যে শাস্তি পেত। শাস্তি হতে পারে এ রকম : আসামিকে এক সপ্তাহ সেলে রাখা হোক। প্রিজনার যদি একটা বড় ওয়ার্ডে আর পাঁচজন বন্ধুদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে থেকে থাকে, তবে সেখানে থেকে তাকে আলাদা করে একটা সেলের নিয়ে যাওয়া হোক। সাতদিন সেখানে সে একা থাকবে। সাতদিন পর তাকে আবার ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হোক। অথবা তাকে পেনাল ডায়েট দেওয়া হোক, তাকে সাতদিন ধরে শুধু ফেনভাত দেওয়া হোক। এই রকম বিভিন্ন ধরনের শাস্তি জেলে দেওয়া হত।

অনশনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই শরীর দুর্বল হতে থাকে। আমি খেয়াল করে দেখেছি, এ রকম অবস্থায় শরীর কী করে। শরীর তখন স্বপ্ন দেখে। কীসের স্বপ্ন? খাবারদাবারের স্বপ্ন। শরীর তার চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে নিজের মতো করে। আমি হয়তো স্বপ্ন দেখলাম, আমি নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে মরণচাঁদের মিষ্টির দোকানে ঢুকে গেছি এবং মিষ্টি খাচ্ছি। এই যে ইচ্ছাপূরণ এই ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার কিন্তু সবারই থাকত। যারা ধূমপানে আসক্ত ছিলেন তাদের খুব অসুবিধা হত। অনশন ধর্মঘট না থাকলে কনসোলিডেশন বিড়ির ব্যবস্থা করত। কিন্তু অনশন ধর্মঘট তো একটা পীড়নমূলক ব্যাপার। সুতরাং তখন বিড়ির ব্যবস্থা করতে পারত না এবং ধূমপায়ী ব্যক্তিদের খুবই কষ্ট হত। আমাদের মনে তখন একটা প্রশ্ন জাগত—'আর কতদিন?' প্রত্যেকটি ব্যক্তির মনেই কারাবাসের নির্দিষ্ট একটা সময়ে গিয়ে ওই প্রশ্নটি জাগত। রাজবন্দীদের মধ্যে যারা একটু অগ্রসর তাদের কাউকে যখন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হত তখন তিনি পাশের বেডে শুয়ে থাকা প্রিজনারদের উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, 'আমাদের আন্দামানের কাহিনী আছে যেখানে তারা ৬০ দিন অনশন ধর্মঘট করেছে। তাঁদের অনেককে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কী করা? আমাদের তো একটা আদর্শ নিয়ে থাকতে হবে।' এভাবে তাঁরা অন্যদের রাজনৈতিকভাবে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করতেন যাতে তারা মানসিকভাবে ভেঙে না পড়েন।

AMARBOI.COM

যদিও আমি ২০তম দিবসে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছি তবুও আমার শরীর তো দুই-এক দিন পরেই অনশন ভাঙতে চায়। আমার মন তা চায় না কিন্তু শরীর তা চায়। আমি তখন নিজের মনকে বলতাম, 'আমার তো ভাঙার দিন এখনো আসেনি। আমার সাথীরা ইতোমধ্যে ২০ দিন অনশন করেছে। আমি যখন ২০ দিন পার করতে পারব এবং তারা ২১ দিন অনশন করবে তখন আমি নিজেকে বলতে পারব যে আমি এখন আর থাকতে পারছি না। এই যে একটা মনোবল যে আমার সাথীরা অতদিন পার করেছে, আমিও ততদিন পার হয়ে নিই তারপর দেখা যাবে। এভাবে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে আমাকে চলতে হয়েছে।

আমাদের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আল-মুতী শরফুদ্দীন এই অনশনের সাথে যুক্ত ছিলেন। আল-মুতী যখন তাঁর স্মৃতিচারণ করেন তখন তিনি এই অনশনের উল্লেখ করেন না। আমরা কিন্তু করি। আল-মুতী বড় লেখক ছিলেন। সহজ ভাষায় লিখতেন। আমার খুব বন্ধু মানুষ। তাকে বলা যেতে পারে পূর্ববঙ্গের রামেন্দ্রসুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিবেদী। তিনি অনশন চালিয়ে গেছেন। অনেক ভুগেছেন তিনি। অনশন ধর্মঘটের পরে তাঁর বাবা তাঁকে রিলিজ করে নিয়ে যান। রিলিজ করে নিয়ে যাওয়াতেই তিনি ফিজিক্সে তাঁর এম এসসি-টা শেষ করতে পারেন।

জেলখানায় মানবেতর পরিবেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা অনশন ধর্মঘটকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন যথাসাধ্য। সব সময়, সব জায়গায় তারা তা করতে পারেনি। অত্যাচার হয়েছে তাদের উপর। যেমন সিলেট জেলে আমি শুনেছি, সেখানে বয়স্ক সব প্রিজনারদের লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে পিঠে দাগ করে দিয়েছে। আর একটা মেথড ছিল। প্রিজনারেরা বলেছে, আমরা আর কিছু খাব না, শুধু জল খাব। জলের সাথে লবণ মিশিয়ে তারা খেত। এতে করে শরীরে অনশনের প্রতিক্রিয়াটা যে পরিমাণ হওয়ার কথা সে পরিমাণ হত না, একটু কম হত। এটা রাজবন্দীরা শিখেছিল আন্দামান ফেরত বন্দীদের কাছ থেকে। কিন্তু সিলেট জেলে কর্তৃপক্ষ জলের কলসও সরিয়ে নিয়েছিল। জলও খেতে দেয়নি। সাথী প্রিজনারেরা আমাকে বলেছে, 'ছয়দিন পর আমার সারা শরীর গরম হয়ে গেছে, আমি আমার কাপড়-জামা খুলে ফেলেছি, যন্ত্রণায় আমি মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়েছি। আমার জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। জিহ্বা থেকে আমার রক্ত বের হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।' এ অবস্থায় প্রিজনারদের সারেন্ডার করতে হয়। বা জেলপ্রশাসনও এগিয়ে আসে অনশন ভাঙাতে। এভাবেই অনশন ধর্মঘটগুলো শেষ হয়। তবে ঢাকা জেলের অনশন ধর্মঘটটা অনশনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, এ ধর্মঘটটা দীর্ঘ ৫৮ দিন চলেছিল। অনশন হচ্ছে জেলখানায় প্রিজনারদের প্রতিবাদ করার এক মাত্র উপায়। উপায়টি স্যুইসাইডাল ছিল অবশ্যই, কিন্তু এ ছাড়া তাদের হাতে আর কোনো উপায় ছিল না।

২৭. কনসোলিডেশন

জেলখানায় আমাদের জীবনটা সহজ ছিল না। বেশ কঠিন এই জীবন। জেল প্রশাসন অবশেষে একদিন জানতে চাইল, আমাদের নেতা কে? আপনাদেরও জানতে ইচ্ছে হতে পারে, প্রিজনারেরা তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করত কীভাবে? পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করেছিল। ধরা যাক, একটা ঘরের মধ্যে ত্রিশজন সিকিউরিটি প্রিজনার আছে। ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটা কমিটি তৈরি করত। এর নাম ছিল 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন'। কনসোলিডেশনের একজন মুখপাত্র নির্বাচন করা হত। কনসোলিডেশনের কাজ ছিল অর্গানাইজ করা।

আমাদের দাবিগুলো কী কী? আমরা বলতাম, আমরা এই চাই। আমাদের বিছানা দিতে হবে। আমাদের অন্তত জামাকাপড় দিতে হবে। আমাদের খাবারের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আমাদের কমিটি দাবি করত, আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আমরাই করব। আমাদের একটি রান্নাঘর দেওয়া হোক এবং সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েদিদের কয়েকজনকে আমাদের হেল্পার হিসেবে দেওয়া হোক। রেশন গুদাম থেকে আমাদের জন্যে বরাদ্দকৃত রেশন আমরাই নিয়ে আসবো। রেশন আমরা কীভাবে ব্যবহার করব তা আমাদের ব্যাপার। এ রকম একটি দাবিনামা প্রশাসন নিয়ে যেত প্রিজনারদের মুখপাত্রের কাছ থেকে। প্রশাসন বলত, আমরা তো এটা করতে পারি না। আমরা এটা হোম মিনিস্ট্রিতে পাঠিয়ে দেবো। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন এ ব্যাপারে। আমরা সে অনুসারে সিদ্ধান্ত নেব।

অবশেষে জেল প্রশাসন বলল, ঠিক আছে, এই বরং ভালো। প্রিজনাররা খাওয়াদাওয়া নিয়ে হাঙ্গামা করার চাইতে নিজেদের খাবার যদি নিজেরা তৈরি করে নেয়, মন্দ কি? কমিটি একজনকে মুখপাত্র নির্বাচন করত। মুখপাত্র যিনি হতেন প্রশাসন তাকে মেনে নিত। তার সঙ্গেই তারা কথাবার্তা চালাত। আমাদের পার্সোনাল ক্যাশ অফিসে জমা থাকত। তার থেকে আমরা অল্পস্বল্প খরচ করতে পারতাম। ধরা যাক, একটা খাতা কিনলাম। তার আবার হিসাব থাকত।

এভাবে জেলখানার মধ্যেই কমিউনিস্টদের একটা অর্গানাইজেশন বা জার্ম অব অর্গানাইজেশন দাঁড় করানোর চেষ্টা হত। মুখপাত্র খেয়াল রাখতেন যে, তার যে অন্য কমরেডরা আছেন, তাদের কারো মনোবল যেন ভেঙে না পড়ে। ধরুন, একজন ক্ষেতমজুর, একজন দিনাজপুরের এক সাঁওতাল, একজন মধ্যবিত্ত—এদের সবার মনোবল অটুট রাখা কনসোলিডেশনের দায়িত্ব। এমনও হয়েছে জেলের ভিতর থেকে একটা চিঠি লিখে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই চিঠি বাইরে থেকে পোস্ট করা হয়েছে কমরেডের নামে। চিঠি পড়ে কমরেডের মনোবল ফিরে এসেছে।

AMARBOI.COM

যদি কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিত, তবে সপ্তাহে একদিন এক জায়গায় বসে পত্রিকা পাঠ করা, পাঠ করে অন্যদের শোনানো ইত্যাদির আয়োজন করা হতো। এক কমরেডকে দায়িত্ব দেওয়া হতো যে, আপনি একদিন সন্ধ্যায় আমাদের লক আপে বন্ধ করার আগে গত পনেরো দিনে কী কী ঘটলো তা আমাদের জানাবেন এবং এরপর আমরা সবাই এক সাথে আলোচনা করব। এসব করা হত যাতে পলিটিক্যাল প্রিজনারদের ইন্টেলেকটুয়াল ফুডটা দেওয়া যায়, যাতে মানসিকভাবে তারা ভেঙে না পড়ে। এ রকম এক একটা মেথড পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা বের করত যাতে পলিটিক্যালি তারা বেঁচে থাকতে পারে।

আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী ছিলেন তখন মন্ত্রী। তিনি মাঝে মাঝে জেল পরিদর্শন করতে যেতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু এক সময় মুখপাত্র প্রশাসনের ইতিবাচক জবাব নিয়ে এল। সব দাবি তো আর প্রশাসন মানবে না। ধরুন, ডায়েটের বাজেটটা তারা দেড় টাকার জায়গায় দু টাকা করবে। ছয় মাস অন্তর একটা হাফ শার্ট আর একটা লুঙ্গি দেবে। বিছানা হিসেবে একটা লোহার খাট আর তার উপরে একটা ছোবড়ার গদি ওরা দিতে রাজি আছে। একটা চাদরও পাওয়া যাবে। কনসোলিডেশনের মিটিঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনশনকারীদের বলা হত—এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা। এর বাইরে আমরা কিছু পেতে পারব না। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে : আমরা অনশন ভাঙব, কি ভাঙব না। তখন নানান জনে নানান কথা বলল। কেউ হয়তো বলল, 'না এতে চলবে না। মরে গেলে মরে যাব। জেলখানায় যখন এসেছি, আমরা কি আর জীবনে মায়া করি?' কিন্তু অন্য কেউ হয়তো মন্তব্য করল, 'তাই বলে তো আমরা আত্মহত্যা করার জন্যে এখানে আসিনি।'

এই দুইটা সাইডই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। তখন একটা পর্যায়ে কনসোলিডেশন স্থির করে যে আমাদের আপাতত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই মেসেজটা যখন জেল-প্রশাসনকে দেওয়া হয় তখন তারা সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটা মেনে নিলে ৫৮ দিনের অনশনের অবসান হয়। কিন্তু প্রিজনাররা বলে যে এভাবে তো হবে না। আমাদের একদিন একত্রিত হতে দিতে হবে। সেদিন মিলিতভাবে আমরা এই বিজয়টা সেলিব্রেট করব। সেদিন আমাদের একটু ভালো খাবারদাবার দিতে হবে।

প্রশাসন মেনে নিল এই দাবি। সবাইকে একদিন একত্রিত হতে দিল। ভালো খাবার মানে খিচুড়ির ব্যবস্থা হলো। এই দীর্ঘ অনশনকালে অনেক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। অনশন করতে করতে অনেকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। একটা সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল। একজন প্রিজনার হয়তো অন্য পাঁচজনের সামনে বিবস্ত্র হয়ে যাচ্ছিল। সে যে বিবস্ত্র হয়ে যাচ্ছে—এটাও সে খেয়াল করতে পারছে না। চট্টগ্রামের কমরেড আব্দুস সাত্তারের কথা মনে পড়ছে আমার। কৃষক নেতা ছিলেন তিনি। তাঁকে আমি এ রকম অবস্থায় দেখেছি। কিংবা হয়তো কোনো কমরেড বলছেন, 'আমি ওসব ব্রেক ট্রেক বুঝি না। কিছু খাবো না আমি'। আমরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি এই বলে : 'এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আমরা অনশন ভঙ্গ করবো। আপনি এই সরবতটা খান'। তিনি তখন জবাব দিলেন, 'দালালদের কথা আমি শুনবো না'। ফণি গুহ নামে ঢাকা জেলার একজন নের্তৃস্থানীয় কমিউনিস্টকে অনশন ধর্মঘটের পরে ময়মনসিংহ জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি মারা যান। অনশনের ধকল তিনি সহ্য করতে পারেননি। অনশনের ফলে শরীরে অনেক ধরনের বিকার শুরু হয়ে যায়। এসব বিকার সবাই সহ্য করতে পারেন না। ৫৮তম দিবসে আমিও অনশন ভঙ্গ করেছিলাম। আমার শরীরের ক্ষতি যা হবার তা তো ইতোমধ্যে হয়েই গিয়েছে।

২৮. জেল থেকে জেলান্তর

জেল জগৎটা একটা ভিন্ন জগৎ। আমাদের পৃথিবীটা যেমন গোল, জেলটাও গোল। জেলের এক জায়গা থেকে যদি আপনি শুরু করেন তবে ঘুরতে ঘুরতে সেই জায়গাতেই আপনি শেষ করবেন। জেলের মধ্যেও জেল আছে, অসংখ্য জেল আছে। বিভিন্ন রকম সেগ্রিগেশন আছে জেলে। নানান রকমের টর্চার আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যান্ড ক্যাফ দেওয়া, সলিটারি সেলে রাখা, প্রত্যেকদিন কোর্ট বসানো। জেলের প্রত্যেক প্রিজনারের নামে একটা টিকেট আছে। এ টিকেটের মধ্যে প্রিজনারের ইতিহাস লেখা থাকে। শাস্তি শেষে প্রিজনারের টিকেট জেলারের সামনে হাজির করা হয়। পলিটিক্যাল প্রিজনারদের বদলি করা হয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। পলিটিক্যাল প্রিজনারদের সব সময়ই একটা টেনশানে থাকতে হয়, কখন তার ডাক আসে, কখন জমাদার এসে বলে 'চলিয়ে!' কতবার যে আমি শুনেছি এই ডাক, 'চলিয়ে সরদার সাহাব'। শুনে চলে যেতে হয়েছে অন্য জায়গায়। কী আর করবো, যাওয়া ছাড়া!

অনশন ধর্মঘটের পরে জেল-প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিল ঢাকা জেলে যারা অনশন করেছে তাদের আর ঢাকা জেলে রাখা যাবে না। তাদের খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর ইত্যাদি বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিল পরিবার থেকে আমাদের যত দূরে রাখা যায়। গোয়েন্দা বিভাগ এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে পরিচালনা করত। যে জমাদার সিকিউরিটি প্রিজনারদের ইনচার্জ ছিল সে একদিন হয়তো এসে বলল, 'কই, সরদার সাহাব কাঁহা?' আমি যখন সামনে এগিয়ে গেলাম তখন আমাকে বলল, 'চলিয়ে। আপকা বিছানাপত্র গুটাইয়ে।' আমি বিছানাপত্র গুটিয়ে নিলাম।

কয়েদি নেওয়ার দিন আগে থেকে পুলিশ বুক করা থাকে। সিলেট গেলে তো ট্রেনে যেতে হবে। ট্রেনে ওরা আগে থেকে বন্দোবস্ত করে। পুলিশ কর্ডন দিয়ে স্টেশনে নিয়ে যায়। ট্রেনে সেন্ট্রি বসে থাকে সাথে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নেবার সময় প্রিজনারদের ওরা হ্যান্ডক্যাফ পরিয়ে রাখে যাতে তারা পালাতে না পারে। যে জায়গায় যেতে হবে সেখানে নেমে নতুন জেলে নিয়ে গিয়ে প্রিজনারকে জেলারের হাতে সোপর্দ করে 'প্রিজনার বুঝে পেলাম।'—এই মর্মে একটা রিলিজ অর্ডার নিয়ে নেয়। এর পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা যেখানে আছে সেখানে।

পরদিন আমাকে নিয়ে গেল অফিসে। আমাকে জানানো হলো যে সিলেট জেলে বদলি করা হয়েছে আমাকে। আমার সঙ্গে আরো একজন পলিটিক্যাল প্রিজনার ছিল বোধহয়। তার নাম সফি, সামসুদ্দীনের ভাই। এখন সে সাংবাদিক। আমাদের দুজনকে সিলেট জেলে পাঠিয়ে দিল। ঢাকা জেল থেকে সিলেট জেলে গিয়েছি ১৯৫১ সালে। সিলেটে বেশ কয়েক মাস ছিলাম। সেখানে বিখ্যাত নানকার নেতা অজয় ভট্টাচার্যের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। খুব দক্ষ লোক এবং সাহিত্যিক। সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। আমার খুব শ্রদ্ধেয় একজন লোক। এ রকম লোক আরো আছে। সত্যব্রত নামে একজন তরুণ ছাত্র এবং ওর বড় ভাই মঞ্জুব্রত দাশ তখন ছিল সিলেট জেলে। সত্যব্রত পরে মণি সিং এর আত্মীয় হয়। সত্যব্রত দাশ, অজয় ভট্টাচার্যদের উপর কী রকম অত্যাচার করা হয়েছিল সে কাহিনীটা আমি সিলেট জেলে গিয়ে পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিলেটে আমাদের ওয়ার্ডে লোহার শিক ছিল না। তার বদলে দেশী বাঁশ ব্যবহার করা হত। অন্য জেলে বিছানা হত লোহার। সিলেট জেলে বিছানা ছিল স্লোপিং সিমেন্টের। মাথাটা উপরের দিকে, পা-টা নিচের দিকে। এক একটা কায়দা মন্দ না। খরচও বেশি নয়। আমরা মোটামুটি একটা বড় এলাকায় ছিলাম, মিশতে দিত, খেলতে দিত। বিভিন্ন দিবস আমরা পালন করতাম। জেল-প্রশাসন বাধা দিত না।

সিলেটে গিয়ে আমি শুনলাম যে ঢাকা জেলের কাহিনী শুনে সিলেট জেলের প্রিজনাররাও অনশন করেছিল। তখন তাদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করা হয় সেটাকে সীমারের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে। কোনো প্রিজনার হয়তো শরীরের কাপড়চোপড় খুলে মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে শরীর ঠাণ্ডা করার জন্যে। এদের কাছ থেকে জলের কলসিটাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে তারা জল পান করতে না পারে।

এরপর আমাকে কয়ক মাস পরে রাজশাহী জেলে নিয়ে আসা হয়। রাজশাহী খুব গরম জায়গা। সেখানে কিছু দিন আমি ওয়ার্ডে ছিলাম। কখনো শাস্তি হিসেবে আমাকে সেলেও রাখা হয়েছে। আমাকেই শুধু নয়, আরো অনেককেই আটকে রাখা হয়েছিল। রাজশাহীতে বসেই আমি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাটা শুনি। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আমি জেলে। ২১ তারিখে অবশ্য খবরটা আমরা জানতে পারিনি। সে সময় ঢাকার কাগজ এক দিনেই রাজশাহী পৌঁছাত না। ২৩ তারিখ যখন খবরের কাগজ গেল তখন আমরা তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কিন্তু খবর কাগজে দেখলাম প্রায় সবটাই কাটা। সব কেটে বিশাল জানালা বানানো হয়েছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খবর থাকলে প্রশাসন সেটা কেটে রেখে তারপর আমাদের পত্রিকাটা পড়তে দিত। এ থেকে আমরা বুঝতে পারতাম সাংঘাতিক কোনো খবর আছে। সে খবর আমাদের জানতে দেওয়া হবে না। আমরা চিৎকার করে উঠলাম, 'এই আসো, আসো, দ্যাখো, কী বিরাট জানালা বানিয়েছে। এর ভিতর দিয়ে আমরা নিজেরাই তো এপার থেকে ওপারে যেতে পারি।' আমরা তাই করলাম, এপার থেকে ওপারে গেলাম, একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা যেন নতুন জীবন পেলাম।

রাজশাহী জেলে একদিন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা ডেপুটি কমিশনার হিসেবে জেল পরিদর্শনে এলেন শামসুর রহমান যাকে আমরা ড. জনসন বলতাম। আমাদের সম্পর্ক তো 'তুমি'র সম্পর্ক। আমি তাকে তখন কীভাবে এ্যাড্রেস করি—এ নিয়ে ভাবনায় পড়লাম। শামসুর রহমান হলো আতাউর রহমান খানের ছোট ভাই। ওদুদুর রহমান, শামসুর রহমান আর আতাউর রহমান তিন ভাই। আজকাল ওকে খুব একটা দেখা যায় না। খুব একটা সামাজিক জীবনযাপন করে না। ব্যবসাপাতি করে। খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। অধ্যাপক রাজ্জাকের স্মৃতিচারণে ওর কথা এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজশাহীতে আমার স্ত্রী আমার সাথে দেখা করতে যেতেন। শামসুর রহমান থাকা অবস্থাতেই গিয়েছেন কয়েকবার। তাদের কাছ থেকে কিছুটা আপ্যায়িতও হয়েছেন। এর পর ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পারমিশন নিয়ে অফিসারের সামনে বসে আমার সাথে কিছুটা কথাবার্তা তিনি বলে আসতে পেরেছেন।

জেল প্রশাসন সিকিউরিটি প্রিজনারদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিল : এ-ডিভিশন আর বি-ডিভিশন। যেমন ধরুন, অনিল মুখার্জী আর অরুণ মুখার্জী দুই ভাই। অনিল মুখার্জী ছিলেন বি-ডিভিশনে। বি-ডিভিশন মানে লোয়ার ডিভিশন। আমি ছিলাম বি-ডিভিশনে। সুতরাং অনিল মুখার্জীর সাহচর্য আমি পেয়েছি। সত্যেন সেনও ছিলেন বি-ডিভিশনে। কখনো হয়তো তাকে কুমিল্লা জেলে বদলি করা হয়েছে। আমাকেও পাঠানো হয়েছে কুমিল্লা সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে পলিটিক্যাল প্রিজনার কম। সাত কি আটজন হবে। আমরা এক সঙ্গে থাকছি। সত্যেন সেনের জীবনাচরণ দেখছি। সত্যেন সেন আমাদের সঙ্গে গল্প করছেন। আমরা কেউ হয়তো রান্নাবাড়ার কাজ করছি, কেউ তরকারি কোটার কাজ করছি—এ রকম একটা এ্যাসোসিয়েশন মোটামুটিভাবে পাওয়া গিয়েছিল।

২৯. খাপড়ার সেই হত্যাকাণ্ড

রাজশাহী জেলে অন্যান্য বন্ধুদের কাছে আমি খাপড়া ওয়ার্ডের কাহিনী শুনেছি। রাজশাহী জেলে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে যে হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত হয় তাকে আমরা বলি 'খাপড়া হত্যাকাণ্ড'। রাজশাহী জেলের সাধারণ কয়েদিরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিল। পলিটিক্যাল প্রিজনারদের রাখা হয়েছিল খাপড়া ওয়ার্ডে। খাপড়া ওয়ার্ডটা ছিল একটা বাংলো বাড়ির মতো এবং এ বাড়িটার চারিদিকে অনেকগুলো জানালা ছিল। পলিটিক্যাল প্রিজনাররা এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে সাধারণ কয়েদিদের সমর্থনে আমাদের কিছু করা উচিত। সাধারণ কয়েদিরা যদি অনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তবে আমরাও অনশন করব।

সে সময় রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান। তার নাম ছিল মি. বিল। ও অর্ডার দেয় যে কয়েদিদের মধ্যে যারা নেতা আছে তাদের আলাদা কর। আলাদা করার দিনটিতে মি. বিল যখন তার দলবল অর্থাৎ ডেপুটি জেলার ও অন্যদের নিয়ে খাপড়া ওয়ার্ডের ভিতরে অর্থাৎ সেই বাংলো বাড়িতে ঢুকে তখন পলিটিক্যাল প্রিজনাররা বাংলোর দরজাটি বন্ধ করে দেয় যাতে জেলাররা সেখান থেকে বের হতে না পারে। আগে থেকে নিশ্চয়ই এ রকম একটা প্ল্যান করা ছিল। সুতরাং সেখানে একটা ক্লাশ-ট্যালাশ হয়। তখন যা সাধারণত হয়ে থাকে, আটকা পড়া জেলাররা বাঁশি বাজিয়ে দিল। বাঁশিতে ফু দিলে সিগনাল হয়ে যায়। পাগলা ঘণ্টি বাজতে আরম্ভ করে। আর্মড সিপাহীরা খাপড়া জেলের দিকে ছুটে আসে জেলাররা তখনো ভিতরে আটকা পড়ে

AMARBOI.COM

আছে। পলিটিক্যার প্রিজনাররা খাটটাট এসব জানালার সামনে রেখে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সিপাহীরা এসে জানালায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করতে শুরু করে।* সাতজন পলিটিক্যাল প্রিজনার নিহত হয়। আহত হয় অনেকে। আবদুশ শহীদের বইয়ে নাম আছে, কারা কারা নিহত ও আহত হয়েছিল। জেল হত্যার ইতিহাসে এটা একটা বড় ঘটনা। জেল কিলিং অন্যত্র হয়েছে, প্রেসিডেন্সি জেলেও হয়েছে, এ রকম হয়।

খাপড়া ওয়ার্ডে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার নেতা ছিলেন যশোরের কমরেড আবদুল হক। উনি খুব জঙ্গি নেতা ছিলেন। উনি খুবই উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা দিতে পারতেন। কলকাতার অনেক কমরেড তখনো ছিল। মনসুর হাবিবও একজন বড় এবং দক্ষ নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন বর্ধমানের আবুল হাশেম সাহেবের পরিবারের লোক। আবুল হাশেম সাহেবের পরিবার বর্ধমানের একটি জাতীয়তাবাদী মুসলিম পরিবার। অনেক শিক্ষিত ভালো ভালো ছেলে বের হয়ে এসেছে ঐ পরিবার থেকে। বইপত্রও লিখেছে অনেকে। সবার নাম বলতে পারছি না। বদরুদ্দীন উমর ভালো বলতে পারবেন।

'খাপড়া হত্যাকাণ্ড' সম্পর্কে আমাদের কমরেড আবদুশ শহীদের 'খাপড়া-স্মৃতি' বলে একটা বই রয়েছে। আবদুশ শহীদ নিজে খাপড়া জেলে ছিল এবং আহত হয়েছিল। আবদুশ শহীদ গ্রাজুয়েট ছিল। একটা স্কুলে শিক্ষকতা করত। একটা ধার্মিক পরিবারের ছেলে ছিল। সে কৃষক আন্দোলনে এসে গেল। কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজশাহী জেলে আমি তাকে পেয়েছিলাম। সে আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত।

AMARBOI.COM

যারা সিকিউরিটি প্রিজনারদের ইনচার্জ থাকত তারা সবাই যে খারাপ লোক ছিল তা নয়। ডেপুটি জেলার কেউ খারাপ ছিল, কেউ আবার ভালোও ছিল। সবাই আমাদের দেশের লোক। জেলার এবং সাধারণ কয়েদি সবাই সিকিউরিটি প্রিজনার্সদের খুব শ্রদ্ধা করত। এক সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে সিকিউরিটি প্রিজনারদের চার্জে ছিলেন ডেপুটি জেলার কাজী আবদুল আউয়াল*। তিনি এমএ

---

* বিভিন্ন সূত্র থেকে খাপড়ার ২৪ এপ্রিলের শহীদদের নাম সংগ্রহ করে উল্লেখ করা আবশ্যক : কম্পরাম সিং, আনোয়ার হোসেন, হানিফ সেখ, দেলোয়ার হোসেন, সুধীন ধর, বিজন সেন, সুখেন ভট্টাচার্য।

বি.দ্র. খাপড়া হত্যাকাণ্ডের বিবরণ কিছুটা বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় বদরুদ্দীন উমরের : ভাষা আন্দোলন ১ম খণ্ডে : পৃ. ৩০৯-৩১১। হামদি শেখ, আনোয়ার হোসেন, সুখেন ভট্টাচার্য, দেলওয়ার, সুধীন ধর, কম্পরাম সিং এবং বিজন সেন।

* কাজী আবদুল আওয়াল যে একজন দেশপ্রেমিক মহৎ মানুষ ছিলেন তার এক পরিচয় এই যে ১৯৭৫ এর ৩রা নভেম্বরে মোশতাকের নির্দেশে সামরিক সন্ত্রাসীরা ঢাকা জেলে ঢুকে পড়ায় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসরাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সেই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে তিনি নিজ উদ্যোগে সাহসিকতার সাথে ঘটনার পরবর্তীতে থানায় এই হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাস ছিলেন। নাজমুল করিম, সাজেদুল করিম, বজলুল করিম—এই সমস্ত লোকদের পরিবারের তিনি পরিচিত লোক ছিলেন। অত্যন্ত মানবতাবাদী ও হৃদয়বান এই ভদ্রলোক পলিটিক্যাল প্রিজনারদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং সাহিত্যিকদের খুব প্রশংসা করতেন। বিশেষ করে সত্যেন সেন যে সমস্ত চিঠি লিখতেন সেসব চিঠি তিনি প্রথমে পাঠ করতেন। এরপর সেসব চিঠি তিনি পাঠিয়ে দিতেন আই বি ডিপার্টমেন্টে। এই চিঠিগুলোর যে সব অংশ আই বির পছন্দ হত না সেগুলো তারা মুছে দিত অমোচনীয় কালি দিয়ে। তারপর এসব চিঠি আবার তারা জেলে ফেরত পাঠাত। এই সুন্দর সুন্দর সব চিঠির ভিত্তিতে সত্যেন সেনের বইও তৈরি হয়েছে। রুদ্ধ দ্বার, মুক্ত প্রাণ।

কাজী আবদুল আউয়াল পরে ডিআইজিও হয়েছেন। জেলে যখন তাজউদ্দীনসহ চার জাতীয় নেতাকে খুন করা হয় তখন বোধহয় কাজী আবদুল আউয়ালই ঢাকা জেলের ডিআইজি ছিলেন। তিনিই ব্যাপারটা ফেস করেছেন। যখন সশস্ত্র লোকজন গেটে দাঁড়িয়ে আছে এবং জেলের ভিতরে ঢুকতে চাইছে তখন তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফোন করে জানালেন যে এ রকম কিছু লোক এসেছে। জেলে ঢুকতে চাইছে। তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বা বঙ্গভবন থেকে বলা হচ্ছে : 'তারা যা করতে চায় করতে দাও।'

AMARBOI.COM

৩০. যুক্তফ্রন্ট ও কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলি

১৯৫৪তে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় এসে গেল। আমি মনে করি যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের একটা ভূমিকা ছিল। ততদিনে বেশ কিছু মুসলমান যুবক কমিউনিস্ট আদর্শকে গ্রহণ করে কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে। যেমন একজনের নাম আবদুস সামাদ, সাহিত্যিক লায়লা সামাদের স্বামী। এঁরা খুব বড় রকমের সংগঠক ছিলেন। ১৯৫৪ সালের কথা বলছি। তখনো মুসলিম লীগের শাসন চলছে। নুরুল আমীন ক্ষমতায়। মুসলিম লীগের ব্যাপারে ছাত্রসমাজের মোহমুক্তি অবশ্য শুরু হয়ে গেছে। মুসলিম লীগের একটা ক্রেডিট এই যে তারা নানা রকম চাপের মুখে একটা সাধারণ নির্বাচন দিতে রাজি হয়েছে। তখন আওয়ামী লীগ, হক সাহেবের কৃষক পার্টি এবং নেজামে ইসলাম এর সাথে যুক্ত হলো। এর মানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেমন, সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানী এবং নেজামে ইসলামের আতাহার আলী একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট দাঁড় করালো সরকারের বিরুদ্ধে।

দায়ের করেন এবং তাঁর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার ২৫ বছরের অধিককাল পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনকালে উচ্চ আদালতে হত্যাকারীদের বিচার কার্য শুরু হলে অবসরপ্রাপ্ত ৮০ বছরের বৃদ্ধ কাজী আবদুল আওয়াল আদালতে হাজির হয়ে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষীর বিবরণ প্রদান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা সহজ কোনো কাজ ছিল না। আমি মনে করি, এর পেছনে সাংগঠনিক দায়িত্বটা পালন করেছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা। এদের মধ্যে প্রফেসার মুজাফফর আহমেদ এখনো সক্রিয় আছেন। তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়ছে চট্টগ্রামের চৌধুরী হারুনুর রশীদ, সাহিত্যিক-সাংবাদিক সৈয়দ আলতাফ হোসেন যিনি এখন মারা গেছেন, সিলেটের পীর মুহম্মদ হাবিবুর রহমান এবং বর্তমান পরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ—ইনিও কমিউনিস্ট সংগঠনের একজন অত্যন্ত কাছের লোক। আরো অনেকে ছিলেন যাদের নাম আমি তাৎক্ষণিকভাবে মনে করতে পারছি না। আমি মনে করি যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার দায়িত্বটা পালন করেছে কমিউনিস্ট পার্টি। সাধারণভাবে আমাদের দেশের নির্বাচনে যা হয়, নেতাদের পক্ষ থেকে 'আমি এটা চাই, আমি এই সিট ছাড়বো না, আচ্ছা এই সিটে কাকে দেওয়া যায়' ইত্যাদি ধরনের দাবি উঠে। সেখানে আমি শুনেছি কোনো কোনো কমিউনিস্ট প্রার্থী তার নিজের সিট ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, অমুক আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে সিটটা দেওয়া হোক। এই এ্যাকোমোডেশনের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছাড়া যুক্তফ্রন্ট দাঁড়াতে পারত না।

যুক্তফ্রন্টের সময় আমি জেলে। যুক্তফ্রন্ট হয়ে গেল। নির্বাচন হয়ে গেল। আবুল কাসেম ফজলুল হক সাহেবের সাথে নেতারা আবার সামনে চলে এলেন। আবু হোসেন সরকার সাহেবের নেতৃত্বে হক সাহেবের সরকার পূর্ববঙ্গে তৈরি হলো। পূর্ববঙ্গের সাধারণ দাবি ছিল 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'। রাজবন্দীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন কমিউনিস্ট কর্মীরা। দুটি সাধারণ শ্লোগান ছিল তখনকার দিনে : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এবং 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবু হোসেন সরকার সাহেব তাঁর সুনাম রক্ষার জন্যে কিস্তিতে কিস্তিতে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে শুরু করলেন : কোনো জেল থেকে দশ জনকে, কোনো জেল থেকে পাঁচ জনকে—এভাবে।

এই পর্যায়েই আমাকে ১৯৫৫ সালের মার্চ, এপ্রিল বা মে মাসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অফিসে ডেকে বলা হল—আজ কয়েকজন সিকিউরিটি প্রিজনার রিলিজড হবেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ফজলুল করিম। সরদার অধ্যাপক হিসেবেও জেলের অফিসারদের কাছে পরিচিত। বিকেলে মুক্তি দেবার জন্যে ফজলুল করিমকে নিয়ে আসা হলো। ফজলুল করিম তার দস্তখতটস্তখত দিয়ে জেল থেকে রিলিজড় হলো।

রিলিজ করার ব্যাপারে একটা ঝামেলা ছিল। ফজলুল করিম সরদার নামে নাকি রাজশাহী জেলেও একজন সিকিউরিটি প্রিজনার ছিল। তবে এই সরদার ফজলুল করিমই ছিল বেশি পরিচিত। সরদার ফজলুল করিম যে শুধু পাকিস্তান ও করাচীতেই পরিচিত ছিল তা নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরাও তারা নাম জানত। ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরা যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা ইতোমধ্যে জেনেছে। পাকিস্তানে যে 'গভর্নমেন্ট ইন পাওয়ার' হ্যাজ বিন ডিফিটেড লাইক এনিথিং—এটা ওয়শিংটনের নীতিনির্ধারকরা জানতেন। তাঁরা মনে করতেন, কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক ক্ষমতার কারণেই এটা ঘটেছে এবং ইস্ট বেঙ্গল হ্যাজ গন রেড।

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির ফরমালিটিজগুলো হয়েছে আমি জেলে থাকার সময়েই। মোজাফফর জেলে গিয়ে আমার সম্মতিসূচক দস্তখত নিয়ে এসেছে। আমি তো অনুগত কর্মী ছিলাম। যা বলেছে তাই করেছি। সম্মতি জানিয়ে দস্তখত দিয়ে দিয়েছিলাম। ১৯৫৫ এর মাঝামাঝি সময়ে আমি জেল থেকে বের হয়ে এলাম। আমি রিলিজ পেয়ে বাইরে আসার পর ইলেকশানটা হয়েছিল।

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি গঠিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস এ্যাক্ট অনুসারে। গোলাম মহম্মদ সাহেব এই কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি ভেঙে দিলেন। তমিজউদ্দীন খান সাহেব এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। সেই মামলায় জাস্টিস মুনীর রায় দিলেন যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস এ্যাক্টে কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি ভাঙার কোনো কথা নাই। তবু যখন ভেঙে দেওয়া হয়েছে তখন আর কী করা। এখন সেন্টারে নতুন একটা কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি গঠন করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বিভিন্ন পার্টি থেকে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছে তারাই কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি সদস্য নির্বাচিত করবেন।

প্রাদেশিক পরিষদে তখনো কংগ্রেসের একটা অংশ ছিল আর কমিউনিস্ট হিসেবেও কিছু সদস্য ছিলেন : প্রসূন কান্তি রায়, (বরুণ রায়), চট্টগ্রামের একজন সাহিত্যিক পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সুধাংশু দস্তিদার। এঁরা ধর্ম বা সম্প্রদায়গতভাবে ছিলেন হিন্দু কিন্তু আদর্শগতভাবে ছিলেন কমিউনিস্ট। এঁদের একটা ক্ষমতা ছিল। কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী সদস্যের সংখ্যা ত্রিশের কম ছিল না।

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটা ছিল এ রকম : ধরা যাক, পূর্ব পাকিস্তান থেকে সদস্য নির্বাচিত হবে পঞ্চাশজন। এই পঞ্চাশ দিয়ে আপনি তিনশকে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যাবে অর্থাৎ ছয়জন সদস্যের সমর্থন যদি আপনি পান তবেই আপনি নির্বাচিত হয়ে গেলেন। কোনো সদস্য একবার ভোট দিয়ে ফেললে তার ব্যালটটা বাতিল হয়ে যাবে। এই নির্বাচন পদ্ধতির নাম ছিল প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশান উইথ সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোট। যে দলের যে রকম শক্তি আছে সেই শক্তি অনুযায়ী সে সদস্য পাবে।

আওয়ামী লীগের প্যানেলটা হচ্ছে প্রধান প্যানেল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে যে কমিউনিস্ট কর্মীরা ছিলেন তাঁরা শেখ মুজিব ও সোহারাওয়ার্দী সাহেবের কাছে একটা কথা নাকি এভাবে বললেন যে, আওয়ামী লীগের মেইন প্যানেলকে আমরা ভোট দেব তবে আমাদের নিজেদের একটা দাবি আছে। আমাদের নিজেদের একজন লোককে কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলিতে পাঠাতে চাই। তাঁরা জানতে চাইলেন 'সে কে?' কমিউনিস্ট নেতারা উত্তর দিলেন, 'সে যেই হোক'। পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার নামটাও আওয়ামী লীগের প্যানেলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের প্যানেলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এটা আমি তখনো জানতাম না। এ ব্যাপারটাকে আমি বলি, বাঙালের হাইকোর্ট দেখা। আমার কাছে করাচী ইত্যাদি দূর মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপার। আমি কোনোদিন চিন্তা করি নাই যে আমি করাচী যাবো বা আমি আইন সভায় যাব। আমি হচ্ছি একজন মোস্ট নন-এ্যামবিশাস পারসন। নন-এ্যামবিশাস অবজার্ভার অব লাইফ। আই টুক ইন্টারেস্ট ইন দি অবজার্ভেশন অব লাইফ। জেলখানায় ৫৮ দিনের হাঙ্গার স্ট্রাইকে আমি অংশগ্রহণ করেছি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নুরুল হক এবং প্রফেসার আনিসুজ্জামানের স্মৃতিচারণে আছে কনস্টিটিউশান এ্যাসেমব্লির ব্যালটিংটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখন যেটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিস সেখানে। ওটা আগে ছিল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিশনার্স অফিস। ইলেকশানের শেষে তরুণ কর্মী যারা আছেন তাঁদের প্রধান প্রশ্ন দাঁড়াল যে সরদার ফজলুল করিম ইলেক্টেড হয়েছেন কিনা। তারা যখন শুনল যে তাঁদের প্রার্থী সরদার ফজলুল করিম নির্বাচিত হয়েছেন, তখন তাঁরা খুবই উৎফুল্ল হলেন।

সে সময় আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। রোজার দিন ছিল তখন। পুলিশেরা তাদের কী একটা দাবি নিয়ে স্ট্রাইক করেছিল সে সময়। এ অপরাধে পুলিশদের এ্যারেস্ট করা হয়। ঘেরাও করা হয় তাদের। আইয়ুব খান তখন চার্জে ছিল। গভর্নমেন্ট কমিউনিস্টদের এই পুলিশ ধর্মঘটের সাথে ইনভল্‌ভ করে এবং তাদের এ্যারেস্ট করতে শুরু করে। আমাকেও এই সময়ে আবার এ্যারেস্ট করা হলো।

আমি রিলিজ পেয়েছিলাম ঢাকা থেকে। ইলেক্টেডও হয়েছিলাম ঢাকা থেকে। ইলেক্টেড হয়ে আমি এ্যাসেমব্লি এ্যাটেন্ড করতে গেলাম। এ্যাসেমব্লির প্রথম অধিবেশন বসে মারী পাহাড়ে। মারী পাহাড় রাওয়ালপিন্ডির কাছে। এই মারী পাহাড়েই মোঘলরা তাদের রাজবন্দীদের রাখত। এটা একটা মজার ব্যাপার যে পাকিস্তান সরকার কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির প্রথম অধিবেশনটা করাচীতে করল না, করল পিন্ডির কাছে মারী পাহাড়ে গিয়ে।

আমি যখন পাকিস্তান পার্লামেন্টে মেম্বার ছিলাম, তখন বিভিন্ন মহলে আমার বন্ধুবান্ধবেরা ছিল। হক সাহেবের দলের লোকদের সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব আমাকে খুব এ্যাফেকশনেটলি দেখতেন। ওঁর একটা কমেন্ট আমার এখনো মনে আছে। করাচীতে পার্লামেন্টের মেম্বারদের থাকার জন্যে যে মেস ছিল (এখনকার এমপি হোস্টেলের মতো) সেখানে আমি দেখতাম পাকিস্তানের পলিটিক্স শুরু হয় আফটার মিড নাইট বা মধ্যরাতের পর। মধ্যরাতের আগ পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট আছে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, সেই গভর্নমেন্ট আর নাই। যত ষড়যন্ত্র, যত আলোচনা সব সেখানে হত মধ্যরাতের পরে। আমি ছিলাম একটা নরমাল মানুষ। আমি হয়তো সন্ধ্যা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরম্ভ করে খুব বেশি হলে বারোটা পর্যন্ত জাগব, তার পর বারোটার সময় ঘুমাতে যাব। যদিও আই ওয়াজ এ্যালাইড টু আওয়ামী লীগ এবং আমি আওয়ামী লীগের যে কোনো মিটিঙে যেতে পারতাম কিংবা আমি জিজ্ঞেসও করতে পারতাম কোনো ব্যাপারে, কিন্তু আমি দেখলাম যে আমি স্যুটেবল না। আমি অংশগ্রহণ করতাম না মধ্যরাতের পরে সংঘটিত হওয়া এই সব গোপন সভায়।

সুতরাং গভর্নমেন্টের উত্থান এবং পতনের সঙ্গে আমি খুব একটা জড়িত ছিলাম না। সে জন্যেই সৈয়দ আজিজুল হক যার পরিচিত নাম নান্না মিয়া এবং যিনি হচ্ছেন হক সাহেবের নিজের ভাগনা, তিনি আমাকে একদিন বললেন, 'সরদার (কিংবা ফজলুল করিম, এই দুই নামেই তিনি আমাকে ডাকতেন) একটা আশ্চর্য ব্যাপার শুনবেন?' আমি বললাম 'কী?' উনি বললেন, 'আপনি তো বড় সাংঘাতিক মানুষ। হোয়াইল উই রান আফটার পাওয়ার, পাওয়ার রানস আফটার ইউ।' তারা একদিন মন্ত্রী হতে চাচ্ছেন, একদিন সরকার গঠন করতে চাচ্ছেন। আমার ভোট একটা হলেও অনেক সময় এক ভোটে ডিসিশন হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি এই পক্ষে ভোট দিই তা হলে সে জিততে পারে—এরকম হতে পারে। সেই জন্যেই উনি বললেন যে পাওয়ার তোমাকে ধরতে পারছে না। এটা আমার জন্যে একটা বড় ট্রিবিউট বলে আমি মনে করি।

গীবন নামে একজন ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। স্পিকার ছিলেন আবদুল ওহাব খাঁ। গীবন আমার সম্পর্কে প্রশংসা করে লিখেছেন : হি ইজ এ সিরিয়াস ম্যান। পাঠানেরা যখন আমার সম্পর্কে একটু ঠাট্টা করে বলেছে, 'ইয়ে সরদার হ্যায়, ইস্ট পাকিস্তানকা, মাশরেকী সরদার'। মানে এ একটা লিলিপুটের মতো মানুষ, তার নাম নাকি আবার সর্দার। এরকম বলেছিল হয়তো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আবদুর রশিদ যে আগে পুলিশের আইজি ছিল পরে চিফ মিনিস্টারও হয়েছিল। সে তখন পার্লামেন্টের মেম্বার। এ ধরনের মন্তব্য শুনে গীবন বলতেন, ছোটা হায়তো ক্যা হ্যায়, ইয়ে সরদার তো হ্যায়। সীমান্ত প্রদেশের কোনো কোনো পাঠান হয়তো আমাকে ডিফেন্ড করে বলত, 'নেহি নেহি, ইন্‌কো দিমাগ হ্যায়'। এই কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির একটা বুকলেট পাকিস্তান সরকার বের করেছিল তাতে আমার ছবি ছিল। শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান এদের সবার ছবি ছিল। কিন্তু ৫৬ এর পাকিস্তান সংবিধানে আওয়ামী লীগ স্বাক্ষর করেনি। আমারও কোনো স্বাক্ষর ছিল না।

পাকিস্তান হওয়ার পর চারটি প্রভিন্সিয়াল ইউনিট ছিল : সিন্ধ, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পূর্ব বাংলা। এরপর ওয়ান ইউনিট করে সিন্ধ, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অটোনোমি বাতিল করা হয়। তখনি সোহরাওয়ার্দী সাহেব এই ফর্মুলা নিয়ে আসেন যে ইস্ট পাকিস্তান আর ওয়েস্ট পাকিস্তান সমান। পালামেন্টের ওয়ান ইউনিটের ডিবেটে আওয়ামী লীগ সাপোর্টেড ওয়ান ইউনিট। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সাপোর্টেড ওয়ান ইউনিট। এক সময় আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পলিসির বিপক্ষে ভোট দিতে পারিনি কারণ আমার পাশে তখন কেউ ছিল না এবং কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল যে আই ভোট এগেইনস্ট সোহরাওয়ার্দীর ফরেন পলিসি। কিন্তু ওয়ান ইউনিটের সময় আই ডিড নট হেজিটেট। আই সেইড মাই পয়েন্ট। ইংরেজিতে আমি বলেছি এই যে, এ্যাবোলিশান অব প্রভিন্সিয়াল অটোনোমি অব নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স, অব সিন্ধ, অব বালুচিস্তান—দিস ইজ নট গুড।

পাঞ্জাবিদের কারসাজিতে এসব হয়েছিল। 'জিয়ে সিন্ধ' নামে একটা আন্দোলন পর্যন্ত হয়েছিল সিন্ধু প্রদেশে। সে সময় তাদের মধ্যে প্রচলিত একটি কৌতুক ছিল এ রকম : ধরা যাক, একজন সিন্ধ কোনো একটা ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। সেই ঘরে যদি একটি সাপ আর একটা পাঞ্জাবি ঢুকে পড়ে তবে সিন্ধটি তার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কাকে আগে মারবে? সিন্ধটি অবশ্যই পাঞ্জাবিটিকে আগে মারবে, কারণ সে সাপের চেয়ে ভয়ঙ্কর।' পাঞ্জাবিদের সম্পর্কে পাকিস্তানের বাকি প্রদেশবাসীদের মনোভাব এই গল্পে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং আমার এই বক্তৃতা পাঠানেরা খুব এ্যাপ্রিসিয়েট করেছে। পাঠানেরা তো ওয়ান ইউনিট চায়নি। এ্যাবোলিশান অব পাখতুনিস্তান তারা চায়নি। আওয়ামী লীগ ওয়ান ইউনিট চেয়েছে কারণ পূর্ব পাকিস্তানে তারা ছাড়া তো আর কেউ ছিল না তখন! সুতরাং ওয়ান ইউনিট হলেই বা তাদের লোকসান কোথায়?

আমি ছিলাম ইনোসেন্ট একটা মেম্বার। আমি এসব কিছু দেখেছি। এমন হয়েছে, কোনো কোনো সময় যে পত্রিকায় কোনো মেম্বারের নাম আসছে না। কিন্তু পত্রিকায় নাম কেমন করে আসবে যদি তিনি এ্যাসেমব্লিতে বক্তৃতা না দেন? আমার এক বন্ধু (আমি নাম বলছি না) পিছন থেকে বারবার স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বলছেন, 'স্যার!' মানে উনি কিছু বলতে চান আরকি। স্পিকার বলছেন, 'ইউ সিট ডাউন।' দুই মিনিট পরেই আমার ফ্রেন্ড আবার বলছে, 'স্যার আই ওয়ান্ট টু স্পিক।' স্পিকার হয়তো আবার তাকে বলছেন বসে পড়তে। পরের দিন হি বিকেইম হেড লাইন অব পাকিস্তান টাইমস কিংবা ডন ইত্যাদি পত্রিকায়। প্রথমে তার নাম তার পর লেখা 'দি ইনডোমিটেবল'। দি ইনডোমিটেবল মি. অমুক। স্পিকার তাকে সুযোগ দিচ্ছিলেন না, কারণ তার হয়তো সময় তখনো আসে নাই বা সময় দিলেও যে তিনি ইংরেজিতে একটা ডেলিবারেশন দিতে পারবেন এমন যোগ্যতা হয়তো তার নেই। যদিও বাংলা তখন গৃহীত হয়েছে তবুও বাংলায় বক্তৃতা দেওয়াটা নর্ম নয়। বাঙালি কেউ পাকিস্তান পার্লামেন্টে বাংলায় বক্তৃতা করেছে বলে আমার মনে পড়ে না। তারা উর্দুতে বা ইংরেজিতে বলেছেন। এমনকি বঙ্গবন্ধুও বেশিরভাগ সময় ইংরেজি ব্যবহার করেছেন, ইন হিজ ওন ওয়ে। শেখ সাহেব দেখতাম, বক্তৃতার ব্যাপারে খুব একটা পরোয়া করতেন না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা মাথায় আসত তাই ইংরেজিতে বলতেন। তিনি খুব একটা মেপে কথা বলতেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক মাত্র ঐ পাগলা, মানে ফরিদ আহমদ ইংরেজিতে প্রফিসিয়েন্ট ছিল। আমার ক্লাসফ্রেন্ডও ছিল সে এবং ইংরেজির ছাত্র ছিল। যেমন ইংরেজি, তেমন উর্দু এবং তেমন বাংলা—এই তিনটি ভাষাতেই সে বক্তৃতা করতে পারত। ওর মেম্বারশিপটাকে, হি মেড ইট এ প্রফেশান। কারণ তখন বিজনেসম্যানরা পার্লামেনেটর মেম্বারদের দিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রবলেম এ্যাসেমব্লিতে প্রজেক্ট করত : উইল দি অনারেবল মিনিস্টার রিপ্লাই হোয়াই দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড? কিংবা লাইসেন্স-টাইসেন্স ইত্যাদি নানান ব্যাপারে সে প্রশ্ন করত। এই ফরিদ আহমদ প্রত্যেকটা প্রশ্ন করার জন্যে ফি আদায় করত পাবলিকের কাছ থেকে। দ্যাট ওয়াজ কোয়াইট এ বিজনেস। হি ওয়াজ মোর এ ক্যারিকেচার দ্যান এ সিরিয়াস স্পিকার। পরবর্তীকালে তার যে পরিবর্তন হয়েছে তাতো আপনারা দেখেছেন।

কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির মেম্বারদের মধ্যে একমাত্র আমিই বলতাম যে আমি কৃষকের ছেলে। আওয়ামী লীগের মম্বোরদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন এ্যাডভোকেট বা উকিল। এদের কেউ কেউ কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসতে পারেন। এ্যাসেমব্লি ওয়াজ কনস্টিটিউটেড বাই মুসলিম মিড্‌ল ক্লাস, মুসলিম রাইজিং মিড্‌ল ক্লাস। পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা সবাই ছিলেন বড় বড় সামন্ত প্রভু। পূর্ব পাকিস্তানের একজন সদস্যও তাঁদের কাছে গণনীয় ছিলেন না। পাকিস্তানেও ইস্কান্দর মির্জার মতো বড় বড় নেতারা সব ছিলেন। মিয়া ইফতেখার উদ্দিন ছিলেন পাকিস্তান টাইমসের মালিক এবং জাতীয়তাবাদী। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একজন বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা। পরে পাকিস্তান সরকার তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।

মিয়া মমতাজ দৌলতানার বক্তৃতা আমি শুনেছি। পারফেক্ট বক্তৃতা দিতেন তিনি এবং সিরিয়াস ব্যাপারে আলোচনা করতেন। পাকিস্তান পার্লামেন্টে সিরিয়াস কোশ্চেন উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সিরিয়াসলি তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত প্রভুরা একে অপরের সাথে টেক্কা দেবার জন্যে একটি নির্বাচনী ট্যাকটিস ব্যবহার করত। সামন্ততন্ত্রের টপ সেকশানটা যদি মনে করত যে অমুককে আমরা নির্বাচনে কনটেস্ট করতে দেব না, তবে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে পঞ্চাশ বা এক শত মাইল দূরে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। এর ফলে একদিকে সেই প্রার্থীর পক্ষে বাড়ি ফিরে এসে আবার নোমিনেশন পেপার সাবমিট করা সম্ভব হত না আর অন্যদিকে যে ব্যক্তি এটা করত তার বিরুদ্ধে কোনো মার্ডার কেস ফাইল করা যেত না।

কমিউনিস্ট কর্মী পশ্চিম পাকিস্তানেও ছিল, তবে ইস্ট বেঙ্গলের মতো অত বেশি ছিল না। এরিক রহিম নামে এক কমিউনিস্ট নেতার কথা মনে পড়ছে। ওখানকার কমিউনিস্ট কর্মীরা আমাকে যথা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। সব সময় আমার পেছনে স্পাই আছে এটা তো জানাই ছিল। প্লেনে করে করাচী হয়ে যখন মারী গেলাম তখন আমার পাশের সিটেই বসে ছিল উচ্চপর্যায়ের এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোয়েন্দা কর্মকর্তা। আমার নির্বাচনটা পূর্ব ও পশ্চিম, এই উভয় পাকিস্তানে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। ওরা আমাকে কমিউনিস্ট বলে আখ্যায়িত করে, যদিও আমি নিজেকে কমিউনিস্ট দাবি করতাম না। আমি নিজেকে বললাম 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট'। কিন্তু ওরা সে কথা স্বীকার করত না।

৩১. ওয়াশিংটনের উদ্বেগ ও দ্বিতীয়বার কারাবরণ

ওয়াশিংটনে আমার নির্বাচনের খবরটা আসে এভাবে : ওয়ান কমিউনিস্ট ফ্রম জেইল ইলেক্টেড টু কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লি। তাদের কাছে এটা একটা বড় ব্যাপার। ওয়াশিংটন এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দাবি করে করাচীতে আমেরিকান এ্যামবেসাডরের কাছে। আমেরিকান এ্যামবাসাডর ব্যাখ্যা দাবি করে করাচীতে পাকিস্তানের হোম ডিপার্টমেন্টের কাছে। করাচীর হোম ডিপার্টমেন্ট ব্যাখ্যা দাবি করে ঢাকার আবু হোসেন সরকারের কাছে যে, 'টেল আস, হাউ সরদার ফজলুল করিম হ্যাজ বিন রিলিজড!' তখন আবু হোসেন সরকার কোনো রকম করে একটা কৈফিয়ত তৈরি করে জানান যে সরদার ফজলুল করিমকে রিলিজ করা হয়নি। সরদার ফজলুল করিম নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে জেল থেকে বের হয়ে এসেছে। আমরা শিগগিরই তার বিরুদ্ধে আবার মামলা করব এবং তাকে আবার এ্যারেস্ট করা হবে।

আমি পুলিশ ধর্মঘটের কথাটা জানতাম। এও জানতাম যে কমিউনিস্টদের আবার জেলে ঢোকানো হচ্ছে এবং তারা আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে। একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলি। সেদিন দ্বিতীয়বারের মতো পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে এ্যাসেমব্লিতে যোগ দেবার জন্যে আমি তেজগাঁও এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেনে উঠেছি। শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান ইত্যাদি বড় বড় লিডাররাও প্লেনে উঠে পড়েছেন। বোর্ডিং শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ আগে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্লেনটা ছাড়ছে না, দেরি করছে। এমন সময় এয়ারপোর্টের ওসি প্লেনে উঠে ডেকে বলছে, 'হু ইজ সরদার ফজলুল করিম?' আমি নিজের পরিচয় দেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, 'ইউ প্লিজ কাম ডাউন। ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট।' এই বলে আমাকে বিমান থেকে নামানোর সময় আমি 'মুজিব ভাই' বলে ডাক দিলাম। বললাম, 'মুজিব ভাই, আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।' পুলিশ আমাকে সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদ করল, আমি কেমন করে রিলিজ পেয়েছি ইত্যাদি ব্যাপার এবং তার পর সোজা আমাকে সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিল।

৩২. জেল থেকে পালিয়েছে!

সেন্টাল জেলে আমাদের পুরোনো সাথীরা অল্পবিস্তর তখনো আছে। সিকিউরিটি এ্যাক্টের আন্ডারে তো আমি আছিই। ডেপুটি জেলারকে দিয়ে একটা মামলা ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দায়ের করল। মামলাটা হচ্ছে এ রকম : সরদার ফজলুল করিম ওয়াজ নট রিলিজড। দি রিলিজ অর্ডার ওয়াজ অন ফজলুল করিম সরদার অব রাজশাহী। যশোরের এক কর্মী অবশ্য ছিল যার নাম ফজলুল করিম সরদার। হোম ডিপার্টমেন্ট আবু হোসেন সরকারকে বলেছিল, এ ব্যাপারটাকে ব্যবহার করে আমার বিরুদ্ধে কোনো কেস ফাইল করা যায় কিনা। অভিযোগটা হবে এই যে সরদার ফজলুল করিম নিজের নাম ভাঁড়িয়ে জেল থেকে রিলিজ নিয়েছেন, তাকে রিলিজ দেওয়া হয়নি।

কেস যেহেতু হয়েছে, আমাকে মাঝে মাঝে কোর্টে নিয়ে যেত জেল-প্রশাসন। আতাউর রহমান খান সাহেব নিজে আমার পক্ষে মামলা লড়লেন। তিনি আবু হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এটা কী করেছো? সরদারের নামে এটা কী রকম কেস তুমি করলে? তখন আবু হোসেন সাহেব উত্তর দিলেন, 'এতে তো কিছু হবে না। কেস একটা করতে বলেছে তাই কেরছি।' কিছু হলো না অবশ্য শেষ পর্যন্ত। কোর্টে ডেপুটি জেলারকে জেরা করা হলো এভাবে : 'সরদার ফজলুল করিমকে আপনি চেনেন?' উনি উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ চিনি'। 'সরদার ফজলুল করিমকে ওঁর সেল থেকে কে ডেকে নিয়ে এসেছিল আপনাদের অফিসে?' উনি উত্তর দিলেন, আমরাই'। তা হলে কেমন করে আপনি বললেন যে, উনি নিজের নাম ভাঁড়িয়ে জেল থেকে পালিয়ে গেছেন? তখন জেলার মুখ ফসকে বলে ফেলল : 'স্যার আমাদের উপর হুকুম হয়েছে একটা কেস করার, তাই করেছি।' এ কথা বলাতে ডেপুটি জেলার বেচারার চাকরিটা চলে যায়। তিনি নিজেকে ঠিকভাবে ডিফেন্ড করতে পারেননি। আমি অবশ্য মানহানির মামলা করতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করিনি। জজ বললেন, 'মিসটেকেন রিলিজ হয়ে গেছে'। এর পর সিকিউরিটি অধ্যাদেশের আভারে আমাকে আবার সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হলো।

৩৩. ৫৬-র সংবিধান : স্বাক্ষরবিহীন ছবি

১৯৫৬ এর কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেমব্লি একটা স্মরণিকা বের করেছিল। এই স্মরণিকাটি এখনো পাওয়া যায়। সেই স্মরণিকায় আমার ছবি আছে। একটা হ্যাংলা-পাতলা, মুখ ভাঙা লোকের ছবি যার নিচে ইংরেজিতে নাম লেখা আছে সরদার ফজলুল করিম। তাতে আওয়ামী লীগের সদস্যদেরও ছবি আছে কিন্তু ঐ ব্যাখ্যাটা নাই যে কেন তারা কনস্টিটিউশনে সই করেননি। হাসান হাফিজুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের যে দলিলপত্রের একটা সঙ্কলন করেছেন তার মধ্যে এই ব্যাপারগুলো আছে কিনা, আমি জানি না। ওখানে প্রথম খণ্ডে ৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলির একটা বিবরণ দেওয়া আছে। এই কনস্টিটিউশান মেকিঙের ব্যাপারটা সেখানে কতখানি আছে তা আমি দেখতে পারিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেন্টারে যখন সরকার পরিবর্তন হলো অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তার আগে খুব ভাঙাগড়া হয়েছে সরকারে। কখনো চৌধুরী মুহম্মদ আলী, কখনো বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন আইন মন্ত্রী। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হলো। শেখ মুজিব একদিন ডেমোনেসট্রেটিভলী জেলখানায় গিয়ে সিকিউরিটি প্রিজনারদের বার করে নিয়ে আসলেন। এই ঘটনাটা ঘটে ১৯৫৬ সালে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত দেওয়া হচ্ছে তখন। জয়েন্ট ইলেকশানের পক্ষে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বক্তৃতাটা এ সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো লোকেরা খুব বড় রকমের এ্যাডভোকেট ছিলেন। তাঁরা যখনই কিছু এ্যাডভোকেট করতে চাইতেন তখন খুবই দক্ষতার সঙ্গেই তা করতে পারতেন। তখনই আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মুভমেন্টটা প্রথম দেখি। হি ওয়াজ এ সিরিয়াস ম্যান। যখন যে কাজ তিনি করতেন, তিনি তখন তা সিরিয়াসলিই করতেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন ঠিক করতেন যে তিনি একটা বক্তৃতা দেবেন তখন বক্তৃতার পয়েন্ট সব ঠিক করা, পয়েন্টগুলো উচ্চারণ করা, এ্যাসেমব্লির করিডোরে ঘুরে ঘুরে নিজের বক্তৃতা রপ্ত করা ইত্যাদি তিনি নিজেই করতেন।

তখন পূর্ববঙ্গ আইন সভার এক দিকে হক সাহেবের দলে আবু হোসেন সরকার আর অন্যদিকে আওয়ামী লীগ। তারা পালটাপালটি করছে, এক দল আরেক দলকে কথা বলতে দিচ্ছে না, আজ আবু হোসেন সরকার সাহেবের গভর্নমেন্ট আছে কিন্তু পরদিন আওয়ামী লীগ তাকে সমর্থন না করার ফলে আবু হোসেন সাহেবের সরকার নো কনফিডেন্স ভোটে ডিফিটেড হয়ে যাচ্ছে, আবার আওয়ামী লীগ আসছে—এই যে ব্যাপারটা, এটা অত সহজে আমি পিকচারাইজ করতে পারব না।

এই টাগ অফ ওয়ারের অবসান হলো যখন ১৯৫৮ সালের অক্টোবরের গোড়ার দিকে (সম্ভবত ৭ই অক্টোবর) পাকিস্তান সরকার মার্শাল ল জারি করল এবং এ্যাসেমব্লি ভেঙে দিল। ফলে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানটাও বাতিল হয়ে গেল। যে অজুহাতটা দেখিয়ে আইয়ুব খান ক্ষমতায় এল ১৯৫৮ সালে সেটা হচ্ছে প্রাদেশিক পরিষদের সভায় শাহেদ আলী সাহেবের মার্ডার হবার ঘটনাটা।

৩৪. ৫৮ এর সামরিক শাসন

জগন্নাথ হলের যে অংশটা এমন ভেঙে পড়েছে (অর্থাৎ যে জায়গায় এখন অক্টোবর বিল্ডিং) সেখানেই ছিল এই পার্লামেন্টের অবস্থিতি। এখানে পার্লামেন্টের সেশন হয়েছে। সেখানে দর্শকদের গ্যালারিতে বসে আমি পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পার্লামেন্টের সেশন অবজার্ভ করেছি। কিন্তু পাকিস্তান পার্লামেন্টের কোনো সেশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ভবনে হয়েছিল কিনা দ্যাট আই ক্যানট্ রিমেমবার* । সেই প্রাদেশিক আইন সভায় শাহেদ আলী মার্ডারড্ হন। ব্যাপারটা ঘটেছিল এ রকম : পার্লামেন্টে পেপার ওয়েট ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছিল, এবং একটা পেপার ওয়েট ইন্নোসেন্ট শাহেদ আলী সাহেবের কপালে গিয়ে লাগে এবং রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালাইজ করা হয়েছিল কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণজনিত কারণে শাহেদ আলী সাহেব মারা যান। দিজ গেইভ এ ক্যজ টু আইয়ুব খান টু ডিক্রেয়ার মার্শাল ল এন্ড ডিজলভ্ অল এ্যাসেমব্লিজ। অল দিজ ওয়াজ ডান ইন অক্টোবর ১৯৫৮।

১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত আমি ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির মেম্বার হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছি। যেমন, বরিশাল গিয়েছি। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছি। ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির মেম্বার হিসেবে আমার কিছু প্রিভিলেজ ছিল যেমন, ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর টিকেট পেতাম আমি। ১৯৫৮ এর শেষের দিকে একদিন বরিশাল গিয়েছি। তখন অক্টোবর মাসই ছিল সম্ভবত। এখনো মনে আছে, আমি জাহাজ থেকে ডিসএম্বার্ক করব তখন দেখি আমার বন্ধুবান্ধবরা, আমার কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বাররা সবাই স্টিমার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং পাড়ে দাঁড়িয়ে তারা চিৎকার করে ঘোষণা দিচ্ছেন, মার্শাল ল জারি হয়ে গেছে। তখন আমি বুঝলাম যে মার্শাল ল জারি হয়ে গেছে। তখন আমি চিন্তা করলাম, আমার আর নরমাল জাহাজে করে (অর্থাৎ যে জাহাজে আমি সাধারণত চলাফেরা করতাম, R.S.N.I.G.N কোম্পানির বড় বড় সব জাহাজে) আমার ঢাকায় ফেরা উচিত হবে না। ঘটনা আরো ঘটবে। সুতরাং তার পরদিন বরিশালে আমি কোনো মিটিং করলাম না।

তখন বরিশাল-ঢাকা লঞ্চ সার্ভিস চালু হয়ে গেছে। আর এস এন আই জি এন কোম্পানির ভালো জাহাজও যেমন অস্ট্রিচ, লেপচা ইত্যাদি চলছে, আবার প্যারালাল ওয়েতে লঞ্চও চলছে। আমি এ রকম একটা লঞ্চে করে ঢাকায় ফেরত আসলাম। আমার তখন বাসস্থান ছিল, এখন যেটা মতিঝিল এজিবি কলোনি সেখানে। এই 'একাউন্টেন্ট জেনারেল', কলোনিতে আমার একটা কোয়ার্টার ছিল। কোয়ার্টারটা পেয়েছিলাম, কারণ আমার ওয়াইফ মতিঝিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের টিচার ছিলেন। এ্যাডুকেশন সার্ভিসের লোক তিনি, সে যুগের এম এ বি টি ছিলেন। মাহফুজুল হক সাহেব নামে হক সাহেবের দলের একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি যখন তাকে বললাম যে, 'আমার তো বাসা নাই, আমার ওয়াইফ কেমন করে কাজ করবে?' তখন মাহফুজুল হক বোধহয় স্টেট মিনিস্টার ছিলেন। মাহফুজুল হক সাহেব

---

* অধ্যাপক আহমেদ কামালের বাবা আদেল উদ্দীন আহমদ কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির মেম্বার ছিলেন। আহমেদ কামাল সংশোধনী হিসাবে জানিয়েছেন তখনকার জগন্নাথ হল ভবনে পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির অধিবেশন বসেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্টারভেন করে এ জি বি কলোনিতে আমার নামে একটা দুই কামরার বাসা এ্যালট করালেন। ঐ বাসাতেই আমার স্ত্রী আমাদের একটি বাচ্চা (তখনো সন্তান আমার একটি) নিয়ে থাকতেন।

আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করার পর সব এ্যাসেমব্লি ওয়াজ ডিজলভ্ড। সো আমার মেম্বারশিপ ওয়াজ ডিজলভ্ড। আমি জানতাম, আমাকে আবার এ্যারেস্ট করা হবে। অন্য কাউকে এ্যারেস্ট করা হোক বা না হোক আমাকে এ্যারেস্ট করা হবে। তার জন্যে আমি মনে মনে তৈরি হলাম। আমার পরিবারকে এসব কথা জানালাম। আমার ফাদার ইন ল একজন অফিসার ছিলেন। তাকেও বললাম যে আমি যদি এভেইলেবল না হই অর্থাৎ আমি যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাই বা আমি যদি বাসায় না থাকি তা হলে এ্যাটাক উইল কাম অন মাই ফ্যামিলি। পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করবে : উনি কোথায় গেলেন?' উনি তো ছিলেন। আমাদের কাছে খবর আছে যে সন্ধ্যার সময় উনি বাসায় ছিলেন। আমি দুই এক সময় যে রাত্রে আমার বাসা এ্যাভয়েড করে আমার বন্ধুদের বাসায় না গেছি তা না। কিন্তু আমি যে এভেইলেবল অর্থাৎ আমাকে যে পাওয়া যায় এটাও আমি ওদের চোখের সামনে রেখেছি।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আমি যখন আমার বাসার কাছাকাছি একটা জায়গায় বেড়াচ্ছিলাম আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে তখন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কিছু লোক এসে আমাকে বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে আসেন।' তারা আমাকে থানায় নিয়ে গেল। থানা থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেন্ট্রাল জেলে। আগের বার জেলে থাকা অবস্থায় আমি ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির মেম্বার ছিলাম। কিন্তু এবার যেহেতু এ্যাসেমব্লি ডিজলভ্ করে দেওয়া হয়েছে সেহেতু আমি এখন একজন সাধারণ সিকিউরিটি প্রিজনার মাত্র।

AMARBOI.COM

৩৫. আবার কারাবরণ

পাকিস্তান নামক ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রটি ছিল আমার বৈরীশক্তি। এই শক্তি আমাকে জেলখানায় আটকে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীটাকে তো আটকে রাখতে পারেনি। এটা আমরা জেলখানায় বসেও বুঝতাম। পৃথিবী একটা গ্রহ, তার মধ্যে পাকিস্তান একটা উপগ্রহ, সেই উপগ্রহেরই আর একটা তস্য উপগ্রহ হচ্ছে জেলখানাটা। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে জেলখানাটাও ঘুরছে। এভাবেই আমরা জিনিসটাকে দেখতাম। পৃথিবী ঘুরছে—এটা বিশ্বাস করতাম বলেই, ঐ যে কনসোলিডেশনের কথা বলছিলাম সেখানে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যাপার, এর অগ্রগতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতাম। আমাদের কল্পনার সাথে বাস্তবের মিল থাকুক বা না থাকুক, জেলখানার মধ্যে আমরা সবসময় একটা রাজনৈতিক জীবনযাপনের চেষ্টা করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্শাল ল জারি হওয়ার পরে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হলো এবং ইমিডিয়েটলি আমাকে ঢাকা থেকে রাজশাহী জেলে ট্রান্সফার করে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ১৯৫৯ গেল। ১৯৬০ গেল। ১৯৬১ও কেটে গেল। রাজশাহী থেকে হয়তো আমাকে কুমিল্লা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয়েছিল। আমার তরফ থেকে সরকারের কাছে আবেদন ছিল, আমি তো কোনো পলিটিক্যালি ইনভলব্‌ড লোক নই, আমাকে কেন এত বার এ্যারেস্ট করা হচ্ছে? জেলে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক এসে মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। কাজী এমদাদুল হক সাহেবের ছেলে কাজী আনোয়ারুল হক একজন বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন। ওঁরা মনে করতেন যে আমি একজন বড় কমিউনিস্ট লীডার। এটা ভেবে একদিন ঢাকা জেলে তিনি আমার সাক্ষাৎকার নেন। উনি আমাকে কিছু পলিটিক্যাল প্রশ্ন করেন : 'এই যে কমিউনিস্ট থিসিস, এই থিসিস সম্পর্কে আমার কী বক্তব্য?' আমি তাঁকে উত্তর দিলাম যে এই সব থিসিস-টিসিস আমি কিছুই জানি না। উনি বললেন, 'আপানার মতো লোক কিছু জানেন না এটা হয় কখনো?' আমি রিয়েলি তেমন কিছুই জানতাম না।

১৯৬২-এর শেষের দিকে 'আমার ফাদার ইন ল যিনি একজন ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন, তিনি গভর্নমেন্টের কাছে যান। উনি বললেন, ও তো ইনোসেন্ট লোক। ওকে আপনারা কেন আটকে রেখেছেন। ছেলেটা তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বললেন যে আমরা তো জানি ওনাকে। কিন্তু আপনারা যদি ওনার পক্ষে সিকিউরিটি হিসেবে না দাঁড়ান তবে তাকে মুক্তি দেওয়া যাবে না। আমরা ওনাকে কিছু রেস্ট্রিকশান দেব। উনি যেন এসব রেস্ট্রিকশান ভায়োলেট না করেন। এই সিকিউরিটিটা আপনারা যদি না দেন তবে আমাদের পক্ষে ডিসিশন নেওয়া মুস্কিল হবে। অন্য কোনো আত্মীয় হয়তো সাহস করতেন না, কিন্তু আমার ফাদার ইন ল অফারড হিমসেলফ্ এ্যাজ সিকিউরিটি ফর মাই রিলিজ।

এর ফলে ১৯৬২ এর ডিসেম্বর মাসে আই ওয়াজ রিজিড আন্ডার সারটেন কনডিশনস্। দুই বছর সেসব কনডিশন আমাকে মানতে হয়েছিল। দি ফলোয়িং কন্ডিশনস আর ইমপোজড আপন ইউ : ১. দ্যাট ইউ উইল নট ইনভলব ইয়োরসেলফ্ ইন এনি পলিটিক্যাল এ্যাকটিভিটিজ, ২. ইউ উইল নট মেক এনি পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট, ৩. দ্যাট ইউ উইল নট লীভ দি ঢাকা টাউন উইদাউট দি পারমিশন অব দি পুলিশ, ৪. ইফ ইউ গো সাম হোয়ার, ইউ উইল রিপোর্ট দি পুলিশ দেয়ার ... এই কনডিশনগুলো আমি দুবছর ধরে স্ক্রুপুলাসলি মেনটেন করেছিলাম।

আবার বাসাটা তখনো এ জি বি কলোনিতে ছিল। কমিউনিস্টেরা বুঝতে পেরেছিল যে আমি আর সক্রিয় নই। তবে ওদের বিরুদ্ধেও আমি নই। আগে তারা চাঁদাটাদা চাইত, এখন আর চায় না। কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেকে আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যত না পছন্দ করত তার চেয়ে বেশি পছন্দ করত আমার বাচ্চাদের। বাচ্চাদের কাছে এসে তারা গল্প করত। অনিল মুখার্জী সে সময়ের একজন বড় কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক আমি তাকে 'অনিলদা' বলতাম। তিনি আমার বাসায় একজন রেগুলার ভিজিটর ছিলেন। তিনি আমাদের বাসায় অনেক দিন খেয়েছেন। কিন্তু হি হ্যাড এ মেথড অফ হিজ ওন। তিনি কখনো কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলতেন না। অনিলদা আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থাতেই রাশিয়া ভিজিট করেছিলেন।

৩৬. বাংলা একাডেমি

১৯৬৩তে বাংলা একাডেমিতে যোগ দিলাম। সৈয়দ আলী আহসান সাহেব তখন বাংলা একাডেমির পরিচালক। তিনি আমার অপরিচিত লোক নন। তার ভাই সৈয়দ আলী আশরাফ ইন্টারমিডিয়েটে আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল আলী আশরাফ খুব ভালো ছাত্র ছিল। আলী আশরাফ, অজিত দে এবং আমি একেবারে এক সেকশানে পড়েছি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। কার্জন হলের বিপরীত দিকের বিল্ডিংটা ছিল তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। ১৯০৫ সালে এটি তৈরি করা হয়।

সৈয়দ আলী আহসানদের বাড়ি ছিল হোসনী দালানে। তাঁদের বাড়িতে আমার যাতায়াত ইন্টারমিডিয়েট থেকে। তিনি আমার সিনিয়র ছিলেন এবং আমার মেরিট তিনি জানতেন। আমাকে এবং আবু জাফর শামসুদ্দিন সাহেবকে বাংলা একাডেমির অনুবাদ বিভাগে নিয়ে গেলেন সৈয়দ আলী আহসান। পরে আমি জানতে পারি যে আমার ব্যাপারে সৈয়দ আলী আহসান হ্যাড টু টক উইথ আবদুল মোনায়েম খান, দি দেন গভর্নর অব ইস্ট পাকিস্তান। সৈয়দ আলী আহসান মোনায়েম খানকে জিজ্ঞেস করেন যে, উনি আমাকে অর্থাৎ সরদার ফজলুল করিমকে বাংলা একাডেমিতে রাখতে পারেন কিনা। তখন মোনায়েম খান পরিষ্কারভাবে সৈয়দ আলী আহসানকে বলেন, 'আই উইল নট লেট সরদার ফজলুল করিম গো ব্যাক টু ঢাকা ইউনিভার্সিটি বাট ইউ ক্যান কিপ হিম আন্ডার ইউ। পরবর্তীকালে মোনায়েম খান পাবলিক মিটিঙেও এ ব্যাপারটার উল্লেখ করেছেন।

সৈয়দ আলী আহসান সাহেব আমাকে যখন বাংলা একাডেমির অনুবাদ সেকশানে নিলেন, তখন আবু জাফর শামসুদ্দীন আমার মতিঝিল বাসায় গিয়ে খবর দেন যে, আমার কেসটা হয়ে গেছে। আই রেসপেক্টেড হিম এন্ড হি লাভড মি লাইক এ্যানিথিং। তিনি ছিলেন ফ্রেন্ড অব দি কমিউনিস্ট। তাকে আমি 'জাফর ভাই' বলতাম। সিকানদার আবু জাফরকেও 'জাফর ভাই' বলতাম। সিকানদার আবু জাফর বড় কবি হিসেবে, নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু জাফর শামসুদ্দীন একজন সেলফ্ মেইড ম্যান। তিনি ঢাকার একটা অঞ্চল থেকে এসেছেন। তিনি প্রথমে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তিনি কোনো ইংরেজি ডিগ্রি নিয়েছেন বলে আমি জানি না। কিন্তু তিনি ইংরেজিতে দক্ষ হন। ইংরেজিতে তিনি প্রবন্ধও লিখেছেন। গোড়াতে তিনি ছিলেন এ্যালাইড টু সৈয়দ আলী আহসান। আবু জাফর শামসুদ্দীন পিইএন নামে যে একটা ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকান অর্গানাইজেশন ছিল তার সঙ্গে যুক্ত হন, যদিও এর সম্পর্কে খুব একটা এ্যাডভোকেসি তিনি করতেন না। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। মাওলানা ভাসানীর কৃষক সমিতির সাথে তিনি এ্যালাইড হন। কাগমারী সম্মেলনে হি প্লেইড হিজ পার্ট বাই গিভিং এ্যাডভাইস এন্ড এটসেটরা। তিনি ঔপন্যাসিক। তিনি গল্পকার। তাঁর একটা গল্পের সঙ্কলন ছিল। 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' নামে একটি বেশ বড় রকমের বই লেখেন তিনি।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উলটো দিকে আবু জাফর শামসুদ্দীন সাহেবের বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির মিটিং হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ফরহাদের সময়ে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি সিমপ্যাথেটিক ইন্টেলেকচুয়ালদের নিয়ে একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। আবু জাফর শামসুদ্দীন ছিলেন এই উপদেষ্টাদের একজন। তাঁর বাড়িতে তিনি উপদেষ্টা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ডাকতেন এবং খই, মুড়ি, চানাচুর ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়িত করতেন। ৬০ এর দশকে কমিউনিস্টদের একজন বড় বন্ধু ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের পদটা হয়েছে স্বাধীনতার পরে। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত পরিচালক পদই ছিল। মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের পরে বাংলা একাডেমির পরিচালক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। আলী আহসান সাহেব টুক হিজ প্রফেসরশিপ এবং তাঁর পরে এলেন কাজী দীন মুহম্মদ। কাজী দীন মুহম্মদের একটা ধর্মীয় ভাব ছিল। ওয়েস্ট পাকিস্তানের লিডারেরা তখনো এখানে আসছে। কাজী দীন মুহম্মদ তাদের খুব করে আপ্যায়িত করার চেষ্টা করছেন।

আমি তখন সংস্কৃতি বিভাগের একজন কর্মকর্তা। তরুণ ছেলেরা একদিন এসে আমাকে বলল যে তারা একটা সভার স্থান চায়। বাংলা একাডেমির বটতলা ব্যবহার করতে পারলে তাদের খুব লাভ হয়। আমি তাদের বললাম : 'বটতলার পারমিশন আমি তোমাদের দিতে পারি না। তোমাদের যেতে হবে কাজী দীন মুহম্মদের কাছে। আমি নিয়ে যাবো'। ছেলেরা তখন আমাকে বলল, 'আপনি তো দীন মুহম্মদের দালাল হয়ে গেছেন।' আমি তখন হেসে বললাম : 'দেখো, আমি যদি কাজী দীন মুহম্মদের দালাল না হবো তা হলে আমি আজ বাংলা একাডেমিতে কেন থাকবো? এটা তো তোমাদের বোঝা উচিত।' এর পর সেদিন বিকাল বেলাতেই ছেলেরা এসে আমার কাছে মাফ চেয়ে গেছে এই বলে যে, আপনার সম্পর্কে এই কথা বলা আমাদের ঠিক হয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একবার ছেলেরা এসে বলল যে, তারা সোমেন চন্দের উপর একটা অনুষ্ঠান করবে। আমি যেন একটা পারমিশান দিই। আমি বললাম, 'আমি পারমিশান দিলে তো হবে না। তোমরা দরখাস্ত করো পরিচালকের বরাবরে। সংস্কৃতি বিভাগের কর্মকর্তার মাধ্যমেই করো। আমি তোমাদের নিয়ে যাবো দীন মুহম্মদের কাছে।' ছেলেদের নিয়ে গেলাম আমি কাজী দীন মুহম্মদের কাছে। বললাম যে, এরা সোমেন চন্দের উপর একটা অনুষ্ঠান করতে চায়। এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, কাজী দীন মুহম্মদ বললেন, 'সোমেন চন্দটা কে?' আমি বললাম, 'সোমেন চন্দ ওয়াজ কিলড ইন ১৯৪২। সোমেন চন্দ ওয়াজ এ ভেরি পোটেনশিয়াল রাইটার।' দীন মুহম্মদ সাহেব বললেন, 'আমি তো জানি না!' এ ব্যাপারে আমার একটা রাইট আপ আছে যে সোমেন চন্দকে একটা জেনারেশন চেনে না কিন্তু একটা সময় আসছে যখন তরুণরা সোমেন চন্দকে মাটি খুঁড়ে বার করবে।

সংস্কৃতি বিভাগে যত অনুষ্ঠান হত আমিই সব কনডাক্ট করতাম। যাঁরাই অনুষ্ঠান করতে আসতেন তাঁরা সবাই আমাকে খুবই এ্যাফেকশনেটলি গ্রহণ করতেন। যে অনুষ্ঠানই হত আমি তার বিবরণ একটা মাস্টার বুকে নোট করতাম। দৈনিক ইনকিলাব কদিন আগে লিখেছে যে সরদার ফজলুল করিমের সম্পাদনায় 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য' নামে একটা সঙ্কলন বের হয়েছিল। এই সঙ্কলনে রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা ছিল। এই লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন।

যখন উন্নয়নের দশক অর্থাৎ ছয়ের দশক সেলিব্রেট করা হচ্ছে তখন সৈয়দ আলী আহসান বাংলা একাডেমিতে এক সপ্তাহের একটি সেমিনার করেন। সেই সেমিনারটার নাম দেন তিনি 'আমাদের সাহিত্য'। এতে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পার্টিসিপেট করেছিলেন। মনসুর মুসা পার্টিসিপেট করেছিলেন কিনা আমি জানি না। আবুল কাসেম ফজলুল হক পার্টিসিপেট করেছেন। এক একটা শাখায় যেমন, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এই প্রবন্ধগুলো নিয়ে আমার সম্পাদনায় 'আমাদের সাহিত্য' নামে একটা সঙ্কলন বের হয়েছিল। এ এইচ এম আবদুল হাই যিনি এখন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের চীনা ভাষার অধ্যাপক তিনি এ কাজে আমার সহকারী ছিলেন। আমি ছিলাম বাংলা একাডেমির কালচারাল অফিসার। তিনি ছিলেন সহকারী কালচারাল অফিসার।

পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা 'আমাদের সাহিত্য' সঙ্কলনটিকে একটি রেফারেন্স বুক হিসেবে কনসিডার করেছেন। 'আমাদের দেশ' বা 'এই আমার দেশ' ধরনের একটা প্যাট্রিয়টিক শিরোনাম দিয়ে শিশু-কিশোরদের জন্যেও আমি একটা সঙ্কলন করেছিলাম। এতে আমরা পুরস্কারও দিয়েছিলাম। বই পুরস্কার দিয়েছিলাম। অনেকে এসে পুরস্কার নিয়েছেন। সংস্কৃতি ডিপার্টমেন্ট ওয়াজ কোয়াইট এ ক্রিয়েটিভ ডিপার্টমেন্ট এ্যাট দ্যাট টাইম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা একাডেমিতে কাজ করাকালীন আমার চেষ্টা ছিল, টু গো ব্যাক টু দি ইউনিভার্সিটি। মফিজ উদ্দিন সাহেব যিনি এক সময় ইস্ট পাকিস্তান গভর্নমেন্টের মিনিস্টার ছিলেন, তিনি আমার একটা রিলেশন হন, খালুশ্বশুর। আমি ওনাকে দুই-একবার এ্যাপ্রোচ করেছি। আমি অবশ্য তাঁকে বলিনি যে আপনি অমুককে একটু বলেন। আমি গোবিন্দ চন্দ্র দেবকেও বলেছিলাম, 'স্যার আমাকে ইউনিভার্সিটিতে আসতে দেন না? আপনি তো আমাকে জানেন'। জি সি দেব বলেছেন, 'হ্যাঁ তোমাকে তো জানি, কিন্তু গভর্নমেন্ট না বললে আমি তো তোমাকে নিতে পারি না'। মফিজ সাহেব নামে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন বড় কর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন ইউনিভার্সিটির একজন বড় লিডার। তিনি মারা গেছেন কিনা আমি জানি না। তিনি সিন্ডিকেটের মেম্বার ছিলেন। আমি ওনাকেও ইমপ্রেস করার চেষ্টা করলাম এই বলে 'হোয়াই ডোন্ট ইউ গিভ মি এ চান্স টু গো ব্যাক টু দি ইউনিভার্সিটি?' তখন উনি আমাকে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কমিউনিস্ট নন?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো কোনো অর্গানাইজেশন করি না।' উনি বললেন, 'আই ডু নট বিলিভ দ্যাট।' যে বীজ আপনার মধ্যে এসেছে তা কোনো দিনও আপনার মধ্য থেকে চলে যেতে পারে—এটা আমি বিশ্বাস করি না। তখনকার দিনে একজন সিরিয়াস কমিউনিস্ট ওয়ার্কারের প্রতি একজন সিরিয়াস নন কমিউনিস্টের যতটা না হোস্টিলিটি ছিল তার চেয়ে বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। যার জন্যে হি ডিড নট ডিজরেসপেক্ট মি। তিনি আমাকে এভাবে রেসপেক্ট দিলেন যে আমি মনে করি না, আপনি কমিউনিজম ছাড়তে পারেন।

৬৫-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মুনীর চৌধুরী একটু পার্টিজান হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান গভর্নমেন্ট যা চেয়েছে ও তাই করেছে। গভর্নমেন্ট তাকে খেতাব দিয়েছে। মুনীর চৌধুরীকে পাকিস্তান সরকার ফ্রন্টেও নিয়ে গিয়েছিল। আবু জাফর শামসুদ্দীন সাহেব ও পথে যায়নি। মুনীর এ সময়ে আমাকে একটু এড়িয়েই চলত। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে চাই—এটা সে জানত। কিন্তু আমার পক্ষে কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ সেটা তার নিজেরই ক্ষতি করতে পারত। সরদার ফজলুল করিমের পক্ষে যে বলে সেও যে কমিউনিস্ট—এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আর কোনো সন্দেহই থাকত না।

প্রশাসন ভাবত, মুনীর বামপন্থী রাজনীতি থেকে দূরে সরে এসেছে। কিন্তু আমার সম্পর্কে এ রকম ধারণা তাদের কখনোই জন্মায়নি। একবার পাকিস্তান গভর্নমেন্ট মুনীরের পাসপোর্ট আটকে দেয়। সে আমেরিকায় যেতে চাচ্ছিল উচ্চশিক্ষার জন্যে। তখন মুনীর তাদের ঠাট্টা করে বলেছিল, 'মিয়ারা আপনারা কার পাসপোর্ট আটকাইতাছেন? আপনাগো পরে যারা ক্ষমতায় আইবো তারা তো প্রথমে আমার পাসপোর্টটাই সীজ করবো!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে সময় কমিউনিস্টরা আমাকে তাদের একজন নিষ্ক্রিয় মিত্র হিসেবে বিবেচনা করত। মণিদা অবশ্য দুই-একবার বাংলা একাডেমিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। একবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কমিউনিজমই যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি তুমি কি তা আর বিশ্বাস করো না? আমি তাঁকে উত্তর দিয়েছিলাম, 'মণিদা, বিশ্বাসের কথাটা যদি তোলেন তো সেটা অন্য ব্যাপার হয়ে যায়।'

একবার আমেরিকান দূতাবাসের এক সেক্রেটারি আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসে বাংলা একাডেমিতে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ঐ সেক্রেটারি আমাকে বলে, 'হোয়াই ডোন্ট ইয়ু জয়েন আস ইন লাঞ্চ?' আমি তখন তাকে জবাব দিই, 'ইয়োর টাইম ইজ ভ্যালুয়েবল এ্যান্ড মাই টাইম ইজ অলসো ভ্যালুয়েবল। লেট আস নট ওয়েইস্ট আওয়ার টাইম!'

৩৭. ৬৯ এর গণআন্দোলন

১৯৬৯ থেকে শুরু করে ১৯৭০ এবং ১৯৭১-এর ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম। আই ওয়াজ এ কনসাস অবজার্ভার অব দি টোটাল প্রসেস। আই ওয়াজ ভেরিটেবলি এ ক্যামেরাম্যান। আমি ফটোগ্রাফারও ছিলাম। ৭১ সালের উত্তাল দিনগুলোর বিভিন্ন ঘটনা খুব সুন্দরভাবে আমি কালেক্ট করেছিলাম আমার ইয়াশিকা ক্যামেরায়। এগুলো প্রিজার্ভেবল ছিল।

১৯৬৯ এর গণআন্দোলন আমি নিজের চোখে দেখেছি। আসাদের যে ঘটনা অর্থাৎ আসাদকে যখন মার্ডার করা হলো, সে দিনের কথাও মনে আছে। সেদিন কাজী দীন মুহম্মদ মোটর গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কক্সবাজার। সেখানে একটি মিটিঙে তিনি বক্তৃতা দেবেন। আমরা যখন মাঝপথে তখন এই নিউজটা এল যে, হাতিরদিয়াতে, আসাদ ওয়াজ কিল্ড। আমরা আর কক্সবাজার যেতে পারলাম না। আমরা ঢাকায় ব্যাক করলাম। আসাদকে আমি জানতাম না। কিন্তু তার মৃত্যুতে ঢাকায় সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হয়। এক মন্ত্রীর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় মর্নিং নিউজ অফিস। আমার এসব ঘটনা মনে আছে। সত্যেন সেনের মতো লোকেরা তখন জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে আসেন। সত্যেন সেনের মতো একটা নিরীহ লোক একটা লাঠি হাতে কয়েদিদের সাথে মিছিল করে যাচ্ছে শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে, চিন্তা করুন একবার! এ ঘটনাটা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। ইট ওয়াজ রিয়েলি এ গণঅভ্যুত্থান।

১৯৬৯-এ আগরতলা মামলা থেকে যে বঙ্গবন্ধু বের হয়ে এলেন—এটা একটা বিরাট ব্যাপার। তাকে দেখার জন্যে আমি গেলাম তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে। আমি অবশ্য জানতাম যে জনতার ভিড়ে শেখ মুজিবের কাছে আমি যেতে পারব না। কিন্তু তবু আমি গেলাম, কারণ আমি মনে করতাম জনতাই হচ্ছে শেখ মুজিব এবং শেখ মুজিবই হচ্ছেন জনতা। এভাবে আমার একটা রাইট আপ আছে। রাইট আপটির শিরোনাম : তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৮. ১৯৭০ এর নির্বাচন ও অতঃপর

১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করল। এই জয়ের পর বাংলা একাডেমি আয়োজিত ২১শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হল*। এ ব্যাপারে কবীর চৌধুরী ওয়াজ দি টপমোস্ট পার্সন। তিনি তখন পরিচালক। আমি এবং কবীর চৌধুরী (এ এইচ এম আবদুল হাইও ছিলেন বোধহয় আমাদের সঙ্গে) তাকে আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা গিয়ে পৌঁছার আগেই বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমিতে এসে গিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমিতে একটি উদাত্ত বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি সবার জবাবদিহিতার কথা বলেছিলেন। তিনি বলছিলেন : 'আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলেন, আপনারা ভাষার জন্যে কী করেছেন? দেশের জন্য আপনারা কী করেছেন?' তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমরা যেদিন ক্ষমতায় যাব সেদিন থেকে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে।' পরবর্তীকালে ক্ষমতায় গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কথা রক্ষা করেছিলেন।

শেখ সাহেব যখন বাংলা একাডেমিতে বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন খবর এল যে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছেন : 'সিডিউলড মিটিং অব দি ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি ওয়াজ পোস্টপনড'। এই মেসেজ ওয়াজ গিভেন টু শেখ সাহেব এবং দি মোমেন্ট দি মেসেজ ওয়াজ গিভেন টু শেখ সাহেব এবং দি মোমেন্ট দি মেসেজ ওয়াজ গিভেন টু হিম, শেখ সাহেব বাংলা একাডেমির মিটিং থেকে চলে যান। মিটিংটা ওভার হয়ে যায়। 'আমি যাই, পরে দেখা হবে'—বলে আমাদের দিকে হাত নেড়ে শেখ মুজিব চলে গেলেন আওয়ামী লীগ অফিসে।

তখন ফান্ড-টান্ড রেইজ করার প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হচ্ছে এবং সেই কমিটির জন্যে চাঁদা তোলা হচ্ছে। আমরা চাঁদা তুলেছি, চাঁদা দিচ্ছি। আহমদ শরীফ স্যারসহ আমরা শহীদ মিনারের মার্চ করে যাচ্ছি। এই সমস্ত জঙ্গি ব্যাপার ৭১ এর প্রথম থেকেই শুরু হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানের বিখ্যাত জনসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি বারবার বর্ধমান ভবনের ছাদে উঠে দেখছিলাম কী রকম গণজমায়েত হয়েছে। তখন রেসকোর্স ময়দানের উপর পাকিস্তানি বিমান চক্কর দিচ্ছিল বারবার।

৭১ সালের ২৫শে মাচের শেলিঙে তিনতলার তেমন ক্ষতি হয়নি। দোতলার ক্ষতি হয়েছিল বেশি। ২৭শে মার্চ তারিখে অফিসে এসে দেখলাম, আমার ঘরের দরজা ভেঙে ফেলা হয়েছে। দেয়ালে অনেকগুলো বুলেট চার্জ করা হয়েছে। আমার টেবিলের পিছনে যে স্টিলের আলমারি, সেটার জিনিসপত্র সব তছনছ করে

---

* বঙ্গবন্ধুর বাংলা একাডেমিতে আসার ঘটনাটা হয়তো ঘটেছিল ১লা মার্চ তারিখে : সেদিনই জাতীয় পরিষদে নির্ধারিত সভা স্থগিত করার ঘোষণা প্রচারিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলা হয়। সেই ঝাঁজরা দেয়ালের সামনে, ভাঙা দরজাওয়ালা ঘরে বসেই পুরো ৭১ সালটা আমি অফিসের কাজ করেছি।

আই কনডিনিউড ওয়ার্কিং ইন মাই অফিস। ইফ আই এ্যাম নট এ্যাভেইলেবল টু আর্মি দেন আর্মি উইল জাম্প ওভার মাই ফ্যামিলি ইন মতিঝিল এজিবি কলোনি। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম না আমার ছেলেমেয়েদের সামনে আমাকে গ্রেপ্তার করা হোক। সে জন্যে আমি সকাল-সন্ধ্যা বাংলা একাডেমিতে অফিস করতাম। কবীর চৌধুরী সাহেব ওয়াজ কোয়াইট ওকে। তিনি তাঁর লেখাপড়া করতেন। আমরা কথাবার্তা বলতাম। সাধারণ কিছু কাজকর্ম হতো কিংবা হতো না—সেটা বড় ব্যাপার ছিল না। এই যে এখলাস উদ্দিন এখন চোখে প্রায় দেখতেই পায় না, সে তো বড় এ্যাকটিভিস্ট ছিল। এই যে আমার গিয়াস, হিস্ট্রির, সে ক্লাস এইটে পড়ার সময় থেকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে সরদার ভাই বলতে অজ্ঞান ছিল। গিয়াসের বড় ভাই নাসিরুদ্দীন আহমদ আমার ইন্টারমিডিয়েটের বন্ধু। গিয়াস, এখলাস এরা সবাই বাঙলা একাডেমিতে আসত।

আমরা সময় কাটানোর জন্যে এক টেবিলে বসে গল্প করতাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কী বলা হয়েছে, মুকুলের চরমপত্রে নতুন কী বলা হলো ইত্যাদি আলোচনা করতাম। কতদিন লাগবে দেশ স্বাধীন হতে, কোন ফ্রন্টে কী হবে? এসব জানার জন্যে আমরা শেষ দিকে প্ল্যানচেট করা শুরু করলাম। প্ল্যানচেটের মধ্যে জিন্নাহ সাহেব আসলেন একবার। তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলো। জিন্নাহ সাহেব কোনো কথাই বলতে চান না। তার পর হক সাহেব আসলেন। হক সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বলেন, দেশ স্বাধীন হতে কতদিন লাগবে?' আমাদের আঙুল নড়ে উঠল। কাগজে লেখা হলো : 'ইট উইল টেক টাইম।' এটা বলেই হক সাহেব চলে গেলেন। এইসব করে আমরা বাংলা একাডেমিতে সময় কাটাতাম।

বাংলা একাডেমির কর্মচারীদের মধ্যে মিলিটারিদের এজেন্ট ছিল। স্বাধীনতার পর তাদের হ্যাকল করা হয়েছে। তাদের থাপ্পড়টাপ্পড় মেরেছে অনেকে। এক এজেন্টের নাম ছিল হেমায়েত। হেমায়েত রেডিও পাকিস্তানে কাজ করত। 'দি সিটুয়েশন ইজ নরমাল' বলে একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করে রেডিও পাকিস্তানের কিছু লোকজন সেই স্টেটমেন্টে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেন। তারা হেমায়েতকে সাথে নিয়ে বাংলা একাডেমিতেও যায়। হেমায়েত আমার কাছে গিয়ে বলল, 'সরদার ভাই, এটা দেখেন। সিগনেচার না দিলে যে কী হবে তা আমরা বলতে পারি না। আপনি নিজে তো বুঝতে পারেন।' তখন আমি নিজে চিন্তা করলাম যে আমি যদি সাইন না দিই তবে আমাকে ইমিডিয়েটলি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে অর্থাৎ আমাকে বাসা ছেড়ে চলে যেতে হবে অথবা আমি যদি বাসায় থাকি, তবে আই শেল বি এ্যারেস্টেড।' এটা আমার পজিটিভ কনক্লুশান। আমি দস্তখত দিতে বাধ্য হলাম। এ্যাট দি গান পয়েন্ট। উপায় ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ঢাকা ছাড়তে পারিনি, কারণ পরিবার নিয়ে আমি কোথায় যাবো? গ্রামে চলে যেতে পারতাম আবু জাফর শামসুদ্দীন ভাইয়ের মতো। কিন্তু সেখানে গিয়ে পরিবার প্রতিপালন করব কীভাবে? ভারতে যাইনি, কারণ, ঢাকা শহর থেকে ভারতে যাবার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। আমি কোনো দলের নই। সুতরাং কোনো দল আমাকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাবে না। আমি তখন কোনো রাজনীতি করি না। কোনো পার্টির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িতও আমি ছিলাম না। আমি বড় কোনো নেতাও ছিলাম না যে পার্টি আমার ভারতে যাবার সব ব্যবস্থা করে দেবে। তা ছাড়া দল না হয় আমাকে রক্ষা করল কিন্তু আমার ফ্যামিলিকে রক্ষা করবে কে? আর আমি ভারতে গেলেই তো হবে না, আমার পুরো পরিবারটিকেও সেখানে নিতে হবে। আমার ফ্যামিলিকে আমি যদি রক্ষা করতে না পারি তবে হোয়াট উইল আই ডু ইউথ মাই লাইফ? এই জন্য আই ডিড নট লিভ মাই কোয়ার্টার। সকালবেলা নিয়মিত অফিসে গেছি, বিকাবেলা বাসায় ফিরেছি। মাঝখানে অফিসে বসে গল্পটল্প করেছি। অনুবাদও করছি কিছু।

আমি ইতোমধ্যে আমার বাসায় বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। আমি বিভিন্ন গণ আন্দোলনের অনেকগুলো ছবি তুলেছিলাম। সেসব ফটোগ্রাফ ইত্যাদি আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি। 'বিসমিল্লহির রহমানুর রহিম' লিখে টাঙিয়ে দিয়েছি আমার দরজায়। পাকিস্তানের পতাকাও একটা রাখা হয়েছে, দরকার মতো সেটাও দেখানো হবে। তখন আমার ছেলেমেয়েরা, দুটি বা তিনটি বোধহয় ছিল তখন, তারা রাত্রে মিলিটারিদের গাড়ি যেমন, ট্রাক বা মাইক্রোবাস আসতে দেখে বা আসার শব্দ শুনে কেঁদে উঠত : 'আব্বা, ঐ আসছে'। তারা বুঝে গেছে, আমাকে এখনো নেয় নাই কারণ, অন্যরা লিস্টের প্রথম দিকে আছে, আমার পালা আসবে একটু পরেই। আর্মি ঘুরে ঘুরে অন্যদের পিকআপ করে নিয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল মাসের দিকে যখন পজিশনটা আরো এ্যাডভান্স করেছে অর্থাৎ মুজিবনগর গভর্নমেন্ট ফর্ম করেছে তখন আরো নানান ঘটনা ঘটছে। ঢাকায় প্রতি রাত্রেই বোমা ফাটছে এদিক ওদিক। যে রাত্রে বোমা ফাটছে না সে রাত্রে মনে হচ্ছে একটা বোমা ফাটলে হত। আমরা রেডিও কানের কাছে ধরে চরমপত্র শুনেছি।

৩৯. হু ইজ সরদার ফজলুল করিম

১৯৭১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, বাংলা একাডেমি থেকে মিলিটারিরা আমাকে ধরে নিয়ে যায়। এর আগে আবু জাফর শামসুদ্দীনকেও নিয়ে গিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। আমি অপেক্ষা করছিলাম যে জাফর ভাই ফিরে এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব মিলিটারিরা তাকে কী কী ধরনের ইন্টারোগেশন করেছে। জাফর ভাইয়ের কাছ থেকে সব শুনে আমি ডিসিশন নেব আমি কী করবো। জাফর সাহেব ফিরে এসে আর জয়েন করেননি। ঐ যে তাকে ইন্টারোগেশনে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিল সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি আর জয়েন করেন নাই। তিনি সেখান থেকেই তাঁর গ্রামের বাড়িতে চলে যান।

৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি অফিসে যাই সকাল ১০টা বা সাড়ে ১০টার সময়। অফিসে গিয়ে বসার কিছুক্ষণ পর কয়েকটা লোক এসে আমার টেবিলের পাশে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে বাঙালি এবং নন বেঙ্গলি দুইই ছিল। তারা জিজ্ঞেস করল : 'হু ইজ সরদার ফজলুল করিম?' আমি উত্তর দিলাম : 'আই এ্যাম সরদার ফজলুল করিম'। তারা আমাকে বলল, 'ইউ কাম ইউথ আস। ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট।' আমি আশপাশের বন্ধুদের বললাম, 'দেখেন, আমি তো চলে গেলাম। আমার বাসায় একটু খবর দেবার চেষ্টা করবেন।' মোতাহের বলে এক কর্মচারী ছিলেন। এখন তিনি মারা গেছেন। এই মোতাহারই বোধহয় সেদিন বিকালে আমার মতিঝিলের বাসায় গিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবরটা পৌঁছে দিয়েছিলেন আমার ওয়াইফের কাছে। আমি পরে জেনেছি, ৬ই সেপ্টেম্বরই আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোক বাংলা একাডেমিতে এসে জিজ্ঞেস করে গিয়েছিল, সরদার ফজলুল করিম কখন আসে। এই খবরটা কিন্তু আমাকে কেউ দেয় নাই। অবশ্য খবর দিলেও আমার কিছু আসত যেত না।

বাংলা একাডেমির পাশে একটা আর্মি জিপ রাখা ছিল। জিপে আর্মড ম্যান ছিল। আমাকে ওরা জিপে নিয়ে গিয়ে ওঠাল। আমি ভাবলাম, বাংলা একাডেমির গেট থেকে বের হয়েই ওরা ক্যান্টনমেন্টে যাবে। কিন্তু জিপটা ক্যান্টনমেন্টে গেল না। আমাকে নিয়ে শহরের মধ্যে মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়াতে ঢুকল। ঢুকে তারা এখানে ওখানে ওয়্যারলেসে নানা কথাবার্তা বলছে : হ্যালো, হ্যালো। টকিং ফ্রম মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া। হোয়াই ডোন্ট ইউ ফাইন্ড হিম, হি সিটস্ দেয়ার, হি হ্যাজ এ লিগাল ফার্ম, সার্চ আফটার হিম ইত্যাদি। তখনি আমি বুঝে নিই ব্যাপারটা : ওরা কামরুদ্দীন সাহেবকে খুঁজছে। কামরুদ্দীন সাহেব অনেক বই-পত্র লিখেছেন পাকিস্তান পিরিয়ডটার বিভিন্ন দিক নিয়ে। কামরুদ্দীন সাহেবের অপরাধ হচ্ছে এই যে তাঁর ছেলে নিজাম ছাত্র ইউনিয়ন করত এবং সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সম্ভাবনাময় এই ছেলেটি সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করত এবং বাপের সঙ্গে এ নিয়ে তার তর্কও হত। ফেনীতে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে মুখোমুখি সংগ্রামে নিজাম শহীদ হয়। এই ছেলেটিকে নিয়ে কামরুদ্দীন সাহেবের অনেক আশা ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উলটো দিকে কামরুদ্দীন সাহেব আর তার পার্টনারের লিগাল ফার্ম ছিল একটা। ওদের কাছে ক্রমাগত নির্দেশ আসছে 'ক্যাচ হিম', 'টেক হিম আপ'* । কিন্তু ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না।

---

* সাইদুল হাসানকে এই ঘটনার পূর্বে জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে পাক আর্মি নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত যেতে যেতে কন্ট্রোল রুমের সাথে আলাপ করতে করতে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশে দিয়ে গাড়িটা রাখল এবং এক সময় দেখলাম, কামরুদ্দীন সাহেবকে ওরা নিয়ে আসছে। কামরুদ্দীন সাহেব গাড়িতে এসে আমার পাশে বসলেন। আমরা দুজনে এমন ভাব দেখালাম যেন উই ডু নট নো ইচ আদার। আমরা একে অপরকে চিনি না।

জিপটা এর পর আর কোথাও দাঁড়াল না। সোজা চলে গেল এমপি হোস্টেলে। যেটা এখন প্রাইম মিনিস্টারের অফিস তার পিছনে একটা এমপি হোস্টেল ছিল। এমপি হোস্টেল ছিল একটা টরচার প্লেস অব দি আর্মি। ওখানে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে আমাদের দুজনকে বসাল। আমরা বসে আছি। একটা মেজর আসল কিছুক্ষণ পরে। মেজর এসে আমাকে একটা গাল দিল : 'ইউ পিপল, দি বাস্টার্ড সানস অব তাজউদ্দীন। উই শ্যাল টিচ ইউ এ গুড লেসন।' তাজউদ্দীনের নামটা তারা নিল, অন্য কারো নাম না। অবশ্যই শেখ সাহেব তখন ওয়েস্ট পাকিস্তানে আটকা পড়ে আছেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট তখন হয়ে গেছে এবং তাজউদ্দীন তখন সরকার প্রধান। তাজউদ্দীন ওয়াজ এ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্সন। কিন্তু তাজউদ্দীন সাইলেনটলি কাজ করত। তাজউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর পাশে বসে থাকত, সাইলেন্টলি বের হয়ে আসত। যা ফাইল ওয়ার্ক ছিল তা করত। তার কোনো বক্তৃতাবাজি ছিল না। আমাকে যেটা স্ট্রাইক করল সেটা হচ্ছে, মেজর বেটা আমাকে গালি দিতে গিয়ে তাজউদ্দীনের নামটা উল্লেখ করল কেন!

AMARBOI.COM

আমরা বসেই আছি। বিকেল বেলায় আমাদের আর একটা অফিসারের সামনে হাজির করল। অফিসারের র‍্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক আমি জানি না। কামরুদ্দীন সাহেবের তো একটা পরিচয় ছিল। হি ওয়াজ এ্যান এক্স এ্যামব্যাসাডর। ওঁকে ছয় মাসের ডিটেনশন দিল। আমাকে দুই বছরের ডিটেনশন দিল। এর পর আমাদের দুজনকে সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি তো জেলবার্ড। আমার মনে একটু ভরসা এল যে জেলে অন্তত সিপাহীটিপাহীদের মধ্যে কিছু পরিচিত লোক পাব।

আমাদের দুজনকে জেলে নেওয়ার পরে যে ট্রিটমেন্টটা আরম্ভ করল সেই ট্রিটমেন্টের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স ছিল। দি ট্রিটমেন্ট হুইচ ওয়াজ গিভেন টু কামরুদ্দীন আহমদ এ্যান্ড দি ট্রিটমেন্ট গিভেন টু সরদার ফজলুল করিম ওয়াজ নট দি সেম। আমাকে তারা জেলের মধ্যে এমন খারাপ জায়গায় পাঠাল যেখানকার খাবার খেলে ব্লাড ডিসেন্ট্রি হতে বাধ্য। কাছাকাছি একটা আর্মির লোকও ছিল যে আমার কাছ থেকে সমস্ত কথা বার করার চেষ্টা করছিল। আমার বাইরের বন্ধুরা চেষ্টা করেছিল যাতে জেলের মধ্যে কোনো একটা ডিভিশন আমাকে দেওয়া হয়। এ জন্যে ওরা অনেক অফিসারের সঙ্গে মিট করেছে। এমনকি তারা মাহমুদ আলীর সঙ্গেও মিট করেছে। মাহমুদ আলী পাকিস্তানিদের সঙ্গে কাজ করছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা বিফলে গিয়েছিল। তারা কিছু করতে পারে নাই। ইন দি মিন টাইম সিচুয়েশনও ক্রমাগত চেঞ্জ করছে। পাকিস্তানিদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ইতোমধ্যে অক্টোবর গেল, নভেম্বর এসে পড়ল। এই দুই মাস আমি খুব সাফার করেছি।

পরাজয় নিশ্চিত—এটা বুঝে যাবার পর ডিসেম্বরের ১৩-১৪ তারিখে রাজাকার-আলবদররা বুদ্ধিজীবীদের খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করে। অনেকে প্রশ্ন করে, শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো লোক কেন সে সময় ঢাকা শহরে থেকে গেল? কীসের ভরসায়? মুনীর চৌধুরী কেন তার বাসায় অবস্থান করছিলেন? মুনীরের সাথে বহুদিন যাবৎ রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে ভাবত তাকে কেন পাকিস্তানিরা মারবে? কিন্তু রাজনীতির সাথে কোনো কালে কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিল না এমন অনেক বুদ্ধিজীবী যেমন, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকেও* রাজাকাররা হত্যা করেছে। আসলে কোনো বুদ্ধিজীবীই ভাবতে পারেননি তাঁদের এভাবে ধরে এনে হত্যা করা হবে।

আমরা যারা জেলে ছিলাম তাঁরা বেঁচে গেছি জেলে থাকার জন্যে নয় বরং আলবদর রাজাকাররা আমাদের হত্যা করার সময় পায়নি বলে। দেশটা এত তাড়াতাড়ি স্বাধীন হয়ে যাবে এটা তারা ভাবতে পারেনি। তারা ভেবেছিল, এগুলো তো জেলে আমাদের হাতের কাছেই আছে জিয়ল মাছের মতো; যে কোনো একদিন মেরে ফেললেই চলবে! ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের দেয়ালের উপর মেশিনগান ফিট করাও ছিল। জেলে আমাদের হত্যা করলে এমন কিছু আসত যেত না ওদের। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগারে ১৯৭১ জেলের ভিতরেই রাজবন্দীদের ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার খবরটা আমরা জেলে বসেই পাই। সিপাহীরাই আমাদের খবরাখবর দিত। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা জেলেই ছিলাম। ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মুক্তিযোদ্ধারা এসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের দরজা খুলে দেয়। ঐ দিন অন্যসব কয়েদির সাথে আমি আর কামরুদ্দীন সাহেবও মুক্তি পাই এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বহু স্মৃতি-বিজড়িত গেটটি পার হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে পা রাখি।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, ঢাকা তখনো একটি ভূতের নগরী। ট্রাফিক সিস্টেম তখনো কাজ করছিল না। আমি হেঁটে হেঁটে প্রথমে বাংলা একাডেমিতে গেলাম। সেখানে পুরোনো কর্মচারীরা সব ছিল। তারা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

* জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে ২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহনী গুলিবিদ্ধ করে। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা পরবর্তীকালে হাসপাতালে প্রাণ ত্যাগ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪০. রিটার্ন অব দি প্রডিগ্যাল সন : দুষ্ট গরুর গোয়ালে ফেরা

পাকিস্তান হওয়ার কিছু দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক আবার আমাকে নিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি পলিটিক্যাল সাইন্স ডিপার্টমেন্টে জয়েন করলাম এ্যাসিটেন্ট প্রফেসর হিসেবে এর পর প্রমোশন পেয়ে এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হয়েছিলাম। কিন্তু আমি প্রফেসর কোনো দিন হতে পারিনি। কেন পারিনি সেটার গল্প অন্য এক সময় করা যাবে।

অনেকে আমাকে বলতেন, 'রাজ্জাক সাহেব তো আপনার উপকার করতে গিয়ে আপনার ক্ষতি করলেন!' আমি রাজ্জাক স্যারকে বলেছিলাম, 'স্যার আমি তো দর্শনের লোক। পলিটিক্যাল সাইন্সে তো আমার এমএ নেই। আপনি আমাকে এখানে কেন নিয়ে এলেন?' রাজ্জাক সাহেব আমাকে উত্তরে বলেছিলেন, 'আপনি ফিলসফির উপর কী সব লেখালেখি করছিলেন না? ঐগুলো আমার দরকার।' উনি বিশ্বাস করতেন, দর্শন ছাড়া রাজনীতি সম্ভব নয়।

ওসমান নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাইব্রেরি এ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। এখনো লাইব্রেরিয়ানরা ওকে চিনতে পারে। আমি যখন প্রথম দিন লাইব্রেরিতে গেলাম তখন এই ওসমান আমাকে যেভাবে ওয়েলকাম করল সেটা খব সিগনিফিকেন্ট : 'স্যার আপনি তো একটা ডেঞ্জারাস্ লোক। আপনি সেই যে পাকিস্তান ভাঙবেন বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লেন, পাকিস্তান না ভাইঙ্গা আপনি আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরলেন না!' আমার জীবনটাকে আমি এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিনি। কিন্তু ওর অবজার্ভেশনটায় কিছুটা সত্য যে আছে তা অস্বীকার করি কী করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট-১

সোমেন চন্দের হত্যা

ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন কমবেশি বাংলার সব জেলা শহরে ছড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে ঢাকা শহর ছিল অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র। ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ ঢাকার বুদ্ধিজীবী, লেখক প্রভৃতি শহরে এক ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন। স্থানীয় জেলা পার্টির অনুরোধে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি ও জ্যোতি বসু সেখানে বক্তা হিসাবে যান। সম্মেলন উপলক্ষে শহরে খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক মহল প্রায় তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম যাঁরা সম্মেলনের পক্ষে, দ্বিতীয় যাঁরা সরাসরি বিপক্ষে, তৃতীয় যাঁরা মোটামুটি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে নিরপেক্ষতার আবরণ নিয়েছিলেন। শেষোক্তদের মধ্যে ছিলেন প্রধানত কংগ্রেস মতবাদের অনুসরণকারীরা ও দ্বিতীয় দলে ছিলেন জাতীয় বিপ্লবী, বিশেষত শ্রীসংঘ ও বি.ভি.র লোকেরা।

যাই হোক, সম্মেলনের দিন সকালে উদ্যোক্তাদের অন্যতম তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ আততায়ীর হাতে নিহত হন। তিনিই বাংলার ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের প্রথম শহীদ। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের পরও যথারীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং আমাদের প্রতি লোক আরও আকৃষ্ট হয়।

১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় সভ্য ছাড়াও বঙ্কিমবাবু, দিল্লীর ফারুকি, শর্মা (ওয়াই.ডি), সাজ্জাদ জহীর (বন্নেভাই) ও রাজেশ্বর রাও নিমন্ত্রিত হিসাবে হাজির থাকেন (বোধহয় বিশ্বনাথও)। সভায় পার্টির জনযুদ্ধের নীতি ও কার্যক্রম অনুমোদিত হয় ও পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী, ব্যাপক, গভীর ও দৃঢ় করবার কার্যসূচি গৃহীত হয়। স্থির হয় যে ১৯৪৩-এর মে মাসে বোম্বাইতে পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। অসুস্থ থাকায় অজয় ঘোষ ঐ সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। তার পূর্বেই কমরেড ভরদ্বাজ ৮ই এপ্রিল ১৯৪২-এ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট-২

হাটুরের জীবনদর্শন

পূর্ববঙ্গীয় সমাজের বিপুল পরিবর্তনের সাক্ষী তিনি, উঠে এসেছেন বরিশালের গণ্ডগ্রামের একান্ত কৃষক পরিমণ্ডল থেকে, চল্লিশের দশকে ঢাকায় পাঠগ্রহণকালে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘটে, কৃতী ছাত্র হিসেবে পাঠ শেষে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে, পাকিস্তানের সূচনার সেই সময়ে বামপন্থা কোনো শৌখিন মজদুরি ছিল না, তিনি অবলীলায় শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে আত্মগোপনে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন এবং অচিরেই উপনীত হন কারান্তরালে। তারপর কারাগার থেকেই নির্বাচিত হন পাকিস্তান ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য, খণ্ডকালের জন্য কেবল মুক্ত জীবনের স্বাদ ভোগ করেন না, রাজা-উজির হওয়ার খেলাও প্রত্যক্ষ করেন একেবারে যাকে বলে দানবের পেটের ভেতর থেকে। এরপর পাকিস্তানে সামরিক শাসনের পর্ব এবং আবারও তাঁর কারাবাস ও পরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সংবরণ করে নেওয়ার সূত্রে কারামুক্তি, ছোটখাটো চাকরিতে নিয়োজিত থেকে দিনযাপনের সরল প্রয়াসও বাধাগ্রস্ত হয় একাত্তরে, সামরিক বাহিনী কর্তৃক বন্দীত্ব বরণ ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তি, শিক্ষক হিসেবে আবারও ফিরে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অব্যাহত জ্ঞানসাধনায় তারপর থেকে বহু বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছেন বাঙালি মনন আর সেই সঙ্গে সাম্যের সমাজ নির্মাণে পরম উদার এক আস্থায় সঞ্জীবিত করেছেন নবীন-প্রবীণ অজস্র মানুষকে। এই মানুষটি, সরদার ফজলুল করিম, নিজেকে সবসময়ে রাখতে চেয়েছেন অন্তরালবর্তী, যদিও সমাজ পরিবর্তনের উত্তালতা বরাবর তাঁকে ঠেলে দিয়েছে সামনের কাতারে। অন্তরাল রচনার প্রয়াসকে তিনি প্রায় সাধনার পর্যায়ে উপনীত করেছেন এবং সেই দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের সামজে একেবারেই দুর্নিরীক্ষ্য। সামান্যতম সাফল্য যেভাবে অস্থির করে চিত্ত, খ্যাতির ঢাক পেটাবার জন্য সবাই নিজেই যেভাবে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, অযোগ্য ব্যক্তি সাফল্যের সোপান অতিক্রমের সুলুক সন্ধানে যে বিস্ময়কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষতার পরিচয় দেন, সেসব দেখে দেখে আমরা যখন বীতশ্রদ্ধ তখন সরদার ফজলুল করিমের মতো মানুষের অবস্থান প্রবল সামাজিক আচারের বিপরীতে সম্পূর্ণ আলাদা এক জীবন-দৃষ্টিভঙ্গি মেলে ধরে সামনে। তবে যেনতেন প্রকারে সাফল্য করায়ত্ত করতে পারাটাই যখন সামাজিক অর্জন হিসেবে স্বীকৃত, অশ্লীল ঢক্কানিনাদে চলছে আত্মপ্রচারের খেলা, গ্ল্যামার বা তরল তাৎক্ষণিক বিনোদনে মজে থাকা এহেন সমাজে সরদার ফজলুল করিমের জীবনদর্শন অনুভব করতে পারার মতো সংবেদন-ক্ষমতাও দুর্লভ হয়ে পড়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনীয় হিসেবে উল্লেখ করা যায় বিশ শতকের এক ব্যতিক্রমী ও জনপ্রিয় গ্রন্থ '*দি ট্রেজার্স অফ সিয়েরা মাদ্রে*'র লেখক বি ট্রেভনের কথা। বলা দরকার, সাদামাটা এই ছদ্মনামের আড়ালের আসল ব্যক্তিটি হচ্ছেন বেনিস ট্রর্সভান এবং লিখেছেন একাধিক ছদ্মনামে। তিনি কেবল নামের আড়াল নেননি, লেখক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিপরিচিতি, এমনকি প্রকাশকের কাছে প্রকাশ করতেও ছিলেন কুণ্ঠিত। তাঁর অভিমত অনুসারে, প্রত্যেক লেখকই সমাজের দ্বারা সৃষ্ট, সমাজজীবনে বহু মানুষ বহুভাবে অবদান রাখেন একজন কারো লেখক সত্তা গড়ে তুলতে। তাই কোনো সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখক একা কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারেন না, আর সে কারণেই তিনি নিজের আড়াল তৈরি করেছিলেন মামুলি বিভিন্ন ছদ্মনাম নিয়ে। তাঁর এই আড়াল রচনার প্রয়াস এতটাই প্রবল ছিল যে তিনি কখনো নিজের ছবি প্রকাশককে দেননি বইয়ের জ্যাকেটে ব্যবহারের জন্য। একবার প্রকাশকের একান্ত পীড়াপীড়িতে তিনি ছবি পাঠিয়েছিলেন, তবে সেটা ছিল গ্রুপ ছবি এবং নিচে লিখে দিয়েছিলেন যে, লেখক এই দলবদ্ধ ছবির কোথাও রয়েছে।

জীবনের যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন সরদার ফজলুল করিম এবং সামাজিক পরিবর্তনময়তার সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী-ক্ষমতা তিনি ধারণ করেন, আর সর্বোপরি কঠিন তাত্ত্বিক প্রসঙ্গসমূহ যে সহজিয়া অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি পেশ করতে পারেন সেসব মিলিয়ে আমরা বুঝতে পারি, তিনি যদি আত্মকথা ব্যক্ত করেন তবে তা আমাদের সমাজকথার অনুপম দলিল হয়ে উঠবে। কিন্তু নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করা যার জীবনসাধনা, নিজের কথা তাঁকে দিয়ে বলায় কার সাধ্য! আমি জানি, বহু মানুষের বহু সাধ্য-সাধনা তিনি, তাঁর স্বভাবধর্ম অনুযায়ী, হেসে পাশ কাটিয়ে চলেন, যেন এমন বালখিল্য প্রস্তাবনা আলোচনার অযোগ্য, অথচ সব সময়ে অন্যদের খুঁচিয়ে তোলেন অন্তর্কথা মেলে ধরার জন্য। প্রতিটি মানুষের যে বলার অনেক কিছু এবং সেই বলায় সমাজের রয়েছে পাওয়ার মতো বহু বিষয়, সেটা প্রবল আস্থার সঙ্গে প্রকাশ করে প্রাণিত করেন তাঁদের। এমনকি অমন যে ডাকসাইটে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, বিপুল পঠন-পাঠন ও গভীর পাণ্ডিত্য নিয়ে জ্ঞানচর্চাতেই মেতে থাকলেন আজীবন, অন্যদেরও জ্ঞানসাধনার পথে প্রেরণা যুগিয়ে চললেন, অথচ লিখতে অস্বীকার করলেন প্রবলভাবে, তাঁরও স্মৃতিভাষ্য আদায় করলেন শিষ্য সরদার ফজলুল করিম, দিনের পর দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাপচারিতা রেকর্ড করে এবং নবীন শিক্ষার্থীর মতো পরিশ্রম সহকারে তা লিপিবদ্ধ ও সম্পাদনা করে অবশেষে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত করলেন। ঝোলার মধ্যে টেপ-রেকর্ডার নিয়ে আরো কত খ্যাত-অখ্যাতজনের জীবন-কথাই বাণীবদ্ধ ও পরে লিপিবদ্ধ করেছেন সরদার ফজলুল করিম, অথচ নিজের বেলায় নৈব নৈব চ। যাই হোক, অবশেষে সরদার ফজলুল করিম অনুসৃত পদ্ধতি তাঁর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাঁর জীবন-কথার এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্বাপর ভাষ্য, তাঁরই জবানিতে, আমাদের সামনে হাজির করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মনসুর মুসা ও শিশির ভট্টাচার্য্য। সেই সে কাল! কিছু স্মৃতি কিছু কথা নামে সরদার ফজলুল করিমের এই গ্রন্থের প্রকাশও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এবং গ্রন্থটি কলেবরে কৃশ হলেও তাৎপর্যে বিশাল।

'নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা' দেওয়ার সুবাদে সরদার ফজলুল করিমের স্মৃতিভাষ্য সাক্ষাৎকার আকারে রেকর্ড করা হয়। গ্রন্থের আগাগোড়া একটি কথোপকথনের মেজাজ তাই বজায় রাখা হয়েছে। সাক্ষাৎকারদাতা যে আত্মকথনে অনিচ্ছুক তার প্রকাশ ঘটেছে বারংবার। তিনি বলেছেন, 'আমি সাধারণ, আমি দুর্বল, অযোগ্য এবং দরিদ্র।' স্বীয় জীবনদর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়ে বলেছেন, 'আত্মজীবনী কথার মতো হয়তো কিছু অহংবোধের ব্যাপার থাকে। তাই আত্মজীবনী বলার আমার সাহস নেই।' পরক্ষণেই মনে হয়েছে, 'কিন্তু জীবন তো, যে জীবন পাঁচটা মানুষ দেখেছে, পাঁচটা কালকে দেখেছে, তার কথা বলার দায়িত্ব তো সে অস্বীকার করতে পারে না।'

তবে এই স্বীকৃতি প্রদান করলেও জীবন-প্রবাহের কুশীলব হিসেবে তিনি নিজেকে বিবেচনা করেননি, বলেছেন, 'আমি বড় পণ্ডিত নই, বড় প্রফেসর নই, বড় গবেষক নই, তাঁরা বড় বড় সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন জীবনের গতি, জীবনের পরিবর্তন, পরিবর্তনের ধারা, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে।' পক্ষান্তরে বড় পণ্ডিত, বড় প্রফেসর, বড় প্রাবন্ধিক, বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও সরদার ফজলুল করিম বলেছেন এবং বিশ্বাস থেকেই বলেছেন, 'আমার দরিদ্র পিতামাতার দান করা জীবন নিয়ে যে নতুন মানুষের স্বপ্ন দেখতে দেখতে এই পথটা আমি হেঁটে এসেছি' সেই কথাটাই বলার প্রয়াস নিয়েছি। কর্মবিচারে তিনি সেনাধিপতি হলেও নিজেকে একজন 'পদাতিক' রূপে গণ্য করেছেন এবং ধূলিমলিন পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের চোখ দিয়ে দেখা জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, যেখানে কে দেখছে তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কী দেখছেন, এ-যেন জ্ঞানদীপ্ত এক হাটুরের দেখা জীবন।

বর্তমান গ্রন্থে যে প্রসঙ্গগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন সরদার ফজলুল করিম তার কিছু কিছু দিক ইতঃপূর্বে রচিত তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধে ঘুরেফিরে এসেছিল। কিন্তু সে সবের অবতারণা ঘটেছিল পরোক্ষে, ধারাবাহিকভাবে জীবনকথা তথা জীবনধারা যেভাবে তিনি দর্শন করেছেন তার বিবরণী এমনভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কখনো তিনি বলেননি। এর একটি সুবিধার দিক রয়েছে, তাঁর জীবনের অনেক অজানা কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তিনি এখানে এড়িয়ে যাননি। এমনকি নিজের জন্য বিব্রতকর অপ্রিয় বিষয়গুলোরও উল্লেখ ঘটেছে। যেমন তিনি বলেছেন, দীর্ঘ কারাবাসের অবসান ঘটিয়ে তিনি কীভাবে বের হয়ে এলেন এবং রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব না রাখার এই প্রতিশ্রুতির ফল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযোগহীন হলেন। বলেছেন, একাত্তরে বাংলা একাডেমিতে চাকরিরত অবস্থায় কীভাবে গোটা পরিবারের বোঝা মাথায় নিঃসঙ্গ মানুষটি উপায়ন্তরহীনভাবে পাকিস্তানের পক্ষে বানোয়াট বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু কথোপকথনের বিপদ হলো, এখানে বলা যায় কেবল প্রশ্নকর্তার আগ্রহমাফিক বিষয়ে কথাবার্তা। গভীরতম ব্যক্তিগত উপলব্ধি, যা মানুষ স্বগতোক্তির মতো নাড়াচাড়া করে, সেসব হয়তো লেখায় মেলে ধরা যায়, কিন্তু আলাপচারিতার বৈঠকি ঢঙে তার প্রকাশ ঘটানো কষ্টকর। আর সে মানুষটি যদি হন সরদার ফজলুল করিমের মতো 'মোস্ট নন-অ্যামবিশাস অবজার্ভার অফ লাইফ', তবে তো পেটে বোমা মেরেও ব্যক্তিগত কোনো কৈফিয়ৎ তার কাছ থেকে বের করা যাবে না। ফলে আমাদের অসংবেদনশীল সমাজে ও বাম-রাজনীতির হৃদয়হীন কাঠিন্যের পরিমণ্ডলে সরদার ফজলুল করিমের জীবনের ওই দুই ঘটনার মামুলি বিচার ও মামুলিতর রায় প্রদানে আগ্রহীজনের অভাব ছিল না। অথচ জীবনের বন্ধুর চলার পথে হোঁচট খাওয়া এই ঘটনায় যে কিছু আসে যায় না, যদি মানুষটির পথচলা অব্যাহত থাকে এবং আমরা তো জানি ব্যক্তিগত ও সামাজিক কষ্ট ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেও মানবতা ও জ্ঞানসাধনার বিস্তারে কী অনুপম যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন সরদার ফজলুল করিম!

সরদার ফজলুল করিম, আমরা জানি, পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আত্মনিয়োগ করলেন কমিউনিস্ট পার্টির কাজে। পাকিস্তানের উন্মাদনায় সমাজ তখন মাতোয়ারা, অপরদিকে রণদীপে নীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য পোষণ করে পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিও বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের উগ্র হঠকারী নীতি গ্রহণ করেছে। একদিকে নতুন দেশে জায়মান মুসলিম বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিকাশের অফুরান সুযোগ এবং এর বিপরীতে জেল-জুলুম পীড়নে জর্জরিত অনিশ্চিত জীবন—তার মধ্য থেকে যে বাছাই সরদার কিংবা তাঁর মতো বিরল কতক প্রতিভাবান যুবক প্রদর্শন করেন এর পেছনকার চিত্তশক্তি বুঝতে যে-সমাজ পারঙ্গম নয়, সেটা ওই সমাজেরই ঘাটতির দিক। যাই হোক, এসবের তথ্য কেবল প্রদান করেছেন সরদার ফজলুল করিম, বিশ্লেষণে নিয়োজিত হননি এবং বলেছেন অনুপম এক ঘটনার কথা যখন মফস্বলে চাকরিরত বড় ভাই বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে এলেন ঢাকায় স্নেহভাজন ছোট ভাইটিকে পাগলামির পথ থেকে ফেরাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধেশ্বরীর এক আত্মীয় বাড়িতে আত্মগোপনরত তরুণের দেখা পেলেন তাঁরা। সরদার ফজলুল করিম বলেছেন, 'বাবা তখন বৃদ্ধ মানুষ, তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই একটা পাগল, তুই এগুলো কী আরম্ভ করেছিস? তোকে আজ আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। বাড়ি যেতে হবে।'

আমি ধরা পড়ে গেলাম। বড় ভাই আর বাবার হাতে আমি ধরা পড়ে গেলাম। আমার মনে তখন একটাই প্রশ্ন, 'এই বন্ধন থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পাব?' আমি তখন অপেক্ষা করলে লাগলাম, কখন মাগরিবের নামাজ শুরু হবে এবং বাবা আর বড় ভাই কখন মাগরিবের নামাজ পড়তে যাবেন। আমি ঠিক করলাম, সেই সময়টাতে আমি পালাব।'

ঘটনার এই বিবরণী অনেকটাই সংবাদ ভাষ্যের মতো, কিন্তু এখানে জড়িয়ে আছে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত আরো যেসব গভীর উপলব্ধির দিক সেসব এই ভাষ্যে মেলে না। বস্তুত সরাসরি নিজের জবানিতে তা বলাও বোধহয় কষ্টকর। 'আমার বাবা' শিরোনামে ১৯৮৫ সালে যে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেছিলেন সরদার ফজলুল করিম সেখানে মনোজগতের কিছুটা পরিচয় মেলে, আত্মকথনের বদলে পিতৃস্মৃতি অবলম্বন করায় সহজভাবে আরো কিছু কথা বলা সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। সেই নিবন্ধে একই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন :

"১৯৪৮ সালের সেই দিনটিতে বাবা যখন জানতে পারলেন, তার সেজ ছেলে ইউনিভার্সিটির চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, 'পাগল' হয়েছে, সেদিন তাকে এই পাগলামির পথ থেকে ফিরিয়ে নিতে এসেও সেই ছেলেটিকে 'চল, আমার সঙ্গে বাড়ি চল'—এই কথাটি বাদে তার কোনো কথা বলতে পারেননি। আর এই কথাটি বলেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আমাকে বুকের মধ্যে, তার কৃষ দেহের সঙ্গে এক করে ফেলেছিলেন, তার চোখ দিয়ে পানি ঝরে পড়ছিল। দুঃখের পানি। আফসোসের পানি। তার এই ছেলেটি এমন কেন! হয়তো আমাকে বারকয়েক জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'বল্ তুই কী করবি? বল্ তুই কী করবি?' কিন্তু আমার মুখ থেকে একটি কথাও সেদিন বেরোয়নি। কী কথা আমি বাবাকে বলবো। আমি কি বাবাকে রাজনীতির কথা বোঝাবো? বোঝাবো, এই পাকিস্তানের স্বাধীনতা আসল স্বাধীনতা নয়। সমাজতান্ত্রিক বপ্লব না হলে শ্রমিক-কৃষকের দুঃখ যাবে না। না, এমন বলার দুঃসাহস আমার ছিল না। বাবা জানতেন তার ছেলেটি সব সময়েই শান্ত এবং শিষ্ট। আজ কেবল শান্ত এবং শিষ্টই নয়, আমি পাথরের মতো নির্বাক রইলাম। নিঃশব্দ রইলাম্ বাবা আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। যেন তিনি জীবনেও এই স্নেহের বন্ধন থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন না। ... যেভাবে সেদিন বাবার কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম তাকে সাহস বলবো কিংবা পাষণ্ডতা, তা আমি জানিনে। কেবল বুঝতে পারছিলাম, আমি আমার জীবনের সবচাইতে বড় সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। ভাষা দিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে এই দুর্জয় স্নেহের বন্ধনকে আমি ছিন্ন করতে পারবো না। কেবল অপেক্ষা করলাম। কখন সন্ধ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘনিয়ে আসে এবং বাবা কখন খানিকক্ষণের জন্য আমাকে ছেড়ে দেন। তাই যখন দিলেন, তখুনি নিঃশব্দে জঙ্গলঘেরা সেই আশ্রয়ের চারপাশে ঘনীভূত অন্ধকারের সঙ্গে আমি মিশে গেলাম।'

এই দুই বয়ানের উল্লেখ এজন্য যে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সূত্রে ঘটনার প্রতি সুবিচার করা অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে উত্তমপুরুষের বয়ানে নয়, তৃতীয় পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক স্বচ্ছন্দে ব্যক্তি-অনুভূতির গভীরে চলে যেতে পারেন সরদার ফজলুল করিম, একটা আড়াল তৈরি হলে অনেক স্বাভাবিকভাবে তিনি মেলে ধরতে পারেন আপন উপলব্ধি। তাই তাঁর প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকবে, নিজের কথা বলার অহং নয়, সমাজসত্যের বিভিন্ন দিক উন্মোচনের স্বার্থে তিনি যেন লিপিবদ্ধ করেন আঁটিপাড়ার এক মধ্যচাষীর তৃতীয় পুত্রের কাহিনী, মেলের ধরেন ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মঞ্জে আলীর চরিত্রের বিচিত্র দিক ও তাঁর বিদ্যোৎসাহী কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা, বলেন বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ একজন আউটসাইডারের কথা তিনি যেন বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন উন্নত্তর এইসব কাহিনী, যা অন্য কোনোভাবে আমরা স্পর্শ করতে পারবো না।

পাকিস্তান জমানায় কারাজীবনের চরম পীড়নমূলক দিকগুলো যে মিতকথনে উল্লেখ করেছেন সরদার ফজলুল করিম, সেসব পাঠকচিত্তকে কীভাবে স্পর্শ করবে তা নিয়ে সংশয় অবশ্য থেকে যায়। ১৯৪৯ সালে চব্বিশ বছরের টগবগে তরুণ জেলে ঢুকেছিলেন, বের হলেন ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী বিজয়ের পর। মাঝখানে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের পর শেখ মুজিবসহ অনেক রাজবন্দী মুক্তি পেলেও বামপন্থীদের ভাগ্য তেমন প্রসন্ন ছিল না। কারাজীবনের পীড়ন প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেননি, তবে বলেছেন কারাবন্দীদের ৫৮ দিনের দীর্ঘ অনশনের কথা, যে-অনশনের বিংশতি দিবসে কারাগারে প্রবেশ করে তিনি এতে শরিক হয়েছিলেন। এই অনশনে শিবেন রায়ের মৃত্যু নানা সূত্রে এর উল্লেখ মেলে, কিন্তু ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের কারাগারে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী এই তরুণ সম্পর্কে আমরা আর কতটুকু জানি? এই তরুণের জন্ম কোথায়, কেমন ছিল তার পারিবারিক পটভূমি, কী ছিল তার স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সংগ্রামের দীক্ষা কীভাবে সে গ্রহণ করেছিল, কোথায় আছে আজ তার পরিবারের সদস্যরা এসব কিছুই তো আমরা জানি না। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে জেলের ভেতরে রাজবন্দীদের সংগ্রাম বাইরের আন্দোলনেও প্রেরণাদায়ক হয়েছিল, কিন্তু কারাবাস্তবতা বাইরের মানুষ কতটা অনুভব করতে পেরেছিল সেই জিজ্ঞাসা তো থেকেই যায়। সরদার ফজলুল করিমও বলেছেন, লোকে জানতে চায় কবে আপনি জেলে গিয়েছিলেন কবে বের হলেন, 'মাঝখানে জেলজীবনের দীর্ঘ ছয়-সাতটি বছর কেমন করে কাটালাম—এটা তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে না। বাইরে যারা থাকে তাদের মনে এই প্রশ্নটা আসে না। তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করে জেল ইজ জেল। সেখানে লোকে যায় আর বেরিয়ে আসে।" পূর্ববঙ্গে জেলখানা ও রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা জোরের সঙ্গে বলেছেন লেখক। তাঁর এই অভিমত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতে হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে অগণিত মানুষের ত্যাগ ও বেদনার পরিমাপ গ্রহণ ছাড়া আমরা কখনোই বিকাশের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠা রকতে পারবো না, হয়ে থাকবো ভুঁইফোঁড় জাতি এবং বিহ্বলভাবে খুঁজে ফিরবো পথ।

বামপন্থার সঙ্গে সরদার ফজলুল করিমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রে পঞ্চাশের দশকের সুচনাকালের কমিউনিস্ট পার্টি এবং পার্টির প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য পোষণকারী ত্যাগী তরুণদের মানসিকতার পরিচয় এই স্মৃতিভাষ্যে ফুটে উঠেছে। যে সময়ে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা অর্জনের সব ধরনের সুযোগ তুচ্ছ করে বিপ্লব সাধনের মন্ত্রে মুগ্ধ ছিলেন সরদার ফজলুল করিম, সে সময়টি কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য বড় ধরনের আলোড়নময় পর্ব। পার্টি নেতা বি টি রণদীভে ভারতে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজমান ঘোষণা করে যে আশু বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটাবার ডাক দিয়েছিলেন তা পূর্ববাংলার ক্ষুদ্র কিন্তু সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি পূর্বাপর বিবেচনাহীনভাবে মান্য করেছিল এবং সম্পূর্ণ প্রতিকূল সামাজিক পরিবেষ্টনে গণবিচ্ছিন্ন বিপ্লব সংঘটনে নিবেদিত হয়েছিল। এর ফলে বহু তরুণকে ঠেলে দেওয়া হয়েছি জেল-জুলুম ও চরম নিপীড়নের মুখে। সেই সময়ে পার্টি কর্মীদের সততা ও আন্তরিকতা বিষয়ে জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে শ্রদ্ধার ভাব বজায় থাকলেও তাদের অনুসৃত নীতি বিশেষ গণসমর্থন অর্জন করতে পারেনি। স্বদেশী বাস্তবতার প্রতি যথোপযুক্ত নজর না দিয়ে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটাবার নিষ্ফলা প্রচেষ্টায় অব্যাহতভাবে মাথা কুরে যেতে ব্যর্থ হন অনেক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ এবং তাঁরা পার্টির চড়া সুরে বাঁধা কর্মধারা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেন। এই গুটিয়ে নেওয়ার পেছনকার কার্যকারণ অনুধাবনের চেষ্টা পরিহার করে এঁদেরকে পার্টির দৃষ্টিকোণ থেকে পরম শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং 'রেনিগেড' কলঙ্ক এঁরা ধারণ করেন। কিছুকাল পর, ১৯৫১ সালে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কর্তৃত্বের নির্দেশে ভারতের পার্টি রণদীভে নীতি পরিত্যাগ করে এবং পূর্ববাংলার পার্টিও একই ধারার অনুসারী হয়। রাতারাতি নীতি পরিবর্তনের অভিঘাত তরুণ কর্মীদের ওপর কীভাবে পড়েছিল, এসবের ফলে কোনো সংশয় তাঁদের মধ্যে জেগেছিল কিনা সেসবের পরিচয় অবশ্য বর্তমান স্মৃতিচারণে মেলে না। পরে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে যখন পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা নিশ্চিত করে কারামুক্তির চেষ্টা করা হয় তখন সেটা মেনে নেন সরদার ফজলুল করিম। আজকের দিনের অভিজ্ঞতায় আমরা এর মধ্যে বড়ভাবে দোষণীয় কিছু খুঁজে পাব না। রাজনীতিতে যাঁরা মনপ্রাণ ঢেলেছেন জীবনের ও রাজনীতির চলার পথে কোনো এক সময়ে তাঁরা হয়তো ক্লান্ত ও সর্বস্বান্ত বোধ করে পথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। কিন্তু পীড়নমূলক পরিবেশে প্রতিপক্ষের নানা খবরদারির মধ্যে যে গোপন পার্টি কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তার অভ্যন্তরে অবিশ্বাস ও সন্দেহের মাত্রা অতি তীব্র। ফলে ওই স্বাভাবিক ঘটনা বিচারেও স্বাভাবিকতার স্থান বিশেষ থাকে না। কারামুক্ত সরদার ফজলুল করিমের জীবনাচরণ এটা জানান দিয়েছিল যে রাজনীতি ছেড়ে এলেও বিশ্বাস তিনি পরিত্যাগ করেননি। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ফিরে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, সিনেটের এক প্রভাবশালী সদস্য পার্টির সঙ্গে তাঁর সংশ্রবহীনতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আই ডু নট বিলিভ ইট, যে বীজ আপনার মধ্যে এসেছে তা কোনোদিনও আপনার মধ্য থেকে চলে যেতে পারে—এটা আমি বিশ্বাস করি না।' কিন্তু সংগঠনের ভেতর থেকে এসব মানুষের অবস্থান বিচারে ঔদার্যতার কোনো ছাপ থাকে না। বরং থাকে এক ধরনের আক্রোশ যা প্রকাশ পায় তাঁদেরকে বর্জন ও ছাপাঙ্কিত করার মধ্যে। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী মুক্ত পরিবেশে অনেকখানি পাল্টে গেলেও ষাটের দশকের গোড়ায় অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ফলে সরদার ফজলুল করিমের কারাগার থেকে মুক্তির প্রশ্ন যেমন তাঁর জন্য ব্যক্তিগত তেমনি সংগঠনগতভাবেও ছিল আলোড়নময় ঘটনা। কিন্তু সেই আলোড়নের বিভিন্ন মাত্রার কোনো প্রকাশ সরদার ফজলুল করিম এখানে ঘটাননি। জীবন-পথের ওইসব জটিল জিজ্ঞাসা ও সংশয় মনোজগতে যে ছাপ ফেলে তার পরিচয় লাভের জন্য পাঠকসমাজ নিশ্চয় প্রবলভাবে আগ্রহী হবেন। সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে এলেও ত্যাগের জীবনসাধনাকে কখনো ভোগের জীবনস্পৃহায় রূপান্তরিত হতে দেননি সরদার ফজলুল করিম, তাঁর জীবনাচরণে এই ত্যাগের ধারা অর্জন করেছে অনুপম এক সহজিয়া রূপ। বাঙালি জীবন চেতনার গভীরে প্রোথিত এই ত্যাগের সাধনা একদা প্রবল ছিল জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে এবং তারই উপচে পড়া প্রবণতা হিসেবে বামপন্থী আন্দোলনে। পশ্চিমি বামপন্থা থেকে পৃথক এই ঘরানা স্বদেশী বামপন্থায় অবশ্য এখন তলানিতে ঠেকেছে। তবে সরদার ফজলুল করিমের জবানিতে এর বাস্তব রূপ ও পশ্চাতের দর্শন যদি কিছুটা প্রস্ফুটিত হতো তবে নতুন প্রজন্মের সদস্যরা এক ভিন্নতর জীবনসমৃদ্ধির আমেজ পেতে পারতেন।

সেই সে কাল! কিছু স্মৃতি কিছু কথা গ্রন্থে ঠাসা রয়েছে সমাজেতিহাসের নানা উপাদান, আর রয়েছে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের জীবনোপলব্ধির ইঙ্গিত। কিন্তু এসবই হিমবাহের উপরি-অংশ মাত্র, এই গ্রন্থে তাই যা-পেয়েছি তার চেয়ে বড় হয়ে ফুটে ওঠে যা পেতে পারি তার সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার দ্বার খুলে আমাদেরকে উপলব্ধির আলোকময় ভুবনে নিয়ে যেতে পারেন কেবল একজনই, তিনি সরদার ফজলুল করিম, তাঁর কাছে দাবি থাকবে যে প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছেন এবার সেটা পূরণ করুন, সবিস্তারে লিখুন আপন জীবনাভিজ্ঞতা, কেননা সেটা তো কেবল ব্যক্তির ইতিহাস হবে না, সমাজসত্যের গভীর দিকগুলো এই সুবাদে আমরা অনেক স্বচ্ছভাবে দেখতে সক্ষম হবো।

মফিদুল হক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট-৩

ভিন্নধর্মী একটি স্মারক বক্তৃতা সমাজ ও রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট একটি উদ্যোগ

খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নামে স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার রীতি বাংলাদেশে আজও যথেষ্ট প্রচলিত। ব্রিটিশ সাম্যাজ্যবাদ তথা পশ্চিম শিক্ষার বদৌলতেই যে এই রীতি ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে চালু হয় তা অবশ্যই বোধগম্য। ব্রিটিশ শাসন পূর্বকালেও এ জাতীয় কোনো রেওয়াজ এখানে ছিলো কি না আমার জানা নেই। যখন যেভাবে এর প্রচলন শুরু হোক না কেনো, এ দেশের স্মারক বক্তৃতামালায় সাম্প্রতিককালে একটি বিশেষ ধারার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

বিভিন্ন স্মারক বক্তৃতার আয়োজক বা উদ্যোক্তারা এক এক বছর এক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাদের কাঙ্ক্ষিত মানুষের স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে নির্ধারণ করেন। কিন্তু বক্তৃতার বিষয়বস্তু ঠিক করেন বক্তা নিজেই। ফলে যার স্মরণে বক্তৃতা, তিনিই হয়তো অনুপস্থিত থেকে যেতে পারেন তার স্মারক বক্তৃতায়। অনুসন্ধান করলে এরূপ স্মারক বক্তৃতার সন্ধান পাওয়া তেমন কঠিন নয়।

এরূপ বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে যারা নির্বাচিত হন উদ্যোক্তাদের তরফে তারা অবশ্যই জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি এবং যে বক্তব্য তারা পেশ করেন তাও সন্দেহাতীতভাবে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও উচ্চমান সমৃদ্ধ। কিন্তু যার উদ্দেশে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন তার জীবন-চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বক্তব্যের একটা সংগতি বা যোগসূত্র থাকা যুক্তিযুক্ত। তা ছাড়া স্মরণীয় ব্যক্তির ধ্যান ধারণার সঙ্গে সমকালীন উপযোগিতাও চিহ্নিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ ক্ষেত্রে একটি উৎসাহব্যঞ্জক নজির স্থাপন করেছেন প্রখ্যাত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিক্ষক, চিন্তাবিদ এবং একজন প্রাক্তন পার্লামেন্টারিয়ান সরদার ফজলুল করিম। তার প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার শিরোনামটিও ব্যতিক্রমধর্মী 'সেই সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল কিছু স্মৃতি কিছু কথা' লেখক আরও বলতে চেয়েছেন—তিনি এর লেখক নন প্রবক্তা মাত্র। একে লেখ্য রূপ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য দুজন শিক্ষক।

কিন্তু তিনি বক্তা না লেখক সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। উপস্থাপিত স্মারক বক্তৃতাটি তারই একটি দিক। তার আর একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার হলো যার স্মরণে এই বক্তৃতার উপস্থাপন তার সঙ্গে কথোপকথনের ধরনেই তা শুরু করেছেন।

এটা করতে গিয়ে স্মরণীয়ার জন্মকাল থেকে শুরু করে তার অনেককাল পূর্ব পর্যন্ত এদেশের সমাজ-সংস্কৃতি অর্থনীতি রাজনীতিকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরার মাধ্যমে শ্রোতা ও পাঠকদেরকে বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। তার পেশ করা বক্তব্যটি তাই মামুলি কোনো ভাষণ নয়। আগ্রাসী শত্রুরাষ্ট্র শাসিত একটি জাতির ধর্মানুগত্য ও প্রগতিশীলতা, কুসংস্কার ও সংস্কারপ্রবণতা, সংগ্রাম ও সংগ্রাম বিমুখীনতা, গ্রামীণতা ও নগরায়ন প্রবণতার পরস্পর বিরোধী টানপোড়েনের প্রতিচ্ছবিগুলো তিনি অব্যক্তভাবেই এতে তুলে ধরেছেন। ভাষণদাতার বক্তব্য অনুযায়ী যে দুজন শিক্ষক সরদার সাহেবের বক্তব্যকে লিখিত রূপ দিয়েছেন তারাও নিঃসন্দেহে সম্পাদন করেছেন একটি প্রশংসনীয় কাজ। বিশেষ করে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ভাষণটির শেষে সংযোজিত বিজ্ঞাপনটি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে ভাষণদাতার আত্মজীবনীমূলক বক্তব্যটির ওপর আয়োজিত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরধর্মী অনুষ্ঠানে, অভূতপূর্ব লোক সমাগমের বিষয়টি অত্যন্ত লক্ষণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই সভায় ব্যাপক জনসমাবেশ হয়। এতে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ আমাদের অতীত সমাজ ও রাজনীতির ইতিহাস জানার জন্যে ক্রমে একান্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এটা নিশ্চয় খুব আশাব্যঞ্জক।

একালে আমাদের দেশ প্রায় সর্বাংশেই যেখানে দেশপ্রেমবর্জিতদের দৌরাত্ম্যে কালো টাকা ও মাস্তানদের অস্ত্র ও পেশী নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে সেখানে তরুণদের মধ্যে দৃশ্যমান এ প্রবণতা ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো জ্বালাতে বাধ্য। আলোচ্য লেখক বা বক্তার জন্যে এটি একটি বড়ো সাফল্য। সরদার ফজলুল করিম যেসব রাজনৈতিক ঘটনা ও নেতার কথা উল্লেখ করেছেন তার অনেকটাই হাল প্রজন্মের তরুণদের অজানা। 'সেই সে কাল কিছু স্মৃতি কিছু কথা' পাঠ করে এই তরুণদের অনেকেই আমাদের অতীত জানার শুধু যে আগ্রহী হয়ে উঠবেন তা নয় দেশাত্মবোধেও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারেন। কাজেই আমরা বলতে পারি সরদার সাহেবের স্মারক বক্তৃতাটি কেবল মাত্র রাজনৈতিক সাহিত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দর একটি দলিল নয়, আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি গণউৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির পক্ষেও সহায়ক দলিল হতে পারে এটি।

স্মারক বক্তৃতা আয়োজনের প্রচলিত রীতিকে অর্থহীন গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত করে একে একটি জাতীয় গঠনমূলক কাজে রূপান্তরিত করার জন্যে সরদার ফজলুল করিম সাহেবের প্রবর্তিত ধারাটি এক অনুকরণীয় পথ হিসেবেও ভূমিকা পালন করতে পারে হয়তো এক পর্যায়ে। তবে এতটুকু হোক বা না হোক তিনি যে একটি নয়া রীতি শুরু করতে চেষ্টা করেছেন তা নিশ্চিত। ...

বিনোদ দাশগুপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরিশালের 'পোলা'র ঢাকা আগমন

উপক্রমণিকা

চল্লিশের দশকের ঢাকা—এই শিরোনাম আমার মনে অনেক দিন ধরেই বেশ আলোড়ন তুলে চলেছিলো। ওই দশকের লোকজন আমাদের পরিচিত মহলে আজকাল একেবারেই কমে গেছেন। চল্লিশের দশকের ঢাকা, বিশেষ করে সে সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, তখনকার সক্রিয় পরিচিত প্রগতিশীল তরুণ ছাত্রদের প্রসঙ্গ, বিশিষ্ট শিক্ষকদের কথা স্মরণ করা এবং বর্তমানের তরুণদের কাছে সেসব জানানোর একটা প্রয়োজন ও গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান অবশ্যই বর্তমানের হাতে। বর্তমানের যুবক আর তরুণরাই বর্তমানের মীমাংসাকারী শক্তি, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি। এই বর্তমান অবশ্যই নতুন। এরা চল্লিশে ছিলো না। চল্লিশে এদের জন্মই হয় নি। চল্লিশে যাদের জন্ম হয়েছে তাদের বয়সই এখন, এতো বছর পরে পঞ্চাশের ওপর। এই বয়সের ব্যক্তিরাও আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এদের কেউ সমর অধিনায়ক, কেউ বা সেক্রেটারিয়েটের কর্মকর্তা, অনেকে রাজনৈতিক নেতা, অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী। তবু এঁরা চল্লিশের দশকে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করেন নি। অথচ চল্লিশের দশকের যে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ভাবনা-ধারণা-চিন্তা, তারই ফসল, তারই সৃষ্টি এঁরা। কিন্তু এই চল্লিশের ধশকের ঢাকার জীবন সম্পর্কে বর্তমানের একজন প্রৌঢ়ের যেমন কোন অন্তরঙ্গ ধারণা নেই, তেমনি বর্তমানের তরুণদের কাছে চল্লিশের দশক একেবারেই অতীত ইতিহাসের ব্যাপার। কেবল যে অতীত ইতিহাসের ব্যাপার তাই নয়, অজ্ঞাত এক ইতিহাস। এ ইতিহাসের ওপর গবেষণা আবশ্যক। কারণ চল্লিশের দশকের ঢাকার গুরুত্ব কেবল এ কারণে নয় যে ওই দশকে যে ঢাকা ছিল পুর্ববঙ্গের একটি শহর মাত্র, সমগ্র বঙ্গদেশের এবং রাজধানী কলকাতার তুলনায় মফস্বল শহর মাত্র, সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকাই দশকের শেষে '৪৭-এর বঙ্গবিভাগের পর পরিণত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের রাজধানীতে। কেবল এই কারণেই নয়। বঙ্গদেশের একটা ঐতিহাসিক বিভাগ পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে ইতিহাসের বেশ কিছুটা পর্যায় থেকেই একটা সত্য এবং তার একটা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যটি প্রধানত এই সম্প্রদায় কিংবা ঐ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-অপ্রাধান্যের বৈশিষ্ট্য। অন্তত সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর বৈশিষ্ট্য। এবং সে দিক থেকেই পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজে শিক্ষার ক্রমপ্রসারের ক্ষেত্রে কলকাতার বাইরে ঢাকা, তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তেমনি ঢাকার শিক্ষাগত এবং সামাজিক—রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, তার ধারা-উপধারা সমগ্র বঙ্গদেশের রাজনীতিতে, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের রাজনীতিতে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ক্রমিক গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছিল।

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালে তখনকার প্রধান মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো লাহোরে। সে প্রস্তাবের শাব্দিক গঠন যাই থাক, পাকিস্তান আন্দোলন মানে ভারতকে হিন্দু-মুসলমান হিসেবে ভাগ করে মুসলমানদের জন্যে একটা ভিন্ন এবং নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। পাকিস্তান প্রস্তাব থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সে আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত হয়েছে। শিক্ষিত তো বটেই, শিক্ষিতদের মাধ্যমে ব্যাপকতর মুসলিম সমাজ তাতে আলোড়িত হয়েছে। সে ইতিহাসে যাচ্ছি নে। হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায় বলে আমরা অনেক সময়ে কথা বলি। 'সম্প্রদায়' কথাটার মধ্যে কোনো নিন্দামূলক ভাব থাকার কারণ নেই। মানুষ গোত্র, ধর্ম, সম্প্রদায়, দেশ, ভাষা ও অর্থনৈতিক শ্রেণী—বিভিন্নভাবে বিভক্ত। কিংবা মানুষকে এভাবে বিভক্ত বলে বিবেচনা করা যায়। মানুষের সমাজের বিকাশ, এই ক্ষুদ্রকায় পৃথিবীতেও সর্বত্র সমান এবং সমতালে হয় নি। ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে ধর্ম হিসেবে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম এবং তাদের বিশ্বাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগে নানা কার্যকারণে রাজনৈতিক তাৎপর্য গ্রহণ করে। হিন্দু-মুসলমান কথা দুটির মধ্যে একটি মানসিক আবেগের ভাব ক্রমান্বয়ে আপসহীনভাবে সঞ্চারিত হতে থাকে। বিশেষ করে মুসলমান ধর্ম বিশ্বাসীদের উচ্চ শ্রেণীগত শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ উনিশ এবং বিশের শতকে নিজেদেরকে যেমন মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিচালনকারী বলে প্রচার করতে লাগলেন, তেমনি মুসলমানরা একই ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুধর্ম বিশ্বাসীদের চাইতে 'একেবারে ভিন্ন' এরূপ ব্যাখ্যা—বক্তব্যের ওপর জোর দিতে থাকেন। যে ভারতীয় উপমহাদেশে, নানা ধর্ম, ভাষা ও জাতির অবস্থান, বিদেশি শক্তির থেকে স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে তার অপর কোনো সমাধানের স্থানে মূলমানদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র স্থাপন, তথা ভারত বিভাগের ওপরই এই নেতৃবৃন্দ তথা মুসলিম লীগ জোর দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলেন। এখান থেকেই মুসলিম লীগের আন্দোলনটি 'সাম্প্রদায়িক'। এই ব্যাখ্যা পাকিস্তান আন্দোলন ধারার বাইরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মহলে উচ্চারিত হতে থাকে। তবু সেদিন সাম্প্রদায়িক বলেও যেমন পাকিস্তান আন্দোলনকে বাতিল করে দেয়া দেশের বৃহত্তর দল এবং জনসমষ্টির পক্ষে সম্ভব হয় নি (তার কার্যকারণের বিশ্লেষণের কথা ভিন্ন), তেমনি কেবল যে অমুসলমানরাই পাকিস্তান আন্দোলনকে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক বিকাশের সুস্থ কোনো পথ নির্দেশক নয় বলে বিবেচনা করেছেন, তাই নয়, মুসলিম সমাজের মধ্যেও, বিশেষ করে তার বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে এমন একটি অংশ চল্লিশের দশকে উদ্ভূত হচ্ছিল, যে অংশটি পাকিস্তান আন্দোলনের শক্তিকে অস্বীকার না করলেও তার সাম্প্রদায়িক আবেগে নিজেরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়তে চায় নি।

মুসলিম সমাজের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এবং ক্রমাধিক সংখ্যায় মুসলিম সমাজের মধ্যস্তর থেকে আগত তরুণদের আধুনিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে ঢাকা শহর তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বের কথা আমি উল্লেখ করছি। কলকাতার সেইকালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে আমার নিজের কোনো গভীর ধারণা নেই। কিন্তু ঢাকার সঙ্গে ১৯৪০ সাল থেকেই আমার একটি সচেতন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। সে জন্যই চল্লিশের দশকের ঢাকার জন্য আমার মমতাবোধ, পেছন ফিরে তাকানোর একটা গভীর আগ্রহ। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে কেবল ব্যক্তিগত আবেগের দিকই নেই। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার পর থেকে পূর্ববঙ্গে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, আরো নির্দিষ্ট করে বললে, পঞ্চাশের দশকে পূর্ববঙ্গে যে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রমপ্রকাশ ও বিকাশ দেখা গেছে, তার ভিত্তি চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে উপ্ত হয়েছিলো। এরকম ভিত্তির কথা যখন বলা হয়, তখন এটা স্বাভাবিক যে, এর মূলে কোনো একটি ব্যক্তি বা কারণকে উল্লেখ করা হয় না। চল্লিশের দশকের ঢাকায় পঞ্চাশের দশকের গণতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো বলার অর্থ, চল্লিশের দশকের ঢাকা তথা মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আবাসক্ষেত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটা পরিবেশ ছিল যার মধ্যে মানবতাবাদী, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে যায় এমন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। সবকিছু মিলিয়ে বলা চলে, একটি মানবতাবাদী, গণতন্ত্রী, বামপন্থী পরিবেশ। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, এটা কি সেদিনকার প্রধান ধারা ছিল, তবে তার জবাব অবশ্যই এই হবে যে না, এটা নিশ্চয়ই সেদিনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে প্রধান ধারা ছিল না। কিন্তু তার বীজ যে ছিল, এটা তো গুরুত্বহীন নয়। বীজ বাদে বৃক্ষের বিকাশ সম্ভব নয়। এটা কোনো রূপক অর্থে নয়, একেবারে বস্তুগত অর্থেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সত্য। অবশ্য চল্লিশের দশকে দুর্বল হলেও, সেদিনও দৃশ্যমান এই বীজটিরও কিছু পূর্বভিত্তি নিশ্চয়ই ছিল। আমার নিজের চিন্তায়, এই পূর্বভিত্তিটি স্থাপন করেছিলেন অধিকতর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিশ ও ত্রিশের দশকের ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ, তার মুখপত্র 'শিখা' এবং তার মুখ্য পাত্রবৃন্দ, যথা কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার তরুণ কিংবা প্রৌঢ় শিক্ষক ও অধ্যাপকবৃন্দ। এই পর্যায় সম্পর্কে কিছু পরিমাণ আলাপ-আলোচনা আমাদের সাহিত্য-আলোচকবৃন্দ করেছেন। যে চল্লিশের দশকের ঢাকার কথা আমি বলতে চাই সে চল্লিশের দশকের ঢাকা অবশ্যই তার পূর্বসূরি ত্রিশের দশকের ঢাকার উত্তরসূরি।

বরিশালের 'পোলা'র ঢাকা আগমন

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জবানবন্দীতে যদি চল্লিশের দশকের ঢাকার কিছু স্মৃতিচারণ করতে হয় তাহলে আমাকে তো প্রথমে ঢাকায় আসতে হয়।

আমি নিজে ঢাকা এসেছিলাম চল্লিশের দশকের ঠিক সূচনাতেই। ১৯৪০ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাস করার অব্যবহিত পরেই।

আমি এসেছিলাম বলাটা ঠিক নয়। বরিশালের একটি কিশোর। বরিশালের ভাষায় বরিশালের একটি 'পোলা' এসেছিল ঢাকায়, ঢাকা কলেজে পড়তে। ম্যাট্রিক পাস করার পর অবশ্যই সে বরিশালের বিএম কলেজেও পড়তে পারত। তার সহপাঠী অনেকে তাই করেছে। অনেকে কলকাতা গিয়েছে। বরিশাল থেকে তখন সকাল-বিকাল এক্সপ্রেস আর মেইল, বিলাতি আর.এস.এন—আই.জি.এন কোম্পানির বিরাট বিরাট চাকাওয়ালা স্টিমার, যেমন 'ফ্লোরিকান', 'নাগা', 'গারো' কলকাতা রওনা হয়ে যেত। খুলনা গিয়ে যাত্রীরা ঘাটে দাঁড়ানো রেলগাড়িতে উঠত এবং তাতে চড়ে সোজা কলকাতা। কিন্তু বরিশালের এই 'পোলাটি' কেন কলকাতা যায় নি, সেটাও আজ খোঁজ কের বার করার ব্যাপার।

এর একটি বোধগম্য কারণ হচ্ছে আর্থিক। কলকাতা গেলে খরচ বেশি পড়বে। ঢাকায় তত পড়বে না। কিন্তু তাছাড়াও আর একটা কারণ ছিল এই যে, কিশোরের বড় ভাইও উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা না গিয়ে এসেছিলেন ঢাকাতেই, সেই বিশের দশকের শেষ দিকে, ১৯২৭ সালে। বড় ভাই মঞ্জে আলী সরদার-এর সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি তাঁরও বরিশালের বিএম কলেজ থেকে বিএ পাস করে এমএ পড়ার জন্য ঢাকায় আসবার কারণের মধ্যে প্রধান ছিল আর্থিক বিবেচনা। ঢাকায় হল বা হোস্টেলে অল্প খরচে থাকা যাবে। এ বিবেচনা একটি গরিব কৃষক পরিবারের সন্তানের উচ্চ শিক্ষা রাভের জন্য দূরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আজ এত বছর পর সেই ছেলেটির ঢাকা আসবার ছবিটির দিকে তাকাতে গিয়ে যে কথা মনে পড়ে, সেটা আর্থিক সেই বিবেচনার ব্যাপার নয়। মনে ভেসে ওঠে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ছবি। খাল-বিল-বরিশালের ছেলে হলেও এমন বড় 'জাহাজে' চড়ে আর সে নিজের জেলার বাইরে কখনো যায় নি। রওনা করলো যখন সে ঢাকার পথে, তখন কোনো আত্মীয়জন আসে নি সেই পনের বছরের কিশোরের সঙ্গে। ঢাকাতে কোনো আত্মীয়জন থাকার মতো অবস্থাই তার ছিল না। তার বড় ভাই-ই তার মুরুব্বি আর অভিভাবক। তিনি তখন সরকারি চাকুরে। বরিশালেরই কোনো থানা শহর বা বন্দরে। তিনি তাঁর ছোট ভাইটিকে তাঁর পরিচিত ঢাকায় পাঠরত বয়স্ক কোনো ছাত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হবার জন্য।

ঝমঝম করে বিরাট জাহাজ (সেদিনকার সেই কিশোর এর চাইতে বড় জাহাজ যথার্থই দেখে নি) বরিশাল থেকে ছেড়ে বিরাট বিরাট নদীর বুকে ঢেউ তুলে, চাঁদপুর বন্দর এবং মুন্সিগঞ্জে নোঙর করে, নারায়ণগঞ্জের নদীতে ঢুকে সেখানে কিছুক্ষণ থেমে তারপর আবার মীরকাদিম হয়ে সন্ধ্যার পরে যখন বুড়িগঙ্গায় ঢুকল, তখন কিশোরের চোখে পড়ল, দূরের রাস্তা দিয়ে আরো দ্রুতবেগে এক-চোখো কী একটা যেন দৌড়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। সঙ্গী বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র কিশোরকে তার বিস্ময় আর ভয়ের ঘোর কাটিয়ে দেবার জন্য নিশ্চয়ই বলেছিল : 'ঐ দেখ রেলগাড়ি যায়।'

রেলগাড়ি! অবাক বিস্ময়ে রইল কিশোরটি দূরে অদৃশ্যপ্রায় সেই অজানা কিন্তু নামে শোনা ছুটন্ত লৌহদানবের দিকে। 'বলত, কোন্ জেলায় রেল যায় নি?'—এ প্রশ্ন কেবল সেদিনের নয়, আজকের দিনের কিশোরের কাছেও সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন আর তার জবাব আজও এক : সে জেলা বরিশাল।

সে যাই হোক, শান্ত বুড়িগঙ্গায় ঢেউ তুলে জাহাজ এসে ভিড়েছিলো বাদামতলি ঘাটে। সেদিনকার বাদামতলি ঘাট বা তার লাগোয়া সদরঘাটের 'বাকল্যান্ড বাধ' এলাকা আজকের মতো সরগরম ছিল না। বুড়িগঙ্গাও এত কৃশকায়া ছিল না। ছিল বেশ বড়। বরিশালের নদীর মতো না হলেও বুড়িগঙ্গা দিয়ে কোম্পানির বড় জাহাজগুলোর চলাচলে, ভিড়তে, কিংবা ছাড়তে কোনো অসুবিধে হতো না। কিন্তু সেকালের বাদামতলি ঘাটে জাহাজ ভেড়া এবং ছাড়ার সঙ্গে যে বিষয়টি কিশোরের মনে জড়িত ছিলো সে হচ্ছে তার আর একটা বিস্ময়। কোম্পানির যাত্রীজাহাজ ঘাটের সীমানায় পৌঁছুলে লম্বা ভোঁ দেয় : 'ডবল সিটি মারে', যাত্রীরা বোঝে তাদের গন্তব্য প্রায় এসে গেছে। ছাড়ার সময়েও বারংবার সেই একই ভোঁ। কিন্তু ঢাকার বাদামতলিতে রাতের অন্ধকারে জাহাজ ভিড়তো যেন চোরের মতো, ছাড়তোও প্রায় চোরের মতোই। ইঞ্জিনের আওয়াজ যেনো ভেড়ার আর ছাড়ার সময়ে কম হতো, অন্য জায়গার চাইতে। কিন্তু কোনো? রহস্যটা কিশোরের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতায় বেশিদিন রহস্য হয়ে রইল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুরা বলল : 'আরে জানো না, বাদামতলি ঘাটের কাছেই ঢাকার নওয়াবের বাড়ি, 'আহসান মঞ্জিল'। নওয়াবের হুকুম, সন্ধ্যার পরে স্টিমার আসা আর যাওয়ার সময় কোনো 'হুইসল' দিতে পারবে না—নওয়াবের তাতে 'ঘুমের ব্যাঘাত হবে।' নওয়াবের হুকুম কিনা তা জানা নেই। (সেকালে ঢাকার নওয়াব পরিবার ঢাকার সমাজ জীবনের অন্যতম প্রধান বলেই বিবেচিত হতো।) কিন্তু সেকালে বাদামতলি ঘাটে জাহাজ নোঙর করা, নোঙর উঠিয়ে ছেড়ে যাওয়ার সময়ে যে ভোঁ দিত না, একথা সত্য।

প্রৌঢ়ের কৈশোর স্মৃতি

অপরে বৃদ্ধ বললে তেমন উপাদেয় বোধ হয় না। প্রৌঢ় বরঞ্চ চলে। পঁয়ষট্টি প্লাসের প্রৌঢ়। তারই কিশোরকালের কিছু স্মৃতি কথা।

সাজিয়েগুছিয়ে বলার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। স্মৃতির পটে যখন যা ভেসে ওঠে, তাকেই আবার তলিয়ে যাবার আগে টেনে তোলার চেষ্টা করা ভালো। এ কোনো সাহিত্যকর্ম নয়। কাজেই সাহিত্যিক সৌকর্যের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়াও নিরর্থক।

১৯৪০ সনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বরিশালের সেই কিশোর পোলাটি ঢাকা এসেছিলো। 'বিদেশ' ঢাকায়। সেদিন ঢাকায় আসার জন্য জাহাজে চড়ে জাহাজ ছাড়ার সময়ে সে ফেলে আসা বরিশাল শহরের দিকে তাকায় নি। তাকিয়েছিলো অজানা ঢাকা দেখা যায় কি না, কখন দেখা যাবে, তার দিকে। সেদিন ছিল অজানার আকর্ষণ। 'লিউর অব দি আননোন্।' কিন্তু আজ স্মৃতির বাহনে চড়ে সেই ৪০ সালে ফিরে গিয়ে অত সহজে বরিশাল ছেড়ে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এখন 'লিউর অব দি আননোন্' কোথায়? এখন জিজ্ঞাসা সেদিনের ফেলে আসা বরিশালকে কি জানা শেষ হয়েছিলো?

সেই বেল ইসলামিয়া হোস্টেল, পাশের এ.কে. স্কুলের খাবার ঘর, নামাজের সময়ে রোলকল্, হোস্টেলে কড়া সুপার সাহেব : টুপি মাথায় দিয়ে খেতে বসতে হবে। তা না হলে খাওয়ার টেবিল থেকে সুপার এসে তুলে দেবেন। রাত দশটা বাজতেই হোস্টেলের লাইট নিবিয়ে দেওয়ার হুকুম। আর তারপরেই অন্ধকারে ৩৯-৪০ সালে সেই কিশোরটির গা ঢাকা দিয়ে খান কয়েক বই হাতে নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের গা ঘেঁষে, লোহার রেলিং টপকে ছবির মতো সুন্দর স্টিমার ঘাটের বুকিং অফিসের 'টাইম-বোর্ড'টার নিচে বসে বই পড়া। আহা, যদি জানতাম, এমন জীবন আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তাহলে ফেলে আসা কৈশোরের জীবনকে আরো গভীর করে ভালোবাসতাম! পূর্ণতরভাবে বাঁচতাম।

জেলা স্কুলের হেডমাস্টার সিরাজউদ্দিন সাহেবের দস্তখত করা আমার ক্লাস টেনের একটা প্রশংসাপত্র এখন পর্যন্ত সযত্নে রাখা আছে। সবল অথচ কম্পিত হাতের সেই সইটির দিকে তাকালেই হেড স্যারের গৌরবর্ণ দেহের ছবিটা চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে ভেসে ওঠে। এখনো ভাবতে ভয় লাগে : আপাতভাবে কী কড়া মেজাজের মানুষ। আর এমন কাঠামোর স্কুল-দালানও আমি আর কোথাও দেখি নি। সামনে-পেছনে বিরাট সিঁড়িওয়ালা একতলা দালান। মাঝখান দিয়ে লম্বা করিডোর। দু'পাশে ক্লাস ঘর। হেডমাস্টার সাহেব এই করিডোর দিয়ে এ-মাথা থেকে ও-মাথা হেঁটে যেতেন। তাঁর পায়ের আওয়াজেই সব ক্লাসরুম হিম-ঠাণ্ডা হয়ে যেতো।

কিন্তু শশধর স্যার ছিলেন কী সুন্দর হাসিখুশি মেজাজের শিক্ষক। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। আর অঙ্কে আমি আজীবনই কাঁচার কাঁচাই রয়ে গেলাম।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অঙ্কের দিন অঙ্ক পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়েছি। কোনো রকম দিয়েছি। একেবারে যে ফেল করব, তা নয়। তবে কানের পাশ দিয়ে যাওয়ার ব্যাপার। তাই উদ্বেগের অন্ত ছিলো না। পরীক্ষা শেষ হতে শশধর স্যারই সহাস্যে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিরে পাস করবি তো? আমি সভয়ে এবং শঙ্কিতভাবে বলেছিলাম : পাস করব না স্যার? চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশও কি পাবো না? স্যার হেসে বলেছিলেন : ঘাবড়াসনে। আমি খাতা একবার দেখে দিয়েছি। পঞ্চাশের মতো তোর থেকে যাবে।

অঙ্কে এমন কাঁচা মানুষের প্রৌঢ় বয়সে অঙ্কের কিছু স্মরণে আসবার কথা নয়। তবু স্মৃতিতে সে যে উঠে এলো, সেটাই মজার। আর মজার ঘটনা বলেই মনে এলো।

ম্যাট্রিকের আগে এ্যানুয়ালে, নাইন থেকে যখন টেনে উঠেছিলাম, তার ফলাফলের ওপর যেদিন পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান হয়েছিলো, সেদিন আমাকে অঙ্কের ওপরও পুরস্কার দেওয়া হয়েছিলো। না, ফেল করার জন্য নয়। বাংলাতে বোধ হয় নম্বর একটু ভালো উঠেছিলো আর অঙ্ক-বাংলার মিলিত নম্বরের একটা পুরস্কার ছিলো। আর তাতেই আমি এই দুবিষয়ে পুরস্কার পেয়েছিলাম। কিন্তু আসলে এটাও মূল কারণ ছিল না। মূল কারণ এ্যানুয়ালে তপনের পরীক্ষা না দেওয়া। তপন ছিলো ক্লাসের হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যে তুখোড় ছেলে। ওই-ই ফার্স্ট হতো। ওরই ন্যায্যত প্রাপ্য ছিল সব পুরস্কার। কিন্তু কোনো অসুখের জন্য বোধ হয় সেবার তপন এ্যানুয়াল দেয় নি। আর তাতেই খুলেছিলো আমার কপাল।

কিন্তু ব্যাপারটাতে আমার আনন্দ বা গর্ববোধ হওয়ার চাইতে কৌতুক জেগেছিলো বেশি। বেশ মজার মনে হয়েছিলো। তবে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া ইংরেজি-বাংলা বই-এর বোঝায় তিনফুটি ছোট্ট কিশোরটির কাঁধ যে ভরে গিয়েছিলো, সেটা সত্য। আর তাতেই দর্শকদের মধ্য সে কী বাহবা!

তাই বলে একেবারেই কি যোগ্য ছিলাম না? মিলাদ হতো স্কুলে। সে উপলক্ষে হজরতের জীবনের ওপর রচনা প্রতিযোগিতা হতো। আর তাতে একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মানুষ হজরত মোহাম্মদ' শিরোনামের আমার লেখাটিকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়েছিলো। এ পাওয়াতে হয়ত তেমন ফাঁকি ছিল না।

আসলে মোজাম্মেলের সামনে এই ভালো হওয়া, পুরস্কার পাওয়া নিয়ে কোনো কথা বলারই উপায় ছিল না। ইচ্ছা করলে মোজাম্মেল আমাদের অনেকের চাইতেই ভালো ফল করতে পারতো। ক্লাস এইটে বৃত্তি নিয়ে নাইনে এসে ভর্তি হয়েছে ও। কালো ছিপছিপে গড়ন। চোখে—মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। ওর চিন্তা ভালো ফলের নয়, চিন্তা নিজের বিপ্লবী দল 'আর.এস.পি'র সাংগঠনিকপ্রভাবে কোন ছেলেকে কীভাবে যোগাড় করতে পারবে, সেটা। আর তাই আমাকে ঠাট্টা করে বলত : এই ভালো ছেলে! বই পড়া রাখো। এই লিফলেট কটা নিয়ে যাও। দেখো, একটু সাবধানে নিও। কেউ যেন জানে না। কালই ফেরত দিও। ওর কথাবার্তায় সত্যি ভয় হতো। লাল কালিতে ছোট ছোট অক্ষরে ছাপা ইশতেহার : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খতম করে ভারতবর্ষে শোষিত জনতার রাজ কায়েম করার জঙ্গি আওয়াজ।

একদিন দিয়েছিলো পড়তে একটা বই। তিনশ' পৃষ্ঠার ওপরে তার আকার। বাংলায় বলেছিলো : প্রোসক্রাইব্‌ড্ বই; বেআইনি বই। খবরদার, কেউ যেন টের না পায়। একরাতে শেষ করতে হবে। আমি তাই করেছিলাম। কোনো কষ্ট করতে হয় নি। একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কেবল যে নিষিদ্ধ বই পাঠের আকর্ষণ, তাই নয়। গ্রন্থের বিষয়বস্তুও। প্রবন্ধ নয়। গল্প। বিপ্লবী উপন্যাস।

নায়ক-নায়িকারা সমিতি করে। শ্রমিকদের মধ্যে সভা করে। ভারতবর্ষের বাইরে। রেঙ্গুনে। মান্দালয়ে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা তাদের লক্ষ্য। নায়ককে ভালোবাসে নায়িকা। কিন্তু নায়ক দুর্বল। পুলিশের আতঙ্কে সে দলের গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়। এই অপরাধে গুপ্ত দলের গোপন বিচার বসে। রায় হয় : এই গুরুতর অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। কিন্তু সে দণ্ড কার্যকর হতে পারে না। নায়িকা তার প্রেমিকের দণ্ডে বিমূঢ়। কিন্তু তাকে অভয় দেয় সব্যসাচী। দলের বিপ্লবী অধিনায়ক। রহস্যপুরুষ। সব্যসাচী বলেন : ভয় পাসনে বোন, ভারতী। অপূর্বর কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু অপূর্ব বিপ্লবীদলের যোগ্য নয়। ওকে তুই এই বিপদের মধ্যে আনিসনে ...।

আজ জানি এ কাহিনী হচ্ছে 'পথের দাবী'র কাহিনী। বই-এর নাম 'পথের দাবী'। লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এই বই তখন ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণায় নিষিদ্ধ আর বিপজ্জনক বই। এ বই কারুর হাতে পেলে অমনি তার গ্রেপ্তারের আশঙ্কা। সশ্রম কারাদণ্ডের ভয়। আর তাই সে রাতে বইটার পুরোটা পড়েও বুঝতে পারি নি : কী নাম এ বইয়ের। বইয়ের পাতার মাথায় মুদ্রিত হয়েছিলো যেখানে যেখানে 'পথের দাবী' নামটি, সবখান থেকেই সেটাকে কেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে আপাত নির্দোষ করা হয়েছিলো 'পথের দাবী'কে। 'পথের দাবী' হীন 'পথের দাবী'কে।

মোজাম্মেলের এই ছিল কারবার। তাই ওর ধমকে ক্লাসে ভালো ফল করেছি বা অনেক বই পুরস্কার পেয়েছি, একথা বলার সাহসই হতো না।

এই বই পড়ার স্মৃতি যেমন মনে গেঁথে রয়েছে, তেমনি মজার স্মৃতি হিসেবে গেঁথে আছে বেল ইসলামিয়া হোস্টেলে কম্পালসরি নামাজের রোলকলের স্মৃতি।

এখন আর বেল ইসলামিয়ার সেই পুরনো মর্যাদা নেই। তার দেওয়ালেও দেখলাম, আজকাল আর চুনকাম হয় না। অথচ সেদিন শহরের 'বি আই' হোস্টেল বা বেল ইসলামিয়া হোস্টেল ছিল জেলা স্কুল আর এ.কে স্কুলের ছাত্রদের ছাত্রাবাস। কোনো ইংরেজ জেলা ম্রাজিস্ট্রেটের নামে প্রতিষ্ঠিত হোস্টেল।

এ.কে স্কুলের মৌলবী, দীর্ঘদেহী, শ্মশ্রুমণ্ডিত সুলতান সাহেব তার সুপারিনটেন্ডেন্ট। তাঁর গলার আওয়াজ আর দীর্ঘ চেহারার সামনে নাইন-টেনের বড় সাইজের ছেলেরাও কুঁকড়ে যেত। তাঁর রেওয়াজ ছিল, মাগরেবের আর এশার নামাজে বোর্ডিং-এর প্রত্যেক ছাত্রকে হাজির থাকতে হবে। নামাজের জমাত হবে বোর্ডিং-এর টানা বারান্দায়। আর সুপারিনটেন্ডেন্ট নিজে তার ইমামতি করবেন। মোনাজাত শেষে রেজিস্টার ধরে রোলকল। রোলকলের জবাবে 'লাব্বায়েক' বলতে হবে। 'লাব্বায়েক' মানে হাজির।

কিন্তু সন্ধ্যার পর ছাত্রদের দুষ্টুমি যে বাড়তে থাকতো, সুলতান সাহেব সেটা বুঝতে পারতেন। কেউ কেউ নামাজে উপস্থিত হতো না। উপস্থিত না হলে ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত 'ওয়াকত' প্রতি জরিমানা ছিল, যতদূর মনে পড়ে, এক আনা। আর ক্লাস সিক্স পর্যন্ত বেত। আমি সাহস করে 'লাব্বায়েক' বলি নি বা জামাতে অনুপস্থিত রয়েছি, এমন কথা মনে করতে পারছি নে। কিন্তু সহপাঠী আমিনুলকে দেখতাম বেপরোয়া। হাসি হাসি মুখ। কিন্তু নামাজে, বিশেষ করে এশার নামাজে সে হাজির হতো না। সুলতান সাহেব এর কৈফিয়ত তলব করতেন। সুপারিনটেন্ডেন্টকে আমরা 'স্যার' বলতাম না। বলতে হতো 'হুজুর'। আমিনুলকে তলব করলে আমিনুল হাসিমুখে বলত : হুজুর, আমি তো বলেছি, আমার জরিমানাটা আগাম নিয়ে নিন ...।

সুলতান সাহেব আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু শুনেছি, আমি বরিশাল থেকে আসার পরেও তিনি আমাকে স্মরণে রেখেছিলেন, তাঁর আত্মীয়জন আর অন্য ছাত্রদের কাছেও আমার কথা বলেছিলেন।

এই বরিশালেই সেই '৩৮ সনে এসেছিলেন ছবির মতো দেখতে সুন্দর, সুভাষচন্দ্র বসু। বক্তৃতা করেছিলেন বি.এম স্কুলের উল্টো দিকের বার একাডেমির মাঠে। এসেছিলেন নিশ্চয়ই। তা না হলে বার একাডেমির মাঠের পাশ দিয়ে এরপর যখনই হেঁটেছি, তখুনি সুভাষ বসুর চেহারা আমার মনের চোখে কেনো ভেসে উঠেছে বারংবার! আজ হয়ত সেই বার একাডেমিও নিশ্চিহ্ন। বরিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরে যতগুলো হাইস্কুল ছিল, এতগুলো হাইস্কুল খুব কম জেলা শহরেই দেখা যেত।

এমনি জানা-অজানা নানা উপাদান। নানা উপাদান দিয়ে গঠিত হয়—যে কোনো পদার্থ। একজন কিশোরও একটা পদার্থ। চারদিকের আলো-হাওয়া, পানি, মানুষজন, দয়া-মায়া, আঘাত, স্নেহ, সব নিয়ে যে পরিবেশ তারই মিলিত উপাদানের ফসল সে। এমনি করেই তার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। তারপরে একদিন আবার সে যৌগিকের বিশিষ্ট উপাদানে পর্যবসিত হয়।

যেমন ছিল তেমনভাবে হয়ত নয়। নতুনভাবে নতুন উপাদানের সৃষ্টি করে পুরনো উপাদান তার ভূমিকা পালন করে। তার কতোখানি সচেতন, কতোখানি অচেতন : সে অনেক তত্ত্বের কথা। সে তত্ত্ব থাক। কিন্তু কোনো এক সময়ে যদি বসতেই হয় কোন উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে একটা জীবন, তার হিসেব নিতে, তখন কোনো উপাদানকেই হিসেবের বাইরে রাখবার উপায় থাকে না। কাউকেই বাইরে রাখা উচিত নয়। অবশ্য সব উপাদানকে নির্দিষ্ট করাও সহজ নয়।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর স্মৃতিচারণ

AMARBOI.COM

চল্লিশের দশকের ঢাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশের কোনো রেখাচিত্র আমার একার পক্ষে তৈরি করা আদৌ সম্ভব নয়। আমি কেবল এর বৈশিষ্ট্য, একে জানবার প্রয়োজন আর এ-বিষয়ে আমার আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছি।

ব্যক্তিগত এই আগ্রহের কথা প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক সৈয়দ নুরুদ্দিনকে আমি বলেছিলাম। কবি সানাউল হকও এই সময়কার ছাত্র। আমার অগ্রবর্তী। তাঁর সঙ্গেও এ সম্পর্কে আলাপের প্রয়োজন রয়েছে। 'সংবাদ'-এর এককালীন সম্পাদক খায়রুল কবির এবং তার বর্তমান সম্পাদক আহমদুল কবির এঁরা দুজনও আমার অগ্রবর্তী। চল্লিশের দশকের ঢাকার কাহিনী লেখার অধিকতর উপযুক্ত পাত্র এঁরা। ঢাকা শহরের না হলেও ঢাকা জেলার এঁরা অধিবাসী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, চল্লিশের দশকেই। এবং বুদ্ধিবৃত্তি-গতভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁরা এঁদের অধ্যয়নকাল থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছেন। চল্লিশের দশকের ঢাকার অন্তরঙ্গ পরিচয় এঁরাই জানেন। এ.কে. নাজমুল করিম আজ প্রয়াত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি ১৯৪১ থেকে '৪৫ সাল পর্যন্ত। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পর সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর। কলেজে পড়ার সময় থেকেই দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না হলেও, এ সম্পর্কে কৌতূহলী মন ছিল তাঁর। তাঁর সহপাঠী হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছাত্র সংগঠন 'ছাত্র ফেডারেশন'-এর কর্মী। এঁদের একজন ছিলেন রবি গুহ। রবি গুহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন সর্বদা হাসিমুখ, আলাপপ্রিয়, সমাজতন্ত্র-ব্যাখ্যাকারী এবং ছাত্র-শিক্ষক মহলে খুব সাদরে গৃহীত ছাত্রকর্মী। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আমার অগ্রজদের কথা স্মরণ করতেই মনে এল নাজমুল করিমের নাম। নাজমুল করিম যে সমাজতন্ত্রে দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করতেন, তা নয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর ছিলো বিশেষ কৌতূহল। চল্লিশের সনে না হলেও বিয়াল্লিশ সনের দিকে ঢাকার কমিউনিস্ট কর্মীরা ছাত্রদের মধ্যে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হওয়ার পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ সম্পর্কে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যে নীতি গ্রহণ করেছিলো, তাতে কমিউনিস্ট পার্টিকে ভারত সরকার আর নিষিদ্ধ রাখা আবশ্যক মনে করে নি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জার্মানি-ইতালি-জাপান মিলে যে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তি তৈরি হয়েছিলো তার বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের নীতি ঘোষণা করেছিলো। এ নীতির ব্যাপারে ভারতের কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের ভেতরে কিংবা বাইরে ফরোয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি. বা বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টি প্রভৃতির বিরোধিতা ছিল। ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রখ্যাত নেতা সুভাষচন্দ্র বসু সে সময়ে ব্রিটিশ সরকারের অন্তরীণ অবস্থা থেকে কৌশলে পালিয়ে বার্লিন হয়ে টোকিওতে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপানের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে ভারতে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অধিকতর জটিল রূপ গ্রহণ করে। ঢাকাতে কমিউনিস্ট কর্মীদের এই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী নীতি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর.এস.পি মহল থেকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এর বিভিন্ন আত্মঘাতী প্রকাশ সংঘটিত হত হিন্দু ছাত্রদের হল ঢাকা হল, জগন্নাথ হল এবং হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রধান তাঁতীবাজার, শাঁখারী বাজার, ওয়ারী ও নবাবপুর প্রভৃতি এলাকার ছাত্র মধ্যবিত্ত কর্মীদের মধ্যে। এ-সব বিরোধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে তেমন কোনো আলোড়ন বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো না। যুদ্ধের চরিত্রের ব্যাখ্যা-প্রতিব্যাখ্যা মুসলিম ছাত্রদের চিন্তা ও আলোচনার কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হলো এই যে, ঢাকা শহরের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন হিন্দু ছাত্র এবং মধ্যবিত্ত অন্য কর্মীরা তাদের নিজেদের সমাজে তীব্র বিরোধের সম্মুখীন হলেও মুসলিম ছাত্র, বিশেষ করে তার মধ্যকার উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের কাছে বেশ সমাদর পেতে লাগল। এই ধারাতেই চল্লিশের দশকে, বিশেষ করে ৪২ থেকে ৪৫-৪৬ সালে ছাত্র ফেডারেশনের এবং ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের কর্মীদের সম্পর্ক তৈরি হয় এই সময়কার মুসলিম ছাত্রদের সঙ্গে। এবং এদের মধ্যে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে যেমন ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ.কে. নাজমুল করিম, তেমনি বাংলার হেসামুদ্দিন আহমদ, ইংরেজির এ.কে.এম আহসান, কবীর চৌধুরী, অর্থনীতির সানাউল হক এরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ নুরুদ্দিন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন কিংবা একেবারে সহপাঠী, সেটাও হিসেব করার বিষয়। সৈয়দ নুরুদ্দিনের পাঠ্য বিষয় ছিল বোধ হয় ইতিহাস। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে প্রয়াত মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর নামও স্মরণীয়। তিনি ছিলেন এ.কে. নাজমুল করিমেরও অগ্রবর্তী। কিন্তু তাঁর সঙ্গেও কমিউনিস্ট কর্মীদের একটা পরিচয় এবং হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিলো।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। ইংরেজিতে অনার্স এবং এম.এ উভয় পরীক্ষাতে তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ করেছিলেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর ছোট ভাই মুনীর চৌধুরী। এককালে যখন জঙ্গি এবং বামপন্থী রাজনীতিতে মুসলিম মধ্যবিত্ত কোনো মেয়ে বা ছাত্রীর সক্রিয়তা একেবারে অচিন্তনীয় ছিল, বিশেষ করে ঢাকায়, তখন পাকিস্তানের গোড়ার দিকে কবীর চৌধুরীর ছোট বোন নাদেরা বেগমের রাজনৈতিক উৎসাহ এবং কর্ম ছাত্রছাত্রী মহলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর একটি পারিবারিক অন্তরঙ্গ নাম 'মানিক'। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অগ্রজপ্রতিম হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে পড়বার সময় থেকে তাঁকে 'মানিক ভাই' বলে সম্বোধন করেছি। এই 'চল্লিশের দশকের' ঢাকার কথা মনে করে সেদিন, ১৭ জুন '৮৩, তাঁর বাসায় গিয়ে বললাম, আপনি কিছু বলুন আমাকে, সেদিনের কথা যা মনে আছে।

কবীর চৌধুরী সহাস্যে বললেন : সেদিনের সঙ্গে আজকের কালের ব্যবধান তো কম নয়। ঘটনা এবং চরিত্রের স্মৃতিও তো প্রায় বিলুপ্ত।

আমি বললাম : আপনি কি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়েই ঢাকা এসেছিলেন?

কবীর চৌধুরী বললেন : না, আমি বেশ কিছু আগেই ঢাকা এসেছিলাম।

কবীর চৌধুরী ঢাকাতে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছেন ১৯৩৮ সালে। ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন ১৯৪০ সালে। তারপর আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাবা আবদুল হালিম চৌধুরী ছিলেন পদস্থ সরকারি কর্মচারী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার ছবিটা স্মরণ করে কবীর চৌধুরী বললেন : ছাত্র সংখ্যা তো তখন কত কম! ধরো, সেই ১৯৪০-এর কথা। আমি অনার্স দিয়েছিলাম ৪৩-এ। তখন আমরা মাত্র জনাবিশেক ছাত্র ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে। মেয়ে মাত্র চারজন।

আমি বললাম : মেয়েদের মধ্যে মুসলমান ছাত্রী ছিল কি একটিও?

মানিক ভাই বললেন : না, আমাদের ইংরেজিতে আদৌ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানে ছিলেন মেহের, যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, পরবর্তীকালে।

দুএকটা কথা। খণ্ডচিত্র। আজ বেশি কিছু মনে পড়ে না। কেবল রমনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত রোমান্টিক পরিবেশ বাদে মনে পড়ার মতো হয়তো কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেইও। তবু সেদিনকার পটভূমিতে তার একটি ভূমিকা ছিল, যা পরবর্তীকালকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী বললেন : সাম্প্রদায়িকতা চারদিকে বিস্তারিত হচ্ছিল, একথা সত্য। কিন্তু ১৯৪২-এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের মনে পড়ে না।

'৪২ সনের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটা সংঘাত ঘটেছিলো। এর সূত্রপাত হয়েছিলো কার্জন হলে ছাত্রীদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সলিমুল্লাহ হলের কিছু ছাত্রের আচরণ নিয়ে, হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদের ফলে। পরের দিন এর বিস্তার ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস এবং অফিস বিল্ডিং অর্থাৎ এখনকার বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বিল্ডিং-এ। এ ভবনের দোতলার একদিকে ছিল ফজলুল হক হল অর্থাৎ মুসলিম ছাত্রদের বাসস্থান। ভবনের পুবদিকে ছিল ক্লাস ঘর, ছাত্রীদের কমনরুম আর শিক্ষকদেরও বসার ঘর। নিচে ছিল লাইব্রেরি। এই দিনের সংঘাতের সময়টাতেই নাজির আহমদ নামের একজন মুসলমান ছাত্র আকস্মিকভাবে ছুরিকাহত হন এবং ঐদিনই বিকেলে মিটফোর্ড হাসপাতালে তিনি মারা যান। আমি তখন মাত্র আই.এ. পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি। নাজির আহমদের স্মরণে পরবর্তীকালে নাজিরাবাজার এলাকায় একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিল মুসলিম ছাত্রবৃন্দ, যার নাম দেয়া হয়েছিলো শহীদ নাজির লাইব্রেরি।

আমি কবীর চৌধুরী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এ ঘটনা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে আপনার কি কিছু মনে পড়ে?

কবীর চৌধুরী সাহেব বললেন : এ ঘটনাকে বলতে পারি সেদিনকার আবহাওয়ার একটি ব্যতিক্রম। কারণ আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কেবল হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে নয়। শিক্ষকদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সমাজের। আমাদের ইংরেজিতে ড. মাহমুদ হাসান ব্যতীত সেদিন কোনো মুসলমান অধ্যাপক ছিলেন না। আমার ছাত্র জীবনের সঙ্গে নয়। শিক্ষকদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সমাজের। আমাদের ইংরেজিতে ড. মাহমুদ হাসান ব্যতীত সেদিন কোনো মুসলমান অধ্যাপক ছিলেন না। আমার ছাত্র জীবনের শেষ দিকে, আমার মনে পড়ে, প্রয়াত ফজলুর রহমান সাহেব এসে ইংরেজি বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন তিনি। পরে তিনি কিছু দিন পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষা পরিচালক অর্থাৎ ডি.পি.আই হয়েছিলেন। অকালে তিনি মারা গেছেন। হিন্দু শিক্ষকদের বাড়িতে গিয়ে আমাদের গল্প করা, ক্লাস করা—এটা ছিল সেদিনকার সেই পরিবেশের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এই শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন যেমন মন্মথ ঘোষ, তেমনি পি.কে. গুহ, অমলেন্দু বোস আর এস.এন. রায়। এঁদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিমান নির্বিশেষে, ছাত্রদের এত আন্তরিক, অমায়িক সম্পর্কে ছিল যে সে কথা আজ একেবারে অকল্পনীয় বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয়। আমাদের সে সম্পর্কটা ছিল, বলা চলে, একেবারে পারিবারিক ব্যাপার। অধ্যাপক জুনারকরের পরিবারের কথা মনে পড়ে। এই পরিবারের সঙ্গে মুনীরের সম্পর্ক তো পরবর্তীকালে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো। এইসব শিক্ষক এত স্নেহপরায়ণ ছিলেন, ছাত্রদের সঙ্গে এঁদের ব্যবহার এত খোলামেলা ছিলো যে সে কথা ভাবতেই আজ মনে একটা আবেগের সঞ্চার হয়।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী নিজের বিভাগের অন্য মুসলিম ছাত্রদের কথাও স্মরণ করলেন। বললেন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার এক বছর কিংবা দুবছর আগে। অবশ্য সৈয়দ আলী আহসান আমার সহপাঠী। আমাদের সময়ে অনার্সে প্রথম শ্রেণী আমি একাই পেয়েছিলাম। ১৯৪৩-এ। কিন্তু এম.এ.-তে আমরা প্রথম শ্রেণী লাভ করেছিলাম পাঁচজন। সে একটা রেকর্ড বিশেষ। এদের মধ্যে আমি ছাড়া ছিলেন আজিজুল হক (কিছুদিন আগে তিনি উপদেষ্টা তথা সরকারের মন্ত্রী ছিলেন)। আজিজুল হক নানা ক্ষেত্রে তখন থেকেই খুব এ্যাকটিভ ছিলেন। খুব ভালো ডিবেট করতেন। তাছাড়া ছিলেন প্রণব গুহ। প্রণব গুহ পরে ভারতীয় ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন এবং আমাদের এখানে একবার ডেপুটি হাই কমিশনার হিসেবেও এসেছিলেন। প্রণব ছিলেন অধ্যাপক মন্মথ ঘোষের আত্মীয়। মন্মথ বাবু ছিলেন আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কৃতী অধ্যাপক। ইংরেজির কৃতী ছাত্রদের স্মরণ করে অধ্যাপক কবীর চৌধরী এ.কে.এম আহসান সাহেবের কথাও বললেন। এ,কে.এম আহসান আমার কিছুটা পরবর্তী—হয়ত এক বছর পরে এসেছিলেন ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু সেদিনও সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনাতে তাঁর মধ্যে একটা তীব্র অতৃপ্তি আর জ্বালার আভাস থাকত বলে আমার মনে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী সাহেব হঠাৎ তাঁর একজন সহপাঠীর নাম এবং তাঁর অকাল মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বললেন : দেখ, হঠাৎ আমার রউফের কথা মনে পড়ছে। কত মেধাবী ছাত্র ছিল সে। ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিলো। উত্তরবঙ্গে বোধ হয় বাড়ি ছিল। যক্ষ্মাতে মারা গিয়েছিলো পরে, অকালে। কিন্তু ওর কথায় একটি ব্যাপার মনে পড়ে। বাংলা বিভাগে সম্ভবত উমা বলে একটি মেয়ে ছিল। এই মেয়েটির সঙ্গে রউফের বেশ একটি প্রণয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো।

কথাটায় কিছুটা চমকিত হওয়ার ব্যাপার আছে। আজ আন্তঃসম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রীতি-প্রণয়ের কথা, এমন কি আন্তঃসম্প্রদায়িক পরিণয়ও আর কোনো চমক সৃষ্টি করে না, সমাজে কোনো তরঙ্গ তোলে না। কিন্তু একদিন, এবং সেই ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে এমন ঘটনা যেমন বিরল, তেমনি সাংঘাতিকই ছিল। সমাজের মধ্যে এমন সম্পর্কের উপলক্ষে মর্মান্তিক বিরোধেরও সৃষ্টি হয়েছে, মারাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রউফের সঙ্গে উমার সম্পর্ক তেমন কোনো বিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিল বলে অধ্যাপক কবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌধুরী স্মরণ করলেন না। বরঞ্চ সেই উমাকে স্মরণ করে বললেন : আজও রউফের প্রতি ওর আকর্ষণের প্রগাঢ়তা এবং সাহসের কথা মনে হলে আমার আনন্দ হয়। সেদিন হিন্দু-মুসলমান সব মেয়েরই বাইরে যাতায়াত ছিল সীমাবদ্ধ। মুসলমান মেয়েরা তো বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে পায়ে হেঁটে বা উন্মুক্ত গাড়িতে আসতেই পারত না। হিন্দু মেয়েদের সীমাবদ্ধতা অতখানি ছিলো না। কিন্তু উমা শাড়ি ছেড়ে সেলোয়ার-কামিজ আর বোরখা পরে মুসলমান মেয়ে সেজে রউফের সঙ্গে রমনার লেকের কাছে এসে যে আলাপ করার সাহস দেখাত, সে চিত্রটি আমি ভুলতে পারি নি।

কাহিনীটি আমারও ভালো লাগে।

তারপরেই কবীর চৌধুরী সাহেব বললেন : তবে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে সেইকালে সাম্প্রদায়িকতা তীব্রভাবে না থাকলেও একটা গোত্রবোধ যে ছিল, সেটি আমি স্মরণ করতে পারি। এবং সেটি আজ বেশ কৌতুকজনক বোধ হয়।

আমি বললাম : এর কোনো ঘটনা আপনার স্মৃতিতে আসে?

কবীর চৌধুরী বললেন : সে এক মজার ঘটনা। আমাদের বিভাগের একটি খৃস্টান ছাত্রীর সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় এবং আলাপ-বিনিময় ছিল। আর সেকালে এটিও ছিলো চোখে পড়ার বিষয়। এ নিয়েই চলত জল্পনা-কল্পনা। একদিন দেখলাম, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সহপাঠী কিছু ছাত্র এসে আমাকে খুব তমিজ করে বললেন : কবীর সাহেব, আপনার একটা ব্যাপারে আমরা খুব উদ্বিগ্ন। (সেকালে সহপাঠী সহপাঠীকে আপনি করে বলত, বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে এই রেওয়াজটি ছিল)। আমি বললাম, কি ব্যাপার? তাঁরা বললেন, এই যে আপনি আমাদের সমাজের বাইরের একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছেন, আপনার মতো একটি মুসলমান ভালো ছাত্র, এটি ঠিক নয়।

ঘটনাটি বলে কবীর চৌধুরী বললেন, এতে তেমন কিছু ঘটে নি। তবে এই যে এঁরা বললেন, মুসলমান সমাজের আমি ভালো ছাত্র, অপর সমাজের কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারব না, এটিতে সেদিনকার মুসলিম ছাত্রদের একটি গোত্রবোধের প্রকাশ দেখা যায়।

ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী সাহেব সেদিনের কথা স্মরণ করে বললেন, মুনীর তো ঢাকা এসেছিল আমার পরে। আমি যখন আসি তখন মুনীর আলীগড়ে পড়ে। তবে ছাত্র-শিক্ষক সবার মধ্যে আমি সেদিন সাম্প্রদায়িকতার চাইতে মানবিক একটি বোধেরই প্রকাশ দেখতাম। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে এবং শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে যে চল্লিশের দশকে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করছিলো এবং নানা মহল থেকে প্রবেশ করানো হচ্ছিল, সে কথাও ঠিক। কিন্তু এখানে যেটি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে এই যে এমন অবস্থায়ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে এমন কিছু ছাত্র ছিলো যারা সাম্প্রদায়িক হওয়ার চাইতে বামপন্থী রাজনীতির দিকে অধিক আকর্ষিত হয়েছে। নিজের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে গিয়ে কবীর চৌধুরী বললেন, আমি সেদিন রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে কোন সক্রিয় কর্মী ছিলাম না। কিন্তু তবু সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেদিনকার ঢাকার বামপন্থী গুণীদের মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (কবি), রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী—এঁরা যে ক্রমান্বয়ে আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন এবং আমরা যে তাঁদের দিকে এগুচ্ছিলাম, এ ভাবটি তো আমার আজো মনে জাগে। কারণ, ৪৭-এর পূর্ববর্তী সময়ে একদিকে কংগ্রেস, আর একদিকে মুসলিম লীগ : এর বাইরে প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তাসম্পন্ন একটা ধারা ছিল।

তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার মনে পড়ে, রায় সাহেবের বাজারের সেই দালানটির কথা, যার তেতলাতেই বোধ হয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অফিস ছিল?

আমি বললাম, হ্যাঁ, সেই দালানটি এখনো আছে। যেখানে এখন একটা ওভারব্রিজ উঠেছে তার পূর্বপাড়ের গোড়াতে। এই গলিটির নাম জি. ঘোষের গলি। এবং এক সময়ে এই গলির মুখের প্রথম তেতলা বাড়িটির দোতলাতে ছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের অফিস। পরে এর নিচের তলায় প্রগতিশীল বইপত্রের একটি দোকানও খোলা হয়েছিলো।

কবীর চৌধুরী বললেন, আমি খুব বেশি হয়ত যাতায়াত করি নি সেদিন প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সেই অফিসে। তবু আমার যোগ নিশ্চয়ই কিছুটা ছিল। তাই সেদিনের কথা মনে হতে আজ এই কবি-০সাহিত্যিকদের কথা মনে ভেসে উঠছে।

কবীর চৌধুরী এম.এ পাস করে ('৪৫ সনে) সরকারি চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। খাদ্য বিভাগে। মুসলিম ছাত্রদের ওপর বামপন্থী বা সমাজতন্ত্রী ভাবনার ক্রমপ্রসারের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বললেন, আমি তখন রাজবাড়িতে সরকারি চাকরি করি। রাজবাড়ির একটা ঘটনা কিন্তু এখনো মনে পড়ে।

আমি বললাম : কী ঘটনা, বলুন।

কবীর চৌধুরী বললেন, আমার মনে আছে, রেল শ্রমিকদের সংগঠক ব্যারিস্টার জ্যোতি বসু এসেছেন রাজবাড়িতে রেল শ্রমিকদের এক সম্মেলনে। জ্যোতি বসু তখনি কলকাতার প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা। রাজবাড়িতে তিনি বক্তৃতা করবেন শ্রমিকদের সম্মেলনে। আমার মতো চাকরিজীবীর সেই সম্মেলনের কাছে যাওয়া সেদিন খুব নিরাপদ ব্যাপার ছিল না। আমার মনে যেমন শঙ্কা ছিলো, তেমনি আকর্ষণও ছিলো। আমার এখনো কৌতুকের সঙ্গে মনে পড়ে যে সেই আকর্ষণ এবং আশঙ্কা নিয়ে, আমি রাত্রির অন্ধকারে আমার এক বন্ধুকে সাথে করে গায়ে-মাথায় কাপড় জড়িয়ে প্রায় আত্মগোপনের ভাব নিয়ে সেদিন জ্যোতি বসুর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম।

১৯.৬.৮৩

*　　*　　*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চল্লিশের দশকের ঢাকা' নামের লেখাটি প্রসঙ্গে 'সংবাদ'-এর বিদগ্ধ পাঠকজনদের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সহপাঠী জনাব বোরহানউদ্দিন আহমদ ইতোমধ্যে 'সংবাদ'-এ তাঁর ছাত্রজীবনের কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন। জনাব সিরাজুল ইসলামের একটি চিঠিও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজশাহীর নওগাঁ থেকে জনাব আতাউল হক সিদ্দিকী অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তাঁর সহপাঠী কৃতী ছাত্র আবদুর রউফ এবং তার সঙ্গে এক হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্রীর যে প্রণয়-প্রীতির কথা উল্লেখ করেছিলেন তার সূত্র ধরে একটি দীর্ঘ রচনা সংবাদ-এর সাহিত্য সম্পাদককে পাঠিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও তিনি এ সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁর এই লেখাটিতে তিনি উল্লিখিত তরুণ ছাত্র আবদুর রউফের শিক্ষাগত জীবন এবং তার সঙ্গে এক হিন্দু তরুণীর প্রণয়ের বিষয়টিকে বিশদভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জনাব আতাউল হক সিদ্দিকী অকাল প্রয়াত রউফের ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে এ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে তিনি তাঁর রচনাটি তৈরি করেছেন। জনাব সিদ্দিকী বলেছেন, রউফের বাড়িও ছিল নওগাঁতে।

তিনি রউফের ছাত্র জীবনের কৃতিত্বের অধিকতর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : '১৯৩৮ সনে ঢাকা সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল থেকে রউফ ঢাকা বোর্ডের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন' এবং বাংলাতেও তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে 'পার্বতীচরণ মেডাল' নামে সাধারণ মেধার স্বর্ণপদকের অতিরিক্ত আর একটি স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন এবং 'তখনকার দিনে শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদপদ বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে রউফের মতো একজন মুসলিম ছাত্রের ঐ রকম কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলে একটা আলাদা গৌরব ছিল'—জনাব সিদ্দিকীর এ মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ এবং যথার্থ। পত্রলেখকের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী অর্ধ-শতাব্দী পূর্বের সেই ঢাকার সমাজে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সংঘাতের পরিবেশে দুই সম্প্রদায়ের দুই তরুণ-তরুণী, রউফ এবং উমার প্রণয়, পরিণয়ের প্রস্তাব অবধি নাকি পৌঁছেছিলো। কিন্তু প্লুরুসিতে আক্রান্ত রউফের আকস্মিক প্রয়াণে তাদের সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হতে পারে নি। ছাত্রীটির প্রকৃত নাম নাকি ছিল জয়ন্তী মজুমদার। ডাকনাম ছিলো উমা। এই বিষাদময় কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করেছেন পত্রলেখক জনাব সিদ্দিকী। সেকালের আবহাওয়াতে এই প্রণয় কাহিনীটি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণের তেমন প্রয়োজন হয়ত আজ নেই।

কলেজ নয় তো রাজপ্রাসাদ

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জবানবন্দিতে যদি চল্লিশের দশকের ঢাকার কিছু স্মৃতিচারণ করতে হয় তাহলে আমাকে তো প্রথমে ঢাকাতে আসতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিজে ঢাকা এসেছিলাম চল্লিশের দশকের ঠিক শুরুতেই। ১৯৪০ সনে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাস করার অব্যবহিত পরেই।

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট সরকারি কলেজে আই.এ.-তে ভর্তি হয়ে গেলাম। কতো সহজে, এক বাক্যে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন ব্যাপারটা এমনিই ছিল। যারা ভর্তি হতে চাইত, যারা আগের পরীক্ষা পাস করে এসেছে তাদের জন্য ভর্তি হওয়া কোন সমস্যা ছিল না। আজ সেদিনের কথা শায়েস্তা খাঁর আমলের চাল-ডালের মতোই শোনায়। চাল-ডালের কথা তুলছিনে। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে সেদিনটি শায়েস্তা খাঁর আমলের ব্যাপারই ছিল। স্কুল-কলেজই ভর্তির জন্য ছাত্র খুঁজে বেড়াত। কোনো স্কুল বা কলেজ কত ভালো, তার প্রসপেকটাস বার করতো।

ঢাকা শহরে তখন প্রধান কলেজ ছিলো ঢাকা কলেজ আর জগন্নাথ কলেজ। আরো কলেজ ছিল। কিন্তু এ দুটিই পুরনো এবং পরিচিত।

ঢাকা কলেজে আই.এ.-তে আমার বিষয় ছিল ইংরেজি, বাংলা এবং তার সাথে ইতিহাস, মানে পৃথিবীর ইতিহাস, লজিক এবং সিভিক্স ও ইকনমিকস্‌স।

'ঢাকা কলেজ' কথাটি মনে করতেই আমার চোখে ভেসে ওঠে প্রাসাদের মতো সেই দালানটি, যেটি ১৯০৫ সনে প্রথম বঙ্গভঙ্গের পরে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম নিয়ে গঠিত প্রদেশের লাট সাহেবের ভবন হিসেবে তৈরি হয়েছিলো। অনেকটা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর প্যাটার্নে তৈরি। সাদা ঝক্‌ঝকে বাড়ি। উঠতে রাজকীয় সিঁড়ি। মার্বেল পাথরের। তারপরে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। ফটো নেওয়ার মতো। উপরে উঠে বাঁদিকে কাঠের মেঝে, বিরাট হল ঘর। পরে শুনেছি এটি নাকি সাহেবদের বলরুম বা নাচঘর ছিল। মোট কথা কোনো ঘরই ছাত্রদের ক্লাস করার জন্য তৈরি নয়। তাই জীবনকালের ভাগ্য যে এমন দালানে ঢোকার অধিকার পেল বরিশালের প্রত্যন্ত গ্রামের এক 'ছাওয়াল'। দিনকালই বদলে যাচ্ছিল। তা না হলে, এমন হয়? প্রাসাদের মধ্যে কৃষকের সন্তানের প্রবেশ ঘটে?

রাস্তার একদিকে এই দালান। বর্তমানে পুরানো হাইকোর্ট নামে পরিচিত। আর একদিকে কার্জন হল। মাঝখানের এই রাস্তাটি সেদিন থেকেই আছে। এর তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তা না হলে সেদিনের ঢাকা আর অপরিবর্তিত নেই। এমন কি শহরের মধ্যকার দোলাইখালও আজ রাস্তা হয়ে গেছে এবং ঢাকার রেলস্টেশন বলতেই যে ফুলবাড়িয়াকে বোঝাত সে এখন এই '৮৩ সালে ঢাকা থেকে যাতায়াতকারী বাসের প্রধান কেন্দ্র। রেল লাইন আর বিদ্যমান নেই। পুরানো সেই রেললাইনকেই তেজগাঁ থেকে গেন্ডারিয়া পর্যন্ত রাস্তা করা হয়েছে।

পরিবর্তিত ঢাকায় হাঁটতে কিংবা রিকশা করে যাতায়াতেও ঢাকাকে যেমন অপরিচিত তেমনি নিজেকে বিদেশি বলে বোধ হয়।

১৯৪০ সনেও নিজেকে ঢাকাতে বিদেশি বলে মনে হয়েছিলো। বিদেশি কিশোর হিসেবেই সেদিন শান্ত ঠাণ্ডা রমনার নাম না জানা এ-রাস্তা, ও-রাস্তা দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটতে হাঁটতে আবিষ্কার করেছি সলিমুল্লাহ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং অর্থাৎ বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ঢাকা কলেজ আর কার্জন হলের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা পূর্বদিকে গিয়ে কোথায় যে মোড় নিয়েছিলো, কোন মাঠে বা বাগানে তা আর এখন স্মরণ করতে পারছিনে। অথচ মন চায় পুরনো দিনে ফিরে যেতে, পুরানো রাস্তায় হাঁটতে। পুরানো বাড়ি আজ বিধ্বস্ত, পুরানো মাঠ আজ সরকারি-বেসরকারি বাড়িতে রূপান্তরিত। এমন অবস্থায় পুরানো জীবনকে স্মরণ করার উপায় কি? তাই অসহায় বোধ করি পুরানো জীবনকে স্মরণ করার চেষ্টায়। ঢাকার সেই ৪০-এর দশকের কোনো পুরানো মানচিত্র আছে কিনা আমার জানা নেই। না থাকাই সম্ভব। থাকলে সেখানে রাস্তাঘাটের নাম দেখেও হয়তো পুরানো কথা কিছু স্মরণ করতে পারতাম। বস্তুর সঙ্গে স্মৃতি জড়িত থাকে, ঘটনার, এমন কি ভাব-ভাবনারও। সেই বস্তুর বাস্তব পরিবর্তনে পুরানো ঘটনাকে স্মরণে আনা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ঢাকায় এসে প্রথম রাতটি কাটিয়েছিলাম নওয়াব মনজিলের ন্যায় গঠিত বিরাট সলিমুল্লাহ হলে। এ কথাটি স্মরণ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক যে ছাত্রটির হাতে জিম্মা করে দিয়েছিলেন আমাকে আমার অভিভাবক বড় ভাই, সে ছাত্রটিই আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। সেখানে যেমন তার বাইরের সৌকর্য ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি ভেতরের বাগানটিও ছিল ছবির মতো সাজানো, মনোহারী। তার চারপাশে কোথাও এমন মনোহর গম্বুজওয়ালা দালান আর ছিল না। এখান থেকে জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে এগিয়ে কার্জন হল অবধি এলেই মাত্র আমাদের ঢাকা কলেজের সাদা গম্বুজওয়ালা বাড়ির সাক্ষাৎ মিলতো।

আজো এই দালানের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে মনে ইচ্ছা জাগে একবার ভেতরে যাই, দেখি আমাদের সেই ক্লাস রুমগুলো এখন কেমন আছে। কিন্তু এমন ইচ্ছা পূরণ করার উপায় নেই। এ ভবন এখন নিষিদ্ধ এবং সংরক্ষিত এলাকা। সরকারের কোনো গোপন বিভাগ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে দালানটিকে জাতীয় যাদুঘর হিসেবে বিবেচনা করে তাকে যেমন অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা আবশ্যক, তেমনি তাকে আজকের যুগের শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, প্রবীণ-প্রবীণার দর্শনের জন্য প্রবেশযোগ্য করাও আবশ্যক। এই ভবনের বিভিন্ন ঘরেই পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের বিকাশ ও বিবর্তনের নানা উপাদান সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হওয়া উচিত। নতুন যাদুঘর ভবন বিশাল বটে, কিন্তু পুরানো এই ভবনটির মতো ইতিহাসের সাক্ষাৎ সাক্ষ্য সে এখনো হয়ে ওঠে নি।

ঢাকার কলেজের কথা বলতে কেবল কলেজ ভবনই যে মনের মধ্যে ভেসে উঠছে, তা নয়। এখানে কলেজের আর একটি ভবনের কথাও বলতে হয়। সেটি ঢাকা কলেজের ছাত্রদের থাকার ভবন। ভবনটি কার্জন হলের দক্ষিণ-পূর্বে লাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইটের ভবন। এটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের মূল ভবন বলে পরিচিত। এর মূল কাঠামোটি এখনো অপরিবর্তিত। কিন্তু দোতলার সঙ্গে আর একটি তলা যুক্ত করা হয়েছে। সামনের মাঠেও নতুন ভবন তৈরি হয়েছে। তবে বৃহৎ আকারের পুকুরটি এবং তারই দুই পাড়ের বড় বাঁধানো ঘাট এখনো আছে। এই পুকুরের পশ্চিম পাড়ের সেকালে ছিলো ঢাকা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস। থাকতো প্রধানত হিন্দু সমাজেরই ছাত্রবৃন্দ। এখন সে ছাত্রাবাসের নাম দেওয়া হয়েছে শহীদুল্লাহ হল : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল।

কাজেই যেটি এখন ফজলুল হক হল, সে ভবনটি আসলে ঢাকা কলেজেরই ছাত্রাবাস। এই ভবনটির সঙ্গে আমার ছাত্র জীবন, বলা চলে '৪০ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যায়, এম.এ. পর্যন্ত জড়িত ছিল। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ঢাকা কলেজের ভবনটি যেমন তখন ব্রিটিশ ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর পূর্ব রণাঙ্গনের সৈনিকদের একটা হাসপাতালে পর্যবসিত হয়েছিলো, ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসও অন্যত্র অপসারিত হয়েছিলো। যুদ্ধের সময়ে ইইনভার্সিটির মূল আর্টস বিল্ডিং-এর একাংশও সামরিক হাসপাতালে পরিণত হয়েছিলো এবং তখনি বোধহয় এই ভবনের দোতলাতে অবস্থিত ফজলুল হক হলকে ঢাকার কলেজের ছাত্রাবাস তথা বর্তমান ফজলুল হক হল ভবনে নিয়ে আসা হয়।

কিন্তু ভবনসমূহের এমন প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার দক্ষ লোক আমি নই। তবু ভবনের মধ্যকার মানুষজন, তার ভাবনাচিন্তার কথা বলতে গেলে ভবনের কথাই আগে আসে।

একটা কথা বলা ভালো। সেদিন এটাকে তেমন বেমানান মনে হয় নি। কিন্তু আজ কথাটা ভাবতে গিয়ে একটু বিস্ময় বোধ হচ্ছে। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের হোস্টেলের কথা বলেছি। কিন্তু ছাত্রীদের সন্ধান কি? আসলে এখনো ঢাকা কলেজ বোধ হয় কেবলমাত্র ছাত্রদেরই কলেজ, যদিও শিক্ষক বা অধ্যাপকরা কেবল অধ্যাপকই নন, অধ্যাপিকাও বটে। কিন্তু সেদিনও ঢাকা কলেজে কোনো ছাত্রী পড়তো না। জগন্নাথ কলেজেও নয়। ছাত্রীদের ইডেন কলেজ শহরের এ মাথাতেই ছিলো না। ছিল ওয়াইজঘাট নামে সদরঘাটের কাছে যে এলাকা আছে সেখানে। মোটকথা মেয়েদের সঙ্গে সেই 'ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে'ও আমাদের কোনো যোগাযোগই ছিল না।

প্রবীণ অগ্রজ সাহিত্যিক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষদের স্মৃতিচারণে দেখছি যে তাঁরা অনেকে ঢাকা কলেজে পড়েছেন এবং ঢাকা কলেজে প্রখ্যাত সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁর সাহিত্য আলোচনা শুনেছেন। কিন্তু আমার সে সৌভাগ্য হয় নি। হয়ত কাজী আবদুল ওদুদ '৪০-এর পূর্বেই ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ বা অপর কোথাও বদলি হয়ে গিয়েছিলেন।

'৪০ থেকে '৪২ সনের কলেজ জীবনে আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে প্রয়াত ডক্টর মমতাজউদ্দিন আহমদের নাম। তিনি তখন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। তাছাড়া আমার নিজের শিক্ষকদের মধ্যে ইংরেজির জালালউদ্দিন আহমদ, পি.কে. রায় (সঠিক মনে করতে পারছিনে নামটি), ইতিহাসের পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী। (আহা! কি নিরীহ কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক। শুনেছি পরবর্তীকালে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হন)। সিভিক্স ও ইকনমিকস্-এর অধ্যাপক জনাব শফিকুর রহমান, লজিকের জনাব ফজলুর রহমান—এঁরা ছিলেন। শফিকুর রহমান সাহেব এবং ফজলুর রহমান সাহেব এখনো জীবিত আছেন এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক কার্যাদির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন। এটি আনন্দের কথা। জালালউদ্দিন সাহেব খুব রসিক মেজাজের মানুষ ছিলেন। তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে সেদিনও আমরা ছেলেরা নানা রস-রসিকতা করতাম। তাঁকে অনুকরণ করে কথা বলতাম। জালাল সাহেব পরবর্তীকালে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে দীর্ঘদিন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তিনি এখন প্রয়াত।

দুবছরের সেই কিশোরকালের কলেজ জীবনে বড় রকমের কোনো ঘটনা স্মৃতিতে নেই। যে একটির কথা স্মরণে আছে তা একটু বিস্তারিতভাবে পরে বলব। কিন্তু তার চেয়ে হালকা ধরনের নিজের যে আচরণের কথা মনে পড়ছে তারই একটু উল্লেখ এখানে করা যায়। বিজ্ঞানের সেদিন কারা ছাত্র ছিলেন, তা আজ জানিনে। কারণ আমি ছিলাম আই.এ তথা কলা শাখার ছাত্র। কলা এবং বিজ্ঞান, এ দুটিই প্রধান শাখা ছিল। বাণিজ্য শাখা তখনও চালু হয়েছে কিনা স্মরণ নেই। কলা শাখায়, বিশেষ করে আমার ক্লাসে সহপাঠী হিসেবে আমি পেয়েছিলাম সৈয়দ আলী আশরাফকে। সৈয়দ আলী আশরাফ সৈয়দ আলী আহসানের অনুজ। সৈয়দ আলী আশরাফ ছিলেন যেমন মেধাবী তেমনি সিরিয়াস। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এইচ. এল. দের ছেলে অজিত দেও আমার সহপাঠী ছিলেন। আমার সহপাঠী ছিলেন কামালউদ্দিনও। ইনি পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স এবং এম.এ পড়েছেন এবং এখন ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। নাসিরউদ্দিনও আমারতখনকার বন্ধু; নাসিরউদ্দিন আহমদ। ডাক বিভাগ এবং যোগাযোগ বিভাগের উচ্চতর দায়িত্ব পালন করে হয়ত এতদিনে অবসর নিয়েছেন। নাসিরের ছোট ভাই ছিলো গিয়াসউদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক, '৭১ সনে হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হয়ে নিজের সতেজ স্বাদেশিক জীবনবোধের অপরাজেয়তাকে প্রমাণ করে গেছেন। তাদের পরিবারেও যেমন, আমিও তেমনি গিয়াসকে তার কিশোরকালে ডাকতাম 'বাচ্চু' বলে। নাসিরের বাবা ১৯৪১-৪২ এ চাঁদপুর মহকুমার প্রধান ছিলেন। জনাব আবদুল গফুর। উদার হৃদয় মানুষ। নাসির নিয়ে গিয়েছিলো আমাকে তাদের সেই বাসায়। আর সেখানেই কিশোর বাচ্চুকে পেয়েছিলাম আমার অনুরাগী স্নেহভাজন হিসেবে। '৪২-এর কথা বলতে এমনিভাবে '৭১-এর শহীদ বাচ্চুও স্মৃতির পাতায় স্মৃতি হিসেবে জ্বলে ওঠে। আমার আর একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন আবদুল মতিন। এককালে সাংবাদিক ছিলেন। এখন বিলেত প্রবাসী। ইনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু হোস্টেলে আমার সঙ্গী ছিলেন। হোস্টেলে সঙ্গী ছিলেন কামালও। তাছাড়া ইতিহাসের আর একজন মেধাবী ছাত্রের নাম আজ স্মরণ হচ্ছে। ফরিদপুর থেকে এসেছিলেন মোজাহেরউদ্দিন আহমদ। মেধাবী এবং ব্যতিক্রমী জীবনবোধ আর আচরণের এক তরুণ ছাত্র ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে ইতিহাসে এম.এ. পাস করেছেন। আইন শাস্ত্রেও কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রি নিয়েছেন। মুন্সেফ থেকে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা এবং অধ্যক্ষতা করেছেন। কিন্তু সংসার বা চাকরি, কোথাও যেন কোনো স্থিতি পান নি তিনি। এবং মানাতে পারেন নি পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে। সে পরিবেশে তিনি এককালে যেমন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের তীব্রতা দেখেছেন, তেমনি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিধাবাদ এবং দুর্নীতি তাঁর আপসহীন মনকে বিচলিত করেছে। তিনি অকালে মারা গেছেন। বন্ধুবর আবুল কাসেম ছিলেন দরাজমন, মেজাজ এবং চিন্তার কিশোর। কূপমণ্ডুকতা এবং সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন সেই তাঁর কলেজের ছাত্রজীবন থেকে এবং কারুর মধ্যে এমন সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পেলে তাকে স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করতে কাসেম ছিলেন দ্বিধাহীন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটিও বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। সরকারি কলেজে ভূগোলের অধ্যাপনা করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যেও ডিগ্রি নিয়েছেন। এখনো তিনি তাঁর সেদিনকার সরস মেজাজ এবং ভঙ্গি নিয়ে বেঁচে আছেন।

কলেজের মধ্যে রাজনৈতিক হৈ-হাঙ্গামা সেকালে তেমন ঘটে নি। তখনো রমনা শান্ত। ৪০, ৪১, ৪২—বিশেষ করে যুদ্ধ বাধার পূর্ব পর্যন্ত সেকালের কিশোর ছাত্রদের জীবন তরঙ্গবিহীন অলস-আনন্দঘন অধ্যয়নের জীবন। শিক্ষকরা ক্লাস করতেন রীতিমতো। বরঞ্চ সেই রীতিমতো ক্লাসের মধ্যে দুএক সময়ে ক্লাস না করাতেই মন আনন্দ পেতো। (এখন রীতি হচ্ছে ক্লাস না হওয়ার। ক্লাস হওয়াটাই রীতির ব্যতিক্রম।) ক্লাসে আমরা শিক্ষকদের সঙ্গে নির্দোষ দুষ্টামিতে আনন্দ পেতাম। জালাল সাহেবের বেপরোয়া ঢাকাইয়া উচ্চারণের ইংরেজি বক্তৃতাতে আমরা বেশ আমোদ বোধ করতাম। শফিকুর রহমান সাহেব সিভিকস্ আর ইকনমিক্স্ পড়াতেন। নিরীহ এবং সিরিয়াস অধ্যাপক। হয়ত ছাত্রদের সঙ্গে রস-রসিকতার যোগাযোগ কম ছিল। আর তাই তাঁর কোনো ভঙ্গি নিয়ে ছাত্ররা তাঁকে জ্বালাতন করার চেষ্টা করতো। তাঁর আলোচনা রীতিকে আমরা একটা রঙ্গ করে প্রকাশ করে নিজেদের মধ্যে তিনি ক্লাসে আসার আগে বলতাম : 'চ্যাপম্যান ওপাইন্স্', সেলিগম্যান কনক্লুডস এ্যান্ড শফিকুর রহমান জয়েনস' : এটা সেকালের দুষ্টু কিশোর আমাদের মস্তিষ্কের সৃষ্টি। শফিকুর রহমান সাহেব হয়ত তাঁর বক্তৃতায় অথরিটির উদ্ধৃতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করতেন। তার প্রতি তাঁর ছাত্রদের সরস সমালোচনা। কিন্তু এমন সমালোচনা তাঁর কানে কখনো গেছে বলে আমি মনে করিনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমতাজউদ্দিন সাহেব নিজে দর্শন শাস্ত্রের বিলেত—ফেরত অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে দর্শন পড়াবার তো কোন জায়গা ছিলো না। লজিকের ক্লাস নিয়েছেন, এমনও মনে পড়ে না। কিন্তু ইংরেজির ক্লাস নেওয়াটাই বোধ হয় অধ্যক্ষকে অধিক মানায়। তাই তিনি আমাদের দুএকটা ইংরেজি ক্লাস নিয়েছিলেন। তার একটা ক্লাসে তিনি 'এসথেটিক্‌স্' ব্যাপারটির সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করে তাঁর নিজস্ব কিছুটা তোতলানো ভঙ্গিতে এবং বিশিষ্ট উচ্চারণে যে বিব্রত হয়ে উঠছিলেন সেটি আজ ৪৩ বছর পরেও মনে ভেসে উঠছে। 'ইউ আনডারস্ট্যান্ড, এসথেটিক্‌স্ মিনস্—' সে উচ্চারণটি কানে বাজলেও তাকে তুলে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সেদিনকার তাঁর বিব্রতকর অবস্থায় দুষ্টু ছাত্র হিসেবে আমোদ বোধ করলেও আজ তাঁর জন্য মমতাবোধ হচ্ছে। মমতাজউদ্দিন সাহেবই পরবর্তীকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন ও বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন 'মমতাজউদ্দিন কলাভবন' বলে অভিহিত হচ্ছে।

কিন্তু তিনি বেশ স্নেহপরায়ণ ছিলেন। কলেজের পেছনে মাঠের মধ্যে একতলা বাড়িটিতে প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে তাঁর বাস ছিল। আমরা সেবার হাস্টেলে কী নিয়ে যেন 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করেছিলাম। তখন রেডিও যুগের সবে সূচনা। হয়ত আমাদের দাবি ছিল হোস্টেলের কমনরুমে একটি রেডিও কেনো বসানো হচ্ছে না। কিংবা হয়ত অভিযোগ ছিলো ডাইনিং হলের ডাল এত পাতলা হয় কেনো? আমরা ঘোষণা করে দিলাম আমরা আর ভাত খাবো না। দুপুর গড়িয়ে যায়, আমরা ভাত খাইনে। অবশ্য নিজের নিজের ঘরে বসে কেক, বিস্কুট খেতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি। আমাদের ক্ষোভ বোধ হয় বেশি ছিল হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট জাঁদরেল মানুষ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে। ওয়ালীউল্লাহ সাহেব অবশ্য মুসলমান ছাত্রদের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা আমরা একই দালানে থাকতাম। পশ্চিম দিকের ভাগটা বোধ হয় হিন্দু ছেলেদের ছিল। পূর্বদিকের ভাগটা মুসলমান ছেলেদের। তিনটা দালান। একটার সঙ্গে আর একটা যোগ করা। উত্তরের অর্ধেক বোধ হয় হিন্দু ছেলেদের। অর্ধেক মুসলমান ছেলেদের। এরও আগে হয়ত হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি ছিল। '৪০-এর দিকে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। সে যা হোক, হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের দুটো ভিন্ন হোস্টেল ছিল, এমন আমার মনে পড়ে না। হিন্দু ছাত্রদের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন বোধ হয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক নির্মল সেন। আমাদের একজন এসিসট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর নাম জনাব কফিলউদ্দিন। ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এবং কফিলউদ্দিন সাহেব—এঁরা দুজনেই আজ প্রয়াত। যে 'হাঙ্গার স্ট্রাইকের' কথা বলছিলাম তাঁর স্মৃতিতে দেখছি, মমতাজউদ্দিন সাহেব যখন শুনলেন আমরা বেলা দুটো পর্যন্ত খাচ্ছিনে, তখনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ছুটে এলেন আমাদের রাগ ভাঙাতে। নিজে ছেলেদের পিঠে হাত দিয়ে আদর করে ডাইনিং হলে নিয়ে গেলেন এবং নিজে তাদের সঙ্গে বসে খেলেন এবং ভরসা দিলেন, ডাইনিং হলের খাওয়ার তিনি উন্নতির ব্যবস্থা করবেন।

শিবরাত্রির ফুল সিরিয়াল

'৪০-৪২ সালের কথা। ঢাকা কলেজের ক্লাসের স্মৃতি যত না মনে পড়ে তার চেয়ে বেশি মনে পড়ে হোস্টেলের। সহপাঠী নূরুল ইসরাম চৌধুরী ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর ছিলেন লুৎফুল করিম। এরা কজন কেবল যে কলেজের সহপাঠী ছিলেন তাই নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্নতা হলেও এঁদের অনেককেই আমি একই ভবনে, অর্থাৎ ঢাকা কলেজের হোস্টেল ভবন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রাবাস ফজলুল হক হলে রূপান্তরিত হলো, তখন হলের সঙ্গী হিসেবেও পেয়েছিলাম। নূরুল ইসলাম চৌধুরী সম্প্রতি বাংলাদেশের ফরেন সার্ভিস থেকে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রয়াত অধ্যাপক এ.কে নাজমুল করিমের কনিষ্ঠ ভাই লুৎফুল করিমও সরকারের প্রশাসন বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু সেই '৪১-৪২ সালের ইন্টারমিডিয়েট হোস্টেলের স্মৃতির মধ্যে আর যে ঘটনাটি ভাসছে সটিকে কিছুটা রাজনৈতিক ঘটনা বলা চলে। এই ঘটনাটির উৎসও বোধ হয় হোস্টেলের জাঁদরেল সুপারিনটেনডেন্টচ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব। সাংঘাতিক কড়া মানুষ ছিলেন। হোস্টেলে নিয়ম করেছিলেন, রাত নটা বাজতেই লোহার সদর গেট বন্ধ করে দিবেন। এরপরে কেউ বাইরে থেকে এলে তাকে গেট বইতে নাম লিখতে হবে এবং তার এমন বিলম্বের জন্য পরের দিন সুপারিনটেনডেন্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। রাত দশটার পরে হোস্টেলের মেইন সুইচ অফ করে দেবার হুকুম দিতেন। দশটার পরে সবাইকে ঘুমাতে হবে। সিনেমা যাওয়া বারণ ছিল। অথচ এমন সমস্ত নিয়ম-নিষেধ আমরা মান্য করার চাইতে ভঙ্গই হয়ত বেশি করতাম। বিলম্বে ফিরলে গেটের খাতায় নাম লেখার বদলে গেটের উঁচু শিক বেয়ে তা টপকে ভেতরে ঢোকার পন্থাই ছেলেরা অধিক গ্রহণ করতো। একবার ব্যাপারটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো।

সে রাতটা ছিল শিবরাত্রি। হিন্দু পর্বের দিন। এমন পর্বে ঢাকায় তখন যে কয়টি সিনেমা ঘর ছিল তাদের মধ্যে বিশিষ্টরা বিশেষ আকর্ষণীয় ছবির প্রদর্শনী করতো। এই শিবরাত্রির তারিখেও ঢাকার অন্যতম সিনেমা হল মুকুলে (এর বর্তমান নাম 'আজাদ', ঢাকা কোর্টের বিপরীতে) এই রাতে তিন তিনটা পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি দেখবার আকর্ষণ ছিল। এমন আকর্ষণে আকৃষ্ট না হওয়া কঠিন ব্যাপার। ভক্ত, অনুরক্ত ইত্যাদি মিলে আমার প্রায় একটি দল বা উপদলের মতো গড়ে উঠেছিলো। এরা একজোটে হাঁটতো, চলতো, গল্প করতো। এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের মধ্যে আলোচনার প্রধান বিষয় হতো সাহিত্য বা কোনো উল্লেখযোগ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঘটনা। নিজেদের ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করার জন্য হাতে লেখা ম্যাগাজিনও আমরা সেদিন তৈরি করেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম : 'পাগলা ঝোরা'। এ নামের কি অর্থ, তা আমি আজো জানিনে। হয়ত বা উৎফুল্ল নির্ঝর। এই দলের প্রায় স্বনির্বাচিত নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আর সেজন্যই বোধ হয় আমার নামের প্রধান দুই অংশকে বাদ দিয়ে বন্ধুরা নামের অপ্রধান অংশকে প্রধান করে 'সরদার' বলে আমাকে সম্বোধন করতো। শিবরাত্রির ফুল সিরিয়ালে যাবার গোপন ব্যবস্থার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। সন্ধ্যার পরেই ডাইনিং হল থেকে খেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা রওনা দিলাম রমনা হোস্টেল থেকে মুকুল বরাবর। ভরসা ছিল, ছবি দেখতে দেখতে তো ভোর হয়ে যাবে। তখন ফিরে এলে গেট খোলাই পাওয়া যাবে এবং ওয়ালীউল্লাহ সাহেব টেরও পাবেন না। তিন তিনটে ছবি। একটির বোধ হয় নাম ছিলো 'দেশের মাটি'। আর দুটির নাম মনে নেই। তবে ঠিকই, সারা রাত্রি ছবি দেখেছিলাম। পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছবি মানে প্রত্যেকটার দৈর্ঘ্য কমসে কম আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। ছবি যখন শেষ হলো তখন ভোর হয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু সারারাত ধরে এমন অদ্ভুত আনন্দ ভোগের নেশায় ছসাতজনের সেই দলের সকলেরই চোখ রাঙা আর ঢুলুঢুলু, মাথার চুল বেপাট, উস্কুখুস্ক। কারুর মুখেই তেমন কোনো কথা নেই। আধ বোজা চোখে নির্জন ঠাণ্ডা রাস্তা দিয়ে 'মুকুল' থেকে সারাটা পথ হেঁটে এলাম। মনে কোনো ভয় ছিল না। ভেবেছিলাম, এত সকালে ওয়ালীউল্লাহ সাহেব জানতেও পারবেন না। কিন্তু প্রবাদে যা আছে বাস্তবে তা সত্য বৈ মিথ্যা হয় না। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয়। আমাদেরওতাই হলো। হোস্টেলের কাছে প্রায় এসে গেছি। এখনো রাস্তার পাশের গেটে পৌঁছি নি। হঠাৎ শুনলাম হাঁক এলো : এই তোমরা সবাই কোত্থেকে এলে, এত ভোরে? ঐ হাঁকের চোটে আমাদের সকলের তন্দ্রা টুটে গেল। চোখের পাতা পুরো খুলতেই দেখি সামনেই ব্যাঘ্র স্বয়ং, সুপারিনটেনডেন্ট ওয়ালীউল্লাহ সাহেব। কিন্তু যেটা মারাত্মক হয়েছিলো, সে হচ্ছে এই দলের মধ্যে জবাবদানকারী একজনের সত্যবাদিতা। সে মুখে আর কোনো জবাব না পেয়ে অক্লেশে বলে ফেলল : স্যার, সিনেমায় গেছিলাম।

বিস্ময় আর আতঙ্কভরা প্রশ্ন এলো আবার : সিনেমায়? সারারাত? ডিড ইউ টেক পারমিশন?

জবাব এলো : স্যার সরদার বলেছে, পারমিশন পাওয়া গেছে ...

কিন্তু সত্যি কি সরদার বলেছিলো, 'পারমিশন পাওয়া গেছে'? সরদারের একথা সেদিনও মনে পড়ে নি, আজো মনে পড়ছে না। তাই বলে, তা নিয়ে বাদপ্রতিবাদের প্রশ্ন ওঠে না। যে বিপদ এসেছে, তার আশঙ্কা তো ছিলই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: সি ইন মাই অফিস : আমার অফিসে সবাই দেখা করো। ...

যা হোক, বিস্তারিত সংলাপ উল্লেখ করে লাভ নেই। ওয়ালীউল্লাহ সাহেব 'শোকজ' করলেন আমাদের সবাইকেই; 'শোকজ' কেনো তোমাদের স্টাইপেন্ড কেটে দেওয়া হবে না এবং লুৎফুল করিমকে (এবং আরো একজনকে বোধ হয়) হোস্টেল থেকে বহিষ্কৃত করা হবে না? লুৎফুল করিম ছিল নাজমুল করিমের ছোট ভাই। নাজমুল করিম ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স পড়েন। আমরা ঢাকা ইন্টার হোস্টেল থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে গল্প করি। তাঁরও একটি ভক্ত এবং গুণমুগ্ধ সহপাঠীর দল ছিল। লুৎফুল করিমের ওপর খড়্গহস্ত হওয়ার কারণ বোধ হয় ওর ত্যাড়াবাঁকা জওয়াব। লুৎফুল করিম সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবকে হয়ত তেমন মান্য করতো না এবং এই অপরাধের ব্যাপারে তাঁকে কিছু একটা বলে থাকবে।

এবং এই বহিষ্কারের আদেশ থেকেই ব্যাপারটা কিছুটা রাজনৈতিক হয়ে দাঁড়াল। আমরা যুক্ত হয়ে পড়লাম আমাদের কলেজের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়, এমন কি বৃহত্তরভাবে দেশের মধ্যে প্রবাহিত রাজনৈতিক ধারা-উপধারার সঙ্গে। ১৯৪০-এর পরবর্তীকাল। যুদ্ধ বেধে গেছে ইউরোপে। সে যুদ্ধ ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে বিশ্বের চারদিকে। '৪২-এর গোড়াতে এশিয়াতে যুদ্ধ চলছে। জাপান এগুচ্ছে চীনের দিকে এবং বর্মার দিকে। ভারতবর্ষে প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠছে। প্রধান ধারার বাইরে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্বে দাবি তুলেছে পাকিস্তানের। '৪০-এর মার্চে লাহোরে পাশ হয়েছে পাকিস্তান প্রস্তাব। মুসলিম সমাজের ছাত্রদের মেধ্যেও পাকিস্তান আন্দোলন সাড়া জাগাচ্ছে। মুসলিম ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলন সমর্থন করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রগণ বোধ হয় এই প্রথম দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক মঞ্চের ঘটনা-দুর্ঘটনা, দাবি প্রতি-দাবির প্রতিক্রিয়াভাবে যুক্ত হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক মঞ্চের ঘটনা-দুর্ঘটনা, দাবি প্রতি-দাবির প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে। তারা আন্দোলিত হচ্ছে তার দ্বারা।

বঙ্গদেশ এবং তার রাজধানী কলকাতায় তখন এই রাজনীতিই নানা জটিলতা লাভ করছে। বঙ্গদেশের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক। তিনি এতদিন মুসলিমদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা ঘটেছে। তিনি মুসলিম লীগের বাইরের শক্তি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সঙ্গী করে কলকাতায় আইন পরিষদে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এই মন্ত্রিসভাকেই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এবং অনুসারীগণ নিন্দাসূচকভাবে 'হক-শ্যামা' বা 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা বলে অভিহিত করেছে। এই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ। পুরাতন ঢাকা তথা ঢাকার স্থানীয় মুসলিম সমাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর নওয়াব পরিবারের তখনো বিপুল প্রভাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্ররা প্রধানত ঢাকার বাইরে থেকে আগত। তাদের বাস ছাত্রাবাসগুলোতে। মোট কথা বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেমন, ঢাকাতেও তেমনি হক সাহেবের মন্ত্রিসভার পক্ষের, বিপক্ষের একটি রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত হয়ে ওঠে।

ঢাকা কলেজের হোস্টেলে আমাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন তারা তখন জরুরিভাবে আবেদন করল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেবের কাছে। হয়ত এটা তাদের কৌশলগত একটা ব্যাপার ছিল। তারা বলল যেহেতু তারা হকপন্থী সে কারণে তাদের বিরুদ্ধে এরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এক সাহেব নাকি কলেজ কর্তৃপক্ষকে এই দণ্ড অবিলম্বে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমাদের হোস্টেলের ব্যাপারটি সাংঘাতিক কিছু অবশ্যই ছিল না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে যে আমরা যুক্ত হয়ে পড়ছিলাম বৃহত্তর রাজনৈতিক ধারা-প্রতিধারার সঙ্গে, সেটি উল্লেখ করা আবশ্যক।

এমনি সময়ে শোনা গেল হক মন্ত্রিসভার নেতৃবর্গ ঢাকা আসবেন আগামী অত তারিখে। ঢাকায় এপক্ষ, ওপক্ষের যেন সাজসাজ রব পড়ে গেল। মুসলমান ছাত্রদের প্রধান অংশ হক সাহেবের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, মুসলিম লীগ হক সাহেবের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং তখন পাকিস্তান আন্দোলনই মুসলমান সামজের প্রধান আন্দোলন। মুসলিম ছাত্ররা সংগঠিত হলো, ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে হক সাহেবের মন্ত্রিসভার নেতারা যখন নামবেন তখন তাঁদের বিরুদ্ধে কালো পতাকা প্রদর্শন করে তাদের বিরোধিতা করা হবে। শহরের মহল্লা সরদারগণ নওয়াব বাড়ির নেতৃত্বে সংগঠিত হলো ঢাকা রেলস্টেশনে হক মন্ত্রিসভার সদস্যদের সংবর্ধনা জানাবার জন্য। খুব সম্ভব এই সদস্যদের মধ্যে নওয়াব হাবিবুল্লাহ মাত্র সেদিন কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। আর কেউ নয়। তবু সেদিন স্টেশনে দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়েছিলো।

ঘটনার আগে থেকে ঢাকা কলেজের আমাদের হোস্টেলেও এই সংবর্ধনা প্রতি-সংবর্ধনার ঢেউ এসে লাগছিলো। একদিন দেখলাম হঠাৎ কয়েকটি ছাত্র এসে আমাদের কয়েকজনকে বলল, আগামী অত তারিখে স্টেশনে যেতে হবে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদর্শনে। তারা এমনটি করেছিলো আমাদের হকপন্থী ভেবেই। একথা ঠিক যে দেশের রাজনীতির ব্যাপারটা আমরা তত বুঝতাম না। এবং সুনির্দিষ্টভাবে সেদিন আমরা হক মন্ত্রিসভার সমর্থন কিংবা বিরোধী হিসেবে দাঁড়াই নি। কিন্তু হোস্টেলের মধ্যে আমাদের নিয়ে ইতঃপূর্বে যে ব্যাপার ঘটেছিলো তাতে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার আমাদের উপায় ছিল না। আমরা বললাম : 'প্রতিবাদে যাব, কি যাব না, সে আমাদের স্বাধীন সিদ্ধান্তের ব্যাপার। একথা আমাদের হোস্টেলের প্রতিপক্ষ দল রুষ্ট হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের এই রোষের প্রকাশ ঐ মুহূর্তে না ঘটলেও ঘটলো সংবর্ধনা প্রতি-সংবর্ধনার সন্ধ্যায়। কারণ ঐ দিন সলিমুল্লাহ এবং ফজলুল হক হলের হক—বিরোধী যে ছাত্ররা প্রতিবাদ জানাতে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে গিয়েছিলো তারা তাদের চাইতে দলে ভারি হক—নওয়াবের সমর্থনকারী মহল্লার লোকদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলো। তাদের কারো পতাকা প্রদর্শন তত কার্যকর হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। এবং এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাল তারা ঐ সন্ধ্যায় ফজলুল হক হল এবং সলিমুল্লাহ হলের যেসব ছাত্রকে তারা হক—সমর্থক বলে মনে করল তাদের বিছানাপত্র ওলটপালট এবং ফেলে দেয়ার মাধ্যমে। ফজলুল হক হলে তাকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো নাজমুল করিম। তাঁর বিছানাপত্র তাঁর প্রতিপক্ষীয়রা ওপর থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিলো। এই আক্রমণ আমাদের হোস্টেলেও বিস্তারিত হলো।

কয়েক মাস পরেই আমার আই.এ ফাইনাল পরীক্ষা। এমন সময়ে হোস্টেলের আবহাওয়া এই সব ঘটনায় পড়াশুনার জন্য প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াল। আমি অবশেষে হোস্টেল ত্যাগ করে আমার বড় ভাই সাহেবের বাসায় চলে যাই। তিনি তখন বরিশাল জেলার নলছিটিতে সাবরেজিস্ট্রার হিসেবে চাকরিরত। সেখানে তাঁর বাসায় বসে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। আমার বড় ভাই হোস্টেলের ঘটনার বিবরণ শুনে আমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর মন্তব্য হলো : 'তোমরা হচ্ছ কওমের দুশমন। তোমরা হুমায়ুন কবীরের মতোই ক্ষতিকারক শক্তি।' বড় ভাই আমার মুরুব্বি। তাঁর সামনে মুখ তুলে কখনো কথা বলিনে। সেদিনও কিছু বলি নি। কিন্তু একটু মজা লাগছিল, তিনি যে আমাকে হুমায়ুন কবীরের নামের সঙ্গে যুক্ত করে আঘাত করতেন, তাই দেখে। কারণ হুমায়ুন কবীরকে আমি ততটা খারাপ কিছু মনে করতাম না। সাংঘাতিক বিদ্বান বলে যেমন তিনি পরিচিত ছিলেন, তেমনি তাঁকে জাতীয়তাবাদী বলে আমি প্রশংসা করতাম।

লাস্টবেঞ্চের আমি

সে যাহোক, মাস দুই পরে পরীক্ষা দিতে যখন ঢাকায় নিজের হোস্টেলে ফিরে এলাম তখন দেখলাম হোস্টেলের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেছে। এমন কি যারা সেদিন সক্রিয়ভাবে আমার বিরুদ্ধতা করেছিলো তাদের মধ্যেও কোনো কোনো সহপাঠী এসে বলল : সেদিন উত্তেজনার মধ্যে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। তুমি সেটা মনে রেখো না।

শান্ত পরিস্থিতিতেই পরীক্ষা শেষ হলো। সে পরীক্ষা ছিলো ঢাকা বোর্ডের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। ঢাকা বোর্ড তখন ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঢাকা শহরের বাইরের সমগ্র বঙ্গের সব স্কুল-কলেজই ছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পরীক্ষার সিট পড়েছিলো জগন্নাথ কলেজে। কেন্দ্রের কথা মনে পড়লো এই কারণে যে সেদিন আমি বোধহয় লজিক পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। সেদিন দেখলাম আমি কিছু লেখার পর থেকেই একজন অধ্যাপক, যিনি পাহারা দিচ্ছিলেন হলে, আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার লেখা দেখতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরেই যদি তিনি চলে যেতেন তাহলে ঘটনাটি মনে দাগ কাটতো না। কিন্তু তিনি প্রায় সারা সময়টাই আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে। যেন আমি নকল-টকল করতে না পারি, তার বিরুদ্ধে পাহারা। ব্যাপারটাতে প্রথমে আমি কিছুটা অস্বস্তিবোধ করলেও কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের লেখায় মগ্ন হয়ে গেলাম। তখন বাংলা বাদে সব বিষয়ের প্রশ্নের জবাবই আমরা ইংরেজিতে দিতাম। যে-অধ্যাপক আমাকে সারাক্ষণ পাহারা দিলেন তিনি যে আমার জবাবদানের দ্রুততায় এবং জবাবের মানে বেশ সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন তাই যেন বুঝিয়ে গেলেন একেবারে শেষ ঘণ্টা পড়ার সময়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে।

পরীক্ষা দিয়ে আবার চলে এলাম বড় ভাইয়ের কাছে। বড় ভাই জিজ্ঞেস করলেন : কেমন হবে তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট। জিজ্ঞাসার মধ্যেও একটু খোঁচা ছিলো। ভাবাটা এমন যে, পড়ার চাইতে অপড়ার কাজেই তো জুটে গেছে। কাজেই কী আর ফল করবে। আমি ছোট কথায় বললাম। পাস নিশ্চয় করব।

তিনি বললেন : আর কিছু নয়?

আমি বললাম : পরীক্ষায় পাস করা ছাড়া আর কী করা যায়?

যা হোক, ছোট-বড়র এমন সংলাপ আর বেশি এগোয় নি।

কিন্তু আমার জবাবে কোনো ক্ষোভ ছিল না। আসলেই পরীক্ষার ফলাফলে আমার কোনো চিন্তা ছিলো না। একে তো ম্যাট্যিকের স্কুলে দেখেছিলাম মোজাম্মেলকে, যে পরীক্ষায় ভালো ফল করাকেই খারাপ মনে করতো। (মোজাম্মেলের একালের পরিচয় অনেকে জানেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক, এককালের রাজনৈতিক দল আর.এস.পি'র নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং ১৯৬৫ সালে কায়রোতে পিআইএ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত। মোজাম্মেল হক আমার স্কুল সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু)। তাছাড়া একবার যখন ম্যাট্রিকের অঙ্কের বাধা পার হতে পেরেছি কোনো প্রকারে, টায়ে টায়ে, তখন বই পড়াতে আমায় আর আটকায় কে? আর বই পড়ার মতো সোজা কাজ আর কী আছে? অন্তত বই পড়া যে তামাক সাজাবার চাইতে সোজা, সে কথাটা আমি জীবনের পাঁচ ছবছর বয়সেই বুঝেছিলাম, বাবা যখন বাড়িতে মেহমান কেউ এলে ডাক দিয়ে বলতেন, করিম তামাক নিয়ে আয়। আর তখন সে হুকুমে হুঁকা জোগাড় করতে হতো, হুঁকার কল্কেতে তামাকের দলা পুরতে হতো এবং সেই তামাকে উনুন থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে হুঁকার মাথায় বসিয়ে মজলিশে নিয়ে হাজির করতে হতো। সে এক কঠিন পরীক্ষা। সে কঠিন পরীক্ষায় বিনা বকাবকুনিতে পাস খুব কম্ করেছি। তখনি বুঝেছিলাম এর চাইতে কত সহজ কোরানের বাণীর সুললিত কাব্যিক অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়া, আর তা পড়ে মা, বোন, চাচা, চাচীকে শোনানো। কতো আকর্ষণীয় হাসান-হোসেনের করুণ কাহিনী পড়া, 'বিষাদ সিন্ধু' থেকে। আহা ইমাম হোসেনের জীবনের শেষ মুহূর্তটি কী করুণ, কী নিদারুণ। 'সীমার ইমাম হোসেনের বক্ষে চাপিয়া বসিয়াছে। সে হোসেনের কণ্ঠে খঞ্জর চালাইতেছে। কিন্তু খঞ্জর হোসেনের কণ্ঠ ভেদ করিতেছে না। ইমাম হোসেন বলিলেন : ভাই সীমার এ জায়গায় তুমি কিছু করিতে পারিবে না। এ জায়গায় হজরত মুহম্মদ মোস্তফা, আমার নানাজান আমাকে চুম্বন করিয়াছিলেন।' 'আর ফোরাত নদীর তীরে এক ফোঁটা পানি না পেয়ে ইমাম হোসেনের পরিবার-পরিজন' বিশেষ করে শিশুদের কী করুণ মৃত্যু। পড়তে পড়তে সত্যি গলা ধরে আসত, চোখে পানি জমত। বাড়ির চাচা, চাচী, বড় ভাই, এরা কেবল ডেকে ডেকে আদর করে বলতেন : করিম তুইতো সুন্দর পড়িস। পড়তো আবার সেই জায়গাটি।

তাই পরীক্ষার ভয় নয়, পড়ার আনন্দই আমাকে আনন্দিত করতো। এই পরীক্ষা পাসের সুযোগেই যখন গ্রামের কৃষক পরিবারের একটি ছেলে আমার পক্ষে ঢাকা কলেজের প্রাসাদ আর হোস্টেলের পাকা ভবনকে নিজের বাড়িতে পরিণত করা সম্ভব হলো তখন আমার চেতন-অবচেতনে আর আনন্দের সীমা রইল না। কলেজ আর হোস্টেল এবং তার শিক্ষকবৃন্দ, সহপাঠী বন্ধুরা, হোস্টেলের ওয়ালীউল্লাহ সাহেব, এসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেনডেন্ট কফিল উদ্দিন সাহেব এঁরা হয়ে দাঁড়ালেন আমার এই বৃহত্তর এবং নতুন পরিবারের আত্মীয়বর্গ। ক্লাস এইট কিংবা নাইন থেকে হোস্টেল জীবনযাপনে অভ্যস্ত আমি তাই কোনদিনই কলেজ আর হোস্টেল জীবনকে বৈরী বলে ভাবতে পারি নি। এত যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঢাকার বুকে বয়ে গেল, কোনোদিন তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে কোথাও যেতে মন চায় নি। ঢাকার মধ্যে থেকেই ঢাকাকে উপভোগ করার একটি বোধ ছিল মনে।

কয়েক মাস পরে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলো। তার খবর পেলাম বড় ভাইয়ের চাকরিস্থানের বাসায় বসে। ঢাকা থেকে আমি তখন দূরে। নিরুদ্বিগ্ন আমার নামে বড় ভাইয়ের 'কেয়ার অবে' হঠাৎ একদিন একটি টেলিগ্রাম এল ঢাকা থেকে। পাঠিয়েছেন ইউনিভার্সিটির অনার্স ক্লাসের ছাত্র নাজমুল করিম। তাঁর সঙ্গে ইতোমধ্যে সম্পর্কটি আমার অগ্রজ-অনুজের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। টেলিগ্রামে তিনি আমার পরীক্ষার ফল জানিয়েছেন। বুঝলাম আমার পরীক্ষার ফলের ব্যাপারে আমার চাইতে তাঁরই আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল অধিক। সে টেলিগ্রামের মর্ম আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিল : কেবল আমার বড় ভাইয়ের জন্য নয়। আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিল খোদ আমার জন্যও। টেলিগ্রাম করেছেন নাজমুল করিম : 'ইউ হ্যাভ স্টুড সেকেন্ড ইন দি বোর্ড। হারটি কনগ্রেচুলেশনস' : তুমি বোর্ডে সেকেন্ড হয়েছ। আমার অভিনন্দনও নিও। নাজমুল করিম কোনোদিন আমাকে তুমি বলে ডাকেন নি। বলেছেন, 'আপনি'। অথচ আমি তাঁর বয়োকনিষ্ঠ এবং অনুজপ্রতিম। কিন্তু সেকালে সহপাঠীও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহপাঠীকে খুব ঘনিষ্ঠ না হলে আপনি বলে সম্বোধন করতো। কিন্তু আপনি বললেও আমার জন্য নাজমুল করিমের স্নেহ ছিল অপার। তিনি আজ অকালে প্রয়াত। সেদিনের এই স্মৃতিতে স্বাভাবিকভাবে আমার মনে একটি আবেগের সৃষ্টি হচ্ছে।

টেলিগ্রাম পেয়ে বড় ভাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। তিনি অমনি তাঁর পাড়া-প্রতিবেশীকে খবর দিলেন, যেন আমি মস্ত একটা কাজ করেছি। বিকেলে মসজিদে মিলাদেরও আয়োজন করলেন।

তার কয়েকদিন পরে ঢাকায় পাঠাবার সময়ে হুকুম দিলেন : 'ইংরেজিতে কিন্তু অনার্স নিবে।'

এ হুকুম তিনি করতে পারেন। কি আশ্চর্য অক্লেশে ইংরেজি লিখতে পারেন তিনি। নিজে অনার্স পড়তে পারেন নি। বরিশালের বি.এম কলেজ থেকে বি.এ পাস করে এম.এ পড়তে এসেছিলেন ইংরেজিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, ১৯২৭ সনে। কিন্তু সাংসারিক দৈন্যের কারণে একটি চাকরির সুযোগ পেলে সেই পড়া আর শেষ করতে পারেন নি। অথচ পুরোনো সকল শিক্ষক আর সহপাঠীদের কাছেই তাঁর প্রশংসা শুনেছি : 'আহ! মৌজে আলী! খুব ভালো ছেলে ছিল সে'। তাই বড় ভাইয়ের হুকুম ছিল ইংরেজিতে অনার্স নিতে। আমি প্রথমে ইংরেজিতেই অনার্স নিয়েছিলাম। পরে তাকে বাদ দিয়ে দর্শন। কিন্তু সে কাহিনী পরে বলা যাবে। পরীক্ষায় ভালো ফল করলে ব্যাপারটা যে কেবল ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত নয়, সেটা ব্যক্তি এবং পরিবারকে ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠান, এমনকি বৃহত্তরভাবে সম্প্রদায়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিংবা সেদিন সেরূপ দাঁড়াতে সেটা বুঝলাম, এই মহাকাণ্ড সেকেন্ড হওয়ার ব্যাপারটির প্রতিক্রিয়া দেখে, ঢাকা ফিরে এসে। কলেজে যেতে ইংরেজি অধ্যাপক পি. কে রায় গর্বের সঙ্গে হাত ধরে অফিস ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন অধ্যক্ষ এবং অপর অধ্যাপকদের : দেখুন, আমিই একে হদিস করেছিলাম। আমি জানতাম ও ভালো করবে। ও আমাদের কলেজের নাম রেখেছে। কথাটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখলে কিছুটা সত্য বটে। সেকালে লেখাপড়া আর পরীক্ষাতে সত্যেন ভদ্রের অধ্যক্ষতায় জগন্নাথ কলেজই ছিল প্রধান। পরীক্ষায় জগন্নাথ কলেজই ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হতো। কিন্তু '৪২ সনের পরীক্ষায় ঢাকা কলেজ কলা শাখায় সেকেন্ড 'পোস্ট' দখল করেছে, এটা কি কম কথা। এ প্রায় ফুটবলের কম্পিটিশনের ব্যাপার : কলেজে কলেজে। কলেজের দল জিতলো তো কলেজের নাম। ব্যাপারটাতে আমার বেশ মজাই লাগছিলো। কিছুটা অজাত শত্রুরই ব্যাপার ছিলো একটু। সবাই খুশি হলো। এমন কি আশরাফও, সৈয়দ আলী আশরাফ। আসলে অধিক ভালো ছাত্র আশরাফ আর অজিত দে-ই ছিল। আশরাফ ইংরেজিতে কত দক্ষ। পারিবারিক পরিবেশও উচ্চশিক্ষা আর সাহিত্যের সৈয়দ আলী আহসানের অনুজ। অজিতদেও ইতিহাসে কত ভালো নম্বর পেত ক্লাসে আর কলেজের পরীক্ষায়। ওরা ক্লাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসত ফার্স্ট বেঞ্চে। একেবারে অধ্যাপকের চোখের সামনে। আর আমি বসতাম পেছনে, অধ্যাপকদের চোখ এড়িয়ে, যেখানে বসে পাশের বন্ধুর সঙ্গে একটু খুনসুটি করতে পারি আর স্যারকে দুএকটা বেয়াড়া প্রশ্ন করতে পারি। (এটা বুঝতে পারছি, এ সমস্ত গোপন এই বয়সে, বিশেষ করে মাস্টারি করার অবস্থায়, নিজের ছেলেমেয়ে আর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রকাশ করা বুদ্ধির কাজ নয়। তবু কথার টানে কথা আসছে, স্মৃতির টানে স্মৃতি। বাস্তব বিবেচনাবোধ আর থাকছে কোথায়?)। সবচেয়ে খুশি হলো দেখলাম লাস্ট বেঞ্চের হাসিখুশি মেজাজের সুঠামদেহী কামালউদ্দিন। ওরই বেশি টান ছিল আমার উপর। ওর ডাক নাম ছিলো 'ঠাণ্ডা'। ওই-ই অনেক সময়ে কিছুটা সামনের বেঞ্চ থেকে টেনে আমাকে একেবারে পেছনের বেঞ্চে নিয়ে যেতো। 'আপনি' সম্বোধন করতো না। 'তুমিও' না। করত 'তুই' বলে। বলত 'তোর জায়গা সামনে নয়। সামনে বসবে 'গুড বয়েজ'রা। তুই বসবি আমাদের কাছে আর দেখে দিবি আমাদের খাতা। তুই পড়া নিবি আমাদের। ব্যাপারটা প্রায় তাই ছিল। কামাল, ওরা যে লেখাপড়ায় খারাপ ছিল তা নয়। ওরা সমগ্র জীবনটাকে অধিকতর স্বাভাবিকভাবে নিত। আমি যখনি পারতাম আন্তরিকভাবে ওদের সাহায্য করতাম। বিশেষ করে সেই কামালউদ্দিনের চেহারা আর কথা এত বছর পরেও মনে ভেসে উঠছে। ভেসে উঠছে একটা বেদনাবোধের সঙ্গ। কামালউদ্দিন নাকি মারা গেছেন। একদিনের কথা মনে পড়ে। আমি তখন আমার পরবর্তী জীবনে, এক পর্যায়ের রাজবন্দীত্ব শেষ করে বেরিয়েছি, পাকিস্তান আমলে। ঘটনাচক্রে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হয়েছি, ১৯৫৫ সনে। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন পথে দেখা কামালউদ্দিনের সঙ্গে। দেখা মাত্র একেবারে জোর করে রিকশায় উঠিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে মার কাছে হাজির করে বলল : 'দেখ মা, কাকে নিয়ে এসেছি। আমার কলেজের বন্ধু, সরদার ...।' কামালের বাবা তখন মারা গেছেন। কিন্তু সেদিন অমনি করে ধরে নিয়ে মার কাছে হাজির করে যে পরিচয় আমার সে দিয়েছিল এবং মা স্নেহযত্নে যেভাবে আপ্যায়িত করেছিলেন এবং তাতে কামালউদ্দিনের আন্তরিকতার যে প্রকাশটি ঘটেছিলো, তাতে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

কেবল কলেজে নয়, নাজমুল করিম, দেখলাম, তাঁর দলের একটি ছেলের এমন ভালো ফলকে তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের কাছে একটি 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে উপস্থিত করলেন। দেখ, আমার ছেলেরাই ভালো করে, তারা খারাপ করে না। হোস্টেলের এসিসট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট কফিলউদ্দিন সাহেব সত্যই আন্তরিকভাবে আমাদের, অর্থাৎ কেবল আমার ফলে নয়, আমাদের 'দুষ্ট' দলটির লুৎফুল করিম, আবুল কাসেম, মোজাহার—সকলের রেজাল্টেই খুশি হলেন। সুপারিনটেনডেন্ট ওয়ালীউল্লাহ সাহেব আমাদের ওপর একটু খাপ্পাই ছিলেন। আমাদের প্রতি তাঁর সব আচরণ কফিল উদ্দিন সাহেবের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতো না। তাই আমাদের জন্য কফিল উদ্দিন সাহেবের যথার্থই একটি মানসিক সহানুভূতি ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা কলেজের স্মৃতির কথা এখানে শেষ করতে গিয়ে নিজের মনে কেবল একটি বোধই জাগছে। যে কলেজ একদিন আমার অপরিচিত এবং বিস্ময়ের জগৎ বলে বোধ হতো, সে কলেজ, তার হোস্টেল এবং পরিবেশ আর একদিন যথার্থই আমার অস্তিত্বের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ঢাকাতে তখনো কলেজের পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে কলেজের সঙ্গে কোনো বিচ্ছেদবোধ জাগত না। কারণ ঢাকাতেই ইউনিভার্সিটি। আর আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে যে 'অনভিজাত' তথা কমনারের হল অর্থাৎ ফজলুল হক হলে জায়গা নিলাম সে ফজলুল হক হলও আমার অপরিচিত ছিল না। সে পরিচয়ের সূত্র ছিলেন নাজমুল করিম এবং তাঁর অপর সহপাঠীরা। এবং তাঁর সহপাঠীদের অন্যতম ছিলেন রবি গুহ।

সিনেমা বিশারদ

এই স্মৃতিচারণের একটি জায়গায় সে যুগে সারারাত জেগে সিনেমা দেখার 'পাপের' কথা যখন আজকের নিজের ছেলেপিলের কাছে একবার বলেই ফেলেছি তখন সেকালে কত সিনেমা দেখেছি তার একটি লিস্টিই দিয়ে দিই। তালিকাটি পেলাম ছেঁড়াখোঁড়া প্রায় ৪৫ বছর পুরনো একটি খাতার পৃষ্ঠায়। এ লিস্টি দেখে আমার নিজের তো এখন গর্বই হয়। আর কিছু না হোক, সেদিনকার একজন 'সিনেমা এক্সপার্ট' বলে তো নিজেকে দাবি করতে পারি। কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান কথা, রক্ষিত এই লিস্টি থেকে বাংলা ছায়াছবির সেই কৈশোরকালের চিন্তাভাবনা, আকর্ষণ রুচির কিছু শিরোনাম একালের মানুষ পেতে পারে। সেজন্যই তালিকাটির এই উদ্ধৃতি। সেকালে যে দুএকটি ইংরেজি ছবি আসত তার নামও দেখছি খাতাটিতে মেলে। তাই তাও তুলে দেয়া হলো। সংখ্যাগতভাবে প্রায় 'সেঞ্চুরি'। সংখ্যার ক্রম না দিয়ে কেবল শিরোনামগুলো দিচ্ছি : মুক্তি, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, দিদি, অভিনয় টারজানকি বেটি, খনা, অভিজ্ঞান, অচ্ছুৎ কন্যা, রিক্তা, দেবদাস, গৃহদাহ, পুকার, সাপুড়ে, গোরা, পরপারে, পায়ের ধুলো, পথের শেষে, বড়দিদি, রজত জয়ন্তী, অধিকার, অভিনেত্রী, শুকতারা, জীবন-মরণ, দুশমন, যখের ধন, সাথী, পথভুলে, ঘরকি রানী, ডাক্তার, তরুণী, কলঙ্ক ভঞ্জন, মাদার ইন্ডিয়া, দি লায়ন হ্যাজ উইংস, লাইফ অব এমিল জোলা, দি ম্যান দে কুড নট হ্যাং, ক্রিমিন্যাল অব দি এয়ার, টাইফুন, শাপমুক্তি, দেশের মাটি, হাতে খড়ি, শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, সোনার সংসার, রেবেকা, স্বামী-স্ত্রী, ভালোবাসা ও মায়ামৃগ, শিবরাত্রি, পুনর্মিলন, পরিচয়, খাজাঞ্চী, বিজয়িনী, গ্রহের ফের, চাণক্য, অমরগীতি, সার্জেন্ট ম্যাডেন, দি বিস্ট অব বারলিন, পথিক, ঠিকাদার, পরশমণি, রমা, কয়েদী, জেইলর, রাজকুমারের নির্বাসন, দি রেইনস কেইম, দি কোর্ট ড্যান্সার, রাজনর্তকী, মায়ের প্রাণ, উত্তরায়ন, আজাদ, পড়শী, প্রতিরোধ, অভয়ের বিয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুল ডেজ অব টম ব্রাউন, গ্রেট কম্যান্ডমেন্ট, কঙ্কণ, জীবন প্রভাত, দি বার্থ অব এ বেবী, নন্দিনী, বন্দী, শেষ উত্তর, দি ডিফিট অব দি জারমানস নিয়ার মস্কো, প্রিয় বান্ধবী, ভীষ্ম বন্ধন।

এবার গুণে দেখুন! না! প্রায় ৪৫ বছর আগেকার জীবনের এদিক-ওদিকে দৃষ্টিক্ষেপকারী সেই কিশোর ছাত্রটিকে আমার খুব যে খারাপ লাগছে, এমন বলতে পারিনে। বরঞ্চ একটু মমতা জাগছে এবং কৃতজ্ঞতাও। অন্তত তার খাতায় সিনেমা দেখার 'পাপের' এই সাক্ষ্যটি তুলে রাখার জন্য।

সোমেনের হত্যাকাণ্ড এবং সেকালের এক কিশোর মনের প্রতিক্রিয়া

একালের প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যকর্মীদের কাছে সোমেনকে পরিচিত করার দায়বদ্ধতা থেকে আমি কিছু যে না লিখেছি, তা নয়। কিন্তু সেকালের কথা আমার স্মৃতিতে তত সজাগ নেই। সে এখন ঝাপসা হয়ে গেছে। ১৯৪২ সনের ৮ মার্চ, অসামান্য সম্ভাবনার আকর, রেলশ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, তরুণ লেখক সোমেন চন্দ্র একটি শ্রমিক মিছিল পরিচালনাকালে প্রতিপক্ষীয়দের দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। আমি তখন আই.এ পরীক্ষা পাস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটির দরজায় মাত্র পা রেখেছি। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সাথে তখনো হয়ত হৃদ্যতা তত তৈরি হয় নি। সোমেনের নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনাই হয়তো চুম্বকের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীদের আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিলো প্রগতিলেখক সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে, আলোচনায়, ক্রিয়াকর্মে। আমার ভাগ্য যে, আমিও সে আহ্বানের বাইরে সেদিন থাকতে পারি নি। কিন্তু ঘটনা হিসেবে তার কোনো স্মৃতিকে টেনে তুলতে পারছিনে। আকস্মিকভাবে দেখলাম, কলকাতা থেকে এ যুগে, ১৯৭৩ সনে দিলীপ মজুমদারের সম্পাদনায় দু'টি খণ্ডে 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র' নামে যে সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয়েছে তার একটির মধ্যে সেকালে সোমেনের গল্পসংগ্রহ 'সঙ্কেত'-এর ওপর আমার একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন : "প্রতিরোধ পত্রিকায় (১৩৫০ : ১৯৪৩ : সোমেন স্মৃতিসংখ্যা) সরদার ফজলুল করিম 'সঙ্কেত' নামে যে প্রবন্ধটি রচনা করেন সেই প্রবন্ধেও 'সোমেনের সঙ্কেত ও অন্যান্য গল্প' সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য, এতে একজন সমসাময়িক মুসলিম লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমিক কমিউনিস্ট সোমেনকে তাঁরাও চিনতে পেরেছিলেন। ভালোবেসেছিলেন তাঁকে।"

সেকালের একটি কিশোরের প্রতিক্রিয়ার স্মারক হিসেবে লেখাটির খানিকটা গুরুত্ব এখনো আছে বলেই সম্পাদক এটি পুনর্মুদ্রিত করেছেন। লেখাটির সাহিত্যিক গুণাগুণের কথা নয়। সেই ইতিহাসের আভাস হিসেবে লেখাটিকে এখানেও প্রকাশ করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"১৯৪২ সনের মার্চ মাসে সোমেন চন্দ যখন নিহত হয়, আমাদের মুসলমান ছাত্র সমাজের বৃহত্তর অংশ তখন নিজেদের নেতৃবৃন্দের মান-অপমানের পরিমাণ নির্ধারণ লইয়া ব্যস্ত। কোনো বিশিষ্ট নেতাকে পুষ্পমাল্য প্রদান বা অপর কাহাকেও কালো পতাকা প্রদর্শন, ইহাই ছিল আমাদের রাজনীতির তখনকার বৈশিষ্ট্য। আমাদের সেই চেতনাহীন অবস্থাতে সোমেন চন্দের মৃত্যুকে আমরা হয়তো ঠিকভাবে দেখিতে পারি নাই। এমনি সময়ে শুনিয়াছিলাম সোমেনের মৃত্যুর কথা। ঢাকা শহরের চির পুরাতন দাঙ্গা ব্যতীত সেইদিন তাহাকে কিছু ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি সেই অবস্থাতেও পরিচিত-অপরিচিত কাহারো কাহারো মুখে সোমেন চন্দের মৃত্যু-সংবাদের সাথে বক্রহাসি দেখিয়া সন্দেহ জাগিয়াছিলো।

'তাহার পরে বাহিরের আলোবাতাসে আসিলাম—বক্রহাসি সেদিন কাহারা হাসিয়াছিলো, কেনো হাসিয়াছিলো পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। সোমেনের কাহিনীতো পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নহে। জীবনের কল্যাণের বিরোধী গুণ্ডার দল অনেক সোমেনকে হত্যা করিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের জয়কে ওরা রোধ করিতে পারে নাই। সেদিনও কাপুরুষ ফ্যাসিস্ত গুণ্ডার দল সোমেনকে হত্যা করিয়া সোমেনের জীবনের আদর্শকে নষ্ট করিতে পারে নাই। তাই আজ যদি দিনের আলোতে তাদের কারুকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে জোর গলায় বলিতাম : সোমেনের সঙ্কেতধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে—তোদের দিন শেষ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, দিনের আলোয় আজ আর উহারা বাহির হয় না—পৃথিবীর জনগণের অগ্রগতির প্রতিটি শক্তিতরঙ্গ ওদের বুকে শেল হানিয়াছে-চোরা গর্তে উহারা আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়াছে। তাই আজকাল নিশাচরের বেশে ওদের দুর্বল ছোবল ওদের বিলোপের আভাস দেয়।

"সোমনে চন্দ যখন মারা যায় তখন তাহাকে চিনিতাম না—চিনিবার পর্যায়ে তখন ছিলাম না। সোমেনকে চিনিলাম তাহার 'সঙ্কেত ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশ হইবার পরে। বইখানা হাতে লইতে প্রথমে সঙ্কোচ ছিল যথেষ্ট-অবহেলাও সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের বাজার বাংলা গল্প উপন্যাসে ভরিয়া গিয়াছে—এত বই! কত আর পড়া যায়? আর নিছক একই সুরের বিভিন্ন দুর্বল প্রকাশ। তাই সোমেনের 'সঙ্কেত' হাতে আসার পরেও অনেকদিন যাবৎ অপঠিত হইয়া পড়িয়াছিলো।

"তাহার পর সত্যই 'সঙ্কেত' একদিন পড়িতে আরম্ভ করিলাম। 'রাত্রিশেষ' সঙ্কেতের প্রথম গল্প। বৈষ্ণবদের আখড়ার কাহিনী। পড়িতে আরম্ভ করিয়া তেমন ভালো লাগিল না। পড়িতে পড়িতে কিছুদূর যাইতে এখানে টের পাইলাম, নিজের অজ্ঞাতে ভালো লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। সোমেন একস্থানে চাঁদিনী রাতের বর্ণনা করিতেছে। '... আজ এতোক্ষণে মাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। বনানী কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। পায়ে হাঁটা সাদা পথ টুকরা জ্যোৎস্নায় মনোরম। সৌন্দর্য আহরণের নেশায় চোখ বুঝিয়া আসে—পা ফেলা মন্থর—দেহ শিথিল ...' দেখিলাম আমার অবহেলায় ভাঙন ধরিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম কয়েকটি মাত্র লাইনে বেশ তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ননাটি দিয়াছে। পিছনের পাতা উল্টাইয়া সোমেনের জন্ম-মৃত্যুর তারিখটা দেখিতে ইচ্ছা হইল। দেখিলাম জীবনের পরিধি মাত্র বাইশ বছর। চমক লাগিল। এ গল্প তাহা হইলে নিশ্চয়ই ষোল সতের বছর বয়সে লেখা। আহা, লেখাটার যদি তারিখ থাকিত। গল্পটা শেষ করিলাম। কাহিনীর তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নাই, কিন্তু সংযত হাতের প্রকাশ-ক্ষমতা যেভাবে গল্পটার শেষের দিকে এক জায়গায় সোমেন গাঢ় সন্ধ্যার নিস্তব্ধ তার বর্ণনা দিয়াছে—'... বাহিরে অন্ধকার আরো গাঢ়তায় চাপিয়া আসিয়াছে। একটানা ঝিঁঝি পোকার শব্দ। কিছুদূরে কামার বাড়ির লোহা ঠুকিবার আওয়াজ ...' চমৎকার লাগিল। লাইন তিনটি পড়িতে যাইয়া আমাদের গ্রামের বাড়ির বিশিষ্ট একটা জায়গার কথা মনে পড়িল, যেখানটায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার সময়ে কামার বাড়ির লোহা ঠোকার শব্দ ঠিক শোনা যায়। তিন লাইনে সোমেন সব ছবিটা আঁকিয়া দিল! আজ আবার লাইন তিনটার পানে চাহিয়া সোমেনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, যে সম্ভাবনাকে গুণ্ডা পশুর দল বর্বরভাবে হত্যা করিল, সেই সম্ভাবনার ছবিকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। দ্বিতীয় গল্প 'স্বপ্ন' ও 'রাত্রি শেষ'-এর সুরেই লেখা—কিন্তু এখানে গল্পটির মধ্যে উপমা শক্তির নতুনত্বের যেমন খবর পাইলাম, তেমনি তাহার দরকার মতো কাহিনীর মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির অদ্ভুত হাতেরও স্পর্শ অনুভব করিলাম। এই গল্পে একখানে সোমেন রাত্রিকে বলিয়াছে 'সাপের দেহের মতো পিচ্ছিল নিস্তব্ধ'। এবার বইখানা দরদের সহিত জোর করিয়া ধরিলাম—সোমেন গতানুগতিক নয়, সোমেন নতুন পথের যাত্রী।

"তাহার পরে 'একটি রাত্রি' প্রায় এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া কেবল খুঁজিতে লাগিলাম যদি গল্পটার রচনার তারিখটা পাইতে পারি—যদি আগের দুইটা গল্পের সাথে এই গল্পের সময়ের ব্যবধানটা ও অবস্থা নিরূপণ করিতে পারি। সেদিন পারি নাই। আজো জানি না সোমেন 'রাত্রি শেষ' ও 'স্বপ্ন' কবে লিখিয়াছিল—ইহার পরে তাহার মনে ভাবের বন্যা কীভাবে বহিয়াছিল। সঠিক জানিতে পারি নাই। কিন্তু আভাস পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত নির্মল ঘোষকে লিখিত সোমেনের যে কখানি চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একখানে ১৯৩৮ সনের শেষের দিকে সোমেন এই বলিয়া লিখিল : 'গ্রামের অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর, এমন কী যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতগুলো Sweet উপন্যাস রচনা করেছেন, বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি। কিন্তু ওসব পুরানো হয়ে গেছে—এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। বছরখানেক আগে সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কোনোই পথ খুঁজে পেতাম না—এখন কতটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে।' ১৮ বছর বয়সে সে এই চিঠি লিখিয়াছিল। কাজেই এরও দুই এক বছর আগে হয়ত লিখিয়াছিলো 'স্বপ্ন' ও 'রাত্রি শেষ'। তাই আজ কেবল সোমেন সম্বন্ধে মনে হয়, জীবনের গতি কত সবল ও দ্রুত হইলে ঐ সময়ে এই বয়সে, এই দৃষ্টিভঙ্গি রূপ পাইতে পারে। ... গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সুকুমার। সাম্যবাদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসী সে—তার কর্মীও। ঘরে শুধু বৃদ্ধা মা। ঘরের অভাব-অভিযোগ তো স্পষ্ট—কিন্তু সুকুমারের কর্মে বাধা নেই—'সুকুমারের কাছে কতো লোক যে আসে তার ইয়ত্তা নেই। সারাদিন ডাকাডাকি লেগেই আছে। সর্বদা যারা আসে তাদের মধ্যে গ্লাস ওয়ার্কসের সামসুর একজন ...।' বৃদ্ধা মা ছেলের কাজকর্ম দেখিয়া চোখের জল ফেলেন—কিন্তু ছেলের জন্য তৃপ্তি ও তাদের অনুভূতি তাহার মনকেও ভরিয়া তোলে। ... এই সুকুমারের জীবন কাহিনী—বিশেষ করিয়া তাহার একটি রাতের কথা, যে রাত্রিতে পুলিশ আসিয়া সুকুমারের বাড়ি ঘেরাও করিল। তাই সোমেন শুধু নতুন পথের যাত্রীই ছিল না—সে ছিল নতুন দিনের অগ্রদূত—আমাদের দেশে তার প্রথম বীর সৈনিক। ইহার পরের গল্প তিনটি 'সঙ্কেত', 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর'।

'এক রাত্রি'তে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের সাক্ষাৎ পাইলাম; শেষের এই গল্প তিনটি তাহারই উন্নততর ও পূর্ণতর প্রকাশরূপ হইয়া রহিয়াছে। 'সঙ্কেত' ও 'ইঁদুর' দুইটিই বড় গল্প। 'ইঁদুর' সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ অসঙ্কোচে শিল্পের উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন। সোমেনের শক্তির প্রমাণের ইহার পরে আর প্রয়োজন হয় না। 'ইঁদুর' ইংরেজিতে অনূদিত হইয়া আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রাদেশিক গল্পে পরিণত হইয়াছে। ঢাকার সোমেন আজ শুধু বাংলার সোমেন নয়—সে আজ ভারতের সোমেন। 'ইঁদুর' গল্পের প্রথম পাঠে আমার মনে যে তৃপ্তির শিহরণ জাগিয়াছিলো, তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার জন্মায় নাই। তাহার কতকগুলি জায়গা ভুলিতে পারি না—কেবল পড়িতে ভালো লাগে। গরিব মধ্যবিত্ত পরিবার। সোমেনের নায়ক গরিব মা-বাপের মধ্যে সন্ধ্যার পূর্বে মান-অভিমান হইয়াছিলো! গভীর রাত্রে ইঁদুরের উৎপাতের মধ্যে তাহাদের মান ভাঙনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। সোমেনের নায়ক এইখানটায় বলিতেছে : 'বাবা মাকে ডাকলেন নাম ধরে। ভারি চমৎকার মনে হলো—মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলাম—আর আমার প্রতি ভালোবাসা কামনা করতে লাগলাম তার কাছ থেকে ...।' সোমেনও ছিলো গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখময় কাহিনী—সেই দুঃখের সংসারেও নব জীবনের যে স্ফুলিঙ্গ তৈরি হইতেছে, তাহার এমনি সরস মধুর সাহিত্যিক প্রকাশ আর কি কোথাও পাইয়াছি? তারপর সেইখানটা, সোমেনের নায়ক (একি সোমেন নিজে?) রেল ইউনিয়ন হইতে ফিরিয়া আসিতেছে—মজুর, ইয়াসিন, সুরেন—সোমেনের আপনার জনের মধ্য হইতে সোমেনের নায়ক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিতেছে : 'আমি ফিরে এলাম। সাম্যবাদের গর্ব—তার ইস্পাতের মতো আশা তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলাম ...।'

'সঙ্কেত' গল্পটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করা প্রয়োজন। 'সঙ্কেতে' সোমেনের সাহিত্যিক শক্তির কতখানি প্রকাশ হইয়াছে তাহাই একমাত্র বিচার্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নহে। কিন্তু সেদিক দিয়া বলিতে গেলেও গ্রামের অধিবাসী ও তাহাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের পরিচয় ও তাহার সাহিত্যিক প্রকাশ 'সঙ্কেতে' আছে। কিন্তু সঙ্কেতের অপর যে দিকটা, সে আমাদের দেশের সর্বহারা মজুর ও কিষাণদের জাগরণের সঙ্কেতধ্বনির প্রকাশ। ... কোনো মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়াছে। মিলের মালিক তাহাদের ধর্মঘট শক্তিহীন করিয়া দিবার জন্য দূর গ্রাম হইতে লোভ দেখাইয়া কৃষকদের লইয়া আসিয়াছে। নতুন সংগৃহীত শ্রমিকগণ মিলের মধ্যে ঢুকিতে যাইতে কলের ধর্মঘটি মজুরগণের নেতা তাহাদের বুঝাইয়া বলিতেছে যে যেন তাহারা তাহাদেরই ভাইদের মুখের ভাত কাড়িয়া না লয়—দুঃখ-দুর্দশা তাহাদের উভয়েরই সমান—উভয়ের উপরই শোষণ সমানভাবে চলিয়াছে—মিলের ম্যানেজার হতভম্ভ হইয়াছে কী করিতে সে কী করিল? শ্রমিকের শক্তি সে আরো জোরালো করিয়া দিলো। সোমেনের 'সঙ্কেত', কৃষক মজুরের একতাবদ্ধতার যে সঙ্কেত আমরা আমাদের দেশে পাইতেছি তাহারই প্রকাশ। 'দাঙ্গা' সম্বন্ধে কোনো বিশেষণই বোধ হয় যোগ্য হইবে না। ঢাকা শহরের ১৯৪০-৪১ সনের দাঙ্গার সময়ে প্রায়ই ঢাকাতে ছিলাম। সোমেনের 'দাঙ্গা' পড়িয়া শেষ করিয়া আবার সেই অবস্থা হুবহু মনে পড়িল—সেই 'আল্লাহু আকবর' 'বন্দেমাতরম'-এর মুহুর্মুহু ধ্বনি—বাড়িকে বাড়ি পোড়াইবার সেই অমানুষিক দৃশ্য। সোমেনের এই গল্প সেই সময়ে হয়তো কোথাও প্রকাশ হয় নাই—হয়তো এই বইতেই ইহার প্রথম প্রকাশ—নচেৎ দেশের সেই দুর্দিনে বাংলার সাহিত্যিক জগৎ ঢাকার অবস্থা সম্বন্ধে নিছক নিস্তব্ধ! প্রতিবাদের শব্দ কাহারো লেখনী হইতে তখন বাহির হয় নাই—কোন সমাজেরই না—না হিন্দু, না মুসলমান। হয়তো একমাত্র সোমেনের হাত হইতে বাহির হইয়াছিলো সমবেদনা ও প্রতিবাদের এই তীক্ষ্ণবাণ। 'দাঙ্গা'র একটা স্থান—সোমেনের নায়ক অশোক দাঙ্গার বিরোধিতা করে, তাহাতে তাহার ছোট ভাই অজয় ক্ষেপা : অজু কর্কশ স্বরে বললে, 'তোমরা তো বলবেই'—আবার মৃদু স্বরে—'তোমরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়।' নায়ক অশোক জবাব দিল : 'আমরা ইহুদির বাচ্চা নারে?' তাহার পর আর একস্থানে—মাটির দিকে চেয়ে অশোক মনে মনে বললে, 'আগামী নূতন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ দিয়েছি—তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানের সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে। সেজন্য আমার গর্বের সীমা নেই। আমি জানি আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে—প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলাম—আমার কোনো ভয় নেই।' পড়িয়া ভাবিলাম দেশকে, তাহার জনগণকে কতোখানি দরদ দিয়া ভালোবাসিলে লেখক এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক হইতে পারে—তাহাদেরই জন্য শহীদ হইতে পারে। আর আমাদের দেশের যাহারা সাহিত্যের পবিত্র প্রাসাদে বসিয়া মনে করেন, দেশের জনগণের সমস্যা লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না—দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়া মানে প্রোপাগাণ্ডা করা, তাহারা অন্ততপক্ষে সোমেনের 'দাঙ্গা' পড়িয়া দেখিতে পারেন।

টলার ও রালফ ফক্সের জীবনী পড়িয়া সোমেন একদিন লিখিয়াছিল : 'ফক্স সবচেয়ে গৌরবজনকভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে—কিন্তু যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকত!' আজ সোমেনের স্মৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপন করিতে যাইয়া তাহার নিজের কথাই তাহার সম্বন্ধে কেবল বলিতে ইচ্ছা করে : কিন্তু যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকত! তবু সোমেন আজ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা হতাশ হইব না। সোমেনের মৃত্যুদিনে মুষ্টিবদ্ধ হাতে আমরা আজ এই প্রতিজ্ঞা লইব, যেন তাহার আদর্শের বীজ লক্ষ কোটি হইয়া আমাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে; জীবনের যে ইঙ্গিত সোমেন তাহার জীবনে পাইয়াছিল—আজ যাহার সুস্পষ্ট আভাস সোমেনের ও হাজার লক্ষ জনগণের রক্তের মধ্য দিয়ে আমাদের দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিষ্ঠা যেন আমরা করিতে পারি—কেননা একমাত্র তাহার প্রতিষ্ঠাতেই হইবে সোমেনের জীবনের নব প্রতিষ্ঠা।"

'দি রুটস'

AMARBOI.COM

গাছের শক্তি শেকড়ে। মাটির কত গভীরে তার শেকড় গেল তাতে। কথাটা মনে পড়েছে, আমার বাসা থেকে নিউমার্কেটের পথে যে দুটো গাছ দেখেছিলাম কয়েকদিন আগেও, সামান্য ঝড়ের আঘাতে তাদের পড়ে যেতে দেখে। ঝড়ের পরেও রাস্তায় গাছ দুটো শুয়ে ছিল। গোড়ার দিকে চাইতে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আরে! এর যে শেকড়ই নেই। এ দাঁড়িয়ে ছিল কী করে এতদিন! এটাই বিস্ময়। বৃহৎ বৃক্ষ যেগুলো, যেগুলো বড় ঝড়েও পড়ে না, তার ডালপালা ভাঙলেও সে যে আমুল উল্টে যায় না, তার কারণ তার শেকড়ের গভীরতা। স্বর্ণলতার কথা অবশ্য আলাদা। স্বর্ণলতা, সোনার মতো রং। তাই বোধহয় স্বর্ণলতা। আমরা গ্রামে থাকতে বলতাম, শূন্যলতা। শূন্যলতা অবশ্য গাছ নয়, লতা। কিন্তু যথার্থই শূন্য। শেকড়বিহীন। ওর বাঁচন ও বৃদ্ধি অন্য গাছকে শোষণ করে। কিন্তু তবু তারও বিপদ আছে। যাকে শোষণ করে এমন সোনার রং, সে যদি উল্টে যায়, তবে তারও শেষ। এমনকি, সে যদি ঝেড়ে ফেলে দেয় নিজের গা থেকে এমন পরভোজীকে তবু তার শেষ।

মানুষের বেলায় কি ব্যাপারটা আলাদা? না। নয়। মানুষেরও শক্তি তার শেকড়ে। ব্যক্তি বা জাতি যেভাবেই দেখিনে কেনো, শক্তি তার শেকড়ে। কতো গভীরে সে প্রবিষ্ট হয়েছে, তার ওপর। মানুষের শেকড়ের মাটি কেবল আক্ষরিক অর্থে মাটি নয়। মানুষের শেকড়ের মাটি তার অভিজ্ঞতা, তার ইতিহাস, তার অতীত। যার অভিজ্ঞতা নাই, ইতিহাস নাই, অতীত নাই, সে শেকড়হীন, প্রায় শূন্যলতার মতো। যে মানুষ, ব্যক্তি বা জাতি হিসেবে ঋদ্ধ হতে চায়, কিংবা যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে পতিত হয় সঙ্কটে, তবে তার উচিত অন্বেষণ করা তার শেকড়ের। দেখা, কতোদূর গেছে সে শেকড়। আর এই চেষ্টাতেই তার শেকড় গভীর থেকে গভীরে চলে যেতে বাধ্য। নিজের আত্মবিশ্বাসে সঙ্কটের সমাধানের অস্থিরতায় জিজ্ঞাসা যদি জাগে, সন্ধান করো তোমার শেকড়ের।

আমিও তো জানিনে আমার শেকড় কোথায়? কী দিয়ে তৈরি হয়েছি আমি। চল্লিশ সনে যে কিশোরটি এসেছিল একেবারে 'বিদেশ' এক ঢাকায়, তারও তো কিছু শেকড় ছিল তখনো। কিছু পূর্বকাহিনী। কিছু মালমশলা, পরিবেশ। সুতোর টানে তাও আসে। তাকেও আনতে হয়। জানতে হয়। সেই বোধ থেকে এতদিন পরে গেলাম নিজের বড় ভাইয়ের কাছে, যিনি বেঁচে আছেন এখনো। একদিন ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস হতো না। কিন্তু স্নেহশ্রদ্ধায় দুজনে প্রায় বন্ধুর মতো। গেলাম তাঁর কাছে পুরনো দিনের কিছু কথা জানতে। আমার ভালো লেগেছিলো তাঁর সঙ্গে সেদিনের সেই আলাপটি, মাত্র অল্পক্ষণের। সেই সাক্ষাতের রোজনামচাটিই বরঞ্চ তুলে দিই।

১৩.৭.৮৩ : গুলশানের কাছেই বনানী। ছোট ছেলে তিতুকে সঙ্গে করে গুলশানে বড় বোনের কাছে বিদায় দিয়ে বনানী এলাম। বনানীতে বড় ভাই একটি ছোট বাড়ি করেছেন। চাকরি জীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি অবসর নিয়েছেন। সেও অনেক বছর হয়ে গেছে। সাবরেজিস্ট্রার এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উভয় পদমর্যাদায় বিভিন্ন স্থানে, পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরেও কিছুকাল নানা দায়িত্ব সততা এবং শ্রমের সঙ্গে পালন করেছেন। চাকরি জীবনে তাঁর সততার নানা ঘটনা পরিচিতজনদের কাছে প্রবাদ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। চাকরির কোনো এক স্থলে প্রতিবেশি কোনো এক সহকর্মীর কাছ থেকে নাকি সেলাই করণের জন্য সুই এনেছিলেন একটি, ধার করে। বদলির সময়ে ভুলে ফেরত দেওয়া হয় নি ধার করা সেই সুই। তাতেই মনে শান্তি আসে না। খামে করে চিঠি লিখলেন সহকর্মীকে নতুন জায়গা থেকে এবং খামের মধ্যে ধার করা সেই সুচটি পাঠিয়ে দিলেন সহকর্মীকে। আমাদের কাছে অতিরিক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর কাছে একেবারে ফরজ নিজের চোখে দেখেছি, প্রৌঢ় বয়সে যখন বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছেন, একটি জেলা মিউনিসিপ্যালিটি শাসনের। তখন সেই শহরের টাউন হলের বিদ্যুতায়নের সাজ-সরঞ্জামের যেন না কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়, তাই নিজে দূর ঢাকা শহরে এসে হেঁটে হেঁটে দোকানে দোকানে ঘুরে বাল্ব, তার, সুইচ, কাঠি, বকস্ দর দস্তুর করে ক্রয় করেছেন। সে সব বাক্সবন্দী করেছেন। কুলির মাথায় চাপিয়ে লঞ্চে উঠিয়ে নিজে নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করে টাউন হলের ইলেকট্রিকের কাজ সমাধা করেছেন। সাবরেজিস্ট্রার যখন ছিলেন, তখন দুপয়সা উপরি আয়ের কর্মচারীরা অসুবিধায় পড়ত তাঁর অফিসে। তিনি অফিসে নোটিশ টানিয়ে দিতেন, সরকারি নিয়মের বাইরে কেউ কিছু দাবি করলে দলিল করার জন্য আগত ব্যক্তিগণ যেন সরাসরি তাঁর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযোগ করেন। অথচ রেজিস্ট্রি অফিসের সুপরিচিত রেওয়াজ ছিল (এবং আজো আছে) কেনা-বেচার দলিলের ব্যাপারে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত কর্মচারীগণ উপরি গ্রহণ করে।

এই কথা বলতে আমার আকস্মিকভাবেই মনে পড়ে গেল আমার একেবারে শিশুকালের কথা। আমার বড় ভাই তখনো নিজের সংসার করেন নি। চাকরি জীবন হয়তো মাত্র শুরু করেছেন। আমি হয়ত বাল্যশিক্ষা শেষ করেছি। শ্রেণী হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণী বলা চলে। মিয়া ভাই (বড় ভাইকে আমরা মিয়াভাই ডাকতাম) তখন বরিশাল জেলার পিরোজপুরের মধ্যকার নাজিরপুরের সাবরেজিস্ট্রার। ডাকবাংলো ধরনের লাল টালির ঘরটি আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি। সামনে অদূরে নদী বয়ে যাচ্ছে। বড় বড় পেডাল অর্থাৎ চাকাওয়ালা স্টিমার। যাত্রী কিংবা মালটানা স্টিমার। আমি বলতাম জাহাজ। সামনের নদীর বুক দিয়ে এই জাহাজ যাতায়াত করে। নাজিরপুর স্টেশন পৌঁছার আগে গম্ভীর গলায় দীর্ঘ ভোঁ করে দু'বার আওয়াজ দিত। অফিস বাংলোর সামনে বড় মাঠ। পাশে একটা জোঁকভরতি পুকুর। তারও একটু পরে আর একটা 'রিজার্ভ' পুকুর। এই পুকুরের পানি সবাই খায়। গোছল করা, কাপড় কাচা এতে নিষিদ্ধ। আর একটু দূরে নদীর পারে পোস্টঅফিস। তারও পরে পুলিশের থানার দালান। নদীর ওপারে হাট। হাটের পারেই স্টিমার ভিড়ে এবং ওখান থেকে মোড় ঘুরে ফিরে চলে যায়। আহা! কী সুন্দর ছবি। মনে হয়, সেই জায়গাটিতে, সেই বয়সটিতে আমার বড় ভাইয়ের কাঁধে চড়ে চলে যাই! কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। কাঁধে চড়ার কথাটা আক্ষরিকভাবেই সত্য। সেবার হয়ত ১৯৩০ কিংবা ১৯৩১-এ মিয়াভাই এসেছিলেন ছুটিতে বাড়িতে। ছুটি শেষে রওনা হলেন সন্ধ্যার সময়ে আমাদের গ্রাম আটিপাড়া ছেড়ে উজিরপুরের দিকে। হেঁটে যাবেন উজিরপুর। সঙ্গে ছিল তাঁর অফিসের চাপরাসি, ফজল মিয়া। মিয়া ভাইয়ের এই এক গুণ। যেখানেই কাজ করেছেন, অফিসের কেরানি, কর্মচারী, নিম্নপদের পিয়ন—সবাইকে আত্মীয়ের মতো আপন করে নিয়েছেন। একবার কারুর সঙ্গে দায়িত্বের ক্ষেত্রে পরিচয় ঘটেছে তো সারাজীবন সে পরিচয় সজীব রয়েছে। আঘাত বা শত্রুতামূলক সম্পর্ক কারুর সঙ্গে তাঁর তৈরি হয়েছে, এমন ঘটনা তিনি কখনো বলেন নি। উজিরপুর আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে তিন কিংবা চার মাইল। ওখান থেকে নদীপথে যেতে হবে বানরীপাড়া। বানরীপাড়াতে স্টিমার পাওয়া যাবে সকালে। সেই স্টিমার যাবে হুলার হাট হয়ে নাজিরপুর, মিয়াভাইয়ের যেখানে চাকরি স্থান। আমি তখন বোধ হয় ভাইদের মধ্যে সবচাইতে ছোট এবং স্নেহের। বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার মুহূর্তে বায়না ধরলাম, আমিও যাব বড় ভাইয়ের সঙ্গে। নানা নিরোধ। মা বলেন, তুই কোথায় যাবি? আমি বলি না, আমি যাব। নাছোড়বান্দা। স্নেহপরায়ণ বড় ভাই বলেন : ঠিক আছে, ও যাক। উজিরপুর পর্যন্ত। ওখান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেব বাড়ির লোকের সঙ্গে। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উজিরপুর থেকেও ফেরত পাঠানো গেলো না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো মিয়া ভাই আমাকে সঙ্গেই নিবেন। হয়তো সেদিন তাঁর প্রশ্ন ছিলো কিরে, তুই পারবি, আমার সঙ্গে থাকতে? এ প্রশ্নের কী জবাব দিয়েছিলাম আজ আর তা স্মরণে নেই। কিন্তু ফেরত যে পাঠাতে পারলেন না তাতেই জবাবটি যে ছিলো দৃঢ় এবং নাছোড়বান্দা ধরনের তাতে সন্দেহ নেই। সেই রাত্রির কথা আজো মনে ভেসে ওঠে। বড় ভাইয়ের ইচ্ছা ছিল, উজিরপুর থেকে নৌকা করে বানরীপাড়া যাবেন। কিন্তু নৌকোর কোন মাঝি রাজি হলো না। বলল, নৌকো করে গিয়ে সকালে স্টিমার ধরিয়ে দেওয়া যাবে না।

উজিরপুর থেকে বাড়ির আত্মীয়স্বজনরা বিদায় নিলেন। এবার উজিরপুর থেকে হাঁটা পথে রওনা হলাম আমরা তিনজন। মিয়াভাই, তাঁর চাপরাসি ফজল মিয়া এবং আমি। তিনজন বলে কোনো লাভ নেই। আসলে দুজন। পাঁচ বছরের শিশুকে ঐ রাতে দশ-বার মাইল পথ হাঁটিয়ে নেওয়া যাবে কী করে? কিছু দূর না যেতে শক্ত সবল ফজল মিয়া আমাকে অক্লেশে তাঁর কাঁধে তুলে নিলেন। অন্ধকার পথে হেঁটে ঐ পথে মিয়াভাই কিংবা তাঁর চাপরাসিও যে কখন বানরীপাড়া গিয়েছিলেন তা মনে হয় না। কারণ, কোনো এক পথ ধরে ঘন্টা খানেক হাঁটার পরে দেখা গেল, যে-নদীর পার থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিলো সেই নদীর পারেই তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন। কিছুটা আতঙ্ক নিয়ে আবার হাঁটা শুরু হলো। রাত তখন দুপুর পেরিয়ে হয়ত একটা কিংবা দুটা বেজে গেছে। কত পথ বাকি তাই বা কে জানে। এবার হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লেন তাঁরা দিগন্তবিস্তারী নির্জন মাঠে। এদিকে-ওদিকে ঝাঁকড়ামাথা তালগাছ সেই রাত্রির বুকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরবাড়ির নাম-নিশানা কোনো দিকে নেই। এরকম মাঠ উজিরপুরের মতো ঘনবসতি এলাকায় থাকতে পারে, তা আমি কোনোদিন কল্পনা করতে পারি নি। পরবর্তীকালেও এই মাঠের রূপটি আমাকে আকর্ষিত করেছে। এই মাঠের নাম নাকি হলুদপুরের মাঠ। সারারাত ধরে এই হলুদপুরের মাঠে এ ভুল ও ভুল করে চলতে চলতে একেবারে ভোরবেলা যে বানরীপাড়া এসে পৌঁছেছিলাম এবং চাকাওয়ালা যে স্টিমারটি ঘাটে ছিল সেটি যে ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম করে তার সিঁড়ির একটি তক্তা উঠিয়েও ফেলেছিলো এবং আমাকে কাঁধে করে আমার ভাই এবং তাঁর চাপরাসি উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে সেই স্টিমারটিতে উঠেছিলেন—সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি আজকের সাতান্ন বছরের জীবনের কত শত বিপদ-আপদের স্মৃতি-বিস্মৃতি ঘটনার মধ্যেও জ্বলজ্বল করে ভাসছে। স্মৃতির এই ব্যাপারটিও বিস্ময়কর। কোনটি যে স্মৃতিতে থাকে, ভেসে ওঠে এবং কোনটি যে থাকে না, তলিয়ে যায়—সে এক অজানিত রহস্য।

এমনি করে সেদিন বড় ভাইয়ের সঙ্গী হয়ে এসেছিলাম তাঁর কার্যস্থল নাজিরপুরে। মিয়াভাইয়ের সঙ্গে শিশু ও কিশোরকালের তাই আমার নানা স্মৃতি। আসলে ভাই হলেও তিনিই ছিলেন আমার এবং অপর সকল ছোট ভাইবোনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকট পিতার মতো। তাঁর বয়োকনিষ্ঠ সকলের পড়াশুনার দায়দায়িত্ব তিনিই বহন করেছেন। বাবা-মার কাছে তিনি ছিলেন ভরসার এবং গর্বের ধন। গ্রামের লোকেরা বাবা-মাকে ডাকতো মৌজালীর (মৌজে আলী) বাবা কিংবা মা বলে। বাবা-মা তাঁদের ছেলেকে ডাকতেন 'মনু' বলে কথার টানে সে ডাক শোনাত 'মউন্না' বলে।

আজ তিনি সংসারী তো বটেই। প্রবীণ। চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা মোটামুটি স্থিত হয়েছে আপন আপন সংসারে এবং অবস্থানে। বড় ছেলে ইংরেজির অধ্যাপক। এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। মেয়েরাও শিক্ষিত এবং সংসারী। একটি ছেলে '৭১ সালে জীবন বীমায় চাকরি করত। '৭১-এর আগে কোনো রাজনীতি করতো বলে শুনি নি। কিন্তু '৭১ সালে জড়িত হয়ে পড়েছিলো যুদ্ধের সঙ্গে এবং '৭১-এর শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কোনো জায়গাতে কোনো কর্মসূচি সম্পন্ন করতে সেই যে গেল, আর কিন্তু এল না। মা-বাবা বহুদিন ভবেছিলেন, ছেলে তাঁদের বেঁচে আছে, ফিরে আসবে। কিন্তু বাংলাদেশের অসংখ্য হারিয়ে যাওয়া যুবকের ন্যায় সেও আর ফিরে আসে নি। ছেলেটির নাম ছিল হুমায়ুন। পুরো নাম হামদ নিয়াজ। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ওর একটি ছবি জীবন বীমা কর্পোরেশনের গুলিস্তানের অফিসে এখনো টাঙ্গানো দেখা যায়। তাতে বোঝা যায়, ছেলেটি তার সহকর্মীদের মনেও দাগ কেটেছিলো।

বড় ভাইয়ের জীবনে এই এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কোনোদিন রাজনীতি করেন নি। আমার নিজের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় ক্ষুব্ধ ছিলেন আমার ওপর। ১৯৪৮ সনে হঠাৎ একদিন আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষকতার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিষিদ্ধ রাজনীতিক জীবনে আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলাম, সেদিন সেই মুহূর্তে পুলিশের লোক অন্বেষণ করে আমাকে না পেলেও বড় ভাই ঠিকই আমাকে বের করেছিলেন ঢাকার শহরতলির একটি এলাকাতে। দেখা হতেই বলেছিলেন : 'তুমি বোকার বোকা তো বটেই। এখন দেখছি পাগল। বিলেত যাওয়ার চান্স পেলে। তাও গেলে না। (কথাটা মিথ্যা নয়।) এখন হাতের চাকরিতে ইস্তফা দিলে। এ সবের অর্থ কী?' বড় ভাইয়ের এরকম প্রশ্নের মোকাবেলা আমাকে আগেও করতে হয়েছে। এবং এসব ক্ষেত্রে আমার কৌশলটি কিছুটা ব্যতিক্রমী ধরনের ছিল। আমার নীতিটি ছিল : মুরুব্বিজনের সঙ্গে তর্ক করবে না এবং নিজের বিবেকের সিদ্ধান্তে বিচলিত হবে না। আর এই নীতিতে সেদিনও আমি মিয়া ভাইয়ের প্রশ্নের কোনো জবাব দিই নি। শুনেছি, তিনি তখনি ছুটে গিয়েছিলেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ড. বিনয় রায়ের কাছে। ড. বিনয় রায় আমার নাম ধরে আমার ভাইকে বলেছিলেন : ওকে তো আমরা চিনি। ওতো আমাদের একান্ত স্নেহের ছাত্র। কিন্তু ওর সিদ্ধান্ত থেকে তো ওকে ফেরানো যাবে না। তা না হলে এখনো যদি ও ফিরে আসে, আমরা ওকে আবার সাদরে নিয়ে নেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক বিনয় রায়ের কথা মিথ্যা নয়। আমার প্রতি এই শিক্ষকদের ছিল অপার স্নেহ। দর্শনের প্রখ্যাত শিক্ষক, অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যের, অধ্যাপক বিনয় রায়ের, অধ্যাপক ক্ষিরোদ মুখার্জি বা কেসি মুখার্জির এবং অধ্যাপক রাকেশ রঞ্জন শর্মার স্নেহ। হিন্দু শিক্ষকই তখন সংখ্যায় অধিক ছিলেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সনেও। আমাদের দর্শন বিভাগে মুসলিম শিক্ষক ছিলেন হাদি সাহেব। আব্দুল হাদি তালুকদার। এবং পরবর্তীকালে গোলাম জিলানী, উর্দুভাষী। বোধ হয় লাহোরের। ইনি পড়াতেন মুসলিম দর্শন।

বিনয়বাবুর স্মৃতিটি উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৯৪৬ সনে আমি যখন এম.এ পাস করি তখন দর্শন বিভাগের তিনি অধ্যক্ষ। হরিদাস ভট্টাচার্য তখন অবসর নিয়ে চলে গেছেন, কলকাতায়। এম.এ পাসের পরে কোনো আনুষ্ঠানিকতা করে যে আমাকে দর্শন বিভাগের শিক্ষক হতে হয়েছিলো, তা আদৌ মনে পড়ে না। আসলে কেবল আমাদের বিভাগ নয়, তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টিই ছিল ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি ছোট পরিবারের ন্যায়। আমাদের বিভাগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অধিকতর সত্য। দর্শনের অনার্সে এম.এতে গুটি পাঁচ-ছয় ছাত্রছাত্রী। শিক্ষকদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিলো সন্তানের সম্পর্ক। তাঁদের নিজেদের বাড়ি আর ছাত্রদের ক্লাস, এর মধ্যে কোনো ভেদরেখা ছিলো বলে মনে পড়ে না। হরিদাস বাবু বা বিনয়বাবুর ক্ষেত্রে এ কথা খুবই সত্য। হরিদাস বাবু ছিলেন সারা ভারতব্যাপী বিখ্যাত বাগ্মী, দার্শনিক। কলকাতা, লখনৌ, বেনারস, দিল্লি, বোম্বে, লাহোর—সকল জ্ঞানকেন্দ্রে তাঁর অবাধ যাতায়াত, অহরহ ডাক।

AMARBOI.COM

বিনয়বাবুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের স্মৃতি আমার মনে অমলিন হয়ে ভাসছে। সেটিই আমার শেষ সাক্ষাৎ। (বিনয়বাবু ছিলেন ইংরেজির অধ্যক্ষ এস.এন রায়ের ছোট ভাই। এস.এন রায় ছিলেন সেকালের ইডেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুজাতা রায়ের স্বামী। আসলে স্বামী-স্ত্রী হওয়ার পূর্বেও এঁরা একই পরিবারের লোক ছিলেন। আমাদের সামাজিক ভাষায় হয়ত খালাত-মামাত ভাইবোন। হিন্দু সমাজে এত নিকট আত্মীয়ের মধ্যে নাকি সেকালে বিয়ের সম্পর্ক হতো না। কিন্তু এস.এন রায়-সুজাতা রায় সে সংস্কারকে ভেঙে ছিলেন।)

১৯৪৬-৪৭ সন। কিংবা তারও কিছু পর ১৯৪৮ এর মধ্যভাগ। তখন বিনয়বাব ছিলেন দর্শন বিভাগের প্রধান। তাঁর মারফতেই বয়োকনিষ্ঠ বা জুনিয়র শিক্ষকদের নিয়োগ—তথা তাদের সকল আবেদন-নিবেদন : বিদেশ যাওয়ার বৃত্তির দরখাস্ত বা ছুটির প্রার্থনা। আমি তখন বিভাগের একজন তরুণ শিক্ষক। বিনয়বাবু জানতেন, আমার কিছু এদিক-ওদিক চলাচল আছে। পড়াশুনার বাইরে : এই কনফারেন্সে যাওয়া, ঐ মিটিং করা, করোনেশন পার্কে বক্তৃতা দেওয়া, রাজনৈতিক পত্রিকা বিক্রি করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নপদস্থ পিয়ন বা চাপরাসিদের ছেলেমেয়েদের নাইট স্কুল চালানো, এমন কি তাদের নিয়ে বেয়ারার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমিতি গঠন করা। এসব কিছুকে আমার ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার শিক্ষকরা প্রশ্রয় এবং স্নেহের চোখে দেখতেন। মোট কথা, কেবল বই পড়তে ছেলেটি যে ব্যস্ত থাকে না, আবার এটা-ওটা করেও ছেলেটি বেশ ভালো ফল করে পরীক্ষাতে, এটি আমার অধ্যাপক-শিক্ষকদের বেশ আমোদিত করতো। সে যা হোক, ৪৭-৪৮-এ আমি যখন দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা করছি, তখন দেশ বিভাগ তথা পাকিস্তান হওয়ার পরে ঢাকার রাজনীতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে উঠছিলো। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার বামপন্থী রাজনীতিকদের বিষয়ে তাদের দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ণ করে তুলছিলো। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করা থেকে ধর-পাকড়ও শুরু হয়েছিলো। তখনো বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের অধিকাংশ হিন্দু সমাজভুক্ত। তাঁরাই অধিক পরিমাণে গ্রেফতার হচ্ছিলেন। কিন্তু সরকারের আই.বি তথা গুপ্তচর বিভাগ খোঁজ করছিলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে এমন ধরনের কর্মী আছে কিনা। শিক্ষকদের মধ্যে মুসলিম তরুণ শিক্ষক হিসেবে স্বাভাবিকভাবে এক্ষেত্রে আমি এই বিভাগের নজরে পড়েছিলাম। তাদের এ দৃষ্টি হয়ত আমার ওপর পড়েছিলো বিভাগের পূর্বে, সেই '৪৩ সনের দুর্ভিক্ষ এবং ৪৫-৪৬ সনের সারাদেশব্যাপী ছাত্র এবং শ্রমিক আন্দোলনের আলোড়নের কালেই : নৌবিদ্রোহ, রশিদ আলী দিবস, ঢাকার ছাত্রদের দাঙ্গাবিরোধী শান্তি মিছিল হিসেবে ইতিহাসে যে ঘটনাগুলো পরিচিত হয়ে আছে, তার মধ্যেই। কিন্তু বিভাগের পূর্বে আমার ওপর তাদের দৃষ্টি তত খর হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেশ বিভাগের পরে আমি এমন কর্মীদের মধ্যে প্রায় অন্যতম হয়ে দাঁড়ালাম। পাকে প্রকারে আমি নোটিশ পেলাম : আমাকে তারা অন্বেষণ করছে। এমন অবস্থায় প্রকাশ্য চাকরিরত হয়ে বেশিদিন বাইরে থাকা যাবে না, সংগঠনের এই বিবেচনা থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো : তুমি চাকরি ছেড়ে আত্মগোপন করবে। সিদ্ধান্তটি কার্যকর করতে আমার কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসে নি। সাংসারিক কোনো দায়-দায়িত্ব আমি কোনো দিন পালন করি নি। একমাত্র আকর্ষণ জন্মেছিলো ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। বেশ লাগছিলো ছাত্র-প্রায় আমার শিক্ষকের মতো বক্তৃতা দিতে। কেমন করে যে সেদিন ছাত্রছাত্রীদের কাছে গুরুগম্ভীর কথা বলতাম, তা স্মরণ করতে পারছিনে। তবে গোবেচারী আমার প্রতি ছেলেমেয়েদেরও কিছুটা আকর্ষণ যেন তৈরি হচ্ছিলো। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, এই 'স্যারটি'র যেমন 'অ-স্যারমূলক' নানা আচার-আচরণের কথা শোনা যায়, তেমনি আবার ব্যতিক্রমহীনভাবে তাকে নির্দিষ্ট সময়ে তার ক্লাসটিতেও পাওয়া যায় আর সেখানে তাকে সাগ্রহে পাঠ্য কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যাতে নিবদ্ধ হতেও দেখা যায়। আর এ কারণেই একদিন আমি তাদের সতর্ক করে দিয়েই বললাম : 'আমি আর তোমাদের ক্লাস নেব না।'

তারা বলল : 'কেন স্যার, কেন স্যার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম : 'আমার জীবনে অ-শিক্ষক কিছু দায়দায়িত্ব আছে। সেটি পালন করে শিক্ষকতার পুরো দায়িত্ব পালনে আমি ব্যর্থ হবো। কিন্তু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবো না জেনেও চাকরিতে বহাল থাকব, এমন কথা আমি ভাবতে পারিনে।' সেদিনকার সেই পরিবেশে ছেলেমেয়েদের কাছে আমার এমন কথা নিশ্চয়ই বেশ রহস্যের সৃষ্টি করেছিলো, কিন্তু কথাটা সঠিকই ছিল।

দুদিন পরে আমি এক টুকরা কাগজ নিয়ে অধ্যাপক বিনয় রায়ের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমার সাক্ষাৎশিক্ষক এবং বিভাগের প্রধান, যিনি আমাকে ঘরের ছেলের মতো স্নেহ করতেন, তিনি ভেবেছিলেন, কাগজটিতে আমার কোনো আবেদন আছে, কোনো পদোন্নতির, বা বিদেশ গমনের জন্যে বৃত্তির। আমার হাতের কাগজটিতে আবেদন অবশ্যই একটি ছিল। কিন্তু পদোন্নতির নয়, অব্যাহতির : 'স্যার, আই বেগ টুবি রিলিভ্ড্ অব মাই ডিউটিস এ্যাস এ টিচার ইন দি ডিপার্টমেন্ট : স্যার, বিভাগের শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিবেন।' সোজা কথায়, পদত্যাগ। বিনয়বাবু আমার হাত থেকে সেই কাগজটুকু নিয়ে বেশ কয়েক মিনিট এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, যেন বাক্যটির মর্ম তিনি অনুধাবন করতে পারছেন না। এবং যথার্থই তিনি আমাকে রাগের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন : 'এসবের অর্থ কি? তুমি কি পাগল হয়েছো? আর ইউ ম্যাড?' বিনয়বাবুর বিস্মিত হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। তখনকার হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত কত ছেলে রাজবন্দী হিসেবে জেলে গেছে, এমন কি ফাঁসিতেও ঝুলেছে। আন্দামানে নির্বাসিত হয়েছে, আত্মগোপন করেছে। বিনয়বাবু, এস.এন রায়, পৃথ্বিশ চক্রবর্তী, হরিদাস বাবু। এঁদের কাছে এমন ব্যাপার বিস্ময়কর কিছু ছিলো না। সেকালে তাঁদের কাছে চমক ছিলো ; একটি মুসলমান ছাত্রের এমন 'বিপথে' পা বাড়ানোর। সেদিন মুসলমান সমাজে এমন ঘটনা তাঁদের সমাজের ছেলেদের ন্যায় সচরাচর ছিল না। মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেক্ষিতে এ ছিলো ব্যতিক্রম।

বিনয়বাবু তারপরে আবার বললেন : 'তোমার এ রেজিগনেশন লেটার আমি ছিঁড়ে ফেলব। এমন পাগলামি তুমি করো না।'

আমি বললাম : 'স্যার আপনি তো আমাকে জানেন। ব্যাপারটাতে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এটা তো আর পাল্টানো যাবে না।'

শুধুমাত্র এই কথা কয়টিই। আর কিছু নয়। আর তারপরেই আমার স্বভাবসুলভ সলজ্জ নিঃশব্দতা ব্যতীত আর কোনো জবাব ছিল না আমার। আরো কয়েক মুহূর্ত বোধ হয় পার হয়েছিল। তারপরের ঘটনাটি আজ মনে করতে আমার চোখে পানি আসছে। কিন্তু সেদিন যে কিভাবে ঘটনাটিকে অতিক্রম করে এসেছিলাম, তা আর স্মরণ করতে পারিনে। আমার শিক্ষক ড. বিনয় রায়, বিভাগের প্রধান, আমাকে হঠাৎ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন : তোমার মতো পাগল ছেলে আমি আর পাই নি। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি ...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনয়বাবু আজ হয়ত বেঁচে নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার সেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে শত দ্বন্দ্ব দাঙ্গা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধার ক্রমপ্রসার সত্ত্বেও এমন স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক যে ছিল, তার কথা আজ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করা, ব্যক্তিগত আবেগ থেকে স্মৃতিচারণের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হচ্ছে। সেই বোধ থেকেই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করার এই দুর্বল চেষ্টা।

এক কিশোরের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

ধারাবাহিকভাবে স্মৃতিচারণের চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আত্মজীবনী লেখার মতো 'বড়লোকও' আমি নই। তবু 'চল্লিশের দশকের ঢাকা'র কথা বলার কিছুটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিজের মনের আলো-আঁধারিতে হাতড়ে বেড়াবার চেষ্টা করছি নিরন্তর। হঠাৎ হঠাৎ কোনো একটা উদ্দীপক বা 'স্টিমুলাসে' তার কোনো কোনো জায়গা যেন আকস্মিকভাবে দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। কিছুটা পরিমাণে দেখা যায়। চিত্রবৎ ভেসে ওঠে ১৯৪০, ৪১, ৪২, ৪৩-এর জীবন, তার কোনো ঘটনা, কোনো চরিত্র। তারপরেই আবার হয়ত অন্ধকার। এ প্রায়, অতীত নিয়ে কানামাছির খেলা : এই ছুঁই, এই পাই, এই পাইনে ... চল্লিশ বছরের ওপর। তারিখ আছে কোনো কোনোটির গায়ে : ১৯৪০-৪১ সনের। একটি কিশোরের খাতা। প্রায়ই ছিন্ন। আবার কোথাও কিছুটা ধারাবাহিকতা আছে। একটি কিশোর ছাত্রের খাতা। কিশোর তো বটেই। মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছে। পনের বছরও পুরো হয় নি ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়ে। যে লেখক বর্তমানে এই ভূমিকাটি লিখছে তার নামের সঙ্গে এই কিশোরের নামের অবশ্যই মিল আছে। কিন্তু তাই বলে সেই খাতার মধ্যে যে দুই-একটি সাহিত্যচর্চামূলক লেখার আভাস পাওয়া গেল, সে লেখা বর্তমানের এই লেখকের, এমন কথা বলা অর্থহীন। তার মানে এই নয় যে বর্তমানে প্রৌঢ় বয়সের এই লেখক সেই কিশোরের চাইতে উচ্চতর স্তরের কোনো লেখক, তাই একটি কিশোরের রচনাকে নিজের বলতে তার সঙ্কোচ। ব্যাপারটি তা নয়। বরঞ্চ সেই কিশোরের কাঁচা হাতের লেখার মধ্যে, শব্দের বানানে ভুল এবং ভাষা ব্যবহারের সাধু চলিতের মিশ্রণ সত্ত্বেও যে অকৃত্রিম আবেগের পরিচয় আছে, সেটি বর্তমানের এই তিত-পোড়া প্রৌঢ়ের জীবনে বা তার লেখায় নেই। তাই সে কিশোরের আবেগময় লেখার মালিকানা দাবি করার হক বর্তমানের একই নামধারী এই লেখকের নেই।

সেই কিশোরের এই লেখার একটিও সেদিন কোনো সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয় নি। অপর কোনো লেখা হয়ত ঢাকা কলেজের ম্যাগাজিনে কিংবা 'মাসিক মোহাম্মদী', 'মাসিক সওগাতে' প্রকাশিত হয়ে থাকবে।

কিন্তু অপ্রকাশিত এই পাণ্ডুলিপির একটি রচনা আমার কাছে আজ একটু তাৎপর্যপূর্ণ বলে বোধ হচ্ছে। লেখাটি গল্প। রচনার কাল ১৯৪১-এর শেষ কিংবা '৪২। খাতার বিভিন্ন চিহ্ন থেকে এমন অনুমানই করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঙ্গার শহর, ঢাকা শহর। এই দাঙ্গার পটভূমিতে একটি মুসলমান ডাক্তার ছেলে এবং দাঙ্গায় সদ্য নিহত একটি হিন্দু যুবকের অসহায় বোনকে নিয়ে কিশোর লেখক তার গল্পটি তৈরি করেছে। গল্পটিকে আমি নিচে তুলে দিচ্ছি। সেদিনের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে একটি মুসলিম কিশোর ছাত্র তার সাহিত্যচর্চার চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-ভালোবাসা তথা হৃদয়গত ঐক্যের সূত্রটিকে যে মূল্যবান বলে মনে করেছিলো, এই ঘটনাটি সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত প্রবাহিত সামাজিক-রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই একটি সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বহন করে। এবং সে কারণেই সেই কিশোরের এই কাঁচা লেখাটি অভিজ্ঞ-পক্ক এই প্রৌঢ়ের ভালো লেগেছে।

ভূমিকার এই কথাটি বলে আমি গল্পটি তুলে দিচ্ছি। পাণ্ডুলিপিতে গল্পটির কোনো নাম পাওয়া যায় নি। হয়ত কিশোরের এটি খসড়ামাত্র ছিল। একে মার্জিত করা হয় নি। কিন্তু আজ একে মার্জিত করে কোনো লাভ নেই। সেটি উচিতও নয়। এবং এর নামকরণেরও কোনো প্রয়োজন নেই। পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম ছিল না। খাতার উপর তার নিজের নামটি লেখা ছিল। এবং দ্বিতীয়বার কোনো ব্যাখ্যা না করে বলছি : সে লেখক এই লেখক নয়। কিন্তু তার নাম এবং বর্তমান লেখকের নামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। লেখার পুরোটি পাওয়া যায় নি। যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে 'শরতী' প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। সে যাক, লেখাটির সাহিত্যিক মূল্য বড় নয়। বড় তার বক্তব্যগত বৈশিষ্ট্য।

AMARBOI.COM

*　　　*　　　*

'দাদা, তুমি আমায় ছেড়ে চলে যেও না, যেও না'।

অমল আর সুরমা। দুই ভাইবোন। আত্মীয় বান্ধব বলিতে তখন আর কেহই অবশিষ্ট ছিলো না। মানুষের বাঁচিবার উপায় কম। কিন্তু মরণের পথের অল্পতা নাই। মরণের পথ অসংখ্য। মরণের পথের প্রশস্ততা সত্ত্বেও অমল আর সুরমা এতদিন বাঁচিয়াই ছিল। পূর্ববঙ্গেরই ওরা মানুষ। বাবা ছিলেন জমিদার। অমল কিন্তু গ্রামের জমিদারি বাদ দিয়া পূর্ববাংলারই ঢাকা শহরে বোন সুরমাকে লইয়া বাড়ি করিয়া বাস করিতেছিলো। যখনকার কথা বলিতেছি, অমল তখন বি.এ. পড়ে, বোন সুরমা ম্যাট্রিক।

অমল আর সুরমা। এদের একের বাঁচার জন্য দায়ী অপরে। অমল সুরমার শুধু বড় ভাইই নয়। ছেলেবেলা হইতে অমল সুরমার ভারপ্রাপ্ত। বোন সুরমার একাধারে সে বড় ভাই, মাতা-পিতার মতো রক্ষণকারী সব। সুরমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বই অমলের বাঁচার একমাত্র প্রয়োজন।

ঢাকার ১৯৩৯ সনের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার কালে অমল পাইল এক ভীষণ আঘাত। হাসপাতালে অমলকে স্থানান্তরিত করা হইল। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে লাগিল। সুরমার সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। হাসপাতালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুমূর্ষু ভাইয়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অঝোরে সে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল। সুরমার চক্ষুর সম্মুখে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ লেপিয়া-মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। অমল তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। অথচ অমলের এই চলিয়া যাওয়া সুরমার নিকট যে ভবিষ্যতে কি একটা ভয়াবহ আলোড়ন, একটা ভূমিকম্প আনিয়া উপস্থিত করিবে সে কথা সুরমা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, অমল তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অন্তরের নিগূঢ় ক্রন্দন ধ্বনি মুহূর্তে মুহূর্তে সুরমার মুখে প্রকাশ পাইতেছিলো : 'দাদা, তুমি যেও না' ...

অমল? নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ। সুরমার কথা কানে প্রবেশ করিতেই জ্বলিয়া ওঠে। কিন্তু কথা বাহির হয় না। কোমরের পাশের ক্ষতটার ব্যান্ডেজ আবার রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে। মরণপথের যাত্রীর শেষ নিশ্বাস পড়িতে নিমেষমাত্র বাকি। অমল হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, সুরমা, এই প্রকাণ্ড বিশ্বটায় এমন একটা মানুষও কি নেই যার হাতে তোর ভার আমি ন্যস্ত করে যেতে পারি, নেই?

এতক্ষণ পর্যন্ত হাসপাতালের বারান্দায় একটি মুসলমান ডাক্তার ছেলে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। 'ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের' ভারপ্রাপ্ত সে। গত রাত্রি বারটা হইতে কত মানুষকেই তো সে ভর্তি করিয়াছে এই ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে। কতোজনের শেষ নিশ্বাস তো এরই মধ্যে বাহির হইয়া গিয়াছে। আর একটা কেস এই অমল বাবু। তারও হয়ত আর বেশি বিলম্ব নাই। অথচ অমল চলিয়া যাইবার পরে ঐ পার্শ্বে উপবিষ্ট মেয়েটির অবস্থা এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার কালে কিরূপ নিঃসহায় হইয়াই যে দাঁড়াইবে, সে কথা কি সে এতক্ষণে কম বুঝিতে পারিয়াছে? দাদার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও যে বলিতে পারে, 'তুমি যেও না', সে যে কতটা আশ্রয়হীন, সমস্ত পৃথিবীটায় যে তাহার কোথাও মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থানও নাই, সে কি তাহার বুঝিতে বাকি রহিয়াছে? অথচ কিইবা সে করিতে পারে? আজিজ রেলিং-এ ভর দিয়া দূরে রাঙা আকাশটার পানে নির্নিশেষে চহিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, মানুষে মানুষে এই যে হানাহানি, এই যে লহুর স্রোত দিনরাত বিচারহীনভাবে বহিয়া চলিয়াছে, এর শেষ কোথায়? আজ ভাইয়ের পাশে উপবিষ্ট ঐ নিঃসহায় মেয়েটির আর্তরব, তার বুকফাটা ক্রন্দন কি এই নিষ্ঠুর নির্দয় পশুগুলিকে অভিশাপ দেয় না? আর এই যে বছরে বছরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, এর নিবারণই বা কিসে?

আজিজ ঢাকা মেডক্যাল স্কুলে পড়ে। ওর এই ডাক্তারি পড়ার পেছনেও বেশ একটু গল্পের মতো আছে।

বছর দুই পূর্বে আজিজ যখন স্কলারশিপ লইয়া আই.এ পাস করিল তখন সবাই ভাবিয়াছিলো, আজিজ বি.এ পড়িতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু আসলে তা হইল না। পরীক্ষা দিয়া ও বাড়ি যায়। গ্রামে তখন বসন্ত দুর্দম বেগে বহিয়া চলিয়াছে। প্রতিদিন লোক মরিতে লাগিল। মাটি দিবার কেহ নাই। প্রতিষেধক কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিতে কোনো লোক নাই। দিনের পর দিন গ্রাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উজাড় হইয়া চলিল। রোগ ছড়াইতে ছড়াইতে ক্রমে আজিজদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট ভাইটি ওর যেদিন ওরই সম্মুখে শত শুশ্রূষা সত্ত্বেও ওষুধ না লইয়া মরিয়া গেল, সেদিন ওর সমস্ত চিত্ত আলোড়িত হইয়া নিজের বিদ্যাশিক্ষার উপর একটা ধিক্কার আসিল। পরীক্ষার পরে আজিজ ভাবিয়াছিলো, পিতার সম্মতি লইয়া সে বি.এ পড়িতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু পিতার সম্মতি দেওয়ার সময়ও অতিবাহিত হইয়া গেল। তিনিও তাঁহার ছোট্ট ছেলেটিকে অনুসরণ করিলেন। আজিজের মা ছিল না। বাপ আর ভাইকে কবরগাহে রাখিয়া আসিবার কালে মনে মনে আজিজ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া লইল যে তার ভ্রাতার এবং পিতার আত্মার কল্যাণের জন্য সে ডাক্তারি পড়িবে। রোগে শোকে সে সমস্ত গরিবকে সেবা করিবে। গরিবেরই আশীর্বাদের অশ্রু লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আজিজ তাহার পিছনের ইতিহাসটাকেই উল্টাইতেছিলো। নিঃসহায় আজ ঐ মেয়েটির মতো সেও একদিন এমনিভাবে সহায় সম্বলহীন হইয়াছিলো। কিন্তু তবুও তো কত তফাৎ। এ যে দুর্বল।

দূরে শহরের মধ্যে 'বন্দেমাতরম' আর 'আল্লাহু আকবরের' চাপা ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। একটা বাড়িতে এই মাত্র আগুন দেওয়া হইল। তাহার লেলিহান শিখা সন্ধ্যার আকাশটাকে আরো ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। আজিজের মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল, ধর্মের নামে এরা কত অনাচার, কত অত্যাচারই না করিতে পারে। তবুও মনে করে, ইহারা ইহাদের স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

AMARBOI.COM

হাসি মিলাইয়া যাইতেই ভিতরে অমলের চিৎকারে আজিজের মুখে কালো ছায়া নামিয়া আসিল। অমল তখন বলিতেছিলো, সুরমা, বোন আমার, মানুষ নাই। কার হাতে তোকে সঁপে দিই ...।

অমলের কথা ভালোমতো শেষ হইতে পারিল না। মাঝপথে থামিয়া পড়িল। সুরমা চিৎকার করিয়া উঠিল, ওগো কে আছ? দাদা আমার কেমন করছে।

আজিজ তাড়াতাড়ি আসিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া অমলের হাতের নাড়ি ধরিল। সুরমা বলিয়া উঠিল, ডাক্তার সাহেব, দেখুনতো দাদা আমার—। সুরমার কথা থামিয়া গেল। ডাক্তারের চক্ষে জল।

কি ডাক্তার, দাদা আমার নাই? বলিয়া সুরমা অমলের বুকে উপর লুটাইয়া পড়িয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ডাক্তার রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বাহির হইয়া আসিল। এ দৃশ্য সহ্য করা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। চক্ষু বাঁধ মানিল না। বারবার ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

আজিজ ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তারি মন ওর ছিলো না। একবার ডিসেকটিং রুমে আজিজ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলো। জ্ঞান হইবার পরে সার্জন আসিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইউ শুড নট হ্যাভ কাম টু দিস ডিপার্টমেন্ট মাই বয়। এ ভেরি টেন্ডার হার্ট ইউ পজেজ।'

রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সুরমা এখনো ভাইয়ের বুক আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আজিজ আসিয়া ডাক দিল, সুরমা দেবী, একটু উঠুন। সুরমা উঠিয়া চাহিল আজিজের পানে। শান্ত সমাহিত সে চাহনি। কত বড় ব্যথা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে ঐ চক্ষুর কোটরে। আজিজ নিজের দৃষ্টি নামাইয়া বলিল রাত নয়টা বেজে গেছে। এরপরে সৎকার করানো অসম্ভব হবে। কাকেও পাওয়া যাবে না। এখন কয়েকটি বিশ্বাসী লোক যোগাড় করতে পেরেছি। আপনি একটু আমার প্রাইভেট রুমটায় যেয়ে অপেক্ষা করুন। আমি ফিরে এসে যা হোক একটা ব্যবস্থা করব।

আজিজের নতদৃষ্টির উপর একদৃষ্টে সুরমা চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি তাহার বিস্ময়ের। আজিজ কে? আজিজ ডাক্তার। হাসপাতালের ডাক্তার। সে কোথায় যাইবে? কেনো যাইবে? কাহার জন্য যাইবে? ইহা কিছুই সুরমা বুঝিতে পারিল না। ভাইকে তাহার সৎকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে ডাক্তারের কি? সুরমার মুখ দিয়া বিস্ময়ের সহিত বাহির হইলো, আপনি কোথায় যাইবেন?

ডাক্তার ম্লান হাসিয়া বলিল, আমি না গেলে তো সৎকার করা সম্ভব হবে না। আর যার তার হাতে তো আমি এ মৃতদেহকে ছেড়ে দিতে পারিনে। ডোমের নিকট আমি এঁকে দিতে পারব না। তাছাড়া নেবার পথে লাশের উপর আবার আক্রমণ হতে পারে। কাজেই আমার না গেলেই নয়। আপনি কিছু ভয় করবেন না। আমার ঘরে একটা ইজি চেয়ার আছে। সেখানে যেয়ে আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

AMARBOI.COM

তাহার ভাইয়ের শেষ গতি করিতে আজিজ যাইবে? এত দয়া তাহার? সুরমার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

আজিজ বলিল, আপনি যান সুরমা দেবী। আপনি ঘরে গেলে পরে আমি দাদার দেহটা তুলব।

আবার সুরমার মথা যেন কেমন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে এই দেহটাই ছিলো তাহার একমাত্র ভরসাস্থল। এই দেহেরই আত্মা কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্তও তাহার ভবিষ্যৎ নিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলো। আর এখন কিনা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জোও তাহার নাই। সুরমা আবার অমলের পা জড়াইয়া লুটাইয়া পড়িল। আজিজের চক্ষু ছাপিয়া কান্না আসিল। কিছুক্ষণ পরে আজিজ আবার ডাকিল, সুরমা, সুরমা দেবী, উঠুন।

সুরমা উঠিয়া বলিল, চলুন।

সুরমাকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া আজিজ অমলের মৃতদেহকে লইয়া কয়েকজন সাথী সঙ্গে করিয়া শ্মশানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। দূরে 'বন্দেমাতরমের' সাথে সাথে আর একটি বাড়ি জ্বলিয়া উঠিল।

আজিজ চলিয়া যাইবার পরে হঠাৎ সুরমার একটা কথা মনে পড়িল, মৃতদেহের উপর পথে আক্রমণ চলিতে পারে। ভাবিতেই সুরমা শিহরিয়া উঠিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহার ডাক্তারের কথা মনে পড়িল। যদি ডাক্তারও তেমনি করিয়া আঘাত পায়, যদি ডাক্তারও আর ফিরিয়া না আসে। দাদাকে সে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। দাদা তাহার চলিয়া গিয়াছে। তাহার পরে ডাক্তার একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া আসিয়া দেখা দিল তাহার ভাইয়ের মৃত্যু সময়ে। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সে তাহার দাদার মৃতদেহের সৎকার করিতে গেল। কিন্তু যদি? সুরমা আর ভাবিতে পারিল না। নিজের মনে মনে বারবার সে আবৃত্তি করিতে লাগিল, না না, ডাক্তারের বাঁচিতে হইবেই। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই অপরিচিত ডাক্তার ছেলেটি যে তাহার কতো বড় আত্মীয়, কতদূর নির্ভরস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিয়া এত বড় বিপদের মধ্যেও সুরমার বিস্ময়বোধ হইল।

রাত্রি বারটা পার হইয়া গিয়াছে। আজিজ তখনো অমলের দেহ সৎকার করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে না। সুরমার চিন্তা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। সুরমার পাশের ঘরে ইমারজেন্সির কেসের রুগীদের কাতরোক্তি শোনা যাইতেছে। দূরে একটা হল্লার সাথে সুরমা চমকিয়া উঠিল। কি একটা অশুভের সম্ভাবনায় সুরমার মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

রাত্রি একটার কালে আজিজ ফিরিয়া আসিল। চিতার আগুনের হল্কার জন্য তখনো আজিজের মুখ লাল। আজিজ ফিরিয়া আসিতেই সুরমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ডাক্তার আপনি ফিরে এসেছেন? কোনো বিপদ হয় নি তো?

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিল, না, সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হয় নি। কিন্তু আমি চিন্তিত হয়েছিলুম আপনার জন্যে।

: আপনার মুখ অত লাল কেন?

: আগুনের তাপে বোধহয়। কিন্তু সুরমা দেবী আপনি তো পরিশ্রান্ত। আপনার বিশ্রামের জন্য আমি কি বন্দোবস্ত করতে পারি? যে ঝড় এইমাত্র আপনার ওপর দিয়ে বয়ে গেল সে ঝড়ের প্রাবল্যই আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে কতো বড় হয়ে এর আঘাত লেগেছে আপনার ওপরে। কিন্তু কীইবা সাধ্য আছে আমাদের এর বিরুদ্ধে? আচ্ছা সুরমা দেবী, আপনাদের বাসায় কোনো চাকর আছে?

: না, একটা চাকর ছিল। সেও আজ দুদিন পর্যন্ত আসে না।

: আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে। আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি ইজি চেয়ারটায় একটু বিশ্রাম করে নিন। আমার ওয়ার্ডে আরো প্রায় গোটা বারো কেস এসে জমা হয়েছে। তাদের এ্যাডমিশন করে নিতে নিতে প্রায় সকাল হয়ে যাবে। দেখি তখন একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি কি না। আমার ডিউটিও তখন শেষ হয়ে যাবে। বলিয়া আজিজ সুরমাকে একটু বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া ডিউটিতে চলিয়া গেলো।

ডাক্তার ফিরিয়া আসিযাছে। এতক্ষণে সুরমা একটু নিশ্চিন্তে নিজের জীবনটা লইয়া আলোচনা করিবার অবসর পাইল। সুরমা ভাবিয়া পাইল না মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনটা এত দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া যায় কেমন করিয়া। তাহা না হইলে গত পরশু যে নিজের জীবন সম্বন্ধে, তাহার দাদার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কিছুর কল্পনাই না করিয়াছিলো। আর আজ সে সমস্ত কিরূপভাবে এক নিমেষের ফুৎকারে সব অন্ধকারে লীন হইয়া গেল। সে সমস্তকে আর দ্বিতীয়বার কল্পনা করিবার পথও তাহার রহিল না। ভাবিতে ভাবিতে সুরমা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চিৎকার ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। দূরে কতোগুলি বড় বড় কাপড়ের দোকান পুড়িয়া শেষ হইতেছিলো। তাহার মৃদু আলোকরশ্মি কিঞ্চিৎ ধূমের সহিত আকাশের দিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতে উঠিতে সেখানের আকাশটাকে একটু গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছিলো। আজিজের ডিউটি শেষ হইয়া আসিয়াছিলো। হাসপাতালের গাড়িটার ব্যবস্থা করিয়া সুরমার দুয়ারে আসিয়া আজিজ ডাক দিল : সুরমা দেবী।

সুরমার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। কবাট খুলিয়া বলিল, আপনার ডিউটি শেষ হলো?

: হ্যাঁ, আপাতত শেষ হয়েছে। একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করতে পেরেছি। শহরের দাঙ্গাটা এখন একটু শান্ত আছে। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ডাক্তারের নির্দেশমত সুরমা আসিয়া গাড়িতে উঠিল। আজিজ ড্রাইভারকে রাস্তার কথা বলিয়া গাড়িতে উঠিল।

সুরমা এতক্ষণে অনেকখানি স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। অমল থাকিতে সুরমা একটা দিনও ভাবিতে পারে নাই যে, দাদার অনুপস্থিতিতে তাহার নিজের কোনো অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুরমার অনেকখানি জ্ঞান, অনেকখানি অভিজ্ঞতা হইয়া গিয়াছে। দাদার মতো স্নেহ, দাদার মতো উদার হৃদয় যে আর কাহারো থাকিতে পারে সে কথাটাও সুরমা এই অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল। গাড়িতে সম্মুখে ঐ ড্রাইভারের পাশে বসা ঐ যে ডাক্তার ছেলেটি, ভিন জাতি, ভিন ধর্ম, অথচ কত উদার তাহার হৃদয়, কতো কোমল তাহার অন্তর। একথা কি সে এই একটি রাত্রির মধ্যে কম বুঝিতে পারিয়াছে? এর মধ্যেই তো সে সুরমার দাদার অভাব কতটা পূরণ করিয়া দিয়াছে। দাদার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও সুরমা যখন দাদার পাশে বসিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য আকুলভাবে চেষ্টা করিতেছিলো, তখন তাহার সম্মুখে তাহার ভবিষ্যৎটা কত ভয়াবহ হইয়াই না দেখা দিয়াছিলো। আর সত্যই তো, আজ এই আত্মীয়-স্বজনহীন দাঙ্গা-হাঙ্গামার শহরে তাহার ভাইয়ের অন্তিম গতির কে ব্যবস্থা করিত। হাসপাতালের কর্মকর্তারা যদি তাহার মৃতদেহকে ডোমের হাতেই তুলিয়া দিতেন তাহা হইলেই বা সে কি করিতে পারিত। এই হাঙ্গামা মাথায় লইয়া কে তাহাকে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিত। অথচ বেচারির না হইয়াছে একটু ঘুম, না একটু বিশ্রাম। সারাটা পথ সুরমার চিত্ত ব্যাপিয়া আজিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাই দোল খাইতে লাগিল। তাহার অন্তর আজিজের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায়, অকৃত্রিম সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

বাসায় নামিয়া আজিজ বলিল, সারারাত্রি আপনি একটুকুও চক্ষু বন্ধ করতে পারেন নি, সে আমি বুঝি। আর যে বিপদ এইমাত্র বয়ে গেল তার পরে একটুও বিশ্রাম করা যে কত দুঃসাধ্য সে কথা ডাক্তার হলেও আমার চেয়ে বেশি কে জানে? আপনি দেরি করবেন না। এখনি স্নানাদি সেরে নিন। আমি এই গাড়িতেই যাচ্ছি। কিছু খাবার যদি কোথাও পাই, দেখি। আর একটি বামুনকে চেষ্টা করে যদি পাই তো আমি এখনি নিয়ে আসব।...

সুরমা ভারি গলায় বলিল, আমি যদি ঘুমোতে না পেরে থাকি, আপনি যে একটু জিরোতেও পান নি। সেও তো আমি নিজের চক্ষেই দেখেছি। না, ডাক্তার সাহেব, আপনি যা করেছেন, কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে সে অমূল্যদানকে আমি মূল্য দিতে চাইব না। কিন্তু আপনিও আর দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন না।

একটু থামিয়া আবার বলিল, আর বামুন ঠাকুরের জন্যও এত ব্যস্ত হতে হবে না। আমি নিজের হাতেই সব আপাতত করে নিতে পারব। আর আপনি কোথায় পাবেন বামুন ঠাকুর। কে আসবে এই দাঙ্গার কালে নিজের প্রাণটুকু হারাতে। বৃথা চেষ্টা করবেন না। ওর চেয়ে আপনি দেরি না করে হাত-মুখ ধুয়ে নিন। চা বোধ হয় কিছু আছে। বিনা দুধে আমিই সত্বর যোগাড় করে আনছি। বলিয়া সুরমা আজিজকে কথার অবসর না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজিজের সেবার একাগ্রতায় সুরমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলো। এই সেবার একাগ্রতাই সুরমাকে তাহার এতবড় বিপদের মধ্যেও সান্ত্বনা আর ভরসা দিয়াছিলো। কিছুটা পরিমাণে সে তাহার নিজের দুঃখও এরই জন্য ভুলিতে পারিয়াছিলো।

আজিজ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। রাত্রি জাগিবার অভ্যাস তাহার আছে। কিন্তু ঘুমে ক্লান্ত না হইলেও অনেকগুলি অনেক প্রকার চিন্তা আসিয়া তাহার প্রাণশক্তিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছিলো। একটি আত্মীয় নাই, বান্ধব নাই, একটি বামুন ঠাকুর পর্যন্ত নাই। একা নির্বান্ধবভাবে কেমন করিয়া সুরমা থাকিবে। এই চিন্তাটাই তাহাকে বড় করিয়া পাইয়া বসিল। আজিজ বুঝিতে পারিয়াছে, এই বিপদের সময়ে আজিজের ওপর কতখানি নির্ভর করিয়া আছে সুরমা। কিন্তু সেই বা কি করিতে পারিবে। ক্ষণিকের দেখা। একে স্থায়ী করে রাখার বিপদও কি কম। হাসপাতালের ডাক্তার সে। এই দাঙ্গার কালে এই সাহায্যকে হিন্দু-মুসলমান, কেহই কি ভালো চক্ষুতে দেখিতে পারিবে? অথচ কোন হৃদয়েই বা সে সুরমাকে সম্পূর্ণ বিপন্ন করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এই সমস্ত চিন্তা আসিয়া আজিজকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলো। আজিজ নিজেকে মহা সমস্যায় দেখিতে পাইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নান করিয়া চায়ের ব্যবস্থা সারিয়া সুরমা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। পায়ের শব্দে আজিজ চক্ষু মেলিয়া চাহিল। ডাক্তার আজিজের চক্ষে একটা মস্ত বড় আর্ট এক্ষণে ধরা পড়িল। সবুজ সাধারণ একখানা শাড়ি পরনে সুরমার। অবিন্যস্ত চুলের কয়েকটি আসিয়া কপোলের দুই পাশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিলো। অনিন্দ্যসুন্দর মুখে গত রাত্রির বিপদের ছায়া পড়িয়া তাহাকে আরো গম্ভীর, সুন্দর ও শান্ত করিয়া তুলিয়াছিলো। আজিজ বিস্ময়ে মুগ্ধ-প্রায় চাহিয়া রহিল।

সুরমা ঘরে পা দিয়াই বলিল, খুব ঘুম পাচ্ছে বুঝি? পাবেই তো। ঘুমের তো আর দোষ নয়। এক নিমেষের জন্য কি চক্ষের পাতা বন্ধ করতে পেরেছিলেন? কিন্তু এখনো মুখ ধোননি যে? যান আমার চা হয়ে গেছে।

আজিজ সুবোধ ছেলেটির মতো আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া বলিল, যাই।

আবার প্রশ্ন জাগিল, এতো বিপদের মধ্যে এতো যে স্বাভাবিক, সে কাহার জন্য, কাহাকে আশ্রয় করিয়া?

চা ঢালিতে ঢালিতে সুরমা বলিল, আজকেও আপনার নাইট ডিউটি আছে নাকি?

: না, আজ আর নাই।

: আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ঐ রুগীদের আর্তধ্বনির মধ্যে থেকে কাজ করতে আপনার অসহ্য বোধহয় না?

আজিজ বুঝিল, সুরমা নিজের দুঃখ ভুলিয়া স্বাভাবিক হইতে চাহিতেছে।

আজিজ বলিল, যতক্ষণ হাসপাতালে থাকি ততক্ষণ আমার হুঁশ থাকে না, আমি কোথায় আছি। কোনো দিনই আমি হাসপাতালে বসে নরমাল কনডিশনে থাকতে পারিনে। কী একটা ভাব, একটা ইনস্‌পিরেশন আমাকে রুগীদের ...।

* * *

এখানে এসে পাণ্ডুলিপির দুটি পৃষ্ঠা পাওয়া গেলো না। ছিঁড়ে গেছে। তারপরে আরো কয়েকটি পৃষ্ঠা আছে। গল্পের নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রীতিতে আবদ্ধ হচ্ছে। তবু তাদের দ্বিধা আছে। দ্বন্দ্ব আছে। একের মনে প্রশ্ন : এর শেষ কোথায়? অপরের মনের প্রশ্ন : 'ভিনজাতের এই যে লোকটি প্রতিদিন যে তাহাকে বিপদের আরম্ভ হইতে আগুলিয়া রাখিতেছে, তাহার বিপদের আরম্ভ হইতে সে যে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে অসংখ্য বিপদের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে বিপদের আগুনের হল্কা হইতে আড়াল করিয়া রাখিল, তাহার কি কোনো দাম নাই? ...

তারপরে আবার ছিঁড়ে গেছে কিশোর লেখকের সেই পাণ্ডুলিপি। কেমন করে লেখক গল্পটিকে শেষ করেছিলো, তা আজ আর জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সেটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে কয়টি পৃষ্ঠা পাওয়া গেল এই পাণ্ডুলিপির, তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তত চল্লিশ বছর পূর্বের ঢাকা শহরের অধ্যয়নরত মুসলিম সমাজভুক্ত একটি কিশোরের মনের কিছু আভাস পাওয়া গেল। হয়ত এর মূল্য আছে কিছু, চল্লিশ বছর পরের প্রবহমান জীবনের নতুন কারিগরদের কাছে। কোনো কিছুই শূন্যের ওপর তৈরি হয় না। আর তাই কিছু তৈরির সময়ে তার ভেতরে সন্ধান আবশ্যক তার জমির, সে জমির নরম, শক্ত, গভীর, অগভীর উপাদানের। ...

২০.৭.৮৩

আবে আইজ আর থাউক্কা

ঈদের পরদিন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের বাসায়, সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য। এখন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে কাছে পেলে আমি 'জিল্লুর' বলে ঘনিষ্ঠতার সম্বোধনে ডেকে থাকি।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বেশ কয়েক বছর যাবৎ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ইংরেজির অধ্যাপক। বাংলাদেশের তিনি একজন সুপরিচিত কবি, প্রবন্ধকার এবং চিন্তাশীল সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর আলাপআলোচনা কিংবা বক্তৃতাতেও বেশ একটি চারুশীলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। পোশাক-পরিচ্ছদে অনাড়ম্বর, কিন্তু সুপরিপাটি। যে কারুর সঙ্গে আলাপে দুষ্প্রাপ্যরূপে ভদ্র, সুজন।

আমাকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন। তাঁরও আগে তাঁর স্ত্রী আমার স্ত্রীকে চিনতেন। তখন অবশ্য এঁরা কেউ কারুর স্ত্রী হন নি। জিল্লুরের স্ত্রী শিক্ষাজীবনে আমার স্ত্রীর কিছু বয়োকনিষ্ঠ বলে আমার স্ত্রী তাঁকে নাম ধরে ডাকেন। এঁদের সাক্ষাৎ ঘটেছিলো যখন এঁরা ইউনিভার্সিটিতে বি.এ এবং এম.এ পড়েন, তখন।

জিল্লুর আমাকে জানেন জেলখাটা লোক বলে। পঞ্চাশের দশকে জেলখাটা মুসলমান বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের একটা ভিন্নতর সম্মান ছিলো উন্মুখ মুসলমান বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাবিদদের কাছে।

পঞ্চাশের দশকেরও বোধ হয় পরের কথা। আমি ছিলাম রাজশাহী জেলে বন্দী। হয়ত '৬০-'৬১-র দিকে। আমার স্ত্রী ঢাকা থেকে আমাকে পাঠাতে চেয়েছিলেন কিছু খাবার-দাবার, টুকিটাকি। জিল্লুর তখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজির অধ্যাপক। জিল্লুর আগ্রহ করে তা সংগ্রহ করে আমার জেলখানাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এ কাজটি আমার প্রতি তাঁর একটি সশ্রদ্ধ প্রীতিরই পরিচয়। তারপরে আমার নিজের বর্তমানে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতার পর্যায়ে প্রায়ই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে কোনো আলোচনার বৈঠকে কিংবা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে। কিন্তু সম্প্রতি এই পরিচয়টিকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করে তুলল আমাদের উভয়ের উত্তর-পুরুষগণ : তথা আমার মেয়ে এবং তাঁর মেজ ছেলেটি। তারা উভয়ই চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত। ছেলেটি (শাকিল) মাত্র মেডিকেল কলেজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পরীক্ষা পাস করেছে। আমার মেয়েটি শেষ বর্ষে উঠেছে। তাদের নিজেদের জগতের বক্তৃতা, বিতর্ক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাদের পারস্পরিক পরিচয়। উভয়েরই সরল এবং সহাস্য সামাজিকতার একটি গুণ আছে এবং কিছুদিন পরে উভয়েই সরলভাবে তাদের বাবা-মার কাছে বলল : তারা দুজনে সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। ছেলে, মেয়ে, কোনো পক্ষের বাবা-মারই এতে আনন্দ বই আপত্তির কোনো কারণ ছিল না। এ ক্ষেত্রে জিল্লুরের মন্তব্যটি ছিলো সরস। বলেছিলেন : যা দিনকাল! ছেলে যে বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করেছে, এতেই তো বাবা-মা কৃতজ্ঞ।

কাজেই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সামাজিক আত্মীয়তার ক্ষেত্রে আজ আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ। গতকাল কিছুক্ষণ বসেছিলেন। 'কেমন আছেন' কথার পরেই আমি বললাম : 'চল্লিশের দশকের ঢাকা' সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? আপনি কবে এসেছিলেন ঢাকা?' জিল্লুর প্রশ্নটির তাৎপর্য বুঝলেন। সম্প্রতি 'চল্লিশের দশকের ঢাকা' আমাকে প্রায় ভূতের মতো পেয়ে বসেছে। এর ওপর একটি লেখা এবারকার ঈদসংখ্যা 'সংবাদ-এ' দিয়েছি। সবটা বেরোয় নি। তবু কিছুটা বেরিয়েছে। তাতে চল্লিশের দশকের ঢাকার কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই একই সংখ্যায় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নিজেরও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যার ওপর একটি লেখা বেরিয়েছে। একই সংখ্যায় একই পৃষ্ঠায় রাজশাহীর অধ্যাপক সনৎকুমার সাহার 'আর এক একুশে ফেব্রুয়ারি' নামে 'তেভাগা' আন্দোলনের প্রসঙ্গ নিয়ে একটি লেখা বেরিয়েছে। এ লেখাটিও ভালো। পুরোন যে ঘটনা ও আন্দোলনে মহৎ ঐতিহ্যের সম্ভার রয়েছে তাকে এ যুগের তরুণ ও সমাজকর্মীদের কাছে তুলে ধরার যে প্রয়োজনের কথা আমি 'চল্লিশের দশকের ঢাকা'র সূচনাতে উল্লেখ করেছি, সেই বোধ থেকেই সনৎও তেভাগার অবিস্মরণীয় কিছু ঘটনাকে আবার স্মরণ করেছেন এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রখ্যাত কৃষকনেতা আবদুল্লাহ রসুল তেভাগার কাহিনী নিয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার আলোচনা প্রসঙ্গেই ব্যাপারটি এসেছে।

জিল্লুরের কাছে আমার প্রশ্নে জিল্লুর বললেন : একে তো ছেলে আমি যশোরের এবং কলকাতার সাথে চলাচলের ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক ছিল সকাল-বিকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তায় আমার শৈশব যদি বা কেটেছে যশোরে, কৈশোর কেটেছে জলপাইগুড়িতে, আব্বার সঙ্গে। আরো যখন একটু বড় হলাম, আই.এ পড়ার সময় এল, তখন গেলাম স্বাভাবিকভাবে কলকাতার প্রেসিডেন্সিতে। ঢাকাতে তো আমি আসি নি। কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে এসেছি ভাঙাভাঙির পরেই মাত্র, '৪৭-এ।

আমি বললাম : তবু কলকাতা থেকে ঢাকাকে সেকালে কী চোখে দেখতেন?

জিল্লুর বললেন : ঢাকার প্রধান পরিচয় ছিল আমাদের কাছে দাঙ্গার শহর বলে। তাই ভীতিজনক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম : অথচ '৪৬-এ সাম্প্রদায়িক গণহত্যা হলো কলকাতাতে। তার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকাতেও শুরু হয়ে যেতে পারত নরমেধযজ্ঞ। কিন্তু তা যে হলো না, সে স্মৃতি আমার সচেতন গৌরবের স্মৃতি। ১৬ আগস্টের খবরে আমরাও কেঁপে উঠেছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার প্রগতিশীল অংশটি। আমি তখন এম.এ পড়ি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ কিছুটা জড়িত হয়েছি। আমরা ১৭ কিংবা ১৮ আগস্ট ঢাকাতে বের করেছিলাম হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি রক্ষার শান্তি মিছিল। সে মিছিলটি স্মরণীয় ছিল। তার উদ্যোগ এসেছিলো বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী মহল থেকে। ঢাকার মুসলিম লীগের প্রগতিশীল কর্মীবৃন্দ যাঁরা বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, তাঁরাও যুক্ত ছিলেন এই মিছিলে। এ কারণে শাহ আজিজুর রহমান, ফরিদ আহমদ এদের মতো সেদিনকার মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের পক্ষে এ শান্তি মিছিলের বাইরে থাকা সম্ভব হয় নি।

শাহ আজিজের কথা উঠতো জিল্লুর বললেন, ঐ প্রেসিডেন্সিতে পড়ার কালে মুসলিম লীগ এবং শাহ আজিজের রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ আমারও একটু ঘটেছিলো। '৪৬ সালে ফরিদপুরের নির্বাচনে ভলান্টিয়ারি করেছি বলে আমারও মনে পড়ে। সেটার নেতৃত্ব শাহ আজিজই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমাদের, মোহন মিয়াকে জেতাতে হবে। মোহন মিয়াই মুসলিম লীগের আসল প্রার্থী। বাদশাহ মিয়া নন। বাদশাহ মিয়াকে সমর্থন যোগাচ্ছেন জনাব সোহরাওয়ার্দী।

জিল্লুরও যে রাজনীতির কাছাকাছি কিছুটা ছিলেন তা শুনে আমার আনন্দ হলো। শাহ আজিজকে আমি '৪২-৪৩ সাল থেকে দেখেছি। '৪৬ সালে আমার মনে হয়, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজিতে। অবশ্য এর আগে আলীগড়ও হয়ে এসেছেন। তুখোড় বক্তা ছিলেন : ইংরেজি, বাংলা ও উর্দুতে। অবশ্য কারুর মধ্যে এতে বেশি দক্ষতা থাকলে স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে অহমিকা আর দক্ষতার সুবিধাজনক ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি প্রবণতারও প্রকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে শাহ সাহেব কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন বলে আমার স্মৃতিতে তেমন কোনো ঘটনা নেই। শাহ সাহেবের সঙ্গে বহুদিন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটে নি। সাম্প্রতিককালে তিনি 'রাজপুরুষ' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সরকারি নেতার স্থানেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ এমন হলে তখনি আমার বেশি করে সঙ্কোচ জাগে। ব্যবধানটা তখনি বৃদ্ধি পায়। অথচ এটা ঠিক যে চল্লিশের দশকের ঢাকার কর্মকাণ্ডে, এর প্রতি-ধারার অন্যতম নেতা হিসেবে শাহ আজিজুর রহমানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো।

দাঙ্গার শহর ঢাকা। একথা ঠিক। 'ক্রনিক' দাঙ্গা। তবু তো ঢাকা থেকে পালালাম না কোথাও। এমন মনে পড়ে না, ঢাকাতে দাঙ্গা লেগেছে এবং সে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে হোস্টেল থেকে গাঁটরি-বোচকা বেঁধে ঢাকা ত্যাগ করে নিজ বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছি। না, তেমন কোনোদিন হয় নি। ঢাকার দাঙ্গা আমাদের সেকালের ম্যালেরিয়ার মতো আমরা সহ্য করেছি। তা নিয়ে জীবনযাপন করেছি। মহামারী আকারে ঢাকায় কখনো দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েনি। গণহত্যা ঘটে নি। দাঙ্গা বাধলে তার শিকার অবশ্য নিরীহ পথচারীরা হয়েছে। যারা গ্রাম থেকে হঠাৎ শহরে এসেছে। কোন্‌টা প্রধানত হিন্দুপাড়া, কোনটা মুসলমান পাড়া, তা যার জানা নেই। ঢাকার মানুষ দাঙ্গায় নিহত হয়ত কমই হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে মহররম বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে। কিংবা ভারতের অপর কোথাও কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় যদি কেউ নিহত হয়েছে তবেই বুঝতাম দাঙ্গা বেধেছে। দাঙ্গার এমন সংবাদে শহরটা বিভিন্ন জায়গাতে দুভাগে আপসে ভাগ হয়ে যেত। যেমন ধরা যাক, ঢাকার মধ্যকার মূল সড়ক নওয়াবপুরের কথা। ঢাকা রেল স্টেশন থেকে নওয়াবপুর ছিল হিন্দু এলাকা। কিন্তু নওয়াবপুর রোড যেই রায় সাহেবের বাজারের পুল পৌঁছত, অমনি শুরু হত মুসলিম এলাকা। সদরঘাট থেকে তখন আমি মুসলমান যদি রমনা আসতে চাইতাম তবে রায় সাহেবের বাজার পর্যন্ত এসে ঘোড়ার গাড়ির 'খেয়া' ধরতাম। ইংলিশ রোড আর নাজিমুদ্দীন রোড বরাবর এই খেয়া চলত। যেন মাঝখানে একটা নদী বা খাল বিশেষ। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা শেয়ারে যাত্রী নিয়ে ইংলিশ রোডের বিপজ্জনক এলাকা পার করে ফুলবাড়িয়া-নাজিমুদ্দীন রোডে আমাদের পৌঁছে দিত।

দাঙ্গার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি দেখা দিত ঢাকার বিখ্যাত দুটি পর্বের সময়ে। এদের একটি ছিল জন্মাষ্টমীর মিছিল। 'জন্মাষ্টমী' মানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন : ভাদ্র মাসে পর্বটি অনুষ্ঠিত হত। হিন্দু সম্প্রদায়ের। আর একটি ছিল মহররমের মিছিল। হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর মিছিলের উদ্যোগ নিত হিন্দু মধ্যবিত্ত তরুণরা এবং শাঁখারী পট্টি বা নওয়াবপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা। এই মিছিল হয়ত শুরু হতো সদরঘাট বা তারও পূর্বের লালকুঠি, লোহারপুল ইত্যাদি এলাকা থেকে। বহু চলন্ত মঞ্চে নানা রঙ্গ-তামাশা মঞ্চস্থ হতো। এই সব চলন্ত মঞ্চ আস্তে আস্তে অগ্রসর হত নওয়াবপুর রোডের মধ্য দিয়ে। দুপাশে রাস্তায় এবং বাড়ির বারান্দা ও ছাদে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মিছিল দেখত। দূর-দূর গ্রাম থেকে শিশু কিশোর বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আসত। জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখা একটা পুণ্যের কাজ বলে তারা মনে করত। মহররমের মিছিলও তাই। তাজিয়া বেরুত। 'হায় হাসান, হায় হোসেন' করে শোক মিছিল বেরুত। আজকাল জন্মাষ্টমীর মিছিল একেবারে বিলুপ্ত। মহররমের মিছিলেও সেই শান আছে বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে দুটো জিনিস আমার স্মৃতিতে ভাসে। একটি হচ্ছে, চল্লিশের দশকের মধ্যভাগে এই দুটি মিছিলের উপলক্ষ এলেই আমরা অর্থাৎ বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহল উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতাম, পাছে না এই উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে যায় এবং যাতে তা না বাধে তার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠিত হত। এমন কমিটি গঠনের মূল উদ্যোগ আসত সেদিনকার ঢাকার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে। তারাই গায়ে পড়ে, উদ্যোগ নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের যৌথ মিটিং করতেন। এমন মিটিং অনেক সময়ে নওয়াব বাড়িতে কিংবা ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ঢাকা বিভাগের কমিশনারের অফিসেও অনুষ্ঠিত হত। যখন উত্তেজনা বেড়ে যেত তখন শান্তি কমিটি এবং সরকারি প্রশাসন উভয়ই যৌথভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে কিভাবে শান্তি রক্ষা করা যায়। নওয়াবপুর পুল যেন ছিল 'দুই দেশের' মধ্যকার সীমান্ত। সরকারি ফৌজ নওয়াবপুর পুলের ওপর একদল উত্তরমুখো অর্থাৎ হিন্দু এলাকার দিকে আর একদল দক্ষিণমুখো অর্থাৎ মুসলিম এলাকার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে পাহারা দিয়েছে। এমন দৃশ্য চোখ বুঝলে আমি এখনো দেখতে পাই।

ঠিকই, উত্তেজনা রাজনৈতিক কারণে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ধর্মীয় মিছিল ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করছিলো। জন্মাষ্টমীর চলন্ত রঙ্গমঞ্চে হয়ত বা জিন্নাহ সাহেবকে নিয়ে কৌতুক করা হচ্ছে কিংবা অপর কোনো রাজনৈতিক ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। তারই পাল্টা মহররমের সময়ে মহররমের মিছিলে মুসলিম লীগ অর্থাৎ মুসলমানদের প্রধান রাজনৈতিক ধারা যে-সব নেতাকে হেয় করতে চাইত তাদের মূর্তি বা কুশপুত্তলিকা দাঁড় করিয়ে মঞ্চ তৈরি করে তা চালিয়ে নিত। জিন্নাহ সাহেবকে যেমন হিন্দু সমাজ পছন্দ করতো না, তেমনি মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক গোঁড়াপন্থীগণ কংগ্রেসের অন্যতম মুসলিম নেতা মওলানা আজাদকে পছন্দ করত না। তারা তাঁকে মনে করত কওমের বিশ্বাসঘাতক বা 'গাদ্দার' বলে। আর তাই মহররমের মিছিলে চলন্ত মঞ্চে তাঁকে বিচার করার একটি ব্যঙ্গ অনুষ্ঠানের কথা আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠছে।

এসবই ছিল রাজনৈতিক দাহ্য পদার্থ। আর তাই চল্লিশের দশকের গোড়াতে ঢাকাতে এই দুটি মিছিল দেখার যদি আগ্রহ ছিল আমার মনে, পরবর্তীকালে একজন সচেতন কর্মী হিসেবে এই দুটি মিছিলের সময় হলেই উদ্বেগে আশঙ্কায় মন ভরে উঠত।

যে শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টার কথা বলেছি তা সেদিন হয়তো ভয়ানক কিছু ছিল না। এ সব সত্ত্বেও বিছিন্নভাবে ঘটনা যে না ঘটেছে, তা নয়। তবু জন্মাষ্টমী আর মহররমে যে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটত ঢাকায়, তাতে অশুভ শক্তির বাইরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং সহনশীলতা এবং আনন্দভোগের মনোভাবটি প্রধান না হলে ১৯৪৬-এর আগস্টে কলকাতায় যা ঘটেছে তা ঢাকায় প্রতিবছর অন্তত দুবার করে ঘটতে পারতো। তেমন যে ঘটে নি, তার কারণ নিয়ে আমাদের তরুণ গবেষকদের কি একটু গবেষণা করা উচিত নয়? এই প্রসঙ্গে দাঙ্গার ক্ষেত্রেও ঢাকার স্থানীয় অধিবাসীদের রসবোধের যে বৈশিষ্ট্য এককালে সুপরিচিত ছিলো, তার উল্লেখ করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগামসিহ্ লেন মুসলমান পাড়া। বেচারাম দেউড়ী হিন্দুপাড়া। দাঙ্গা চলছে। দাঙ্গার আবহাওয়া। দাঙ্গা কেবল ছুরি দিয়ে হয় না। আগামসিহর ইট পড়ছে বেচারাম দেউড়ীর টিনের চালে। বেচারাম দেউড়ীর ইট আগামসিহতে। বিরামহীনভাবে ইটের উত্তর প্রত্যুত্তর চলতে চলতে রাত দশটা পার হয়েছে। ঘুমের সময় এসে গেছে। তখন আগামসিহ ঢাকাইয়া ভাষায় ঢাক দিয়ে বলছে : আবে, আইজ আর থাউককা, ঘুমা। আবার কাইলকা ছুরু করিছ।' বেচারাম দেউড়ী জবাব দিচ্ছে : ঠিক আছে।...

অগ্রজপ্রতিমকে স্মরণ করি

প্রয়াত অধ্যাপক এ কে নাজমুল করিমের লেখা 'ফাল্গুনকরা'। কিন্তু নাজমুল করিম লেখক হিসেবে স্পষ্টভাবে নিজের নাম ব্যবহার করেন নি। লেখকের নাম লিখেছেন, 'ইবনে রশিদ', অর্থাৎ 'রশীদের পুত্র'। নাজমুল করিমের পিতা ছিলেন শিক্ষাবিদ আবদুর রশিদ। কুমিল্লা জেলার মানুষ। নাজমুল করিম তাঁর বাবা, মা, দাদা, নানা, পূর্ব-পুরুষদের জীবনের, তাদের সময়কার সমাজের ঘটনা, কাহিনী, কিংবদন্তি, সংস্কার—এই বইতে বর্ণনা করেছেন তৃতীয় পুরুষ হিসেবে। এর মধ্যে ভেসে উঠেছে পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের একটি মুসলিম পরিবারের ক্রমবিকাশের কাহিনী। লেখকের লেখার ধরনটি প্রাঞ্জল। কথা ছোট ছোট সহজ বাক্যে আবদ্ধ। তাঁর বিবৃত কাহিনীতে উনিশের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকের গ্রামীণ সমাজচিত্রেরও আভাস পাওয়া যায়।

এই 'ফাল্গুনকরা'র প্রকাশকাল দেখা যায় ১৯৫৮ সন। নাজমুল করিমের একটি সমাজতাত্ত্বিক তথা সমাজের বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর 'ফাল্গুনকরা' বইতে বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যদি তাঁর জীবনের পরবর্তীকালের কর্মকাণ্ড এবং তার ফলের কথা বাংলাতে প্রকাশ করতেন, তাহলে বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান প্রভূতভাবে উপকৃত হত। নাজমুল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মহাবিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য একজন মিশনারির ঐকান্তিকতা, উদ্যোগ ও পরিশ্রম নিয়ে কাজ করেছেন। এজন্য বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের অগণিত ছাত্র-শিক্ষক তাঁর গুণমুগ্ধ এবং ভক্ত। তাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

নাজমুল করিমের সঙ্গে আমার নিজের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক। নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই অসময়ে এবং আকস্মিকভাবে তাঁকে তাঁর জীবনের প্রিয় প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপ্রবাহকে পরিত্যাগ করে যেতে হয়েছে। 'ফাল্গুনকরা'-তে যে জ্যেষ্ঠ ভাই সম্পর্কে তিনি এত বিস্তারিত লিখেছেন এবং নিজেকে নেপথ্যে রেখেছেন, তিনি শুনেছি আজো সৌভাগ্যবশত জীবিত এবং কর্মক্ষম রয়েছেন। এটি নাজমুল করিমের পরিবারবর্গের নিকট যেমন আনন্দের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি নাজমুল করিম, যিনি তাঁর পরিবারের অন্যতম গর্ব এবং গরৌবের পাত্র তাঁর এই অকাল বিয়োগ তাঁদের নিকট এক দুঃসহ আঘাত স্বরূপ।

নাজমুল করিমকে স্মরণ করতে চাইলে আমার নিজের মন চলে যায় দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর আগের কালে। সে সময়টা আমার যেমন কিশোরকাল, তেমনি নাজমুল কমিরেও তরুণকাল। ১৯৪০-৪১ সাল আজকের চুরাশি সাল থেকে চুয়াল্লিশ বছর পেছনের কাল। মহাকালের পরিমাপে এটি ক্ষণকালও নয়। তথাপি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এই সময়টাতেই আমাদের দেশ ও সমাজের এত বিচিত্র পরিবর্তন ক্ষতে দ্রুত সংঘটিত হয়েছে যে চুরাশি থেকে পেছন ফিরে তাকালে সেই চল্লিশের ঢাকার পরিবেশ ও জীবনকে এক ছায়াঘেরা, নির্দ্বন্দ্ব রোমান্টিক জীবনের যুগ বলে মনে হয়।

আমি নিজে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বরিশাল থেকে এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৪০-এর মধ্যভাগে। ঢাকা কলেজ তখন ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের চিহ্নধারক কার্জন হলের অপর পারে লাটভবনে স্থাপিত। কেবল যে আমি, তা নয়। সেদিন যে পূর্ববঙ্গের মুসলিম কৃষক বা মধ্যবিত্ত সমাজের কিশোর ও তরুণরা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ঢাকায় আসতে শুরু করেছিলো এবং এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের প্রাসাদোপম ভবনরাজিতে প্রবেশ করছিলো, এ ঘটনাও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের এক স্মারক।

ঢাকা কলেজে আমি নাজমুল করিমের সাক্ষাৎ পাই নি। কিন্তু তাঁর ছোট ভাই লুৎফুল করিমের আমি সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। আমুদে মানুষ লুৎফুল করিম ছিল আমার সহপাঠী। ঢাকা কলেজের হোস্টেল তথা তার ছাত্রদের আবাসিক ভবন, বর্তমানে ফজলুল হক হলে, লুৎফুল করিমসহ আমাদের সমদৃষ্টি এবং মেজাজের একটি কিশোর দল গড়ে উঠেছিলো। এরা এক সাথে উঠত, বসত, জোট করে বই পড়ত, সাহিত্যের মিটিং করত, হাতে লেখা সাহিত্যপত্র প্রকাশ করত। এদের মধ্যে ছিল আবুল কাসেম, নাসিরউদ্দিন আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল মতিন, এ এইচ এম কামালউদ্দিন। এঁরা সকলেই পরবর্তী জীবনে শিক্ষা, প্রশাসন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে নিজ নিজ অবস্থানে প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু সেদিনের কথা স্মরণ করলে আজকের সমস্যাপীড়িত আমাদের কোনো মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। ভেসে ওঠে সেদিনের জীবনোচ্ছল কয়েকটি তরুণের মুখ।

নাজমুল করিম তখন হয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স ক্লাসের ছাত্র। তিনি থাকতেন আজকের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভবন এবং সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের দোতলার একটা দিকে। সেই ভবনেই তখন ফজলুল হক হল ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

কেমন করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো, তা আজ স্মরণে নেই। কিন্তু ১৯৪২ সনে আই.এ পাস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পূর্বে যে ঘটনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা স্নেহ-শ্রদ্ধা এবং হৃদ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম, সে ঘটনা বিস্মৃত হই নি। বলা চলে সে এক রাজনৈতিক ঘটনা।

নিস্তরঙ্গ ঢাকার বুকেও তখন ছোটবড় ঢেউ জাগতে শুরু করেছিলো। ১৯৪০ সনে ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে তীব্র হয়ে উঠছিলো। তার ঢেউ ঢাকার ছাত্রদের মধ্যে প্রধানত এসে আঘাত করতো কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির হিন্দু তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। তারা ধর্মঘট আহ্বান করত। মিছিল বের করত। তারাই পুলিশের লাঠি-পেটা খেত। মুসলমান ছাত্ররা তার যে বিরোধিতা করত, তা নয়। কিন্তু গভীরভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে সেই দৈনন্দিন আন্দোলনে যে তারা জড়িত হতো না, সে কথাও সত্য। কিন্তু সাধারণভাবে কিংবা সামগ্রিকভাবে মুসলিম ছাত্ররা এতে জড়িত না হলেও ইংরেজ সরকার বিরোধী এরূপ জঙ্গি ছাত্র আন্দোলন মুসলমান সমাজের ছাত্রদের মধ্যে কারো কারো মনকে যে আলোড়িত করে তুলত না, তাদের মনেও যে প্রশ্নের উদ্রেক করত না, এমনও নয়। এরই প্রভাবে সেখালে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেও, ক্ষুদ্র হলেও, একটা জাতীয়তাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি হতে থাকে।

১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মুসলিম লীগ সম্মেলনে গৃহীত হওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবে ঢাকার মুসলমান ছাত্রসমাজ সেই আন্দোলনের আকর্ষণে আলোড়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু '৪২-৪৩ সালে মুসলমান সমাজের রাজনীতিও অখণ্ড ছিল না। মুসলিম লীগের নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধের ফলে বাংলাদেশের কৃষক ও মধ্যবিত্ত সমাজের অবিসংবাদিত নেতা এ.কে. ফজলুল হক আইন পরিষদে ভিন্ন দল গঠন করেছেন এবং আইন পরিষদে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্ত্রিপরিষদও গঠন করেছেন। হক সাহেবের সঙ্গে রয়েছে ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ। মুসলিম সমাজের এই বিভেদে ক্ষুব্ধ হয়ে লীগপন্থী ছাত্র এবং তরুণরা নিন্দাসূচক ভাষায় এই মন্ত্রিসভাকে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা বলে অভিহিত করছে। এমনি অবস্থায় হক সাহেবের ঢাকা আসার কথা ঘোষিত হলো। নবাব হাবিবুল্লাহর তখন ঢাকার বাইরে না হলেও ঢাকার স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা। কেননা তিনি ঢাকার নবাব। আর ঢাকার নবাব তখনো ঢাকার মুসলমানদের সমাজ-নমাজের প্রধান পুরুষ। কিন্তু সে প্রভাব রেল লাইনের দক্ষিণ পারেই সীমাবদ্ধ। ঢাকার রেললাইন ছিল সেদিন মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে, অন্তত নতুন পুরাতনের বিভক্তি লাইন। রেললাইনের উত্তর পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আর তার ছাত্রাবাস সলিমুল্লাহ এবং ফজলুল হক হলে অবস্থান করে মুসলমান ছাত্রবৃন্দ। এদের সকলেই, বলা চলে, অ-ঢাকাবাসী তথা বহিরাগত।

কিন্তু যে কারণে একথার উত্থাপন সেটি হচ্ছে এই যে নতুন পুরানের দ্বন্দ্ব যে সর্বদা সহজভাবে প্রকাশ পেত, তা নয়। নতুন ঢাকার সকল মুসলমান ছাত্রই যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন মুসলিম লীগ এবং মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্বে চলত, এমন নয়। তারই প্রকাশ ঘটলো '৪২-এর গোড়ার দিকে, হক সাহেবের ঢাকা আগমনকে কেন্দ্র করে।

হক সাহেব ঢাকা আসবেন। সবেমাত্র তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। কাজেই ঢাকার অধিবাসীদের তরফ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন হলো। এই সংবর্ধনা নিয়েই ঢাকার মুসলিম ছাত্রসমাজ যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। এক দল অভিহিত হলো প্রো-হক বা হক সমর্থক বলে, অপর দল এ্যান্টি হক বা হক-বিরোধী বলে।

ফজলুল হক হলে নিশ্চয়ই প্রো-হকদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন এ.কে. নাজমুল করিম। নাজমুল করিম তাঁর কলেজ জীবন থেকেই কলেজের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন, আলোচনা, বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর অনুরক্ত একটি দল স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়েছিলো। এ দলটির বৈশিষ্ট্য ছিল, এ দলের ছাত্ররা চিন্তা এবং বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, মতবাদে সমাজতাত্ত্বিক, অসাম্প্রদায়িক এবং খানিকটা সমাজবাদীও। সংবর্ধনা নিয়ে ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে প্রো-হক ও এ্যান্টি হকদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটেছিলো। প্রো-হকদের প্রধান জমায়েত ছিলো ঢাকার স্থানীয় অধিবাসী, যারা 'কুট্টি' নামে সাধারণত অভিহিত হতেন এবং এ কারণে স্টেশনে প্রো-হক পক্ষই ছিল প্রধান এবং এ্যান্টি হক ছাত্ররা হয়েছিলো পরাজিত। কিন্তু পর্যুদস্ত দল অর্থাৎ মুসলিম ছাত্রাবাসের রাজনৈতিক ছাত্রদের অধিকাংশের দল প্রতিশোধ নিল হলে ফিরে এসে প্রোহকদের ওপরে। নাজমুল করিমের বিছানাপত্র তারা তছনছ করল, ফেলে দিল উপর থেকে নিচে। ফজলুল হক হলের এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমার নিজের জানা নেই। কিন্তু ঢাকা কলেজের হোস্টেলের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যেও যে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া পড়েছিলো তা আমি সাক্ষাৎভাবেই জেনেছিলাম। কলেজ ছাত্রাবাসের আমার 'দলটি'ও ঘটনাক্রমে প্রো-হক বলে বাকি ছাত্রদের দ্বারা অভিহিত হলো এবং এই ছাত্রাবাসের মুসলিম লীগপন্থী ক্ষুব্ধ ছাত্ররা স্টেশন থেকে ফিরে এসে আমাদের ওপরও রূঢ় আচরণে আঘাত হানার চেষ্টা করল। আমাদের মধ্যে নাজমুল করিমের অনুজ লুৎফুল করিম ছিলো অধিক পরিমাণে খোলামুখ। খাওয়ার ঘরে যাওয়ার সময়ে আক্রমণ হলো তার ওপর। দৈহিকভাবে আঘাত আমার ওপর না এলও হোস্টেলের পরিবেশ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বেশ গরম এবং পড়াশোনার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াল। এমনি অবস্থাতে হোস্টেল ছেড়ে আমি বরিশালে নলছিটি শহরে আমার চাকরিরত বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে আই.এ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। এ ঘটনা স্মরণে পড়ছে এই জন্য যে মাস দুই পরে আই.এ পরীক্ষা দিয়ে আবার বরিশাল গিয়ে অপেক্ষা করছি পরীক্ষার ফলের জন্য। তখন একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে নাজমুল করিমই আমার ভাইয়ের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে আনন্দের সঙ্গে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আমি ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোর্ডের পরীক্ষাতে আই.এ-তে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছি, এতে আমার চাইতে তাঁরই আনন্দ এবং গর্ব ছিলো বেশি।

এর পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাজমুল করিমের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছিলাম। ইউনিভার্সিটিতেও নাজমুল করিমকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গ্রুপ তৈরি হয়েছিলো। এরা যে কেবল মুসলিম ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ছিল তা নয়। নাজমুল করিমের সহপাঠী ছিলেন রবি গুহ। তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী এবং কমিউনিস্ট। তাঁদের মতাবলম্বী ছাত্রদলের নাম ছিল ছাত্র ফেডারেশন। রবি গুহ এবং তাঁর অপর বন্ধুরা, যাদের মধ্যে ছিলেন মদন বসাক, অনিল বসাক, দেবপ্রসাদ মুখার্জি এবং হেসামুদ্দিন আহমদ—এঁরা সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট কর্মী। '৪২ কিংবা '৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিলো, যাতে প্রাণ হারিয়েছিলো মুসলিম ছাত্রনেতা নাজির আহমদ, সে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন নাজমুল করিম, হেসামুদ্দিন (বাহাদুর), রবি গুহ এবং তাঁর অপর বন্ধুরা। এবং দাঙ্গাবিরোধী মনোভাবের কারণে তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ছাত্রদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিতও হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রগতিশীল ও সমাজতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন গ্রুপের সঙ্গে পরবর্তীকালে এসে যুক্ত হয়েছিলো মুনীর চৌধুরী। মুনীর চৌধুরী ক্রমান্বয়ে তার বাকশৈলী, তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি এবং পরিহাসপ্রিয়তায় সেদিনকার ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রমণি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

www.amarboi.com

আমি নিজে ছিলাম দর্শন বিভাগের ছাত্র। কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ত অধিকতর তৈরি হয়েছিলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেরই ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে। নাজমুল করিম, রবি গুহ, দেবপ্রসাদ মুখার্জি—এঁরা ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ডি.এন ব্যানার্জি, এ.কে. সেন এবং আবদুর রাজ্জাক—এঁরা ছিলেন যেমন নাজমুল করিম, রবি গুহের প্রিয় শিক্ষক, তেমনি আমারও। বস্তুত নাজমুল করিম-রবি গুহের মাধ্যমেই আমি পরিচিত হয়েছিলাম এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সঙ্গে। আমার অনার্সের অনুষঙ্গী বিষয়েরও একটি ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। নাজমুল করিম তাঁর পরবর্তী জীবনের শিক্ষকতা ও গবেষণার জীবনে এঁদের কথা, বিশেষ করে অজিতকুমার সেনের কথা, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। নিজের একখানি গ্রন্থের উপক্রমণিকাতে বলেছেন : 'আমার সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার অনুপ্রেরণাদাতা হচ্ছেন অজিতকুমার সেন।' অজিত সেন যথার্থই একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন। আচার-আচরণে তিনি ছিলেন অভিজাত। শুভ্র ধুতি এবং পাঞ্জাবি ছাড়া অপর কোনো পরিধানে তাঁকে কখনো দেখেছি, এমন কথা স্মরণ করতে পারিনে। কথা বলতেন ধীর উচ্চারণে এবং বাংলায়। কেবল যে ব্যক্তিগত আলাপে বাংলা ব্যবহার করতেন, তা নয়। ক্লাসে আলোচনা করতেন বাংলায়। আমাদের টিউটোরিয়াল খাতা সংশোধন করে তার পাশে মন্তব্য করতেন বাংলায় এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগে নিজের চাকরিগত ছুটি বা অন্য কোনো প্রয়োজনের বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সম্বোধন করে চিঠিপত্র রচনা করতেন বাংলায়। সুন্দর হস্তাক্ষরে তৈরি তাঁর সেসব মন্তব্য বা যোগাযোগপত্রে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। বরঞ্চ তাঁর নিজের আচার-আচারণের সরল ও সতেজ ভাবটি সেদিনকার ইংরেজি বচন-বাচন, পোশাক-আশাক পরিবেশকেই করত ব্যঙ্গ। নাজমুল করিম-রবি গুহের সঙ্গেই আমার যাতায়াত শুরু হয়েছিলো অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের বাসায়। সেকালে আমরা যে শ্রেণীকক্ষেই কেবল আমাদের শিক্ষকদের আলোচনা শুনতাম, তা নয়। সেদিনকার সেই রোমান্টিক পরিবেশকে যে উপাদানটি আরো গাঢ় এবং ঘন করে তুলতো তা শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক নৈকট্য ও সাহচর্য। ব্যাপারটি হয়ত ব্যাপকভাবে ঘটতো না। কিন্তু বুদ্ধিমান, লেখাপড়ার আগ্রহী ছাত্রদের জন্য খ্যাতিমান শিক্ষকদের কেবল দরজা নয়, তাঁদের বাসগৃহের কক্ষও ছিলো অবারিত। অনার্স এবং এম.এ-তে ছাত্রসংখ্যা অবশ্য তখনো কম ছিল। এবং এদের মধ্যে যারা মেধাবী ছিল তারা জ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সময়-অসময় নির্বিশেষে চলে যেত শিক্ষকদের রমনার নীলক্ষেতের সড়কের এপাশের-ওপাশের ভবনগুলোতে। আমার নিজের অনার্সের শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্য যেমন ছিলেন দর্শন বিভাগের প্রধান, তেমনি ছিলেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ। নিজে থাকতেন যে ভবনটিতে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের রাস্তার বিপরীতে, সেটি আজ বিলুপ্ত। তার জায়গাতে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের বহুতল আবাসিক ভবন। কিন্তু সেদিন হরিদাস বাবুর ভবনের সামনে ছিল একটি পুকুরও। এবং তাতে ছিলো বাঁধানো ঘাট। তাঁর এই ভবনটিতে তিনি আমাদের ডেকে নিতেন অনেক সময়ে ক্লাসের অসমাপ্ত আলোচনা সমাপ্ত করার জন্য। বলতেন, চলো বাসায় যেতে যেতে কথা বলি। কিংবা বলতেন, কাল সকালে এসো বাসায়। তখন আলোচনাটা শেষ করে দেবো। রাজ্জাক স্যারের বাসার ছিলো ভিন্ন আকর্ষণ। আপ্যায়ন তো বটেই। সহৃদয়, সমৃদ্ধ আপ্যায়ন। ছুটির দিনে সকাল না হতেই আমাদের মনে একটা টান উঠত। হয়ত নাজমুল করিম বলতেন, তাঁর স্মিত মুখে, কি সরদার যাবেন নাকি আজ রাজ্জাক স্যারের বাসায়? এমন আহ্বানে না বলার কোনো ব্যাপার থাকত না। রাজ্জাক স্যার নিজে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতেন, তা নয়। কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করতে আমাদের ভালো লাগত। প্রশ্ন করলেই তিনি আনন্দিত হতেন এবং যে-কোনো বিষয়ে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের কেবল যে দরাজ মনে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা দ্বারা সাহায্য করতেন, তাই নয়, তাঁর নিজের গ্রন্থ-সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থেকে অকৃপণভাবে বই দিয়ে তাঁর ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। এমন যাতায়াতের কথায় স্মৃতিতে এখনো ভেসে ওঠে তাঁর জেলখানার দিকে যাওয়ার রাস্তার পূর্বপাশের একটি ছোট ঘরের দৃশ্য। একখানি তক্তপোশে নামমাত্র চাদর বালিশ তাঁর শয্যা। কাঠের চৌকিখানার কোনো একটি পা হয়তো-বা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঘরে আর যা কিছুর অভাব থাকুক, রাজ্জাক স্যারের ঘরে বইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো অভাব ছিল না। এমন পরিবেশেই তৈরি হয়েছিলেন নাজমুল করিম। তৈরি হয়ে উঠেছিলাম সেদিন আমরা।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢাকা হল আর জগন্নাথ হলের ছাত্ররাই তাদের বার্ষিক পত্রিকার নাম দিত বাংলা 'শতদল' আর 'বাসন্তিকা'। এবং তাদের তৈরিও করত সাহিত্য পত্রিকার সম্ভার ও সৌকর্য দিয়ে। তুলনাতে মুসলিম ছাত্রাবাস দুটির বার্ষিক পত্রিকার চেহারা ছিলো দো-আঁশলা তথা দোভাষী। এ মাথায় বাংলা তো, ও মাথায় ইংরেজি। তাছাড়া আকারে প্রকারে তাদের মনে হতো চপল এবং সামান্য। এই ট্রাডিশনে ভাঙন ধরাবারও চেষ্টা করেছিলাম আমরা, মানে নাজমুল করিম ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। আমরা ফজলুল হক হলের বার্ষিকীর নামকরণ করেছিলাম কেবল হল বার্ষিকী বা হল এ্যানুয়ালের পরিবর্তে 'কলাপী'। ইংরেজিতে কোনো রচনা গ্রহণ করা হয় নি এতে। বাংলাতে যাঁদের লেখা ছিলো তাতে, আমার নিজের একটি লেখা ছাড়া, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আহমদ শরীফ, মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, সানাউল হক, নাজমুল করিম, সৈয়দ নুরুদ্দিন, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, সেরাজুন নূর, মনিরউদ্দিন ইউসুফ, আলীম আল রাজি, আবদুস শুকুর—এঁরা। এঁদের বাংলা রচনায় 'কলাপীর' প্রথম সংখ্যাটিই হয়ে উঠেছিলো সেদিনকার মুসলিম ছাত্রদের সাংস্কৃতিক পরিবেশে এক ব্যতিক্রম সৃষ্টিকারী প্রকাশনা। যথার্থই ব্যতিক্রমী। কারণ আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে চলে আসার পরে সাহিত্যিক এই উদ্যোগের অনুসরণে 'কলাপী'র দ্বিতীয় সংখ্যাও আর প্রকাশিত হয় নি। কেবল হলের এই উদ্যোগ নয়। নাজমুল করিম, আহমদুল কবির, সানাউল হক, এ.কে.এম. আহসান—উচ্চতর ক্লাসের অন্য প্রগতিশীল ছাত্রদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মুখপত্ররূপে সেদিন অর্থাৎ '৪৪ কিংবা '৪৫ সালে যে সাহিত্যপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিলো সেটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্র হিসেবে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির রাজধানী কলকাতার প্রগতিশীল সাহিত্যিক মহলে রীতিমতো বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলো।

হয়ত বা এই সাহিত্যপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিলো নাজমুল করিমের সেই লেখাটি যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'ভূগোল ও ভগবান'। সেই লেখাটিতেই প্রকাশ পেয়েছিলো নাজমুল করিমের সমাজ বিশ্লেষণমূলক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টভঙ্গিটি। প্রবন্ধটি হয়ত বা তাঁর পারিবারিক বইপত্রের মধ্যে আজো পাওয়া যাবে। অন্যত্র পাওয়া যায় নি। আমি উদ্ধার করতে পারি নি। কিন্তু পারিবারিক সূত্রে পাওয়া গেলে, লেখাটি পুনর্বার মুদ্রণের উপযুক্ত। লেখাটি যে দীর্ঘ ছিল, এমন নয়। কিন্তু লেখাটির পরিবেশনায় সাবলীলতা এবং রসবোধের পরিচয় ছিল। তাছাড়া তার প্রতিপাদ্যটি ছিলো সমাজতাত্ত্বিক। লেখার গোড়াতেই প্রশ্নটি ছিল, ভগবান ভূগোল সৃষ্টি করেছেন, না ভূগোল ভগবানকে সৃষ্টি করছে? নাজমূল করিম প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করলেন : দূর উত্তরের শীতের জগতের এস্কিমোদের দেশ লাপল্যান্ডের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প। খৃস্টান ধর্মপ্রচারকারী এক যাজক গিয়েছেন এস্কিমোদের মধ্যে খৃস্টানধর্ম প্রচারের জন্য। ধর্মের পিতার কাছে সরল, নিরীহ, শীতার্তদের নানা প্রশ্ন, ঈশ্বরের স্বর্গে কী কী দ্রব্য পাওয়া যায়? 'খুরমা, খেজুর, মেওয়া, বাদাম, পেস্তা, শরবত : এসব পাওয়া যাবে মৃত্যুর পরে স্বর্গে গেলে। এবং খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করলে স্বর্গে যাওয়া তোমাদের নিশ্চিতই ঘটবে।' ধর্মীয় পিতার এত ওয়াদাতেও শীতার্ত এস্কিমোদের মন ভরে না। তবু তাদের প্রশ্ন থাকে, ঈশ্বরের স্বর্গে অপর যা কিছুই পাওয়া যাক না যাক, তাদের প্রিয় সীল মাছকে পাওয়া যাবে কি না? নাজমুল করিম এ গল্প নিশ্চয়ই শুনেছেন তাঁর প্রিয় অধ্যাপক অজিতকুমার সেনের কাছ থেকে। অজিতকুমার সেন তাঁর প্রিয় ছাত্রদের শুনিয়েছেন সমাজতাত্ত্বিক সেই গ্রন্থের কথা যেখানে উদ্ধৃত আছে সমাজতত্ত্বের এমন তাৎপর্যপূর্ণ সব গল্প। নাজমুল করিম তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, ধর্ম প্রচারক খ্রিষ্টীয় পাদ্রী এস্কিমোদের আর সব প্রশ্নের জবাব ঠিকই দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বর্গে সীল মাছ পাওয়া যাবে, এমন নিশ্চিত জবাব তিনি সরল এস্কিমোদের দিতে পারেন নি। এস্কিমোদের জন্যও তাই এমন ধর্মের আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে নি। কারণ, যে স্বর্গে সীল মাছ নেই, সে স্বর্গ দিয়ে এস্কিমোরা কী করবে। নিবন্ধের বক্তব্য তাই, ভুগোলই ভগবানকে তৈরি করেছে। তাই কোনো এলাকার স্বর্গে ঠাণ্ডা শরবতের নহর প্রবাহিত হয়, কোনো এলাকার স্বর্গে সীল মাছ থাকার প্রশ্ন আসে।

আমাদের ফজলুল হক হলের ১৩৫১ তথা ১৯৪৪ সনের বার্ষিকীটির নামকরণ করেছিলাম আমরা 'কলাপী'। সে কথা আমি ওপরে বলেছি। এই সংখ্যায় নাজমুল করিমের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। লেখাটির নাম 'অবকাশ ও সভ্যতা'। নাজমুল করিম হয়ত তখন এম.এ ক্লাসের শেষ পর্বের ছাত্র। এই লেখাটিতে তরুণ নাজমুল করিমের সমাজবাদ সমর্থনকারী মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। ৪০ বছর আগের কথা। লেখাটিকে ৪০ বছর পরে আবার পাঠ করে আমার ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে, মানুষের যৌবনের সৃষ্টিই তার আবেগে, আন্তরিকতায় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নাজমুল করিমের প্রবীণ বয়সে এই লেখাটির কথা তাঁর নিজের মুখে আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। হয়ত লেখাটিকে জীবনের নানা টানাপোড়েনে এবং ঘটনা-দুর্ঘটনায় পোড়-খাওয়া অধ্যাপক নাজমুল করিম কিশোরকালের কাঁচা রচনা বলে গণ্য করেছেন। একে নিজের বলে আর গর্ব বা দাবি করেন নি হয়ত এমন আশঙ্কায়, পাছে এই ডান-বামের টানাটানি আর দ্বন্দ্বের যুগে তাঁকে কোনো জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আজ যদি নাজমুল করিমের দীর্ঘদিনের শিক্ষাদানের দীক্ষায় দীক্ষিত তরুণরা তাঁর গবেষণামূলক অপর রচনায় মুগ্ধ হন তবে তাঁদের যুবক নাজমুল করিমের এই রচনার কথাটিও জানতে হয়। লেখাটি নাজমুল করিম শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতি দিয়ে, 'রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে এসে বলেছেন, সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম ফসল ফলছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবকাশের ক্ষেত্রে।' এই সূচনা থেকে নাজমুল করিম তাঁর নাতিদীর্ঘ রচনাটিতে মানুষের সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি বর্ণনা করেছেন, কী করে মানুষ আদিম শিকার আর পশুচারণের যুগ থেকে শুরু করে কৃষি যুগের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে উৎপাদনের পদ্ধতি উন্নত করে করে ধনবাদী সমাজে এসে পৌঁছেছে। এককালে মানুষের যেখানে অন্নচিন্তা বাদে কোন প্রকার চিন্তার এবং সৃষ্টির অবকাশ ছিল না, সেখানে মানুষের হাতে আজ সৃষ্টির যেমন নানা উপাদান, তেমনি সৃষ্টির সেই উপাদান মানুষকে সমৃদ্ধি দিয়েছে, দিয়েছে অন্নচিন্তা বাদেও অন্যতর চিন্তা তথা শিল্প-সাহিত্য-সভ্যতা তৈরির অবকাশ। কিন্তু এখনো কি পৃথিবীর সর্বত্র সর্বমানুষের হাতে এসেছে অবকাশের সেই সুযোগ? ধনিক সমাজে এ অবকাশ ধনবানের হাতে। কিন্তু অবকাশভোগী এই ধনবান একেবারে শ্রম-বিচ্ছিন্ন। নাজমুল করিম আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, এই সনাতনী ধারার ব্যতিক্রম এসেছে মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে নতুনতম সমাজবস্থায়, তথা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায়।

'ফাল্গুনকরা'র পরে নাজমুল করিমের আত্মজীবনীমূলক আর কোনো রচনা প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁর নিজের বিবর্তন ও বিকাশ তথা তাঁর পরিবারের পরবর্তী বিকাশেও তিনি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। বিষয়টি তাঁর প্রিয় ছিল। নাজমুল করিম আমার অগ্রজপ্রতিম ছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি ফুলার রোডের তাঁর নিজ বাসা থেকে হেঁটে আমার বাসায় চলে আসতেন। এবং তখন আমরা বর্তমানের চাইতে অধিকতর আবেগে চলে যেতাম সেদিনকার অতীতে। নানা কথায় স্মরণ করতাম চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিনগুলোকে, যে দিনগুলোতেই পরবর্তীকালে বিকশিত গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার আন্দোলনের বীজ কিছু উপ্ত হয়েছিলো। নাজমুল করিম আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন একখানি পাণ্ডুলিপি। আমি দেখে তা ফেরত দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম সেই আত্মজীবনীমূলক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার। সে পাণ্ডুলিপির বর্তমান পরিস্থিতি আমি জানিনে। নাজমুল করিমের প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে 'চেঞ্জিং সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান' বিশেষ পরিচিত।

অগ্রজপ্রতিম নাজমুল করিমের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন ক্রিয়াকর্ম এবং বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয়ে আমি অজ্ঞ। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করি শিক্ষকতা নিয়ে, '৭১-এর পরবর্তী পর্যায়ে, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর নিজের প্রাতিষ্ঠানিক-সামাজিক অবস্থান ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অপর সকলে যে সবসময়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, কিংবা পছন্দ করেছেন, এমন নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এ. কে. নাজমুল করিম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানমূলক জ্ঞানচর্চার ও গবেষণার আগ্রহ এবং আবহ সৃষ্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্যোগী পুরুষ এবং পথিকৃৎ, এ বিষয়ে কারুরই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের সকল প্রয়াস, প্রকল্পে তাই নাজমুল করিম অনাগতদিনেও অনিবার্য এক স্মরণীয় নাম হয়ে বিরাজ করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৮৪

আমার শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাট বছরপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার অর্থাৎ ১৯৮১-তে কিছু কিছু অনুষ্ঠান হচ্ছে। কোনো কোনো উৎসব বা আলোচনার সঙ্গে 'হীরক জয়ন্তী' কথাটি যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টিকে তেমন অনুপ্রেরণাদায়ক করে তোলার চেষ্টা নজরে পড়ে না। কয়েক মাস আগে এ বছরটির উদ্বোধন করেছিলেন উপাচার্য ফজলুল হালিম চৌধুরী। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সংলগ্ন মাঠে। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ছাত্রাবাসগুলোর পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিলো। আকাশে পারাবত ওড়ানো হয়েছিলো। একটি গেট তৈরি করা হয়েছিলো। পতাকাগুলো এবং প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলরদের উৎকীর্ণ বাণীসহ ফেস্টুনগুলো রোদে-বৃষ্টিতে বিবর্ণ হয়ে আজো দণ্ডের ওপর উড়ছে। ছাত্রছাত্রী মহলে এর কোনো উৎসাহজনক প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট উদ্যোগ নিয়েছেন হলের ষাট বছর পূরণকে স্মরণ করার জন্য একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করার।

জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রভোস্টদের মধ্যে ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য ছিলেন অন্যতম। হরিদাসবাবু আমার সাক্ষাৎ এবং স্মরণীয় শিক্ষক। আমি দর্শন বিভাগ থেকেই বিএ এবং এমএ পাস করেছিলাম। সে কথা জেনেই জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট বন্ধুবর ডক্টর রঙ্গলাল সেন বারংবার অনুরোধ করেছিলেন হরিদাসবাবুর ওপর একটি প্রবন্ধ তৈরি করে দিতে। হরিদাসবাবু সেই আমলে ক্ষুদ্রায়তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন, তেমনি অখণ্ড ভারত-উপমহাদেশের বিদ্বজ্জনমধ্যে দার্শনিক এবং বাগ্মী হিসেবে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। সেদিন অন্যান্য বিভাগ যেমন, দর্শন বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ছিল কয়েকজনে মাত্র সীমাবদ্ধ। সেটা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। তার ফলেই এ রকম গুণী অধ্যাপকদের নৈকট্যে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত। কিন্তু হরিদাসবাবুর দার্শিনিক মতামত বা তাঁর জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করার মতো তথ্য এবং গ্রন্থ পাওয়া এখন দুষ্কর। তবু জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের অনুরোধটি আমাকে আকর্ষণ করেছিলো। হরিদাসবাবুর দর্শনের আলোচনা না হোক, তাঁর একটি আলেখ্য তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে খোঁজ করেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে তাঁর অধ্যাপনার চাকরিকালীন ব্যক্তিগত নথিটি পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেল অবশ্য, কিন্তু সবটা নয়। কেবল তাঁর ঢাকা আগমন থেকে ১৯৩৫ সন পর্যন্ত কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিদাসবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন ১৯৪৫ সন পর্যন্ত। তবু তাঁর ব্যক্তিগত নথির এই অংশটির চিঠিপত্র, আলাপ-আলোচনা ও তথ্যাদির ভিত্তিতে আমি একটি লেখা তৈরি করে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টকে দিয়েছি। তাঁরা সেটি হয়তো তাঁদের স্মারকগ্রন্থে প্রকাশ করবেন। লেখাটি সম্পর্কে দর্শন বিভাগের কয়েকজন সাথীকে বলেছিলাম। আশা করেছিলাম দর্শন বিভাগ যদি এই হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে 'দর্শন বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য'—এই নামে একটি আলোচনার আয়োজন করে, তাহলে সে সুযোগে দর্শন বিভাগের পুরাতন শিক্ষকদের কথা বিভাগের পুরাতন ছাত্ররা স্মরণ করতে পারবেন। তখন হরিদাস বাবু সম্পর্কেও আলাপ উঠবে এবং আমার না জানা আরো কিছু খবর আমি জানতে পারব। কিন্তু দেখলাম, দর্শন বিভাগ বিষয়টিতে তেমন আগ্রহ বোধ করছে না। কিন্তু বিভাগের অধ্যাপক জহুরুল হক সাহেব বিষয়টি, বিশেষ করে আমার প্রবন্ধটির ব্যাপারে বেশ আগ্রহ দেখালেন। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই সাহেবের বাসায় কয়েকদিন আগে এই প্রবন্ধটি শুনবার জন্য একটি ঘরোয়া আসরের আয়োজন করেছিলেন। হাই সাহেব খুবই সামাজিক এবং অতিথিপরায়ণ প্রতিবেশি। আমার ফ্ল্যাটের বিপরীত ফ্ল্যাটে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আছেন। জহুরুল হক সাহেব খবর দেওয়াতে প্রবীণ অধ্যাপক এবং ত্রিশের গোড়াতেই হরিদাসবাবুর ছাত্র দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ আসরটিতে এসেছিলেন। তাছাড়া ছিলেন দর্শন বিভাগের জহুরুল হক সাহেব ব্যতীত মিসেস আখতার ইমাম, অধ্যাপক আবদুল মতিন, হাসনা বেগম, কাজি নুরুল ইসলাম এবং জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক আবদুল বারি।

আমার প্রবন্ধটি সকলে বেশ আগ্রহ সহকারে শুনলেন। এবং কেবল একটি নথির ভিত্তিতে করা হলেও এটি যে একটি প্রয়োজনীয় কাজ হয়েছে, সেটা তাঁরা বললেন। উপস্থিত এঁদের মধ্যে আজরফ সাহেব, হাই সাহেব এবং মিসেস আখতার ইমাম হরিদাসবাবুকে সাক্ষাৎভাবে পেয়েছেন। এঁরা সকলেই তাঁর ছাত্রছাত্রী। আমি এজন্যই এঁদের কাছে প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনাতে চেয়েছি। এঁদের স্মৃতিচারণে লেখাটিকে আমি আর একটু ভালো করতে পারব। আজরফ সাহেবের বয়স প্রায় সত্তর হলেও তিনি দর্শন ও সাহিত্যচর্চাতে এখনো বেশ সক্রিয়। নানা সভা-সমিতিতে তিনি আলোচনা করেন এবং পত্রপত্রিকাতে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। হরিদাসবাবু সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস উক্তি এবং স্মৃতিচারণ আমাদের সকলকেই বেশ আনন্দ দিয়েছে। তিনি হরিদাসবাবুর আলোচনা ও বক্তৃতাদানের বেশ কিছু নমুনা এখনো হুবহু উদ্ধৃত করে শোনাতে পারেন। আমাদের শোনালেনও। আমার প্রবন্ধটিতে যেমন, এদিনের শ্রোতা এবং আলোচকদের স্মৃতিচারণেও তেমনি, হরিদাসবাবু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হলেও তিনি যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রীকে অকৃপণভাবে স্নেহ করতেন এবং জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে তিনি যে স্মরণীয়ভাবে উদার এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীদের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাগ্র ছিলেন, সেই চিত্রটিই প্রকাশ পেয়েছে। আজরফ সাহেব বললেন, 'একদিন আমি এবং আর এক সহপাঠী, দুজনে বাসায় গিয়ে বললাম, স্যার, হেগেলকে বুঝিনে। তিনি তখন ধুতি পরে, গলাবন্ধ কোট আর চাদর কাঁধে এবং লাঠি হাতে বেরুচ্ছেন আর এক অধ্যাপকের বাড়ি যাবেন বলে। সেই ত্রিশের দশকে শান্ত, ছায়াচ্ছন্ন নীলক্ষেতের পরিমণ্ডলে। কিন্তু সে অজুহাতে আমাদের ফিরিয়ে দিলেন না। বললেন, 'চলো, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আলাপ করি।' এবং রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তাঁর অনবদ্য ভাষায় যে আলাপ তিনি করলেন তা সেদিনকার কিশোর আমাদের মনে হেগেলের জটিরতাকে যেমন বিরাটভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছিলো, তেমনি আমাদের মনের ওপর একটা স্থায়ী ছাপও কেটে দিয়েছিলো। অধ্যাপক দেওয়ান মুহম্মদ আজরফের এ বর্ণনা যথার্থ। হরিদাসবাবুর এই বৈশিষ্ট্যটি আমার মনকেও সেদিন মুগ্ধ করেছিলো। দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের নানা কঠিন তত্ত্ব ভাষা ও ব্যাখ্যার গুণে তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাঞ্জল করে তুলতে পারতেন হরিদাস ভট্টাচার্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো তাঁর সেই সম্মোহনী বিনয়সূচক উক্তি, 'আরে, আমিও কি বুঝি এসব তত্ত্ব? এই, তোমাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করা, আর কি?' একদিকে রাশভারী ব্যক্তিত্বময় চরিত্র, আবার অন্যদিকে একেবারে আনুষ্ঠানিকতাবিহীন। ক্লাসে তাঁর কক্ষে তাঁর টেবিলের তিনপাশ ঘিরে আমরা বসেছি গুটিকতক ছাত্রছাত্রী। তিনি পড়াচ্ছেন, মানে আলোচনা করছেন। আলোচনা করতে করতে সময় ফুরিয়ে এল। অন্য কোনো ক্লাস বা কাজ রয়েছে হরিদাসবাবুর। তিনি তাই বললেন, 'এখন এ পর্যন্ত রইল। কাল সকালে এসো তোমরা, আমার বাসায়। তখন বাকিটুকু সেরে দেবো' এমনি করে সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে এই শিক্ষকবৃন্দ একেবারে সেই প্রাচীনকালের ভারতের আশ্রম-প্রায় করে তুলেছিলেন। সেদিনকার ক্রমাধিক পরিমাণে অসঙ্গতিপূর্ণ দেশ এবং সমাজে এও ছিল আর এক অসঙ্গতি। মাঝে-মাঝেই শহরে দাঙ্গা ঘটত। সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু তখনো আমার অধ্যয়নকালেও, চল্লিশের দশকে, সংখ্যায় হিন্দু ছাত্রছাত্রীই বেশি। মুসলমান ছাত্রী তো কুল্লে ডজন খানেক। রমনা নতুন শহর। রেললাইনের দক্ষিণ পাড়ে পুরনো শহর। রমনা যদি বা মুক্ত, কিছুটা উদার, ঢাকা রক্ষণশীল। মুসলমান ছাত্রী যারা ঢাকা থেকে আসত, তারা আসত বদ্ধ দরোজা—ঘোড়ারগাড়িতে। রেললাইন পেরুলেই মাত্র গাড়ির দরজা আর মাথার ঘোমটা ফেলে দিতে সাহস পেত। কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি অভিহিত হত 'মক্কা ইউনিভার্সিটি' বলে। তবু 'মক্কা ইউনিভার্সিটির' শিক্ষকদের বেশির ভাগ তখনো হিন্দু। দাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও যে দু'এক সময় না হয়েছে তা নয়। পাকিস্তান আন্দোলনে যত জোর বাড়ছিলো, দাঙ্গার প্রকোপ তত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। সম্প্রদায়গত উভয় দিকের জঙ্গীবাজদের কারণে। চারদিকের আবহাওয়া ক্রমান্বয়েই অসহিষ্ণু আর আতঙ্কজনক হয়ে পড়ছিলো। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষকরা তাঁদের তরুণ ছাত্রছাত্রীকে স্নেহ করতেন। কে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সে বিবেচনা তাঁদের ছিল না। আমার প্রবন্ধটি পাঠের উপলক্ষে মিসেস আখতার ইমামও সে কথা বললেন। তিনি নানা পারিবারিক অসুবিধার মধ্যে এসেছিলেন দর্শনে এম.এ পড়তে। মিসেস ইমামও প্রবন্ধটি শুনে বললেন, 'আমাকেও তিনি নিজের মেয়ের মতোই দেখতেন।'

আমি নিজে যে খুব বিশিষ্ট ছাত্র ছিলাম, এমনও নয়। তবে একটু 'বেলাইনের' বটে। যত না রীতিমাফিক পড়াশোনা করতাম, তার চাইতে একটু 'রাস্তার' বাইর দিয়ে হাঁটতাম। রাজনীতি আর ছাত্র আন্দোলনের বৃহৎ দুটি ধারা, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগপন্থী ধারা, তখন বেশ প্রবল। আমি কোনো ছাত্র নেতা ছিলাম না। তবু যে ভালো করে পড়াশোনা না করে, বিশ্ববিদ্যালয়েরই অল্প বেতনের কর্মচারীদের সঙ্গে মিশতাম, তাদের পাড়ায় গিয়ে নানা রকম কথা বলতাম, তারা আদাব জানাত, নিজেদের লোক বলে মনে করত, এটি হরিদসবাবুর দৃষ্টি এড়ায় নি। আমি এ ভয়েই হরিদাসবাবুর কাছে তত ভিড়তে সাহস পেতাম না। পাছে ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন আর মনোবিজ্ঞানের কঠিন কোনো প্রশ্ন করে আমাকে বিপাকে ফেলেন! কিন্তু না, তেমন কোনোদিন করেন নি। মনে হতো যেন 'বেলাইনের' এই চলার জন্যই আমার প্রতি তাঁর স্নেহ আর কৌতুকমিশ্রিত একটা প্রশ্রয় ছিল। কখনো কোনো সম্মেলনের কারণে দুদিন ক্লাসে উপস্থিত না হয়ে তৃতীয় দিনে হাজির হলে বলে উঠতেন, 'কি দেশোদ্ধার হলো!' একবার হরিদাসবাবু নিয়ে গেছেন বিভাগের আমাদের সবাইকে সঙ্গে করে লখনৌতে। দর্শন সম্মেলনে। সে সম্মেলনে বোধ হয় তিনি সভাপতি ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আমাদের সকলকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে। আলাপ-আলোচনায় রাজনীতির কথা উঠলে রাজনীতিতে আমাদের কিছুটা সংস্রবকে একেবারে নিন্দা করলেন না। বললেন, 'শ্লোগানও অহেতুক নয়। তারও প্রয়োজন আছে।' আমি কাছে যাই নি তেমন। কিছুটা দূর থেকে লক্ষ করেছি হরিদাসবাবুকে। কিশোর মনের বিস্ময় আর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে। কিন্তু আজ তাঁকে স্মরণ করতে মনে বেশ আবেগেরও সৃষ্টি হচ্ছে। মনে আছে, কখনো কলকাতা, দিল্লি, বম্বে থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিভাগ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে এলে আমাকে ডেকে বলতেন, 'এ বইটি বেশ ভালো। তোমার ভালো লাগবে। তুমি আগে পড়ো, তারপরে আমি লাইব্রেরিতে জমা দেব।' অনার্স পরীক্ষার ফলের ওপর কিছু বই প্রাইজ পাওয়ার ভাগ্য হলো। হরিদাসবাবু বললেন, 'কি হে মার্কসিস্ট! কী বই কিনবে?' আমি সলজ্জভাবে বললাম, 'ঐ মার্কসিস্ট বই স্যার।' প্রশ্রয় দিয়ে বললেন, 'আমাকে লিস্ট দিও। এখানে কোথায় পাবে? আমি কলকাতা কিংবা বম্বে যাব। নিয়ে আসব তোমার জন্য।' ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

... কিন্তু একাল সেকাল নয়। একালের তরুণদের সেকালের এই স্মৃতিচারণ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। এবং একালের আমিও আর সেকালের শিক্ষক নই। তাই আফশোস আর অভিযোগের দিকে গিয়ে লাভ নেই। তবু একালের মন্দ-ভালো, যা বৈশিষ্ট্য তাতে সেকালের অবদান নিশ্চয়ই আছে। সেকালের ওপরই একালের আগমন। সে সত্যটি স্মরণ করার জন্যই এসব কথার উল্লেখ। ...

২০.৩.৮১

* * *

হরিদাসবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে স্মরণ করতে গেলেই আমার যে ভবনটির কথা মনে পড়ে সেটি আজ আর নেই। বর্তমানে যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্র তার ঠিক বিপরীতে একটি দোতলা দালান ছিল। এটিই ছিল জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের ভবন। ভবনটি সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তার জায়গাতে শিক্ষকদের একটি বহুতল ভবন তৈরি হয়েছে।

খুব যে দীর্ঘ ছিলেন, এমন নয়। কিন্তু গায়ের রঙটি ছিল খুবই ফরসা। গায়ের রঙ-এর মতোই ধবধবে সাদা ধুতি-চাদর পরতেন। স্যুট-টাইতে কখনো দেখি নি। গলাবন্ধ যে কোট পরতে দেখতাম তাকে আজকালকার ভাষায় বল চলে 'চীনা কোট'।

হরিদাস ভট্টাচার্যের বাড়ি কোথায়, তাঁর অধ্যয়ন জীবনের কৃতিত্ব কী ছিল, কী ছিল না, তা আমি কিছুই জানতাম না। ১৯৪২ সনে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ পাস করে যখন বিশ্ববিদ্যালয়, মানে বর্তমানের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভবনে বি.এ পড়তে এলাম তখন প্রথম চোটে আমি দর্শন শাস্ত্রে ভর্তির আবেদনও করি নি। আবেদন করেছিলাম ইংরেজি সাহিত্যে। কিন্তু মাঝখানে করিডোর আর দুপাশে ক্লাসরুম। এই ভবনের করিডোর দিয়ে যাওয়াতে যে শিক্ষক-বক্তার দর্শন, জ্ঞান, সত্য-মিথ্যার ওপর দরাজ গলার আলোচনা আর যে-কোনো ছাত্রের মতো আমাকেও চমকিত এবং আকর্ষিত করেছিলো—সে গলা ছিল হরিদাস ভট্টাচার্যের। আর সেই আকর্ষণেই ইংরেজি সাহিত্য পরিত্যাগ করে দর্শন শস্ত্রে ভর্তি হবার আবেদনপত্র নিয়ে একদিন হাজির হয়েছিলাম অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সেই বাগ্মী হরিদাস ভট্টাচার্যের সামনে। এখনও মনে ভেসে উঠছে, আমার সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিলো দর্শন বিভাগের প্রধানের দপ্তরে নয়, ঘটেছিলো জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের দপ্তরে। আমার আবেদনটি হাতে নিয়ে আই.এ পরীক্ষার নম্বরাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে কথাটি বলেছিলেন, সেটি এখনো কানে বাজছে, 'ফিলসফি পড়তে এসেছ? কিন্তু টিকবে তো?' এ এক কঠিন প্রশ্ন। এর সরাসরি কোনো জবাব নেই। মুখচোরা গোবেচারী আমি সেদিন তাঁকে কী জবাব দিয়েছিলাম, একটি কিশোর ছাত্র বা ছাত্রীকে কেবল যে জ্ঞানের একটি শাখাই অপর শাখা থেকে কম কিংবা বেশি আকর্ষণ করে, তাই নয়। কোনো বিভাগের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি কম কিংবা বেশি আকর্ষণ করে তার কোনো বিশেষ শিক্ষকও। ব্যাপারটি আজ বিরাট আকারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে হয়তো তত জোরের সঙ্গে বলা যায় না; কিন্তু সেদিনকার সেই আশ্রম কিংবা পরিবার প্রায়-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনেকখানি সত্য ছিল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন বসু, দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপক এস.এন রায়, গণিতের এস.এন বসু, অর্থনীতির এইচ এল দে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ডি এন বানার্জী, এ কে সেন, অবণীভূষণ রুদ্র, আবদুর রাজ্জাক, বাংলার মোহিতলাল মজুমদার, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবী বিখ্যাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি প্রশংসাবাক্য প্রচারিত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। অক্সফোর্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী, আমার জানা নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে যে তখনকার ভারত উপমহাদেশের জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছিলো তাতে সন্দেহ নেই। আর ছাত্র হিসেবে সেটিই ছিল আমাদের গর্ব এবং গৌরবের বিষয়। তা না হলে কলকাতা বা লখনৌ বা কাশী বা আগ্রা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অজ-পাড়াগাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাঁড়াবার উপায় ছিল না।

কিন্তু যে কথা আজ এই হীরক জয়ন্তীতে ভাবতে গিয়ে চমৎকৃত হতে হয়, সেটি হচ্ছে, সমাবেশের এই ঘটনাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে নি। এমন নয় যে হরিদাস ভট্টাচার্য, সত্যেন বসু, রমেশ মজুমদার, এফ রহমান এরা কোথাও বেকার বসেছিলেন, আর চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে তাঁরা কলকাতাকে ছেড়ে ঢাকাতে দৌড়ে এসেছিলেন। তাঁদের কে খুঁজে পেতে সংগ্রহ করা হয়েছিলো। আর তার প্রতিষ্ঠানগত কৃতিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালের সাংগঠনিক কমিটির হলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজেপত্রে যে ব্যক্তির ঐকান্তিক আগ্রহ, পরিশ্রম ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় তিনি না বাঙালি, না ভারতীয় এবং না হিন্দু, না মুসলমান। তিনি ইংরেজ—পি জে হারটগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ভাইস চ্যান্সেলর বা উপাচার্য। তিনিও বেকার ছিলেন না। হয়ত ছিলেন ভারতীয় শিক্ষা সারভিস বা আই.ই.এস-এর অভিজ্ঞ এবং উচ্চতর সদস্য। কিন্তু ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি, তার সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, আইন—সকল বিভাগের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক অন্বেষণের যে প্রচেষ্টা হারটগ সাহেব চালিয়েছিলেন, সেটি তাঁকে একজন যথার্থ কর্মী, জ্ঞানী, এবং উদ্যোগী সংগঠক হিসেবে প্রমাণিত করে। আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত সেই গোড়াকার সকল প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মধ্যে যাঁরা ছিলেন, পি জে হারটগ এবং তাঁর অন্য সহকর্মীদের পরিচয় বিবরণী সংগ্রহ করে প্রকাশ করা।

শুধু বিজ্ঞাপনের জবাবে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে নিয়োগপত্র দেয়ার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার সংগঠন, বিশেষ করে ভাইস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ্যান্সেলর হারটগ সাহেবের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথির কিছুটা মাত্র এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে। তা নাড়াচাড়া করতে গিয়েই দেখলাম, ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসেও কলকাতা শহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের ক্যাম্প-অফিস চালু রয়েছে। আর সেখান থেকে ২৯ জানুয়ারি (১৯২১) তারিখে হারটগ সাহেব হরিদাস ভট্টাচার্যকে তাঁর কলকাতার ৩৬ নম্বর আমহারস্ট রোডের ঠিকানায় ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে লিখছেন :

"Dear Mr. Bhattacharyya,
I am authorised by His Excellency the chancellor to offer you the Post of Reader in Philosophy in the University of Dacca at an initial salary of Rs. 500/- per mensem rising by annual increments of Rs. 50/- per mensem of a maximum which has not yet been fixed, but which I hope will be fixed shortly. I should be glad to hear from you at your early convenience that you will accept the Post. It will be necessary for you to join the University not later than 13th June in order to complete the arrangements preparatory to the beginning of the session on July the 1st ..."

হরিদাস ভট্টাচার্য তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিলসফি এ্যান্ড একসপেরিমেন্টাল সাইকোলজির' লেকচারার। তিনি অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রফেসর' পদের জন্যই একটি আবেদন পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হারটগ সাহেবের এই পত্রের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, 'রিডার'-এর পদ গ্রহণেও তাঁর আপত্তি নেই। হরিদাসবাবুর বাংলা হস্তাক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া ভার। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত নথিতে শুরু থেকে, অর্থাৎ ১৯২১-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত রক্ষিত নথিতে (১১৩৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ের নথির খোঁজ আমি পাই নি) তাঁর নিজের অত্যাশ্চর্য ইংরেজি হস্তাক্ষর এবং ইংরেজিতে লেখা সাবলীল পত্রাদির কোনো অভাব নেই।

ভাইস চ্যান্সেলর হারটগ সাহেবের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে স্যার আশুতোষ মুখার্জির উল্লেখ দেখা যায় : "But before putting into your hands the formal letter of acceptance I think I ought to see the President to the Post-Graduate Department, Sir Ashutosh Mukherjee. I wish you could have told him that you wanted me just as he did to Dr. Urquhart. It is always so very delicate to touch upon the subject of resignation and departure before one with whom I am on cordial terms and who during the last month made me a paper-setter in B.A. Philosophy (Pass and Honours) unasked ...".

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার হারটগের পক্ষে এমন অনুরোধ রক্ষা করার তেমন কোনো বাধ্যতা ছিল না। কিন্তু হরিদাস ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত নথিতে রক্ষিত পত্রাদির মধ্য দিয়েও বোঝা যায় স্যার হারটগ (পদবিসহ যাঁর নাম ছিলো Sir P.J. Hartog Kt. CIE LLD, M.A, B.Sc) যথার্থই ভদ্র এবং দক্ষ সংগঠক ছিলেন। হরিদাসবাবুর সঙ্কোচের কারণটি তিনি বুঝেছিলেন এবং যথার্থই স্যার আশুতোষকে হরিদাসবাবু সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন।

এরপরে স্যার হারটগকে যে দীর্ঘ পত্র হরিদাসবাবু লিখেছিলেন তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন কিনা সে প্রসঙ্গটি বেশ উল্লেখযোগ্য :

... (2) The facility for research and freedom in teaching. It has been hinted to me that the freedom and leisure for study that I enjoy here may be denied me there. Personally I do not put much credence in these statements but I should like to be assured that I shall not be unnecessarily dictated to by the professor or by anybody else in matters of study and teaching. There must certainly be consultation and mutual arrangement and agreement but that should be all. I have already told you that here I am absolutely free to teach as I like and have to report only at the end of the year what and how much I have taught. I have never abused that privilege, in fact, both at Scottish Churche's College and at the University. I have taken extra classes on my own initiative, and I shall justify you confidence in me on that point there too ...".

চাকরিতে স্থায়ী হতে কত দিন লাগবে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের কী সুযোগ পাওয়া যাবে, থাকার ব্যবস্থা কী হবে প্রভৃতি সব বিষয়েই তিনি ভি.সি-র কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন এবং এতদিন পরে একজন গবেষককে যা চমৎকৃত করবে সে হচ্ছে ভি.সি স্যার হারটগও বিস্তারিতভাবে হরিদাস ভট্টাচার্যের সকল প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন।

৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ তারিখে স্যার হারটগ হরিদাসবাবুকে লিখলেন :

"Dear Mr. Bhattacharyya,
Many thanks for your letter of February 7. As you will learn from my letter no. 89/C dated the 7the February, 1921, I have already written to Sir Ashutosh Mukherji in regard to you appointment. I now deal with your various queries : (1) With a record like your own I anticipate that confirmation after the Probationary period

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

would be merely normal. However I will put your points before the Chancellor; (2) The University will enter into a written contract with you and will be obliged to carry out the obligations of the contract. This is required under the Dacca University Act.

(3) One of the main objects of the University is to provide every facility for research and freedom in teaching. If you will consult the Dacca University Act, you will see what a large space the teachers will occupy in the management of the University. The post of Reader would be one of dignity and importance and your letter seems to me to indicate the exact spirit in which the department should be conducted. Mutual arrangement and agreement are of course necessary, but you ought certainly not be hampered in any way in your teaching ...".

হরিদাসবাবু নিজে স্যার হারটগকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার গোড়াতেই দেখা যায়, তিনি ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তেমনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে, খুব সম্ভব ১৯১৭ সন পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হরিদাসবাবুর নথিতে কোনো আবেদনপত্র এবং তার সঙ্গে তাঁর জীবনের কোনো বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু স্যর হারটগের সঙ্গে এই পত্রালাপের উল্লেখে মনে হয়, হরিদাসবাবুর জন্ম হয়ত ১৮৯০ কি ৯১ সনে। হরিদাসবাবুর শিক্ষাগতভাবে ছিলেন এম.এ.বি.এল। অর্থাৎ এম.এ পাস করে হয়ত তিনি দুবছর ল' পড়েছিলেন এবং আনুমানিক হিসেবে ১৫ বছরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ১৯০৫-এর দিকে এম.এ পাস করেছেন। তারপরে ল' শেষ করে হয়ত স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করেন।

হরিদাসবাবু কলকাতায় বসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগদানের পত্র পাঠান এবং দর্শন বিভাগে আর কোন উপযুক্ত সহকর্মীকে গ্রহণ করা যায় এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগারের জন্য কী যন্ত্রপাতি কিংবা দর্শনের জন্য কোন কোন গুরুত্বপুর্ণ পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করা যায় তার প্রচেষ্টাতে নিজেকে অবিলম্বে নিযুক্ত করেন।

হরিদাসবাবু তখন তরুণ অধ্যাপক। কিন্তু স্যার আশুতোষের মতোই স্যার হারটগও যে নির্বাচনে ভুল করেন নি তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকে যে-কোনো দলিলপত্র বা প্রকাশনা ওল্টালেই বোঝা যায়। নিজের দাবিদাওয়া আদায়ের ব্যাপারে হরিদাসবাবু যে 'দার্শনিক রকমের' নিরাসক্ত ছিলেন, তা নয়। তিনি তাঁর প্রাপ্য আদায় করতে জানতেন। কিন্তু তাঁর পত্রালাপ বা দাবি উত্থাপনের মধ্যে যুক্তির জোর এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশের চিহ্ন স্পষ্ট। বস্তুত প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল দর্শন বিভাগের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অরডিন্যান্স ও রেগুলেশনসমূহ সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব পড়ে হরিদাসবাবুর ওপর। ১৯২৪ সনের একটি পত্রে দেখা যায়, হরিদাসবাবু ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট একটি দাবি জানিয়েছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অরডিন্যান্সসমূহ সম্পাদনাতে তাঁর যে কষ্টকর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেজন্য তাঁর কিছু প্রাপ্য হওয়া উচিত। এবং পরবর্তী সময়ে একসিকিউরিটিভ কাউন্সিল হরিদাসবাবুকে এ পরিশ্রেমের জন্য পাঁচশ' টাকার একটি সম্মানী প্রস্তাব করে মঞ্জুর করে।

হরিদাসবাবু দর্শন বিভাগের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। কিন্তু গোড়াতে তিনি দর্শন বিভাগের হেড ছিলেন না। হেড ছিলেন অধ্যাপক জি.এইচ. ল্যাংলী এবং তিনি যখন ১৯২৪ সনের এপ্রিল মাসে ছুটিতে যান তখন মাত্র হরিদাসবাবু বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন।

এই সময়কার চিঠিপত্র পাঠ করতে গিয়ে একটি বিষয়ে আমার বেশ আমোদ লেগেছে। ঢাকায় আসার পূর্বে হরিদাসবাবু ভিসি হারটগ সাহেবকে চিঠিতে ঢাকার মশার আতঙ্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন। হারটগ সাহেব তার জবাবে লিখেছিলেন : "I am told that although there are mosquitoes in Ramna, there is no malaria and many people who have lived here for years had never had an attack. The situation is open and healthy." অর্থাৎ ঢাকার মশা তোমাকে কামড়াবে বটে কিন্তু ম্যালেরিয়ার রুগী করবে না। ঢাকার মশা ভদ্র এবং রসিক। সে গুণ তার এখনো আছে। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদের নিবাসস্থল ভাটপাড়ার টিকিধারী তরুণ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হারটগ সাহেবের এই অভয়তে ঢাকা এসেছিলেন। তাছাড়া হারটগ সাহেবের আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত ব্যক্তিগত পত্রালাপ এবং ঢাকাতে আগমনে ইচ্ছুক একজন তরুণ শিক্ষকের সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে দেবার প্রয়াসও নিশ্চয়ই কম আকর্ষণীয় ছিল না।

কিন্তু বাদুড়ের উৎপাতের কথা তরুণ অধ্যাপক বাইরে থেকে আঁচ করতে পারেন নি। আজকের ঢাকাবাসীরা যদিও মশাকে ভালোভাবেই চেনেন তবে বানর আর বাদুড়কে তাঁর তেমন জানেন না। কিন্তু হরিদাসবাবু খুবই বিব্রত হয়েছিলেন বাদুড়ের উৎপাতে, যখন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিকটবর্তী 'চামেরী হাউস' ভবনটি থাকার জন্য দেওয়া হয়। এই 'চামেরী হাউস' থেকে ১৯২৪ সনের দিকে হরিদাসবাবু ভি.সিকে লিখলেন :

> "My dear Sir.
> I am afraid, I shall have to think serioulsy of vacating University Quarters next session. The unbearable stench of bat's excreta returned with the summer heat in spite of last year's renovation of the ceiling cloth and the P.W.D. people practically told me that they would be unable to drive the bats away".

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ রকম ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা উল্লেখ করে কোনো শিক্ষক আজকের দিনের একজন ভিসিকে পত্র দিলে তিনি তার জবাব ব্যক্তিগতভাবে এবং লিখিতভাবে দেবেন কিনা এবং কী জবাব দেবেন তা আমি নিশ্চিত জানিনে। তবে হারটগ সাহেব অবিলম্বে কেবল যে হরিদাসবাবুকে জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন তাই নয়, তিনি নিজে পি, ডব্লিউ ডির ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠি লিখে বললেন :

"My dear Stein,
Mr. Haridas Bhattacharyya who lives in the Chummery tells me that the stench of the bats in the house in so unbearable that he wishes to leave it. Is it not possible to keep the bats out of the house? At one time they used to come into this house but since wire-netting has been put in the holes through which the electric wires pass, they have been kept out completely. I know that the Chummery is differently constructed, but it is difficult to believe that it is impossible to keep bats from entering above the ceiling cloth."

হরিদাসবাবু কেবল যে বিভাগের অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন, ল্যাংলী সাহেবের পরে দর্শন বিভাগের প্রধান হয়েছেন, তাই নয়। একাধিকবার তিনি ডেপুটি রেজিস্ট্রার বা রেজিস্ট্রারের দায়িত্বও পালন করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, যে সেদিনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে হরিদাসবাবু একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব হিসেবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের কিছুকালের মধ্যেই পরিগণিত হয়েছিলেন।

'হরিদাস ভট্টাচার্য, এম.এ, বি.এল, পি.আর.এস, দর্শন সাগর। পি. আর. এস বা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার' তো আমাদের নিকট আতঙ্কজনক ব্যাপার ছিল। যিনি এই বৃত্তির অধিকারী হন তিনি অবশ্যই মহাপণ্ডিত। তার ওপর 'দর্শন সাগর'! এবং অপ্রতিরোধ্য এক ব্যক্তিত্ব। এসবই সেই কিশোরকালের আমাকে চল্লিশের দশকে মুগ্ধ করেছিলো। বৃহত্তর বিশ্ব, কোলকাতাতে লেখাপড়া করতে না যাওয়ার জন্য আমার কোনো আফসোস ছিলো না। কিন্তু হরিদাসবাবুর টিকি এবং উপবীত বা পৈতা (পৈতা অবশ্য বার থেকে দেখা যেত না) আমাকে বিস্মিত করেছিলো। দর্শন বলতে তো জিজ্ঞাসা আর সংশয়কে বোঝায়। হরিদাসবাবুর দরাজ বক্তৃতাতেও দর্শনের এই অর্থই আমি উপলব্ধি করেছিলাম। তাহলে এই 'জিজ্ঞাসা এবং সংশয়ের' সঙ্গে দার্শনিক হরিদাসবাবুর 'টিকি এবং পৈতা'র সঙ্গতি কোথায়? এ প্রশ্ন সেদিনও আমার মনে জেগেছিলো। কিন্তু এমন প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় নি। অসঙ্গতি কেবল এ ক্ষেত্রে নয়। অসঙ্গতি এখানেও যে, হরিদাসবাবু বাড়ির বাইরে অপর কারুর পাক করা অন্ন গ্রহণ করতেন না। শুনছি বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও গেলে তিনি নিজেই রান্না করে খেতেন। একেই বোধ হয় বলে 'স্বপাক ব্রাহ্মণ'। কিন্তু এই হরিদাসবাবুর বাড়িতে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত অধ্যাপক হুমায়ুন কবির যখনি ঢাকা এসেছেন কোনো পরীক্ষা কার্য ব্যপদেশে, তখন তাঁর স্থান হয়েছে। অপর কোথাও তাঁকে তিনি থাকতে দেন নি। এও কম বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না আমাদের কাছে। আসলে হরিদাসবাবু শুধু দর্শনের ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিলেন না। ছিলেন মনোবিজ্ঞানেরও। আর তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন, 'যে ব্যক্তিকে তোমরা বাইরে থেকে আস্ত কিংবা অখণ্ড দেখ, সে আসলে আস্ত কিংবা অখণ্ড কোনো সত্তা নয়। নানা খণ্ডিত, পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আচরণ, সংস্কারের টুকরো নিয়ে বাহ্যত অখণ্ড ব্যক্তির সৃষ্টি। এই পরস্পর-বিরোধী সত্তাতেই ব্যক্তির মধ্যকার অসঙ্গতি আর দ্বন্দ্ব। এটা যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য। কেবল এই পরস্পরবিরোধী সত্তাগুলো যখন এমন তীব্রতাপ্রাপ্ত হয় যে ব্যক্তির সর্বমোট নিয়ন্ত্রণটা নষ্ট হয়ে যায়, তখনি আমরা এমন ব্যক্তিকে 'এ্যাবনরম্যাল' বা মানসিক রোগী বলে আখ্যায়িত করি।' এমন শিক্ষা এবং সত্যকেই বোধ হয় হরিদাসবাবু সচেতনে নিজের মধ্যে ধারণ করতেন। তাই তাঁর ব্যক্তিগত নথি ওল্টাতে ওল্টাতে যখন দেখলাম, কলকাতায় বালিগঞ্জে তৈরি নতুন বাড়ির 'গৃহপ্রবেশ' অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ছুটির আবেদন করে ৫-১১-৩১ তারিখে তিনি লিখেছেন : ... "The earliest possible date is the 11th instant. The only other date is 20th instant. The astrologers consulted have vetoed these two dates after consulting my horoscope and in the matter I am absolutely in their hands." তখন আর বিস্মিত হই নি। 'জ্যোতিষীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারা আমার কুষ্টি দেখে বলেছেন ১১ কিংবা ২০ তারিখে গৃহপ্রবেশ করা চলবে না। এ ব্যাপারে আমি একেবারেই তাদের হাতে বন্দী।' দর্শন সাগর হরিদাস ভট্টাচার্য এমন সত্য স্বীকারে কোনো অস্বস্তি বোধ করেন না। কারণ, ব্যক্তি তো অখণ্ড সত্তা নয়, খণ্ডিত সত্তাসমূহেরই সমন্বিত প্রকাশ।

হরিদাসবাবু বাগ্মী হিসেবে সেদিনকার সারা-ভারতেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষাতে বিরামহীনভাবে বক্তৃতাদানের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে যেমন ছাত্র, সহকর্মী এবং দেশবাসী সকলের নিকট প্রিয় করেছিলো, তেমনি বোধ হয় সে কারণেই রীতিসিদ্ধ গবেষণাকর্মে বা একাধিক গ্রন্থ রচনাতে তিনি নিবদ্ধ থাকতে পারেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সেদিনকার সমাজের নানা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বে তিনি ব্যাপৃত রয়েছেন। এক সময়ে তিনি 'বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক' নামক একটি ব্যাঙ্কের অন্যতম ডাইরেক্টর নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের বাইরে বলে তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

হরিদাসবাবু একবার লখ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছিলেন সেখানে 'ফিলসফির প্রফেসর' হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য। তাঁর নথিতে এ সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ল্যাংলী সাহেব হরিদাসবাবুর যোগ্যতার প্রশংসা করে তাঁর সে আবেদন লখ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়েছিলেন, এ তথ্য পাওয়া যায়। এটা ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা।

হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথিতে তাঁর সম্পর্কে ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্র-নাথ শীলের একটি প্রশংসাপত্র রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর হরিদাসবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে এই প্রশংসাপত্রের একটি কপি পাঠিয়েছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

"On perusing certain portions of my scientific work, The Evolution of Individuality and of my philosophical work, The Principle of Activism, Dr. Brtojendra Nath Seal under whom I had the honour of serving in the Philosophy Department of the Calcutta University for about three years has sent a certificate ...".

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রশংসাপত্র পাওয়া একজন ছাত্র কিংবা শিক্ষকের পক্ষে অবশ্যই গর্বের বিষয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। সেখান থেকে ৭ আগস্ট ১৯২২ তারিখে তিনি হরিদাসবাবুকে নিম্নোক্ত প্রশংসাপত্রটি পাঠিয়েছিলেন :

Mysore

7th August, 1922.

I have known Professor Haridas Bhattacharyya for the last eight years in various capacities and I have had ample opportunities of judging his personal worth, his mental calibre and his attainments in philosophy. He has a full mind, a rapid sweep of thought which does not however miss the significant details in the ensemble and a marked gift of lucid and interesting exposition. He has studied with great profit the foundations of recent philosophical thought in physical and biological sciences and kept himself abreast of the modern developments of experimental and comparative psychology. I have no hesitation in stating that alike by his metaphysical acumen and his strenuous thinking, by his clearness of ideas, his knowledge of the principles and methods of physical and biological sciences and his gift of exposition he is exceptionally fitted to occupy the chair of professor of Philosophy in any Indian University.

Brojendra Noth Seal
Bice chancellor,
Mysore University

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিদাসবাবুর বৃহৎ আকারের গ্রন্থের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে আছে তাঁর Foundations of Living Faiths। এছাড়া ১৯২৭ সনের ২৯ এপ্রিল তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে হরিদাসবাবুর শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দেন তাতে নিম্নোক্ত কথা ক'টি অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায় :

"(1) Teaching Experience: that Mr. bhattacharyya was professor of Philosophy in the Scottish Churche's College, Calcutta and Lecturer in Philosophy and Experimental Psychology, Calucutta University before entering the service of the Dacca University in 1921 ..." হরিদাস বাবুর নথির মধ্যে Inferiority Complex নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের কপি রক্ষিত হতে দেখা যায়। ঐ প্রবন্ধটি ব্যক্তির হীনম্মন্যতা বোধ, তার প্রকাশ প্রভৃতির ওপর মনোহর ইংরেজিতে লিখিত একটি আকর্ষণীয় রচনা। প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিলো ১৯২৭ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের 'সাইকোলজি সেকশনে' এবং 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯২৭ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। লেখাটির প্রাঞ্জল-উপস্থাপনায় যথার্থই মুগ্ধ হতে হয়। আমাদের দর্শন বিভাগ তাঁদের কোনো মুখপত্র বা বার্ষিক প্রকাশনায় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি পত্রিকায় আজো লেখাটি হরিদাসবাবুর নথি থেকে উদ্ধার করে পুনর্মুদ্রণ করলে আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং পাঠকসাধারণ একটি সুন্দর রচনা পাঠে উপকৃত বোধ করবেন।

Foundations of Living Faiths-এর প্রথম খণ্ডের একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এখনো রক্ষিত আছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা তা আমার জানা নেই। এ গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশকাল ১৯৩৮। গ্রন্থখানির নাম পৃষ্ঠাটি ছিলো নিম্নরূপ। এই নাম পৃষ্ঠায় তিনি যে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট সে কথারও উল্লেখ দেখা যায় :

STEPHANOS NIRMALENDU GHOSH LECTURES
THE FOUNDATIONS OF LIVING FAITHS
(An Introduction to Comparative Religion)
by
HARIDAS BHATTACHARYYA
Provost, Jagannath Hall
and
Head of the Department of Philosophy
University of Dacca
First Volume
Published by the University of Calcutta
1938

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পিতার নামে। উৎসর্গ বাক্যটিতেই হরিদাসবাবুর পিতার নাম পাওয়া যায় :

"To the sacred memory of my father,
Pandit Ramprasanna Sruti Ratna Battacharyya
whose life has ever been to mean ideal and an inspiration"

এই গ্রন্থ মূলত ছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি বক্তৃতামালার ভিত্তিতে রচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত 'স্টিফানোস নির্মলেন্দু ঘোষ লেকচার্স' সেকালের একটি মর্যাদাবান বক্তৃতা ছিল। এ বক্তৃতাদানের আহ্বান যখন ১৯৩২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টচার্যের নিকট আসে তখন তাঁর বয়স হয়ত ৪২ বছর। কিন্তু সে বয়সের জন্যও এমন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাদানের আহ্বান একটি সম্মানের বিষয় ছিল। এই বক্তৃতাদানের জন্য তাঁকে সম্মানী দেওয়া হয়েছিলো ৯০০০ টাকা, আজকের মূল্যমান হিসেব করলে নিশ্চয়ই এটিকে লক্ষ টাকা বলে উল্লেখ করা যায়।

Foundations of Living Faiths বা 'জীবন্ত ধর্মসমূহের ভিত্তি'। বিষয়টি হরিদাসবাবুর বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার সঙ্গে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। আগ্রহী গবেষক বা পাঠক এই গ্রন্থখানার সঙ্গে প্রাথমিকভাবেও পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করলে একদিকে যেমন মুগ্ধ হবেন হরিদাসবাবুর সকল ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের বিস্তার এবং গভীরতা দেখে, তেমনি চমৎকৃত হবেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা তাঁর উদারতা এবং পারদর্শিতা দেখে।

'স্টিফানোস বক্তৃতা' দানকে হরিদাসবাবু নিজেও বিশেষ সম্মানের বিষয় বলে বিবেচনা করেছিলেন। সেই বোধেরই প্রকাশ দেখা যায় তাঁর এই গ্রন্থের 'প্রিফেস'-এর মধ্যে।

I am much flattered to think that the distinction of a fairly orthodox Brahmin being appointed to a christian endowment during the regime of a Muslim Vice-Chancellor should have fallen first on me. By a curious coincidence I had the unique privilege of being born in one of the greatest strongholds of Sanskrit learning and Hindu orthodoxy in Bengal, of being educated in one of the oldest Missionary colleges of Calcutta and of spending the greater part of my teaching career at one of the most important centres of Muslim Culture in India. ..." (P. VIII, Preface Foundations of Living Faiths.)

এই প্রিফেস-এর মধ্যেই ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমতের উল্লেখ করতে গিয়ে হরিদাসবাবু বলেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"... I have also made no secret of my belief that most, if not all, religions fight ignorance half heartedly for fear lest a widespread culture should mean the disowning of all spiritual obligations and a gradual loss of influence of those new in spiritual power over the uneducated masses. I have not subscribed, however, to the view that religion as a distinctive attitude towards life and reality is ultimately destined to pass away with the growth of education and the development of industry ... (ঐ P. IX)

'প্রিফেস'-এর এই মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য যে বক্তৃতাগুলো তিনি লিখিতভাবে পাঠ করেন নি, উপস্থিত বক্তৃতা হিসেবে দিয়েছেন। ... Following my usual practice, I delivered the entire series of lectures extempore in order to be better able to adjust my discourse to the actual audience of the day ..." (ঐ P. IX) এও তাঁর স্বভাবসুলভ। আমার ছাত্রজীবনের এমন কোনো দিনকে স্মরণ করতে পারিনে যেদিন হরিদাসবাবু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত বাগ্মিতা বাদ দিয়ে লিখিত কোনো কিছু আমাদের পাঠ করে শুনিয়েছেন।

ইসলাম ধর্মকে সুবিস্তারিতভাবে যে তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায় এ থেকে যে 'গড ইন ইসলাম' এই শিরোনামের প্রায় ৬৫ পৃষ্ঠাব্যাপী অধ্যায়তে। তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগের শক্তিসমূহ থেকে শুরু করে 'ইসলামের রহস্যবাদ ও হিন্দু সর্বেশ্বরবাদ' শিরোনামে বিভিন্ন উপ-অধ্যায়সমূহে যে আলোচনা করেছেন সে উপ-অধ্যায়গুলোর সংখ্যা হচ্ছে চৌষট্টিটি। এই উপ-অধ্যায়গুলোর আকার যে বৃহৎ, তা নয়। কিন্তু এতে ইসলাম ধর্মের এবং মুসলিম দর্শনের যে সমস্যাসমূহের তিনি আলোচনা করেছেন তার মাঝেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় মেলে। হরিদাসবাবুর আলোচিত সমস্যাগুলোর মধ্যে 'Pre-Islamic Religious Forces', `The Quranic Revelation', 'The Last Prophet', 'Christ and Muhammad as rival Prophets', 'Muhammad's miracles', 'Islam as the universal religion', 'The Nature of Islamic Toleration', 'The Quran and the Bible', 'The Quranic view of God', 'The Mutazilite view of God', 'The ninety nine names of Allah', 'Divine Will and Human Destiny', 'Human Freedom', 'Divine Forgiveness', 'Divine Mercy', 'The orthodox and Mutazilite views', 'Al-Asharis opinion', 'Islamic mysticism',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'Islamic mysticism and Hindu Polytheism'–প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। এ গ্রন্থটিকেও পুনর্মুদ্রিত আকারে বাংলাদেশের আজকের ছাত্র, শিক্ষক এবং পাঠক-সাধারণের কাছে পৌঁছাবার দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার দর্শন বিভাগের পালন করা উচিত। হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথিটি তাঁর মনোহর হস্তাক্ষরে লিখিত নানা মন্তব্য, স্লিপ, পত্র, স্মারক ইত্যাদিতে পূর্ণ। হয়ত হস্তাক্ষর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানো তাঁর ছুটির আবেদনে। তার সংখ্যাধিক্যে এই নথিটির পাঠকের মনে হতে পারে যে হরিদাসবাবু অসংখ্যবার ছুটি নিয়েছেন। আসলে ব্যাপারটি তা নয়। কিন্তু অসংখ্য এই ছুটির আবেদনের যে বৈশিষ্ট্যটি আমাকে বিমোহিত করেছে সে হচ্ছে তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা এবং দায়িত্ব পালনে নিয়মনিষ্ঠা। নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে না পারলে অবশ্যই পদাধিকারীকে নিয়মমাফিক সকারণ ছুটির আবেদন করতে হবে এবং ছুটি এ্যালাউ করতে হবে। 'ফ্রেঞ্চ লিভ' বলে ইংরেজিতে একটি কথা আছে। সেটি শব্দগতভাবে আমরা যত না ব্যবহার করি, কার্যগতভাবে তার অধিক যে তাকে ব্যবহার করি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু হরিদাসবাবু নিশ্চয়ই 'ফ্রেঞ্চ লিভ' ব্যাপারটি সম্পর্কে চরিত্রগতভাবে জ্ঞাত ছিলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অফিসও হয়তো হরিদাসবাবুর এমন নিয়মনিষ্ঠায় কিছুটা বিব্রত হয়েছিলো। তাই হরিদাসবাবু যখন একদিনের ছুটির আবেদন করে একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন তখন দেখা গেল রেজিস্ট্রার সাহেবের অফিসে এক সহকারী হরিদাসবাবুকে লিখে পাঠাচ্ছেন : 'V.C. says that you do not really require the leave.' কিন্তু এর উত্তরে হরিদাসবাবু লিখে পাঠালেন : 'I was obliged to cut two classes from 10-30 to 12-30. So formal leave would still be required'. এই মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায় আর একটি চিঠিতে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সিকে তিনি চিঠি লিখে বলেছেন : (১.৩.৩৫) :

"Dear Mr, Vice-Chancellor,

As I was detained too long at the Court to be able to take my class, I pray that duty leave for this day only be granted to me ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিস্মৃত তথ্য হিসেবে এখানে একটি কথা বলা যায়। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, সে সিন্ডিকেট বা ভিসি যিনিই হোন, তিনি নিয়োগকারী, এমপ্লয়ার এবং শিক্ষক হচ্ছেন এমপ্লয়ী। সেদিন অর্থাৎ বিশের বা ত্রিশের দশকের অন্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কী ছিল তা জানিনে। কিন্তু শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি 'ইউ আর এ্যাপয়েন্টেড' বলে কোনো নিয়োগপত্র দিতেন না। শিক্ষক আর বিশ্ববিদ্যালয় এরা উভয় ছিলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটি পক্ষ, সমপক্ষ। তাদের মধ্যে চুক্তি হত। উভয়পক্ষের জন্য চুক্তির শর্ত উল্লেখ থাকত। এবং উল্লেখ থাকত যে এক পক্ষ চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে অপর পক্ষ তার প্রতিবিধানের কী পথ গ্রহণ করতে পারবে। আজো অবশ্য পক্ষ দুটি। তবু সেদিন 'চুক্তির' পদ্ধতিতে আজকের প্রভু-ভৃত্যের দিকটি এত প্রকট হয়ে চোখকে বিদ্ধ করত না।

একেবারে গোড়াতে অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এমন চুক্তিপত্রও শিক্ষকদের জন্য তৈরি হয়নি। ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৩ সালের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উভয় পক্ষে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হতে শুরু করে এবং এরূপ চুক্তিপত্রে মাহিনার শর্তে যে গোড়াকার প্রতিশ্রুতির পরিবর্তন ঘটেছিলো তার আভাস পাওয়া যায় হরিদাসবাবু ১৯২৩ সনে রেজিস্ট্রারকে যে প্রতিবাদপত্র লিখেছিলেন, তা থেকে। হরিদাসবাবুর নিকট প্রেরিত চুক্তিপত্রের গোড়াতে ছিলো :

'Where as the Executive Council of the Dacca University in exercise of the powers conferred on them by the Dacca University Act have engaged the party of the first part (Mr. Haridas Bhattachayya) to serve as a Reader in Philosophy in the University of Dacca till he attains the age of fifty five and subject to the conditions and agreements herein contained ...

3. That from the first of July nineteen hundred and twenty four the University will pay him, o long as he shall remain in the said service and actually perform his duties, a salary at the rate of Rupees 700/- Seven hundred (fixed) per mensem.

'৭০০' টাকা নির্দিষ্ট মাহিনার এই শর্তের প্রতিবাদে হরিদাসবাবু রেজিস্ট্রারকে লিখেছিলেন : (১৮.১২.১৯২৩)

"This is the first official intimation that I have received from the University that the maximum has been reduced from Rs 1200/- to Rs 700/- in the case of Readers ... Taking all the facts together the matter comes to this that instead of a maximum of 1200/- pay and 120/- as P.F. contribution of the University I am being offered now practically half of what was in the original offer and this inspite of the fact that I wanted a definite assurance from the Vice-Chancellor that the maximum offered would not be varied from ..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার স্মরণমতে হরিদাসবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রিডার' হিসেবেই অবসর গ্রহণ করেন ১৯৪৫ সনে। অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫২ বছর। (সে হিসেবেও হরিদাসবাবুর জন্ম সন নির্দিষ্ট করা যায় ১৮৯০ সাল।) এই দীর্ঘ সময়ে অর্থাৎ ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে প্রায় পঁচিশ বছর কার্যকালে তাঁর মাহিনার সেই নির্দিষ্ট ৭০০ টাকার কোনো পরিবর্তন ঘটেছিলো কিনা, আমার জানা নেই।

বাংলাদেশের যেমন রাজনীতি আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমনি রাজনীতি আছে। ইংরেজিতে আমরা বলি 'ইউনিভার্সিটি পলিটিকস'। এটি নিশ্চয়ই কোনো আধুনিক উপাদান নয়। এটি সেকালেও ছিল। তবে একালের মতো হয়ত সেকালে এত প্রকট বা পোশাক-আশাকবিহীন ছিল না।

এই রাজনীতির আভাসই পাওয়া যায় হরিদাসবাবুর জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একসিকিউটিভ কাউন্সিলের ১০.২.১৯৩৭ তারিখের কার্যবিবরণী থেকে।

হরিদাসবাবু ১৯৩৫ সনে কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সনে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হলে জগন্নাথ হলের জন্য নতুন প্রভোস্ট নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এতদিন জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। সেকালে হলের প্রভোস্ট পদও স্থায়ী চাকরি বলে গণ্য হতো এবং সেই হিসেবেই প্রভোস্ট নিযুক্ত হতেন।

উল্লিখিত তারিখে একসিকিউটিভ কাউন্সিলে বিষয়টিকে আলোচ্য বিষয় করা হয়। সভার কার্যবিবরণীটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে সেকালের বিশ্ববিদ্যালয় পলিটিকস-এর পরিচায়ক হিসেবে। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পান্ন উদ্যোগী এবং কর্মীপুরুষ হরিদাস ভট্টাচার্য যে অজাতশত্রু ছিলেন, এমন মনে করা যায় না। তবে তাঁর গুণগ্রাহীরও অভাব ছিল না। তাই দেখা যায়, সে সভার শুরুতে হরিদাস ভট্টাচার্যকে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট পদে নিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন ড. এন.এম. বসু এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। কিন্তু এ প্রস্তাবের বিরোধিতা আসে জনাব এস.এ. সেলিম এবং সুলতান উদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে।

তাঁরা কয়েকটি নামের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করে সেই কমিটির কাছে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রেরণ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু যাঁদের নিয়ে এই কমিটি গঠনের প্রস্তাব হয় তাঁদের মধ্যে পি.এন. রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায় এবং মূল প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় :

"Original motion was put to vote and carried, eight members voting for it and three members against. Messrs Fazlur Rahman, Sultan uddin Ahmed and S.A. Salim voted against the motion"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সভারই শেষে অবশ্য ফজলুর রহমান এবং সেলিম সাহেবও হরিদাসবাবুর প্রভোস্ট নিয়োগে সম্মত হয়েছিলেন।

একসিকিউটিভ কাউন্সিলের এই প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হরিদাসবাবুর নিকট ১০.২.৩৭ তারিখে প্রেরণ করে লিখেছিলেন :

Dear Sir,
I am directed to communicate to you the following resolution of the Executive Council adopted at its meeting on 10th February, 1937 :
"That Mr. H. D. Bhattacharyya, M.A.B.L. Head of the Department of Philosophy, be appointed Provost of the Jagannath Hall on an allowance of Rs. 150/- per mensem and free quarters for a period of two years in the first instance, with effect from the 11th February, 1937 and that with approved service the appointment may be renewed up to the end of the session in which he will attain the age of 55 years."

১৯৫৪ সনে হরিদাসবাবু চুক্তি মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের রীডার হিসেবে অবসর গ্রহণ করে কলকাতা চলে যান। পঞ্চান্ন বছর তখন তাঁর বয়স। সে বয়স কর্মক্ষম থাকার বয়স।

হরিদাস ভট্টাচার্যের জন্য অবসর গ্রহণের বয়স ছিল না। হরিদাবাবু কি তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কোনো আবেদন বা চেষ্টা করেছিলেন? সেদিনকার গোবেচারী ছাত্র আমার তা জানা নেই। হরিদাসবাবুর ব্যক্তিগত নথিটিও '৩৭ সনের পর থেকে নিরুদ্দিষ্ট। হয়তো চেয়েছিলেন, কিংবা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার তিক্ততায় তার ভরসা পান নি। যেমন ভরসা পান নি বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনিও তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়সের পূর্তি বা তার পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন, কারণ আচার-আচরণে যথার্থ দার্শনিক অধ্যাপক বসু তাঁর চারপাশে গুঞ্জন শুনছিলেন। সে গুঞ্জনের প্রধান উৎস ছিলেন করিৎকর্মা মুসলমান রাজনীতিক জনাব ফজলুর রহমান। তিনিই সরবে দাবি তুলেছিলেন, 'আমাদের একজন মুসলমান পদার্থবিজ্ঞানী আবশ্যক। সত্যেন্দ্রনাথ বসু হিন্দু।' অবশ্য অধ্যাপক বসুকে আরো কিছুদিন রাখারও যে প্রচেষ্টা চলে নি তা নয়। কিন্তু অধ্যাপক বসু চান নি তাঁকে নিয়ে এপক্ষে ওপক্ষে টানা-হ্যাঁচড়া হোক। তাই তেমন প্রচেষ্টার উদ্যোক্তাদেরও নিবৃত্ত করে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন।

হরিদাস ভট্টাচার্যের আলেখ্য একটি প্রবন্ধে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। এ কেবল তাঁকে স্মরণ করার প্রয়াস। হরিদাসবাবু ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সেই কালের একটি কৌতুকজনক তথ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ধর্ম হিসেবে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান বলে তালিকাভুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয়। কিন্তু ১৯২১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে ছাত্রদের, বিশেষ করে হিন্দু ছাত্রদের কেবল হিন্দু বলে শ্রেণীভুক্ত করা হয় নি। তাদেরকে ব্রাহ্মণ এবং অ-ব্রাহ্মণ বলেও ভাগ করা হয়েছে। এই তথ্যটি কালের নির্দেশক হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। ছাত্র বিবরণীর চার্টটি তাই তুলে দেওয়া গেল :

RACE OR CREED OF PASSED SCHOLARS	HONS BA	PASS BA
Europenas & Anglo Indians	X	X
Indian Christians	X	X
Hindus : Brahmans	5	12
Non-Brahmans	21	69
Muhammedans	11	20

হরিদাসবাবু সম্পর্কে এই আলোচনাটি ব্যক্তিগত একটি বিষয়ের উল্লেখে শেষ করা যায়। হরিদাস ভট্টাচার্য আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র ছিলেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অকৃপণভাবে তাঁর পরিশ্রমী, ধীমান ছাত্র হরিদাস ভট্টাচার্যের জন্য প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। অধ্যয়ন শেষে শিক্ষক তথা বিভাগীয় প্রধানের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করা ছাত্রদের পক্ষে একটি বোধ্য প্রয়াস। হরিদাসবাবু সম্পর্কে তাঁর ছাত্র হিসেবে আমার এই স্মৃতিটি আনন্দের এবং অনুপ্রেরণার যে তিনি ঢাকা থেকে চলে যাবার পরেও ১৯৪৭ সালে তাঁর কলকাতার বাড়ি থেকে নিজের টাইপ মেসিনটিতে নিজের হাতে টাইপ করে তাঁর সেই পরিচিত 'এইচ ডি, ভট্টাচারিয়ার' স্বাক্ষরে আমাকে একটি প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন। সে প্রশংসাপত্র পেয়ে আমি যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছি, তেমনি তাঁর প্রশংসাবাচক উক্তির উপযুক্ত নই বলে বিব্রত বোধ করেছি। এমন প্রশংসাপত্র ব্যবহার বা বিক্রি করে কোনো জাগতিক উন্নতি লাভ করতে আমি সঙ্কোচ বোধ করেছি, কিন্তু প্রশংসাপত্রটি তার মূল কাগজ খণ্ডটিতে রক্ষা করতে পেরে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। এ প্রশংসাপত্র টিকিধারী ব্রাহ্মণ দার্শনিক অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য যে তাঁর স্নেহভাজন একটি কিশোর ছাত্রের প্রশংসায় তাঁরই শিক্ষক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতোই অকৃপণ এবং উদার ছিলেন সেই সাক্ষ্যই বহন করছে, আমার নিজের কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর নয়। ইতিহাসের বিষয় বলেই তাঁর কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"Apart from his intellectual briliance, Mr. Sardar has been a steadying force in the Department. Genial by temperament and social to a fault, Mr. Sardar has proved a cementing force among various sections of students, belonging to different halls of the university and I can testify from personal knowledge to his popularity as a student of the universtity. He was also noted for

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

his social service and his sympathy for the poor and the needy. His teachers are all praise for him and justifiably so."

দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এমন প্রশংসাপত্রের পুরো উদ্ধৃতিতে প্রায় চল্লিশ বছর পরে আজো আমি সঙ্কুচিত। তবে এতে মনোবিজ্ঞানী হরিদাস ভট্টাচার্যের এমন প্রত্যয়টিও ধরা পড়ে যে তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রশংসা করেই মাত্র স্নেহভাজনকে প্রশংসার যোগ্য হওয়ার প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

হরিদাস ভট্টাচার্য আজ বেঁচে নেই। কবে তিনি প্রয়াত হয়েছেন, তার তারিখ বিনা অনুসন্ধানে বার করা ঢাকায় তাঁর পুরাতন ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ১৯৫৫ সনের ৯ সেপ্টেম্বর হরিদাস ভটাচার্যের মৃত্যুর তারিখটি সেদিনের পাকিস্তানভুক্ত ঢাকার কোনো কাগজে সংবাদ হয়েছিলো কি না, আমার জানা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা দর্শন বিভাগ প্রতিষ্ঠানগতভাবে তার প্রতিষ্ঠাকালের অন্যতম সংগঠক শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্যকে স্মরণ করেছিলো কিনা সেটিও আমার অজ্ঞাত। জগন্নাথ হলের বর্তমান প্রাধ্যক্ষ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রঙ্গলাল সেন অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন, তখনকার ঢাকা-জগন্নাথ হলের যুক্ত ছাত্রাবাসের প্রভোস্ট এবং ছাত্রগণ একটি শোকসভায় মিলিত হয়ে হরিদাস ভট্টাচার্যকে সেদিন স্মরণ করেছিলেন। ইতিহাসকে বিস্মরণের প্রবাহে তাঁরা সেদিন অন্তত একটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, হরিদাসবাবুর একজন ছাত্র হিসেবে এজন্য জগন্নাথ হলের ছাত্রদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

মিস এ.জি. স্টকের স্মৃতিকথা

শুনলাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের এক সময়কার ইংরেজ অধ্যাপিকা মিস এ.জি.স্টক কয়েকদিনের জন্য আবার ঢাকায় বেড়াতে এসেছেন। আমি নিজে তাঁর নিকট পরিচিত নই। তাহলে আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আসতাম। ইংরেজি বিভাগ থেকে, শুনেছি, একটি সংবর্ধনা জানানো হবে। তাতে জোর করে উপস্থিত হওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু সেটি বড় কথা নয়। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় অপরিচয় বড় নয়।

মিস স্টকের নামের সঙ্গে আমি সেই '৪৭ সালের দিকেই পরিচিত হয়েছিলাম। অবশ্য তিনি যখন ভারত বিভাগের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে এসে যোগ দেন, তখন একদিকে যেমন আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে, তেমনি অপরদিকে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছে। পুলিশের দৃষ্টি আমার ওপর পড়তে শুরু করেছে। এর ফলেই ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি আমি নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাই। আর তারপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে গ্রেফতার হওয়া থেকে আমার দীর্ঘ বন্দীজীবনের শুরু হয়। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মিস স্টকের সাহচর্যে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিন্তু যে সাহচর্য আমি সাক্ষাৎভাবে লাভ করি নি সেটিই পেয়েছিলাম আজ থেকে বছরখানেক আগে তাঁর ঢাকার স্মৃতিচারণমূলক 'নাইনটি ফরটি সেভেন টু ফিফটিওয়ান মেময়ের্স অব ঢাকা ইউনিভার্সিটি' শিরোনামে বইখানি যখন পড়ি। তাঁর এই স্মৃতিচারণের মধ্যে মিস স্টক একজন দরদী ও জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে কেবল প্রকাশিত হন নি, তিনি পূর্ব বাংলার সে সময়কার ছাত্র-শিক্ষক-মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল ভাষা-সংস্কৃতির আন্দোলনের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বইখানা প্রথমে যখন পড়ি তখন আমার খুবই ভালো লেগেছিলো। এর প্রধান কারণ, ১৯৪৭-৫১—এই সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকে জানার আমারও একটি আগ্রহ আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি ছাত্র ছিলাম। কিছুকাল এর শিক্ষকও ছিলাম। আজ আবার এর সঙ্গে শিক্ষক হিসেবে জড়িত হয়েছি। অধ্যাপিকা মিস স্টকের সরস ও সুন্দর অর্থময় উক্তিপূর্ণ স্মৃতিচারণ আমাকে সেই সময়কার জীবনে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতায় ঋদ্ধ এবং সে কারণে এই স্মৃতিচারণ পাঠে একটা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবোধ আমার মনকে পূর্ণ করে তুলেছিলো। রোজনামচার আকারে লিখিত এ স্মৃতিচারণে অধ্যাপিকা স্টক তাঁর সেই বিলেত থেকে ঢাকা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি গ্রহণ করা থেকে ১৯৫১ সালের শেষে পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তান সরকারের নির্বোধ আচরণের ফলে ক্রমাধিক পরিমাণে সৃষ্টি সাম্প্রদায়িক হত্যা এবং রাজনৈতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ঢাকা ত্যাগের সময় পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। কেমন করে ধীরে ধীরে তিনি পরিচিত হয়েছেন পূর্ববঙ্গের জীবনের সঙ্গে। তারা আবহাওয়া-রাস্তাঘাট-মানুষের সঙ্গে। কেমন করে হৃদ্যতা তৈরি হয়েছে তাঁর বিশ্বস্ত বাবুর্চি আবদুল থেকে ছাত্র, শিক্ষক সম্প্রদায়ের বুদ্ধিমান, সমাজসচেতন চরিত্রসমুহের সঙ্গে। মুনীর চৌধুরী, সারওয়ার মুর্শিদ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. পি সি চক্রবর্তী, কবি জসিমউদ্‌দীন, ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাহমুদ হাসান এঁরা সবাই অন্তরঙ্গ রেখাচিত্র হিসেবে তাঁর রোজনামচায় ফুটে উঠেছেন। রচনার সমগ্রটিতে একজন দরদী সুহৃদের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপিকা মিস স্টকের এ রচনা ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের হলেও এটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন সেটি তিনি কখনো বিস্মৃত হন নি। তাঁর সেই অকৃত্রিম সম্পর্কের টানেই তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার ঢাকা এসেছিলেন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে। তখনি তিনি এই পাণ্ডুলিপিটি ঢাকার গ্রীন বুক হাউজের রুচিবান প্রকাশক মাহমুদ সাহেবের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। গ্রন্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখিকা তাঁর মূল রচনার পরবর্তীকালের ঘটনাবলির আভাসও তাঁর ভূমিকাতে দিয়েছেন। সে ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

... I had reached the language riot of nineteen forty eight when the war brokeout in march 1971 and the present came horryfyingly to life on screen, radio and the newsprint smothering memories. It was months before I learnt anything of the fate of my friends Jyotirmoy guha thakurta was killed in the presence of his students, Munir chowdhury, with his gallantry and gaiety was a body among many bodies in the brickfield ...

আমার স্মৃতিচারণে আমি ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে যখন পৌঁছি তখন ১৯৭১-এর মার্চে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এবার অতীতকে আচ্ছন্ন করে মর্মান্তিক বর্তমান আমার সামনে এসে হাজির হলো। ছবিতে দৃষ্ট সে দৃশ্য, বেতারে শ্রুত তার কাহিনী আর নিউজপ্রিন্টে মুদ্রিত তার বিবরণ আমার অতীতের স্মৃতিকে একেবারে রুদ্ধ করে দিল। কিন্তু বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে আমি জানতে পারলাম না আমার সেদিনের বন্ধুদের কার ভাগ্যে কী ঘটেছে। অবশেষে জানলাম জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁর ছাত্রদেরই সামনে। সদাহাস্য মুনীর চৌধুরী একটা ইটের ভাটিখানায় বহু মৃতদেহের একটি মৃতদেহে পর্যবসিত হয়েছেন। ...

মিস এ জি স্টকের এই স্মৃতিচারণ একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। সাহিত্যপত্র এবং সাহিত্যিক মহলে বইখানির আলোচনা হওয়া উচিত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের যেমন এ একটি উত্তম সৃষ্টি, তেমনি পূর্ববাংলার ১৯৪৭-৫১ সময়কালের জীবন ও নানা চরিত্রের অন্তরঙ্গ আলেখ্যে এ গ্রন্থ অনন্য। বাংলা অনুবাদে মিস স্টকের প্রকাশ মাধুর্য হয়ত রক্ষিত হবে না, তবু ১৯৪৭ থেকে '৫১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের একখানি অনুপ্রেরণাদায়ক অন্তরঙ্গ ইতিহাস হিসেবে এর অনুবাদ হওয়া প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয়।

সানাউল হক : চল্লিশের দশকের অন্যতম সাথী

প্রায় ১২ বছর আগে, '৮১ সালের জানুয়ারি মাসের এক রাতে আকস্মিকভাবে টেলিভিশনের আওয়াজে শুনেছিলাম সৈয়দ নূরুদ্দিনের প্রয়াণের কথা। ১২ বছর পরে '৯৩-এর ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে টেলিভিশনের শেষ সংবাদ পাঠিকার কণ্ঠে খবর পেয়ে চমকে উঠলাম : আমাদের চল্লিশের দশকের অন্যতম সুহৃদ, সাথী, কবি সানাউল হকও চলে গেছেন।

সানাউল হক অসুস্থ ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখনো তিনি আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলছিলেন। বাংলা একাডেমির তিনি সভাপতি ছিলেন। বোধহয় একুশের এক বক্তৃতায় তিনি অপ্রত্যাশিত সাহসী বক্তব্য উপস্থিত করে আমাদের চমকে দিয়েছিলেন। আমাদের নিজের সাংসারিক জীবনের নানা সঙ্কট ও সীমাবদ্ধতার কারণে মনের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সানাউলের কাছে গিয়ে বসতে পারি নি। অথচ নিজের মনে তার সঙ্গে কখনো আমার অন্তরের কথা বন্ধ হয় নি।

সানাউল, নূরুদ্দিন : দুজন বোধহয় একই বয়সের ছিলেন। বয়সে আমার জ্যেষ্ঠ। কিন্তু সম্পর্কে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কখনো বয়সের কোনো প্রশ্ন আসে নি। আসলে আমরা সেদিন, সেই রূপকথার যুগে, জানতামই না আমাদের কার বয়স কতো। আমরা কেউ কারুর চাইতে ছোট কিংবা বড় ছিলাম না। সকলেই সকলের সমান। নূরুদ্দিন তো বটেই, সানাউল হকের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ছিল পরস্পরের 'তুমি' সম্পর্ক। কেমন করে আমরা সেদিনই, এই পূর্ববঙ্গের উত্তর পশ্চিম পূর্বদক্ষিণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশ্রমে' এসে মিলিত হয়েছিলাম তার কোনো হদিস আজ চেষ্টা করেও আমি বার করতে পারছিনে। জল যেমন নিঃশব্দে জলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়, নদী যেমন পূর্ণতার টানে সাগরে মেশে, আমরাও সেদিন জল আর নদীর মতো নিজেদের অজান্তেই পরস্পরের অন্বেষণে ছিলাম এবং সেই অন্বেষণে পরস্পরকে লাভ করেছিলাম। আর তাতেই তৈরি হয়ে উঠেছিলো নতুন জীবন ও স্বপ্নের বোধে উদ্বুদ্ধ সুহৃদ ও সাথীর একটি গোত্র। সেই গোত্রের পরস্পরের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা আর হৃদ্যতার কথা একালের তরুণ-তরুণী, এমন কি বয়স্কদেরও বুঝিয়ে বলা, লিখে জানানো একেবারে অসম্ভব। আর তাই আমি যখন সানাউলের বাড়িতে গিয়েছি, কিংবা টলস্টয়ের জন্মের ১৫০ তম বার্ষিকীতে একই মঞ্চে যে যার ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি, তখন আমাদের পারস্পরিক দৃষ্টিতে যে প্রীতি ও স্মৃতির আবেগ উদ্ভাসিত হতো, তা অপর কারুর পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব হত না।

AMARBOI.COM

পূর্ববঙ্গের এমন অঞ্চল আছে যে অঞ্চলের দুই সুহৃদ একান্তভাবে পরস্পর সংলাপে রত হলে অপর অঞ্চলের মানুষের পক্ষে তার মর্মার্থ অনুধাবন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তেমনি আমাদের অবস্থা হত যখন সানাউল, নূরুদ্দিন, মতিন, মুনীর, কামাল, নূরুল ইসলাম, বাহাদুর একালেও মিলিত হতাম এবং একে অপরকে প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতাম। তখন একালের পারিপার্শ্বিক যেন অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের চোখে ভেসে উঠত জিজ্ঞাসা, এরা কারা, এদের এমন গভীর প্রেম আর প্রীতির রহস্য কি?

নূরুদ্দিন চলে যাওয়ার পরের দিনও আমার এই কথাগুলো মনে হয়েছিলো। আজ ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে সানাউলের জানাজায় শরিক হয়ে মসজিদ থেকে নেমে আনমনে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে কথাগুলোই মনে পড়ছে। ক্রমান্বয় একটা সঙ্গীহীনতার অসহায়তা যে বৃদ্ধি না পাচ্ছে, তা নয়। যথার্থই ক্রমান্বয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীহীন হয়ে পড়ার একটা অসহায় এবং অনিবার্যতার বোধ মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

না, দিনক্ষণ মনে করতে পারছিনে। আনন্দে বিষাদে সঙ্কটে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ফজলুল হক হলের বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে, যুদ্ধের মধ্যে লাভ করা আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের সৈনিকদের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শের 'কমরেডদের' সঙ্গে সাহিত্যের আসরে, কিংবা তাদের উদ্যোগে ক্যান্টনমেন্টের সেনাছাউনিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে সংগঠিত বিতর্কে আমরা কে কী বলেছি তা স্মরণ করতে পারছিনে। এমন কি '৪৬ সালের কলকাতার গণহত্যার খবরে উদ্বেগে অস্থির হয়ে আমরা কেমন করে ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে চক-ইসলামপুর-পাটুয়াটুলি-নবাবপুরের মধ্য দিয়ে যে শান্তি মিছিল সংগঠিত করেছিলাম, তাতে সানাউল আমার সামনে কিংবা পেছনে ছিলো তা কেমন করে বলব? কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক সমগ্র উদ্যোগ ও আয়োজনে যে সানাউল থাকত, থাকত মুনীর, নূরুদ্দিন, মতিন : এতে কোনো সন্দেহ নেই।

একটা কথা ভাবতে আমার অবাক লাগে : কোনো বর্তমানই সমস্যা ও সঙ্কটমুক্ত নয়। তাই কোনো বর্তমানের মানুষই নিজেকে নিশ্চিন্ত আর সুখী বোধ করতে পারে না। কিন্তু চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে তার সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনে লালিত-পালিত হচ্ছিলাম যে-আমরা, তারা রাজনৈতিক সঙ্কটে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হলেও, নতুন স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ আমরা নিজেদের সেই জীবনকে মনে করতাম ভাগ্যবান জীবন। মানুষের মুক্তির তত্ত্বের সন্ধান লাভে আমরা ভাগ্যবান ছিলাম। সোমেনকে লাভ করার আমাদের ভাগ্য হয়েছিলো। আশ্রম-সম বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে আমাদের তথা সানাউলের, নূরুদ্দিনের, মুনীরের, মতিনের, নাজমুল করিমের, মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর, আমার ভাগ্য হয়েছিলো বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুকে লাভ করার, ভাগ্য হয়েছিলো জ্ঞানতাপস ড. শহীদুল্লাহর স্নেহ সাহচর্যে ধন্য হওয়ার, ভাগ্য হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমগ্র বঙ্গদেশ এবং ভারতের প্রগতিপন্থী চিন্তাধারার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়ার। এ কেবল স্মৃতির কথা নয়। এ আমাদের সকলেরই সেই কালেরই সচেতন বোধের ব্যাপার ছিল।

আর সে কারণেই অসুস্থ শরীরে সানাউলের মন যখন ভেঙে পড়ল, যখন তার একটি প্রকাশিত কবিতার প্রধান অনুরণন ছিল, 'আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি', তখন সে কবিতা পাঠ করে বন্ধুবর মতিনের মতো আমার মনও বেদনায় ভরে উঠেছিলো। একথা জানতাম, সেই অসুস্থ অবস্থায় সানাউল হকের কাছে গিয়ে সান্ত্বনা বা আশার কথা বলা নিরর্থক ছিল। তবু সানাউল তথা আমরা, সেই চল্লিশের দশকের সুহৃদরা, সাথীরা তাদের স্বপ্ন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি নিঃশেষ আর ব্যর্থ হয়ে গেছি? শরীর দুর্বল হলে অনিবার্যভাবে মনও আমাদের দুর্বল হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে। তবু সেই অসুস্থ শরীরের হাহাকার এবং আফসোস কি একদিনকার আশাবাদী তরুণ সানাউলদের নিষ্ঠা, আদর্শ ও স্বপ্নের অবদানকে মিথ্যে করে দিতে পারে? যদি আমার সাধ্য থাকত তবে আমি সেই কবিতাটি পাঠ করার পরে সানাউলকে গিয়ে বলতাম, না, তুমি নিঃশেষ হয়ে যাও নি, তুমি ব্যর্থ হয়ে যাও নি। তুমি মানেই আমরা, আমরা মানেই তুমি। আমি নিজে সেদিন সানাউলের কাছে যেতে পারি নি। এই না পারার অক্ষমতার দুঃখই আজ সানাউলের মৃত্যুর খবর হঠাৎ ৪ তারিখে শুনে আমার মনে বড় হয়ে বাজল।

এই রোজনামচাটি শেষ করার মুহূর্তে হাসনাতের কাছ থেকে ১৯৯০ সালে নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে প্রকাশিত সানাউল হকের 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য' বইখানা পেলাম। বইখানাকে সানাউল উৎসর্গ করেছেন একালের মননশীল সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল হাসনাত ও সংস্কৃতিবান কর্মী আফজাল হোসেনকে। এই উৎসর্গটিতে কবি সানাউল হকের প্রিয়জনদের জন্য স্নেহ ও মমতার একটি অনাবিল প্রকাশ ঘটেছে।

আমার আফসোস, সানাউলের জীবৎকালে এই গ্রন্থখানির আমি খবর রাখতে পারি নি। তাঁর ছেলেবেলার কাহিনী বেরিয়েছিলো, তা আমি জানতাম। কিন্তু সানাউল তার সেই চল্লিশের দশকের তারুণ্যে, কলেজে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে, দিনের পর দিন জীবনের নানাদিকের ওপর তার চিন্তাপূর্ণ মন নিয়ে সুন্দর কাব্যময় গদ্যে দিনলিপি রচনা করে যে ভবিষ্যৎকালের জন্য রক্ষা করেছেন, তা আমি জানতাম না। তাঁর এ দিনলিপি সমগ্র বাংলাসাহিত্যে একটি মূল্যবান ও তাৎপর্যময় সংযোজন বিশেষ। সানাউলের এই দিনলিপি নিয়ে উপযুক্তভাবে কি ঢাকার সাহিত্যিক মহল আলোচনা করেছেন? আমি তেমন আলোচনা সম্পর্কে জ্ঞাত নই।

আমি এখনো সানাউলের দিনলিপি পাঠ শেষ করতে পারি নি। তবু তার মধ্যে থেকে ১০ বৈশাখ ১৩৪৫০ তথা ১৯৪৩ সালে লিখিত এবং ২৪.৭.১৯৪৩ তারিখে লিখিত দুটি দিনলিপির পাঠ মুহূর্তে আমার এই প্রৌঢ়ত্ব থেকে ৫০ বছর ছেঁটে ফেলে আমাকে পৌঁছে দিল একেবারে কিশোর তারুণ্যে।

'বৈশাখ দশ, ১৩৫০, সাতগাঁও

ভারতের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। বর্তমান শতকে এমন বহুধাবিভক্ত আর দুর্দশাগ্রস্ত দেশ হয়ত একটিও নেই। পৃথিবীর আর সব দেশ যখন নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রয়োগে নব নব সম্ভাবনাকে রূপ দিচ্ছে তাদের কর্মে ও চিন্তায়, ভারত তখন পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান, এই দোটানায় পড়ে পড়ে দিন দিন নির্জীব ও শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। তার অখণ্ডত্বের ও দ্বিখণ্ডত্বের মধ্যে দর কষাকষি হচ্ছে বিস্তর, অথচ যাকে নিয়ে এ তোলপাড় তার দিকে নজর নেই কারো—এ যেনো মার্কামারা থান কাপড়ের মতো। তাকে ছেঁটেকেটে টুকরো করলেও যা, আস্ত রেখে ফরাশ পাতলেও তা। যে ব্যবহার করবে, তার রুচিতেই নির্ধারিত হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব কিছু, যাকে ব্যবহার করা তার 'জো হুজুর' করা ছাড়া যেনো নিস্তার নেই। ধর্ম ও সংস্কার তীক্ষ্ণ কাঁচির মতো হাঁ করে আছে কার হাতে শিকার পড়বে, শুধু এই ভাবনা। জিন্না ও সাভারকর, দুই ভিন্ন স্বার্থের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন। একজন কথার তুবড়িতে আর একজনকে উড়িয়ে দেন—দলের লোক চেঁচিয়ে বলে, শাবাশ নওজোয়ান জিতে রাহো। সাগর পাড়ের মুরুব্বিরা আশ্বস্ত হয়ে, একের অগোচরে অন্যকে উৎসাহ দেন।'

আবার ২৪.৭.৪৩ তারিখের দিনলিপিতে সানাউল আমাদের নিয়ে যান সেকালের প্রতিক্রিয়া ও রক্ষণশীল শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সানাউল ও তার 'কমরেডদের' সাহসী উদ্যম উৎসাহ, প্রয়াস-প্রচেষ্টার জমিনটিতে।

২৪.৭.১৯৪৩

'আমাদের হলের জনৈক বিলাত-ফেরত উচ্চ শিক্ষিত (?) হাউজ টিউটর আমাদের কমরেড রবিগুহ ও প্রত্যক্ষ দত্তের হলের প্রবেশাধিকার নিয়ে যে তুমুল হৈ চৈ করে আমাকে ধমকালেন, তা শালীনতা, ভদ্রতা ও ভব্যতার বাইরে। তার কথাগুলো এতো জ্বালাময়ী যে তা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হতে বাধ্য হলাম। মানুষের চরমতম নিচাশয়তার পরিচয় জীবনে আমি বহুবার দেখেছি, কিন্তু তাতে মনে এতটা বাজে নি। কিন্তু আজ যখন হিন্দু-মুসলমান উভয়ের শিক্ষাদান-কর্তব্যে নিযুক্ত এই শিক্ষক এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই দু'টি ছাত্রের হলের আগমন নিয়ে এমন কাণ্ড বাধালেন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তথা শিক্ষাগার সম্বন্ধে আমি ঘোর সন্দিহান হয়ে উঠতে বাধ্য হলাম। আমাদের আজ বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুধু বিধর্মী হলেই মানষ মানুষের শত্রু নয়, অন্যপক্ষে এক ধর্মাবলম্বী মানুষই পরস্পরের বন্ধু নয়।'

সানাউলের সংযত রুচিপূর্ণ বাকভঙ্গিটি চোখের সামনে আজ ভেসে উঠছে। আমি যেন আমার সদ্যপ্রাপ্ত তাঁর 'তারুণ্যের দিনলিপি' নিয়ে তাঁকে অবাক করে দেওয়ার জন্য রহস্য করে বলছি, দেখ তো, এই লেখকটিকে তুমি কি চিনতে পারো?

সানাউল অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দপূর্ণ আবেগে অসুস্থ শরীরেও হেসে ওঠার চেষ্টা করে বলছেন, আরে সরদার! এ বই তুমি কোথায় পেলে? তোমাকে দেব বলে ভেবেছি। কিন্তু দেওয়া তো হয় নি।...

আমি সানাউলকে বলছি, তাতে আমার কোনো অভিমান নেই। তোমার এ বই নিয়ে আমাদের অবশ্যই আলোচনা করতে হবে।...

আমার আফসোস এজন্য আরো যে, সানাউল বেঁচে থাকার সময়ে আমি তাঁর ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বিরতিবিহীন'-এর উৎসর্গপত্রটি দেখি নি যেখানে তিনি তাঁর চল্লিশের দশকের সতীর্থদের উল্লেখ করে বলেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কবীর চৌধুরী
ওয়াদুদুল হক
সরদার ফজলুল করিম
চল্লিশের দশকের সহমর্মিতার বন্ধুত্রয়—"

৭.২.৯৩

ওজনের বেলা করিও না হেলা

'ওজনের বেলা করিও না হেলা,
মাপকাঠি তব রাখিও সমান ...'

শুধু এই বয়াতটিই আমার মনে আছে। সেই ছোটকাল থেকে। তখন আরো বয়াত আমার মুখস্থ ছিল। কোরানের সুরা 'আর রহমান'-এর বোধ হয় একখানি কাব্যিক অনুবাদ মিয়া ভাই সাহেব এনে দিয়েছিলেন। সে বইয়ের সবটাই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। বাড়ির সকলে ডেকে ডেকে আমাকে বলতেন, তুমি পড়ো তো একটু সেই বইখানা। কিন্তু বড় হয়ে, সব ভুলে গেছি তার পদ। কেবল মনে আছে এই দু'টি ছত্র। 'ওজনের বেলা করিও না হেলা, মাপকাঠি তব রাখিও সমান।' কথাটি সুন্দর। মনকে উদ্বুদ্ধ করে। ওজনের বেলা সতর্ক থেকো। দেখো, যেন সেখানে কোনো এদিক-ওদিক না হয়। যার যা প্রাপ্য তাকে তা ঠিকমতোই দিবে।'

AMARBOI.COM

জীবনের জন্য এ এক মৌলিক নির্দেশ। আর এই নির্দেশ পালনেই আমাদের যত ব্যর্থতা। মিয়া ভাই সাহেব নিশ্চয়ই আজো জানেন, কোরানের এই কবিতার অনুবাদের অনুবাদক কে? এই বই কি এখন পাওয়া যায়! গতকালের (১৩.৭.৮৩) সাক্ষাতে তাঁকে প্রশ্নটি করেছিলাম। আমার প্রশ্নে মিয়া ভাই খুশি হলেন। বললেন, 'মীর ফজলে আলী অনুবাদ করেছিলেন। কেবল সুরা আর রহমান নয়। আরো বেশ কিছু সুরা। তাই নিয়ে বই বার করেছিলেন। নাম 'কোরানকণিকা'। বইখানি এখন আবার ছাপা হয়েছে। এসলামী বইয়ের দোকানে তুমি পাবে। আমারও বোধ হয় আছে একখানা। কোথায় আছে ঠিক নেই। পেলে তোমাকে আমি দিয়ে দেব।'

বইখানাকে খোঁজ করে দেখতে হবে, পাই কিনা। বইখানি আবার আমার পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে।

বরিশাল শহর থেকে আট মাইল পশ্চিমে রহমতপুর। রহমতপুরে আমার বড় ভাই সাবরেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৯৩৪-৩৫ সালের কথা। জমিদার বাড়ির কাছে হাই স্কুল। বেশির ভাগ ছেলেই হিন্দু। মুসলমান কম। হেডমাস্টার উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন। সেকালের হেডমাস্টাররা সবাই প্রায় বড় ছিলেন। আজকাল তেমন বড় হেডমাস্টার খুব পাওয়া যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু রহমতপুর স্কুলকে আমার যে কারণে স্মরণ হয় তার একটি : যে বাড়িটিতে আমরা থাকতাম সেই বাড়িটির কারণে। আর দ্বিতীয়টি আমার ক্লাসের বন্ধু কানাইয়ের কারণে। গ্রামের মধ্যে আমাদের সেই বাড়িটি, অর্থাৎ বড় ভাই-এর অফিস-কাম-বাসা বাড়িটি ছিল সুন্দর দোতলা দালান। সেকালে এমন বড় দোতলা দালান হিন্দু পাড়া ব্যতীত কোনো মুসলমান পাড়া বা বাড়িতে ছিল না। কিন্তু এই বাড়িটি ছিল বরিশালের ওয়াহাব খান সাহেবের বাবার। ওয়াহাব খান বরিশালের উকিল ছিলেন। আরো পরবর্তীকালে তিনি হক সাহেবের দলের নেতা ছিলেন এবং ১৯৫৬-৫৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের স্পিকার হয়েছিলেন। তাঁদের বাড়িটি, আমি যেকালের কথা বলছি, সেকালে প্রায় পোড়ো বাড়ি হয়েছিলো। কারণ এ রকম কথা শুনেছিলাম যে পারিবারিক কোনো বিবাদের কারণে ওয়াহাব সাহেবদের কোনো নিকটজন এই বাড়িতে নিহত হয়েছিলেন। সামনে বাঁধানো ঘাটের বড় পুকুর। পেছনে আম-সুপারির বড় বাগান। পেছনে আর একটি বাঁধানো ঘাটের পুকুর। মেয়েদের জন্য। চারদিকে দেয়ালঘেরা। মোটকথা, জমিদারের এক বাগান বাড়ি-প্রায়। বাড়ির সামনে পাকা দোতলা মসজিদ।

কিন্তু মারাত্মক ঐ ঘটনার পর থেকে বাড়িটি খালি পড়েছিলো। ওয়াহাব খান সাহেবের পরিবার-পরিজন গ্রাম ছেড়ে ৭/৮ মাইল দূরে বরিশাল শহরে স্থায়ীভাবে উঠে গেলেন। পরে সরকারের তরফ থেকে বাড়িটিতে রেজিস্ট্রেশন অফিস বসানো হলো। দোতলা দালানের নিচতলাতে অফিস। ওপরের তলাতে সাবরেজিস্ট্রারের বাসা। এ বাড়িটা কেবল পোড়ো এবং ভূতুড়ে ছিল না। সত্যি এতে ভূত ছিল। কোনো সাবরেজিস্ট্রার এখানে বদলি হয়ে আসতে চাইতেন না। এলেও বেশিদিন থাকতেন না। আমার বড় ভাই ধার্মিক পরহেজগার মানুষ। ভূতে বিশ্বাস করেন না। বাড়ির বদনাম সত্ত্বেও তিনি আগ্রহ করে বদলি হয়ে এ বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি এসে ভূত তাড়িয়েছিলেন।

একদিন রাতে, দোতলাতে আমি এবং আমার বোন ঘুমাতাম যে ঘরে এবং যে ঘরের পাশে বড় ভাই থাকতেন, সেই ঘরের সামনে বারান্দায় একটি ভূতকে চক্রবন্দী করা হয়েছিলো। চকের রেখা দিয়ে, ভূত আমাদের পড়শি যে যুবকটির ওপর ভর করেছিলো, সেই যুবকটির চারদিকে মন্ত্রপূত খড়ির রেখার চক্র কেটে তাকে আটক করে এক জবরদস্ত দরবেশ তাকে জেরা করছিলো। জেরায় সে নানা অদ্ভুত কথা বলেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরবেশের দাবড়ানিতে তাকে কথা দিতে হয়েছিলো যে, সে আমাদের এই বাড়ির চারপাশে আর থাকবে না। তার যাওয়ার চিহ্ন হিসেবে দক্ষিণ পাশের আমগাছের একটা ডাল সে ভেঙে দিয়ে যাবে। সেদিন এই পুরো অনুষ্ঠানটির পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে কিশোর মনে যত না ভয় বা বিশ্বাস জন্মেছিলো, তার চাইতে বেশি কৌতুক আর কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু রহমতপুরকে মনে রাখার বা মনে পড়ার এটাই বড় কারণ নয়। রহমতপুরের হিন্দু একটি পরিবারের এক পুত্র-শোকাতুরা মা, যে আমার ধর্মভক্ত বড় ভাইকে একেবারে সন্তানের মতো গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই পরিবারের আম-তেঁতুলের আচারে আমার এবং আমার সহপাঠিনী মেজ বোনের যে অবাধ অধিকার ছিলো, স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা-ভরা সেই স্মৃতি আমাকে রহমতপুরকে ভুলতে দেয় না।

এবং আমাকে ভুলতে দেয় না আমার অন্তরঙ্গ কিশোর বন্ধু কানাই। এক কিশোরের আর এক কিশোর বন্ধু। কানাইয়ের পুরো নাম ছিলো ফণীভূষণ কাঞ্জিলাল। কানাইদের হিন্দুপাড়াটি ছিলো আমাদের রেজিস্ট্রি অফিসের বাসার মুসলমান পাড়ার একেবারে পার্শ্ববর্তী। কিন্তু কানাই সম্পর্কে আমার স্মৃতির মধ্যে একটি বেদনার ভাব আছে। কানাই যখন স্কুলে আসত তখন ওর কাছে ওদের গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখের কাহিনী শুনতাম। কিন্তু কেবল দুঃখের নয়, গর্বেরও। কানাই গর্ব করে বলত, 'জানিস আজ আমার 'ডেটিনিউ' দাদার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি।' 'ডেটিনিউ', 'রাজবন্দী', 'ইন্টারন্‌ড্', 'অন্তরীণাবদ্ধ' রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এই শব্দগুলো সেই কিশোর বয়সে আমি কানাইয়ের কাছ থেকেই শুনেছিলাম। কানাইয়ের এক ভাই ব্রিটিশ সরকার দ্বারা কোথাও 'ইন্টারন্‌ড' বা রাজনৈতিকভাবে 'অন্তরীণবন্দী' ছিলো। কানাইয়ের কাছ থেকে একথা শুনে আমার দুঃখ হত। কানাইয়ের পরিবারটিকে আর পাঁচটি পরিবার থেকে ভিন্ন মনে হতো। সেদিনও আমি জানি নি, আজো জানিনে কানাইয়ের দাদার বয়স কত ছিল, কোন্ দলের সে কর্মী ছিল এবং কবে সে মুক্তি পেয়েছিলো। কিন্তু সেই নিষিদ্ধ রাজনীতির রোমান্টিক একটি আকর্ষণ যে আমার সেই কিশোর বয়সের জীবনেই অনুপ্রবেশ করেছিলো, সে কথাটির উল্লেখ করতে হয়।

আমি ক্লাস সিক্সের পরেই রহমতপুর থেকে চলে আসি। কারণ আমার বড় ভাই তার পরেই রহমতপুর থেকে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ বরিশালের গলাচিপাতে।

কানাইয়ের মা আমাকে কোনো দিন সঙ্কোচ করেন নি। মুসলমান বলে পর মনে করেন নি। ছেলের বন্ধু। ছেলে সাথে করে নিয়ে গেলেই ঘরে তুলে পুজোর নাড়ু, মুড়কি, মোয়া বার করে দিয়েছেন। আমার কোনো সঙ্কোচ, আপত্তি মানেন নি। আমাকে খেতে হয়েছে।

জীবনের স্রোতে কানাই কোথায় ভেসে গেছে, তা আমি জানিনে। একদিন যে হিন্দু পাড়াগুলো সাজানোগোছানো ছোট ছোট শহরের মতো ছিল, আজ সেগুলো পোড়ামাটির ভিটে। ঘরবাড়ি সব উৎসাদিত। ইট-কাঠ-টিনের চিহ্নমাত্র নেই। কোনোদিন যে এমন পাড়া সুন্দর লোকালয় ছিল, তা বোঝাও সহজ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে মানুষের জীবনে, সামাজিক রাজনৈতিক আলোড়নে এক একটা লোকবসতি যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, সে কথা আমি আমার কিশোরকালের পরিচিত হিন্দু বন্ধু এবং পরিচিতজনদের বাসের জায়গাগুলো স্মৃতির টানে আবার দেখতে না গেলে এত মর্মান্তিকভাবে বুঝতেই পারতাম না।

১৪.৭.১৯৮৩

আমার মিয়া ভাই

'৮৩ সালের জুলাই মাস। তখনো আমার বড় ভাই, যাঁকে আমি 'মিয়া ভাই' বলে সম্বোধন করতাম, তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের রোজনামচা হিসেবে নিচের লেখাটি তুলে দিচ্ছি।

গুলশান বড় ভাগ্নের বাড়ি থেকে বনানী। মাইলখানেক পথ। ছোট ছেলে তিতুকে সাথে করে মিয়াভাই সাহেবের বনানীর বাড়িটিতে এলাম ঈদের আগের দিন : ১১ জুলাই, '৮৩। মিয়াভাই সাহেবের দেখা পাবো কি পাবো না, এই এক চিন্তা ছিলো। আজকাল প্রায়ই তিনি তবলিগে যান। তাঁর ভাষায় 'জামাতের দাওয়াতে' যেতে হয়। ৪০ দিন ৪৫ দিন বাসার বাইরে থাকেন। মসজিদে মসজিদে। সঙ্গে দলের আরো মুসল্লি, মোয়াল্লাম থাকেন। খাবারের চিন্তা করেন না। যে যেখানে যা দেয়, তাই খান। সাধারণ কিছু জামাকাপড় সাথে রাখেন। আর কিছু নয়। সবার সঙ্গে নরম হয়ে কথা বলেন। এই তবলিগের মসজিদ আছে কাকরাইলে। বছরে একবার টঙ্গীতে আন্তর্জাতিক জামাত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক তাতে জমায়েত হয়। সুশৃঙ্খলভাবে তাদের খাওয়া-দাওয়া, ধোয়া-মোছার কাজ পরিচালিত হয়। বড় ভাবী আজ আর নেই। দু বছর আগে তিনি মারা যান। কিন্তু তিনি থাকতেও মিয়াভাই এভাবে তবলিগে বার হয়ে যেতেন। আমাদের 'ধর্মের পুনরুত্থান' জাতীয় একটা ব্যাপার চলছে। জাতীয় আন্তর্জাতিক নানা শক্তি এতে যোগান দিচ্ছে। আমার বড় ভাই সরল মানুষ। ধর্মপ্রাণ তো বটেই। ধর্মের আচার-আচরণ সেই তাঁর শৈশব জীবন থেকেই পালন করে এসেছেন। যুবক বয়স থেকে মুখে দাড়ি রেখেছেন। সেও ধর্মীয় নিয়ম বলেই। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারে, বিশেষ করে ছোট ভাই আমার সঙ্গে তাঁর বিনয়নম্র ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছে। আমার অভিভাবক হিসেবে ছোটকালে তম্বি করেছেন। পড়াশোনায় অবহেলা দেখলে দণ্ড দিয়েছেন। এমনকি বড় হয়ে কলেজে পড়ার সময় থেকে আমার যখন কিছুটা সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ও ঘটনাতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপার ঘটে, তখনো তিনি আমার ওপর রাগ করেছেন, কড়া নসিহত করেছেন। কিন্তু সবসময়েই স্নেহ বোধ করেছেন। দীর্ঘদিন যখন কারাগারে ছিলাম তখন দুএক সময়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে জেলখানায় গিয়ে আমাকে দেখে এসেছেন। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রতিককালে তাঁর এই তবলিগের দিকটি নজরে পড়েছে। এখন আর আমার সঙ্গে কখনো রাগ করে কথা বলেন না। এখনো নসিহত করেন। কিন্তু সে এক মিশনারি বা ধর্মপ্রচারকারীর বিনয়নম্র মনোভাব থেকে। আজো যখন দেখা হলো এবং জানলেন, রোজা রাখি নি, তখন বললেন রোজা রাখতে পার নি বুঝি। কিন্তু নামাজটা আদায় করো। তুমি তো কত জান। কিন্তু একথা তো মানবে যে, দুনিয়ার শেষ থাকলেও আখেরাতের শেষ নেই। সেই আখেরাতে আমাদের সকলেরই তো জবাব দিতে হবে।

আজ আমি মিয়াভাই সাহেবের সঙ্গে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই দেখা করতে এসেছি। তাঁর বয়স হয়েছে। এখন তিনি বৃদ্ধ। অবশ্য এই বয়সেও তিনি যেরূপ চলাচলতি করেন, তাতে আমাদের অবাক হতে হয়। হাঁটতে পারলে রিকশা নেবেন না। দূরের পথে ভিড়ের মধ্যেও বাসে যাবেন। গ্রামের সঙ্গে আমাদের যেখানে নিশ্ছিদ্র বিচ্ছেদ ঘটেছে, সেখানে তিনি এখনো গ্রামের বাড়িতে যান। নিজেদের বাড়িতে সকল জ্ঞাতি ভাই কিংবা ভাইয়ের ছেলেদের সাংসারিক অবস্থা খারাপ। যে-বাড়িতে এককালে উঠোনে ধানের স্তূপ জমে উঠত, সেখানে অনেক ঘরেরই রোজকার খাবার জোটে না। যারা একটু লেখাপড়া শিখেছি তারা তাদের ছেলেমেয়েসহ প্রবাসী হয়েছি, শহরবাসী হয়েছি। কিন্তু মিয়াভাই ব্যতিক্রম। তিনি গ্রামে যান। বাড়িতে নিজের আগ্রহে বাবা-মার কবর দুটিকে বাঁধাই করেছেন। নিজে নানাভাবে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে টিনের মসজিদখানিকে পাকা দালানে পরিণত করেছেন। বাড়ির দরজাতে একটি মাদ্রাসা তৈরি করেছেন। তার জন্য পাকা দালানও উঠিয়েছেন। একবার হজ করে এসেছেন। গ্রামে সকলে চেনে। 'ডেপুটি সাহেব' নামেই তিনি পরিচিত। এই মাদ্রাসার এ্যাফিলিয়েশন, তার জন্য অর্থ সাহায্য ইত্যাদি সংগ্রহে সবক্ষণই ব্যস্ত থাকেন। এই ব্যস্ততার কারণেই মনে অপর কোনো চিন্তা প্রবেশ করতে পারে না। তাই বয়সের তুলনাতে তিনি ভালো আছেন এবং একথা ভাবতে আমার বেশ ভালো লাগে।

তিনি যখন ধর্মের কথা তুলে আমাকে নসিহত করেন তখন আজো আমি নীরবে নতমস্তক হয়ে থাকি। তিনি মুরব্বি মানুষ। তাঁর সঙ্গে তর্ক চলে না। তাছাড়া ধর্ম নিয়ে আদপেই কোনো তর্ক চলে না। আজো যখন তিনি আমার মঙ্গলের জন্য নামাজ-রোজা পালনের কথা বললেন, তখনো আমি স্মিতমুখে চুপ করে রইলাম। তারপরে বললাম, মিয়া ভাই, আপনার এখন বয়স কত?

আমার প্রশ্নটিতে তিনি একটু চকিত হলেন। হয়ত বুঝলেন, আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চাচ্ছি। তাই হাসিমুখে বললেন, তা ৭৯ চলছে ...

তাঁর বয়স হয়েছে জানতাম। কিন্তু তিনি যে ৭৯ বছরের মানুষ এটি আমি কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এখনো তাঁর শরীরের ঋজুতা সে কথা বিশ্বাসে আনতে দিতে চায় না। বললেন, ১৯০৫-এ জন্ম। তারপর হিসেব করে দেখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৩-এ ম্যাট্রিক পাস করলাম। বি.এম স্কুল থেকে। ১৯২৫-এ আই.এ পাস করলাম আর ১৯২৭-এ বি.এ পাস করে ঢাকা এলাম এম.এ পড়তে।

আমি বললাম আপনি ইংরেজিতে এম.এ নিলেন। এত সুন্দর আপনার ইংরেজির হাত। কিন্তু শেষ করলেন না কেন?

নতুন করে জানা নয়। যথার্থই আমি এসব কথা জানতাম না। আজ দেখছি, এ তথ্যগুলোর একটি তাৎপর্য আছে। আমার ভাইয়ের লেখাপড়া তথা সেদিনকার হাই স্কুলে পড়া মানে একটি মুসলিম গরিব কৃষক পরিবারে প্রথমবারের মতো আধুনিককালের শিক্ষার প্রবেশ ঘটা। সেই পরিবারের এই ছেলেটি কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেছে। আই.এ এবং বি.এ পাস করে ঢাকা এসেছে এম.এ পড়তে, এটার মধ্যে একটা সামাজিক রূপান্তরের আভাস আছে। শুধু একজন ব্যক্তির জীবনযাপন নয়। যুগ পরিবর্তিত হচ্ছিল, একথা সত্য। তাই এই শতকের গোড়ার দিক থেকেই মধ্যবিত্ত এবং গরিব ঘরের কৃষকের ছেলেও শুধু মক্তব নয়, হাই স্কুল আর কলেজে এসেছিলো, উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য।

মিয়াভাই সাহেব তাঁর এই পাসের কথায় দুঃখ করে বললেন, কলেজে তো আমাকে সকল প্রফেসররা অসম্ভব স্নেহ করতেন। সলিল চৌধুরী, তিনি পরীক্ষার পরে আমার খাতা দেখে বলেছিলেন, 'ইওর্স ইজ দি বেস্ট।' তবু তো রেজাল্ট ভালো হলো না। এক নম্বরের জন্য সেকেন্ড ক্লাস পেলাম না। অথচ প্রফেসরদের কাছে শুনেছিলাম আমার খাতায় 'হাই সেকেন্ড ক্লাস' উঠেছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এর কারণ কী?

মিয়াভাই বললেন, কারণ, মুসলমান ছেলে ভালো কেন করবে?

মিয়াভাইয়ের এমন অভিযোগের কথাতেও বিস্ময়বোধ ছিল। আমি বললাম, কিন্তু আপনার গুণের কারণে হিন্দু শিক্ষকরা তো আপনাকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।

একথা তিনি স্বীকার করলেন। মনে করে বললেন, বি.এম স্কুলের হেডমাস্টার অমৃতলাল দাশগুপ্ত, নিজের ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন আমাকে।

ধর্মপরায়ণ মিয়াভাইয়ের এই আর একটি দিক। একদিকে যেমন হিন্দুরা মুসলমানদের ছোট ভেবেছে, তাদের হেয় জ্ঞান করেছে, এ অভিযোগ তিনি বিভিন্ন সময়েই করেছেন এবং এর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, তেমনি এরূপ ধর্মপরায়ণ, আচার-আচরণ লেবাস মুসল্লি মুসলমান একজন তরুণের যে হিন্দু অভিভাবক থাকতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না। অথচ আমার ছোটকালের রহমতপুরের সে ছবি তো আমি আজো ভুলতে পারি নি।

১৯৩৩-এর দিকে মিয়াভাই বদলি হয়ে এলেন রহমতপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে সাবরেজিস্ট্রার হিসেবে, নাজিরপুর থেকে।

রহমতপুর ছিল একটি হিন্দু-প্রধান এলাকা। রহমতপুর বাজার বসত সে এলাকার জমিদার বাড়ির দরজায়। তার কাছের স্কুলে আমি এবং আমার বড় বোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সঙ্গে পড়তাম। তখন আমার ক্লাস ফাইভ এবং সিক্স। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ সন পর্যন্ত বোধহয় বড়ভাই ছিলেন রহমতপুরে।

এই রহমতপুরের জমিদার বাড়ির এক জমিদারের নাম ছিল বোধ হয় কালু বাবু। কালু বাবুর স্ত্রী আমার বড় ভাইকে নিজের ছেলে বলে ডাকতেন। এই বাড়িতে আমাদের যাতায়াত কেবল যে অবাধ ছিল, তাই নয়। এদের কোনো অনুষ্ঠান আমাদের বাদে হত না।

এই বাড়ির কথা মনে হলেই আমার চোখে যে ছবিটি ভেসে ওঠে সে হচ্ছে : কালু বাবুর বাড়িতে মিয়াভাই বেড়াতে গেছেন। সন্ধ্যায় পুজার ঘণ্টা বাজছে এক ঘরে। এদিকে মগরেবের নামাজেরও সময় হয়েছে। মিয়া ভাই তাঁর 'মাকে' বললেন, মা একখানা ধোয়া কাপড় দিন। আমি পাশের ঘরে নামাজটা আদায় করে নিই। মা স্নেহে এবং আগ্রহে ধোয়া কাপড় বার করে দিয়েছেন। তাঁর মুসলমান 'পুত্র' একঘরে মগরেবের নামাজ পড়ছে এবং আর একঘরে সন্ধ্যা আহ্নিকের আয়োজন হচ্ছে। এ এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। আমার কিশোর মনকে ঘটনাটির এই সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির দিকটি সেদিনও অভিভূত করেছিলো।

কিন্তু একথা ঠিক যে ত্রিশের এবং চল্লিশের দশকে সাম্প্রদায়িক দ্বেষই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন প্রীতির সম্পর্ক বিরল হয়ে আসছিলো। কিন্তু মিয়াভাই সাহেব একদিকে যেমন কোনোদিন হিন্দু সমাজের যারা তাকে স্নেহপ্রীতি দিয়েছেন তাদের কথা ভুলতে পারেন নি, তেমনি সমাজে সাধারণভাবে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল এবং সাধারণভাবে হিন্দু-প্রধানরা যে মুসলমান সমাজ, এমন কি তার বিকাশমান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অংশকেও বৈরী দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই অনুভবটি নিজের মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

তাই নিজের বি.এ পরীক্ষার ফলাফলে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবটি যে কাজ করেছিলো সে সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপারটি খুবই সম্ভব বলে আমারও মনে হলো। যখন বললাম, কিন্তু হিন্দু অধ্যাপকরা তো আপনাকে ভালো ছেলে বলে জানতেন, তখন তিনি বললেন, আমার কলেজের প্রফেসররা জানলে কী হবে। তখন তো খাতার ওপর পরীক্ষার্থীর নাম লেখা থাকতো। আর তো থেকেই ধরা যেত কোন্ খাতা হিন্দু-ছাত্রের এবং কোন খাতা মুসলমান ছাত্রের। আর এ কারণেই মুসলমান ছাত্রের পক্ষে সেদিন ভালো করা ছিলো প্রায় অসম্ভব।

সেকালের কথা ভালো করে আমি জানিনে। কিন্তু মিয়াভাইয়ের এ ব্যাখ্যায় যুক্তি আছে।

সে যা হোক। তবু তিনি ঢাকায় পড়তে এসেছিলেন এম.এ, ইংরেজিতে। ইংরেজিতে তাঁর দক্ষতা ছিল এবং এখনো আছে। এখনো তিনি যেমন দ্রুতগতিতে সুন্দর শব্দরাজি দিয়ে ইংরেজিতে নিজের মনের ভাব, বিশেষ করে লিখিতভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ করেন, তাতে আমার মনে বিস্ময় আর ঈর্ষার সঞ্চার হয়। আহা, আমি যদি এমন করে ইংরেজিতে লিখতে পারতাম!

ঢাকায় এসে তিনি ইংরেজির অধ্যাপক এস এন রায়ের স্নেহ পেয়েছিলেন। ড. হাসানও তাঁকে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু গরিব কৃষকের ঘর থেকে একেবারে নিজের উদ্যোগে যে ছেলেটি স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এসেছিলো সে যখন ১৯২৮ কিংবা ২৯-এর দিকে একটি চাকরির সুযোগ পেল তখন আর সে চাকরিকে গ্রহণ না করার দুঃসাহস দেখাতে পারল না। কারণ তার ওপর নির্ভর করছে গরিব বাবা, মা, ছোট ভাই আর বোনেরা।

আমি একটু সমাজতাত্ত্বিক ভাব থেকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এম.এ পড়ার জন্য কলকাতা না গিয়ে ঢাকা কেন এলেন? বরিশাল থেকে তো কলকাতা যেতে পারতেন।

মিয়াভাই বললেন, ১৯২১ সনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো। তারপর থেকে পূর্ববঙ্গের আমাদের কাছে, বিশেষ করে অর্থের দিক থেকে যারা কম সচ্ছল, তাদের ঢাকা আসার দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল। আমিও সে কারণেই ঢাকাতে পড়তে এসেছিলাম।

মিয়াভাইয়ের কাছ থেকে আরো অনেক কথা জানার আছে। কিন্তু এদিনের সাক্ষাতে অন্য কথা আর তুললাম না। মিয়াভাই সাহেবের কাছে আমরা যারা ছোট ভাইবোন, তাদের ঋণের শেষ নেই। একথা সচেতনভাবে আমি সবসময়ই মনে করেছি। এখন তাঁর নিজেরই বৃহৎ সংসার। তাঁর সন্তানরাও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানা পথঘাট ঘুরে আমিও সংসার জীবনের থিতু হয়ে বসেছি। আমারও ছেলেমেয়ে আছে। সংসারের দায়দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব পালনের আর্থিক অক্ষমতা জীবনের সমস্যাকে রোজকে রোজ কঠিনতর করে তুলছে। মিয়াভাই সাহেবের ঋণের কোনো পরিশোধ হতে পারে না। তিনি সেদিন না পড়ালে আমার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এসে পৌঁছাও সম্ভব হত না। কিন্তু এ ঋণের কথা মুখে প্রকাশ করা যায় না। শব্দের কৃত্রিমতায় তা লঘু হয়ে দেখা দেয়। আজো তার কাছে কৃতজ্ঞতার কথা মুখে বললাম না। কিন্তু উঠে আসার সময়ে তিনি যেন মনে কিসের ভার অনুভব করে বললেন, তোমাদের কারুর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ জানেন, আমি সারা জীবন আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি।...

আমি বললাম, আমাদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ থাকা যে কত স্বাভাবিক তা আমি জানি। তবু যে আপনি কোনো অভিযোগ রাখছেন না, সেও আপনার গুণ, আমাদের নয়।...

মিয়াভাই সাহেবকে সালাম করে ছোট ছেলেকে সাথে করে চলে এলাম।

তাঁর যে এদিন দেখা পেয়েছিলাম, আর অতীত নিয়ে একটু আলাপ করতে পেরেছিলাম, তাতে নিজের মনটা আনন্দে বেশ ভরে উঠেছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামে নির্বাসন : পিতামাতার কাছে প্রত্যাবর্তন

সে এক পাগলামিই বটে। '৪৬ সনে এম.এ পাস শেষ হলো। সেকালের ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর একালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আকাশ-পাতাল পৃথক। আমার জীবনের এ এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। প্রাচীনকালের জ্ঞানের আশ্রমের কথা শুনেছি। গুরুগৃহে, গুরুর সাহচর্যে, নৈকট্যে শিষ্যের বাস। শিষ্যের সাধনা। চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার জীবনে প্রায় তাই ছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে আমি আমার নিজের বাড়িতে রূপান্তরিত করে ফেলেছিলাম। গুরুদের নৈকট্য পেয়েছি। তাঁদের স্নেহ এবং সাহচর্যে ধন্য হয়েছি।

দর্শনের ছাত্র। দর্শন বিভাগে সর্বমোট ৫টি কিংবা ৬টি ছাত্রছাত্রী। ছাত্রী বোধহয় অনার্সে ছিলো দুটি। ওদের বাসা ছিলো পুরোন ঢাকার পাতলা খান গলিতে। এখানেই বাসা ছিলো সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স এবং এম.এ-র অন্যতম জনপ্রিয় কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মী রবি গুহের। রবিগুহ আর নাজমুল করিম, এঁরা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। ইউনিভার্সিটির ভাষায় 'সিনিয়র'। কিন্তু আমাদের এই তিনজনের ক্ষেত্রে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠতা বা বয়োকনিষ্ঠতার ব্যাপার ছিল না। আমরা পরস্পরের নিকট ছিলাম আত্মীয়সম। রবিগুহকে আমি নাম ধরে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতাম। কিন্তু সে 'আপনি'তে সমীহের চাইতে প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল অধিক। রবি গুহও আমাকে 'তুমি'-র বদলে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু সে 'আপনি' স্নেহ মমতায় 'তুমি'-রও অধিক ছিল। রবি ইউনিভার্সিটির হলে থাকতেন না। থাকতেন বাসায়। ঐ পাতলা খান লেনেই বোধহয়। তাঁর দিদি এবং ভগ্নিপতির সঙ্গে। তাঁদের সে বাসাও আমার নিজের বাসায় পরিণত হয়েছিলো। তাঁদের কোনো পারিবারিক আতিথেয়তা ও অনুষ্ঠান আমাকে বাদ দিয়ে হতে পারতো না।

অনার্স এবং এম.এ.-তে যে ভালো ফল হলো, এতে আমার চাইতে নাজমুল করিম আর রবি গুহের আনন্দই অধিক। আমি যত বলি, স্যাররা খাতির করে নম্বর দিয়েছেন। আমি এর যোগ্য নই। তাঁরা তত বলেন, এরকম খাতির স্যাররা আমাদের কেন করেন না?

অনার্স আর এম.এ-তে ভাইভা পরীক্ষা শেষ করে বেরিয়ে আসতে মূল পরীক্ষক প্রখ্যাত দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বললেন, ভালো করেছ। এখন কী করবে? আমি সবিনয়ে হেসে বললাম, 'মাস্টারি করা ছাড়া আর কী করব স্যার?' তিনি তখন বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতা চলে গেছেন। দর্শন বিভাগের হেড তখন ড. বিনয় রায়। বিনয় রায় ইংরেজি বিভাগের তখনকার হেড এস.এন. রায়ের ছোট ভাই ছিলেন। উভয়েরই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সহাস্য স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ইউনিভার্সিটির সর্বমহলে পরিচিত ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরির দরখাস্তের ভিত্তিতে নয়। বিনয়বাবু বললেন, ফজলুল করিম, কাল থেকে তুমি ক্লাস নিতে শুরু করো।

তখনো ছাত্রদের সংখ্যা কম। ক্লাস নিতে গেলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক হিসেবে গণ্য করার চাইতে তাদের সঙ্গেই পাঠরত আর একটি ছাত্র বলেই বিবেচনা করেছে বেশি। ভাবতে আজ মজা লাগছে।

ভালোই লাগছিলো এই মাস্টারি। '৪৭-এর শেষ আর '৪৮-এর প্রথমে। কিন্তু দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক সঙ্কট বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাকিস্তান হয়ে গেছে। ভারত বিভক্ত হয়েছে আগে যা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ দাঙ্গা হিসেবে সংঘটিত হয়েছে, তা এখন ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের রূপ গ্রহণ করেছে। '৪৬-এর ১৬ আগস্ট হলো 'ক্যালকাটা কিলিং'। তার প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি, বিহারের হত্যাকাণ্ড। '৪৭-এর বিভাগের কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। ফলে সাধারণ মানুষের অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতা। লক্ষ লক্ষ নরনারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এপার থেকে ওপার গমন।

এর আঘাত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও এসে লাগল। দাঙ্গার আকারে নয়। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রখ্যাত শিক্ষকদের ঢাকা থেকে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে গমন। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন শিক্ষকদের তখন অভাব। একটা দায়িত্ববোধ থেকেই দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেছিলাম। কিন্তু চাকরির বাইরে রাজনৈতিক একটা দায়িত্ব বহন এবং আদেশ পালনেরও একটা ব্যাপার ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কমিউনিস্ট সংগঠনের আমি একজন অনুগত কর্মী। সে সংগঠনেও সামাজিকভাবে দেশত্যাগের আঘাতে কর্মীর অভাবে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সংগঠন তাই বলল, তোমার অধ্যাপনার চাকরি ছাড়তে হবে। তার প্রধান কারণ, গুপ্ত পুলিশের দৃষ্টির খরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মীশূন্য মাঠে আমি তাদের কাছে পূর্বের মতো আর 'ফেলনা' রইলাম না। আমাকে তারা অন্বেষণ করে বেড়াতে শুরু করল।

পার্টি বলল, তুমি চাকরি ছাড় এবং আত্মগোপন কর। আমি তাই করলাম। কোনো অসুবিধা হলো না সিদ্ধান্ত গ্রহণে। আমার বিভাগের হেড বিনয়বাবুকে গিয়ে দরখাস্ত দিয়ে বললাম, স্যার, আমি আর চাকরি করব না।

তিনি প্রথমে অবাক হলেন। ব্যাপারটার আকস্মিকতায়। বিশ্বাস করতে চাইলেন না। রাগ করে বললেন, তোমার পদত্যাগপত্র আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব।

আমি বললাম, স্যার, আপনি তো আমাকে নিজের সন্তানের মতো জানেন। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। একে তো আর বদল করা যাবে না।

স্যার আমাকে চার বছর ধরে দেখে আসছেন। তাঁর বাসায় আমার যাতায়াত ছিলো অবাধ। আমাকে তিনি আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁর স্নেহ-সম্ভাষণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আত্মগোপনে চলে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরি থেকে পদত্যাগ করার কথা শুধু বিভাগে আলোচ্য বিষয় হলো না। সরকারি মহলেও আলোচিত হলো। আমার সেই '৪৮ সনের চাকরির নথি খুললে এখনো তার মধ্যে রেজিস্টারের কাছে লেখা স্বরাষ্ট্র তথা পুলিশ বিভাগের কর্তাদের কৈফিয়ত তলবমূলক বার্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কেন ফজলুল করিম সরদার চাকরি ছেড়েছে এবং তার আস্তানা, অধিষ্ঠান, 'হোয়্যেয়ারঅ্যাবাউটস্' কোথায়, তা সরকারকে অবগত করা হোক।

আসলে আমার আস্তানা-অধিষ্ঠানের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। দুর্বল সংগঠন। আমি পাতলা আর কৃশ দেহের ক্ষুদ্রকায় জীব হলেও আমার নামটা ভারি ছিলো। সে নামকে ছেঁটে ফেলেও রেহাই পাওয়া দায় হয়ে উঠলো। নাম পাল্টালাম। নামের শরীর থেকে ভারি অংশ 'সরদার'কে বিদায় করলাম। ওজনে হালকা হল বটে, তবু নিঃশঙ্ক হওয়া গেল না। শহরে নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব। পার্টি দেখল, আমি তাদের বিদ্যমান অবস্থায় সম্পদের চাইতে বোঝা বেশি। কোথায় রাখবে আমাকে।

অবশেষে বলল, ঢাকা জেলার মনোহরদি-চালাকচর এলাকায় কৃষকদের মধ্যে আমাদের কিছু প্রভাব আছে। তুমি সেখানে গিয়ে থাকো। কৃষকদের মধ্যে থাকবে। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করবে।

তাই সই। আমাকে কোনো কর্মী-বন্ধু পৌঁছে দিলেন চালাকচরে। চালাকচরে তখনো আন্দামানের নির্বাসন-ফেরত বিখ্যাত কৃষক নেতা অন্নদা পাল হয়তো ছিলেন। এলাকার প্রবাদ পুরুষ। চালাকচর, পীরপুর, শরীফপুর, মনোহরদি, পোরাদিয়া, হাতিরদিয়া, এই নামগুলো এখনো মনে ভেসে উঠছে। কারণ এই গ্রামগুলোতে '৪৮-৪৯ সনে প্রায় এক বছর আমি আত্মগোপন করেছিলাম। পীরপুরের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক আখতারুজ্জামানের হাসিমুখ চেহারাটি এখনো চোখের সামনে অমলিন। তাঁর এলাকার সম্মানিত শিক্ষক এবং গ্রামীণ নেতা। কমিউনিস্ট সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি আমাকে স্বনামেই জানতেন। কিন্তু তিনি অন্য লোকের কাছে আমাকে ভিন্ন নামে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আখতারুজ্জামান হয়তো আজ আর বেঁচে নেই। পীরপুরের পাশেই ছিলো শরীফপুর। শরীফপুর ছিলো প্রধানত পানের বরজ বা পানচাষীদের এলাকা। হরেন সিং, সুরেশ সিং, এরূপ নাম মনে ভেসে উঠছে। তাদের বাড়িঘর ছিল গ্রামের অন্য, বিশেষ করে মুসলিম-প্রধান এলাকা থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। ঘরের সঙ্গে ঘর লাগানো। উঁচু দাওয়া। সুন্দর নিকোনো, ধোয়া-মোছা উঠোন। টিনের ঘরই বেশি। প্রত্যেক বাড়ির পাশে পানের বাগান বা বরজ। বাঁশ আর পাটকাঠি দিয়ে পানের লতার সাড়ি দেওয়া মাচান। কী সুন্দর পরিচ্ছন্নতায় রক্ষণাবেক্ষণ। তাঁরা যেদিন তোলাপান বিক্রির জন্য হাঁটে যেত, সেদিন সকালে পানের বরজে ঢুকে আমিও পানলতা থেকে কচি পান তুলে এনে তাঁদের সাহায্য করতাম। ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন আত্মগোপনের জীবনে ঘটনার আধিক্য ছিল না। তাই ঘটনার কোনো স্মৃতি নেই। তবু এই একটা বছর গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনযাপনই একটা ঘটনা হিসেবে আমার জীবনে অমোচনীয় এক আনন্দকর স্মৃতির পলি রেখে গেছে। গরিব কৃষকের এলাকা। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে কাজের অভাবে গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরের অর্ধাহারে-অনাহারে সঙ্কট বৃদ্ধি পেত। কিন্তু এলাকায় কাঁঠাল হতো প্রচুর। প্রত্যেক বাড়িতেই কাঁঠাল গাছ ছিল। আমি অনেক সময়ে ভাতের বদলে কাঁঠাল খেয়ে দিন কাটিয়েছি। ভাত পেলে ভাতের সঙ্গে কোনো ডাল-তরকারি নয়। একটি শুঁটকি-পুঁটি পাটকাঠির মুখ আগুন ধরিয়ে তাকে পুড়িয়ে ভাতের সঙ্গে মেখে খেয়েছি ...

হিন্দু পান কৃষকদের বাড়িতে হিন্দু নাম নিয়ে থেকেছি। আখতারুজ্জামানই নিয়ে গেছেন এলাকাতে। আমাকে অশোক কিংবা আশীষ নাম দিয়ে অন্দরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মেয়েরা তাঁদের দূর সম্পর্কীয় দেবর কিংবা মাসতুতো, পিসতুতো ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সেই একটি বছরের এমন প্রাপ্ত জীবনকে আমি একটা সৌভাগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। সেই কবে শিশু বয়সে আমার অভিভাবক বড় ভাইয়ের কাঁধে চড়ে নিজের গ্রাম ছেড়ে এসেছিলাম। প্রায় পঁচিশ বছর পরে আবার যেন আমার সেই নিজগ্রামে প্রত্যাবর্তন ঘটল, বাবা, মা, চাচা-চাচী, ভাইবোনের কাছে প্রত্যাবর্তন।

সেই জীবনের স্মৃতি এখনো টানে, এই প্রৌঢ় বয়সে। ইচ্ছে হয় আবার ফিরে যাই সেই চালাকচর, পীরপুর, শরীফপুর, পোড়াদিয়া, হাতিরদিয়া আর মনোহরদিতে। ...

২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ : চল্লিশের দশকের শেষ

শতকই বলি, আর দশকই বলি, এগুলো প্রচলিত, তবু কৃত্রিম হিসাব। সময়ের হিসাব। সময়ের গতি এবং তার এরূপ শুরু, শেষের হিসাব সবার জীবনে এক নয়। মহাকবি শেখসপীয়র নাকি বলেছিলেন, প্রেমিকের জন্য সময়ের গতি একরকম, আর ফাঁসির আসামীর জন্য আর এক রকম। প্রেমিকের প্রতীক্ষার মুহূর্ত ঘণ্টাতেও শেষ হয় না। ফাঁসির আসামীর ঘণ্টা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়।

'চল্লিশের দশকের ঢাকায়' আমার যা একটু বোধ-বুদ্ধির বিকাশ, তার শেষ হয়ে গেল আকস্মিকভাবে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সনে। '৫০ পর্যন্ত আর আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না।

যথার্থই কি ২৫ ডিসেম্বর '৪৯? ২৫ ডিসেম্বর অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কিন্তু সেটি আমার জীবনেও যে একটি পর্যায়ন্তরের সূচনা ঘটাবে তা সেদিন বুঝি নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে তারিখটা ২৫ ছিলো কিনা তা যাচাই করার জন্য আমার বন্ধু, প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক দৈনিক 'সংবাদ'-এ কর্মরত সন্তোষগুপ্তের কাছে গেলাম। সন্তোষগুপ্তকে আমি প্রীতির সম্বোধনে শুধু 'সন্তোষ' বলে ডাকি। 'তুমি' বলি। সন্তোষ আমাকে 'আপনি' বলে। সে বয়সের কারণে কিনা জানিনে। কিন্তু সন্তোষের সঙ্গে সেই '৪৯ সনে একদিনের যে পরিচয় ঘটেছিলো, সেটিই আজীবনের পরিচয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে সন্তোষের এক পরিচয় অন্যন্য এক স্মৃতিধর হিসেবে। কম্প্যুটারের যুগ আসার পূর্ব থেকে সন্তোষের মস্তিষ্ক কম্প্যুটারে পরিণত হয়েছিলো নিশ্চয়ই। স্মৃতি, তথ্য, সংখ্যা আর তারিখের কম্প্যুটার। সে কিছুই বিস্মৃত হয় না। এবং তার স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই সে ইতিহাসের মোকাবেলা করতে পারে। তাঁর সে পরিচয় সাম্প্রতিককালেও আমরা পাচ্ছি। সন্তোষের বয়স কতো, এটি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে। দেখতে আমার চাইতেও পাতলা-দুবলা। বিরামহীনভাবে সিগারেট পান করে। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলি, তোমাকে না সিগারেট খেতে নিষেধ করেছি। সে তার কাব্যিক চরণ উচ্চারণ করে বলে, 'আয়ু নয় তো, বায়ু। সিগারেটের ধূম্রের সঙ্গে সে যদি উড়ে যায়, তো যাক না। তাতে আফসোস কি?

আমি তাঁকে বলি, 'কম্প্যুটার' সন্তোষ। সেদিন খোঁজ করে সাক্ষাৎ করে বললাম, সন্তোষ, তুমি-আমি সেই '৪৯ সনের কোন্ তারিখে এ্যারেস্ট হয়েছিলাম?

সন্তোষ নিশ্চিন্তে বলে দিল, ২৫ ডিসেম্বর, দুপুরে খাওয়ার পরে।

: কে কে সেদিন তোমার বাসা থেকে গ্রেফতার হয়েছিলাম?

: আপনি, আমি, আমার মা, বারি সাহেব, রানু চ্যাটার্জি ... আর যেন কে?

: জ্ঞানদা, জ্ঞান চক্রবর্তী কি সেদিন গ্রেফতার হয়েছিলেন?

সন্তোষ বলল : না। জ্ঞানদা বোধহয় তার আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ...

যাক, বোঝা গেল, সন্তোষ সন্দেহের উর্ধ্বে। আমরা গ্রেফতার হয়েছিলাম সন্তোষের বাসা থেকে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সনে।

ঘটনার স্মৃতি নয়। স্মৃতির পলি। স্মরণের কাঠি দিয়ে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। আজো এতদিন পরে। পুরো চুয়াল্লিশ বছর পরে। সন্তোষ দিনরাত 'কলাম' লেখা নিয়ে ব্যস্ত। তার সময় নেই এসব নিয়ে আলাপ করার। গল্প করার। চেপে ধরলে বলে, আর কী হবে বাল্যকালের বালখিল্য সেসব ব্যাপারকে খুঁচিয়ে তুলে?

একথা রাজনৈতিক বিশ্লেষণে সন্তোষ বলতে পারে। সে বলে, সেকালের আদর্শ, বিশ্বাস-নির্যাতন ভোগ, ত্যাগ সবই ছিলো ভুল।

এজন্য সন্তোষের ওপর আমার কোনো মান-অভিমান নেই। সন্তোষের বর্তমানে 'সব্যসাচীর' কলম এবং 'কলাম্‌ন' আছে। আমার যে ৪৪ বছর আগের স্মৃতির পলি বাদে আর কিছু নেই। আরো পাঁচ বছর যদি বাঁচতে হয়, তবে আমি বাঁচি কী নিয়ে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বাল্যকালের বালখিল্যতায় আমার আফসোস নয়, রোমাঞ্চ লাগে। এ রোমাঞ্চের কথা অপরকে লিখে বা বলে বোঝানো মুশকিল।

সন্তোষের বাসা। ঢাকার তাঁতিবাজারে। পুরনো একতলা একটি দালানে। ঢাকা কোর্টের পেছনের পশ্চিম দিকের এলাকা। বাসা নয়, তাকে আমরা জানতাম 'ডেন' বলে। নিষিদ্ধ প্রায় গোপন কমিউনিস্ট পার্টির অভিধানের টেকনিক্যাল শব্দ 'ডেন'। শব্দটা ভয়ঙ্কর। অর্থ : গুহা, গহ্বর ইত্যাদি। শুধু শব্দটা ভয়ঙ্কর নয়। ব্যাপারটাই ভয়ঙ্কর ছিল। কতো যে ভয়ঙ্কর তা নিরীহ সদ্য এম.এ পাস করা, রোমান্টিকতার আবেগে আবিষ্ট, হাতের মোয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের শিক্ষকতার চাকরিতে রিজাইন দেওয়া আমি বুঝতাম না। আসলে আমাদের সে জীবনে 'ভয়' শব্দটার অর্থই আমি বুঝতাম না। রাতের অন্ধকারে নিম্নস্বরে আশ্রয়দাতার বিভিন্ন বাড়িতে আলোচনা বসেছে। দেশের অবস্থা নিয়ে জেলা কমিটির মিটিং বসেছে। 'ডাকাতি'র প্রোগ্রাম নয়। পরিস্থিতি নাজুক। সে বিষয়ে আলোচনা। ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়ে গেছে অনেক কমরেড। যারা আছি, দায়িত্ব বহন করতে হবে তাদের। জনতার মধ্যে থাকতে হবে। বিবেক-বুদ্ধি মতো যা পারি সেটুকুই করতে হবে। বলতে হবে, বর্তমানই শেষ নয়। মৃত্যুর পরেও জীবন থাকে। থাকবে। দেশ থাকবে। ইতিহাস থাকবে। ইতিহাস তৈরি হবে। ইতিহাস আমাদের পক্ষে। সমাজ বদলাবে। বিপ্লব অনিবার্য। বিপ্লব মানুষের জীবনে, সমাজের জীবনে সংঘটিত হবে।

AMARBOI.COM

আমার তো মনে হয় কথাগুলো সাংঘাতিক কোনো খারাপ কথা নয়। ভয়ঙ্কর কথা নয়। কিন্তু সেদিনের এবং এদিনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা তাকে তাই মনে করে। কেউ এ রকম কথা ভাবছে, বা বলছে, মনে মনে কিংবা কানে কানে, এমন আভাস পেলেই তাকে 'জননিরাপত্তা' আইনে গ্রেফতার করে 'নিরাপদ' জেলখানাতে আবদ্ধ করেছে।

কাজেই এমন যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাতে সন্তোষ কিভাবে জড়িত হয়েছিলো, একথাটা আজো আমার জানা হয় নি। আর তা জানাও যাবে না। সন্তোষ আর তা বলবে না।

অথচ যথার্থই কী ভয়ঙ্কর, কী বিপজ্জনক! বিধবা মা। আমরা ডাকতাম 'মাসিমা' বলে। তাঁকে নিয়ে বাস করছে। নিজে চাকরি করে পূর্ববঙ্গের কারা-প্রধান তথা 'ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস্'-এর অফিসে। তারই গোপন সহকারী। 'কনফিডেনস্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট'। অফিস ঢাকা জেলেরই ভেতরে। আর তার তাঁতিবাজারের বাসায় কমিউনিস্ট ডেন! 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'। সেখানে রাতের অন্ধকারে আসেন কমিউনিস্ট নেতা ফণি গুহ, অনিল মুখার্জি, জ্ঞান চক্রবর্তী, আবদুল বারি, রওশন শেখ, মনু মিয়া এঁরা। আসেন সংগঠনের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে। রাতের আঁধারে আসেন। দিনের বেলা থাকতে হলেও অন্ধকারেই থাকেন। আবার আঁধার হলে যার যেখানে যাওয়ার চলে যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে। সন্তোষের বাসায় ছিলেন কৃষকনেতা অজিত চ্যাটার্জির স্ত্রী রানু চ্যাটার্জিও।

এই 'ডেনে'র বিষয়ে আর একটু জিজ্ঞেস করতে সন্তোষ স্বল্পতম দৈর্ঘ্যের দুএকটি বাক্যে বলল, আসলে ডেনটা আরো আগে তুলে দেওয়া উচিত ছিলো। আমার বাসায় ঢোকার মুখেই কিছুদিন আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন ফণি গুহ। কাজেই বাড়িটার ওপর সরকারের আইইব তথা গুপ্ত পুলিশের 'ওয়াচ' অবশ্যই ছিলো। কিন্তু পার্টি প্রয়োজনীয় সময়ে উপযুক্ত ডিসিশন নিতে পারে নি।

আমি এত সবের কিছুই জানতাম না। আমি ছিলাম নির্বাসনে। ঢাকা জেলার মনোহরদি থানার চালাকচর-পীরপুর-শরীফপুর অঞ্চলে আত্মগুপ্ত অবস্থায়। আমার চাকরিতে রিজাইন করে 'আন্ডারগ্রাউন্ড' চলে যাওয়ার পর থেকেই হয়ত বা '৪৮ সনের মধ্যে কিংবা শেষ দিক থেকেই। সেখানে আমার চলছিল ভালোই। জলের মধ্যে মাছের যেমন। কাঁঠাল আর শুঁটকি-পুঁটির পোড়া খেয়ে।

কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ছোট্ট খামে হুকুম গেল : তোমাকে ২৩ ডিসেম্বর ঢাকায় আসতে হবে সাংগঠনিক আলোচনার জন্য। 'কোরিয়ার' গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবে। তুমি রেডি থেকো।

আমি রেডি ছিলাম। আর 'কোরিয়ার' আমাকে রাতের আঁধারে প্রায় চোখ বাঁধার মতো করে অপরিচিত একটি এলাকার অপরিচিত একটি বাড়িতে নিয়ে এসে রেখে গেল। সেখানেই আলোচনাটি বসেছিলো। সকালের সেশন শেষ হয়েছে। হয়ত পাঁচ-ছ' জনের বৈঠক। দুপুরে বিরাম। খাওয়া-দাওয়ার জন্য। উচ্চকণ্ঠে কোনো কথা নয়। হাসিও নয়। কাশিও নয়। এ বাড়িতে কোনো লোক আছে, তা কেউ আন্দাজ করবে কী করে?

কিন্তু যাদের শ্বাপদ-চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল নিরীহ কেসেমের লোকগুলোকে, তারা ঠিকই আন্দাজ পেয়েছিলো।

তাই দুপুরের শেষে, অন্ধকারের অপেক্ষা না করেই তারা আক্রমণ করল। বাড়িটা ঘিরে ফেলল। পেছনের দরজায় দমাদম আঘাত পড়ল। আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না, কী ঘটতে যাচ্ছে।

বিকেল বোধ হয় চারটে। পালাবার কোনো পথ নেই। তবু একটা দরজা দিয়ে দেয়াল টপকে পাশের বাড়িতে পড়লাম। সাথে তখন আর কে যেন ছিল। চারপাশের বাড়ির ছাদেই মানুষজন উঠে গেছে। তারা হয়ত ভাবছে, পুলিশ ডাকাত ধরছে। আমরা এ বাড়ি থেকে ওবাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করতেই চারদিকে থেকে শব্দ উঠছে 'ঐ যায়, ঐ যায়।' এখন ভবতে মজাই রাগছে। কিন্তু সেদিন?

পুলিশ সন্তোষের গায়ে হাত তুলেছিলো। হয়ত লাঠি মেরেছিলো। মাসিমা সহ্য করতে পারেন নি। চুলোর পাশ থেকে লাকড়ি তুলে তিনিও তাগ করেছিলেন পুলিশের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনিট পনেরোর মধ্যে অপারেশন শেষ। সন্তোষ, মাসিমা, রানু চ্যাটার্জিসহ আমাদের সবাইকে ধরে একটা জায়গায় জড়ো করে নিয়ে এলো পাশের কোতোয়ালী থানায়। বসিয়ে রাখল এক গারদে। কিছু পরে দেখলাম আই বি মানে গুপ্ত পুলিশ নানা জায়গা থেকে খবর পেয়ে ছুটে আসছে। সবাইকে দেখছে। কার কী নাম, জেনে নিচ্ছে। আমার নাম শুনে অবাক হলো। চেহারার দিকে চেয়ে পছন্দ হলো না। ক্ষুদ্র দেহে ভারি নাম। এই নামের পেছনে তারা এখানে ওখানে এতদিন ছুটে বেড়িয়েছে! জেরার সময়ে আপ্যায়ন যে আরো কিছু না জুটেছিলো তা নয়। কিন্তু সে কথা স্মরণ করে কী হবে? রাতটা থানায় রাখল। পরের দিন পাঠিয়ে দিল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। জেলের গেটে নাম-পরিচয় লিখে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো নানান জনকে নানান জায়গাতে। আমার সঙ্গে ছিলেন বোধ হয় সন্তোষ আর রেলশ্রমিক নেতা বারি সাহেব।

জেলখানার অফিস থেকে ভেতরে 'এসকর্ট' করে নিয়ে গিয়েছিলো নিরাপত্তা বন্দীদের খবরদারি করতো যে জাঁদরেল জমাদার, সেই নাজির জমাদার। গোড়াতে ছিল বোধ হয় বিহারি। কিন্তু বাংলাদেশে থাকতে থাকতে 'বাংলা-বিহারিতে' পরিণত হয়ে গেছিলো। দশাসই চেহারা। ভারি আওয়াজ। নিয়ে গেল আমাদের 'ফাঁসির সেল' তথা খুপরিতে। আট ডিগ্রিতে। পাশাপাশি আটটা খুপরি। সামনে পাশে উঁচু দেয়াল। ফাঁসির ডিগ্রিতে ঢোকাতে ঢোকাতে নাজির জমাদার আওয়াজ দিল, 'যাইয়ে। হিয়াঁছে আর যানে নেহি সাকতা। এখান থেকে আর বেরুতে হবে না।' সেদিনের পরিবেশে হুঙ্কারটা মিথ্যে ছিল না।

আমি এখনো জানিনে, সেই সেকালে, আমাদের গ্রেফতারের খবর অন্তত 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় ২৬ ডিসেম্বর কিংবা তার কাছাকাছি কোনো তারিখে কিভাবে উঠেছিলো।...

কথা শুরু করেছিলাম 'চল্লিশের দশক' নিয়ে। সেই ৪০ সনে বরিশালের একটি নিরীহ 'পোলা' কিশোর বালকের ঢাকা আগমনের কথা বলে।

সম্প্রতি জাতীয় যাদুঘরের উদ্যোগী একজন কর্মী আবদুল মোতালেব আমাকে দিয়ে জন্ম থেকে অর্থাৎ ২৫ থেকে '৯৩ পর্যন্ত জীবনের কাহিনীর একটি 'আউটলাইট' বারবার অনুরোধ করে বলিয়ে তাঁর শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরে রাখলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটা অনুভূতি জেগেছিলো। তাঁকে বলেছিলাম, আমার জীবনের আবার কথা কি? তবু বলতে গিয়ে দেখলাম, কথা কথাকে টেনে তুলছে। ঘটনা ঘটনাকে। তার পরিমাণে নিজেই একটু বিস্মিত হয়ে গেলাম। দ্বিধায়-সঙ্কোচে পূর্ণ সেই 'পোলার' মনে জমা কথার পরিমাণ আজ দেখছি খুব কম নয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নয়। কোনো ঘটনার বিস্তারিতস্মৃতি নেই।

আজ এখানেও এই নতুন পর্যায়ের কোনো বিস্তারিত বিবরণ নয়। এ প্রসঙ্গে উত্থাপন কেবল এই কথা বলতে যে, চল্লিশের দশকের যবনিকা ঘটল আমার জীবনে সেই ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপরের পর্যায় জেলের পর্যায়। রাজবন্দীর জীবনের পর্যায়। এই পর্যায়ের দৈর্ঘ্য কয়েক কিস্তিতে প্রায় এগারো বছর। এই এগারো বছরেই বাইরের পৃথিবীতে, পূর্ববঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রথম পর্যায়ে বন্দী ছিলাম '৪৯ থেকে '৫৫ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

এই প্রথম পর্যায়েই ঘটেছিলো ঢাকা জেলের প্রায় একশ' রাজবন্দীর দীর্ঘ ৫৮ দিনের অনশন সংগ্রাম। জেলের ভেতর মানবেতর অবস্থা থেকে রাজবন্দীদের একটু মানুষের মতো মর্যাদা আদায় করার সংগ্রাম। এই অনশন ধর্মঘটের মাঝখানেই আমরা গ্রেফতার হয়েছিলাম। আর গ্রেফতার হওয়ার পরদিন থেকে অনশন সংগ্রাম আমরাও শুরু করেছিলাম। অন্য বন্ধুদের যদি ৫৮ দিন হয়েছিলো তো মাঝখান থেকে আমাদের অর্থাৎ আমার, সন্তোষ, বারি সাহেব, এদের অন্তত ৩৩ দিন অনশন হয়েছিলো। কিন্তু তার মর্মান্তিক কাহিনী সংক্ষেপে বলা যায় না। অপর দুএকটি উপলক্ষে কিছু স্মৃতির টুকরোতে হয়ত এর আভাস দেবার চেষ্টা করেছি।

এই অনশনের দশ দিনের দিন ঘটেছিলো বন্দী, কুষ্টিয়ার শ্রমিক নেতা শিবেন রায়ের হত্যাকাণ্ড। 'ফোর্সড্ ফিডিং' বা জোর করে নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে দুধ বা জলীয় কিছু ঢেলে দেওয়ার সময়ে শ্বাস বন্ধ করে হত্যা করার মর্মান্তিক ঘটনা।

আমার আফসোস পূর্ববঙ্গের রাজবন্দীদের বছরের পর বছর বন্দীদশার কাহিনী, তাদের নির্যাতনভোগ, নিহত হওয়া এবং সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেদের রাজনৈতিক মনোবল রক্ষার অবিশ্বাস্য চেষ্টার কাহিনী আজ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে রচিত হয় নি। এবং সে কাহিনী বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম এবং তার প্রগতিশীল সংগ্রামী কর্মীদের কাছে অজ্ঞাত। অথচ কারাগারের অন্তরালে সেদিনের শত শত কমিউনিস্ট রাজবন্দীর মরণপণ সংগ্রাম কারাগারের বাইরের রাজনৈতিক জীবনকে অনুপ্রাণিত করে জঙ্গি ও সংগ্রামী করে তুলেছিলো। আবার বাইরের সংগ্রামী জীবনের বিস্তার ও বিকাশ কারাগারের ভেতরের মুমূর্ষু রাজবন্দীদের জীবনকে আশার আলো দিয়ে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলো।

অনশন ধর্মঘটের বিস্তার ঘটেছিলো রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে এবং সিলেটের জেলেও। সিলেটের জেলে '৫০ সনে স্থানান্তরিত হয়ে জেনেছিলাম সিলেট জেলের সাথীদের ওপর প্রৌঢ়, প্রবীণ আর কিশোর বন্দীদের ওপর অবিশ্বাস্য অত্যাচারের কথা।

এই '৫০ সনেই ঘটেছিলো রাজশাহীর রাজবন্দীদের ওপর ২৪ এপ্রিল খাপড়া ওয়ার্ডে নির্বিচার গুলিবর্ষণ। আর তাতে নিহত হয়েছিলেন সাতজন রাজবন্দী, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলনের নেতা হানিফ শেখ, বিজন সেন, সুধীনধর, কম্পরাম সিং, আনোয়ার হোসেন, দেলোয়ার হোসেন এবং সুখেন ভট্টাচার্য। আহত হয়েছিলেন আরো অনেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই '৪৯-৫০ সনেই সাঁওতাল আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ইলামিত্র এবং সাঁওতাল কর্মীরা গ্রেফতার হয়ে এসেছিলেন। গ্রেফতারের মুহূর্ত থেকে থানার হাজতে ইলামিত্রের ওপর সংঘটিত হয়েছিলো অবিশ্বাস্য পাশবিক নির্যাতন। সংখ্যাহীন সাঁওতাল বন্দী থানায় এবং জেলখানায় অত্যাচারিত হয়ে নিহত হয়েছিলেন।...

দশকের হিসেব হয়ত কালের বুকে সামান্য সময়ের হিসেব। তবু এই সামান্য সময়ের অসমান্য ঘটনাসমূহই রচনা করেছিলো পূর্ববঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী বিবর্তন ও বিকাশের ভিত্তিভূমি।

২৪.৯.১৯৯৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~